বাংলাদেশের সিকিমীকরণ ও নাৎসীবাদের পথ

সিরাজুর রহমান

লেখকের কলাম থেকে

বাংলাদেশের মানুষের যখন মুক্তিযুদ্ধে কখন কি ঘটছে জানার সুযোগ ছিলো না, পাশের গ্রামের খবরও যখন দুষ্প্রাপ্য ছিলো, তখন বিবিসি বাংলা বিভাগে সাময়িক প্রসঙ্গের দায়িত্বে থাকায় অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থান ছিলো আমার। খণ্ড খণ্ড এবং টুকরো টুকরো খবর জোড়া দিয়ে মোটামুটি নির্ভরযোগ্য পূর্ণাঙ্গ চিত্র বাংলাদেশের ভীত, আতঙ্কিত মানুষকে শোনাতে পেরেছি। বিশ্বের মিডিয়ায় মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত খবরাদি প্রতিদিন সঙ্কলন ও প্রচার শুধু বিবিসির জন্যেই সম্ভব ছিলো তখন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী আমার অনুরোধ ও পীড়াপীড়িতেই লন্ডনে আমাদের আন্দোলনে যোগ দিতে রাজি হন।

• • •

পাকিস্তান থেকে মুক্তি পেয়ে শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডনে এলেন এ ধারণা নিয়ে যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তানকে 'অটোনমি' দিতে রাজি হয়েছেন। বাংলাদেশ যে অটোনমি নয়, স্বাধীনতাই অর্জন করেছে, সে খবরটা সর্বপ্রথম আমি তাকে দিয়েছিলাম।

• • •

সন্তানের যারা জন্ম দেন সে সন্তানকে মানুষ করার, জীবনে প্রতিষ্ঠা দেবার অনেকখানি দায়িত্ব তার ওপর বর্তায়। মুক্তিযুদ্ধে আমার ভূমিকা ছিলো। বর্তমান দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা কাটিয়ে দেশটাকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর তাগিদ সব সময় বোধ করেছি। এ তাড়না থেকেই সংবাদপত্রে কলাম লিখতে শুরু করি।

• • •

দিনে দিনে বয়স বাড়ছে, স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়ছে। প্রতিভাবান পুত্র ও কন্যাকে নিয়ে আমার স্ত্রী ও আমার গর্বের অবধি ছিলো না। তাদের অকালমৃত্যু আমাদের বুক ও সাহস ভেঙে দিয়ে গেছে। এখন আমরা ক্লান্ত। তবু বাংলাদেশকে সন্তান বিবেচনা করেই এতোদিন মানুষ করার চেষ্টা করেছি। আমার সাধের বইগুলোর বক্তব্য সময় এলে অন্য কেউ লিখবেন বলে আশা করি। অপারগতার জন্য পাঠকদের কাছে আমি আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থী।

বাংলাদেশের সিকিমীকরণ

ও

নাৎসীবাদের পথ

বাংলাদেশের সিকিমীকরণ ও নাৎসীবাদের পথ

সিরাজুর রহমান

কাশবন প্রকাশন, ঢাকা

বাংলাদেশের সিকিমীকরণ ও নাৎসীবাদের পথ

সিরাজুর রহমান

প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১৬

প্রকাশক
আমিনুল ইসলাম
কাশবন প্রকাশন
২৫৪ নবাবপুর রোড, ঢাকা ১১০০
মোবা ঃ ০১৫৫২-৩৩০৯০৮
e-mail : kashban@gmail.com

গ্রন্থস্বত্ব : সোফিয়া রহমান

পরিবেশক
উত্তরণ : বাংলাবাজার, ঢাকা
পাঠক সমাবেশ : শাহবাগ, ঢাকা
বাতিঘর : চট্টগ্রাম

প্রচ্ছদ : ম. হামিদুল হক মানিক

বর্ণবিন্যাস : মাইক্রোটেক কম্পিউটার্স
৪৭/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মুদ্রণে : জনপ্রিয় প্রিন্টিং
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মূল্য : ৬০০ টাকা মাত্র

Bangladeshser Sikimikoron O Natsibader Path by Sirajur Rahman
Published by : Kashban Prokashan, 254 Nawabpur Road, Dhaka 1100.
Price Tk. 600.00 US. Dollar 20.00 only.

ISBN : 978-984-91437-0-3

উৎসর্গ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও
গণতন্ত্রকামী জনসাধারণের হাতে–

এই লেখকের আরো কিছু প্রকাশিত গ্রন্থ

এক জীবন এক ইতিহাস
রাজনৈতিক প্রবন্ধ
ইতিহাস কথা কয় ও নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ
ইরাকের বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধ
লন্ডনের চিঠি
বাংলাদেশ স্বাধীনতার পনেরো বছর
প্রীতি নিন সকলে

অনুবাদ

রক্ত আখর
টম সয়্যার
গ্রেট এক্সপেক্টেশন্স
প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস
জেন এয়ার
চেকফের নাটক

কলকাতা থেকে

সম্পাদক দায়ী নহেন
বিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত
একান্ত তোমারি
ভালুক

শ্রদ্ধা নিবেদন

১৯৫২ সালে সিরাজুর রহমান যখন পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের (EPUJ) ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তারও ৫ বছর পর আমার জন্ম। আজ ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (DUJ) সভাপতি হিসাবে যখন তার গ্রন্থে এই শ্রদ্ধা নিবেদন লিখছি, তারও বছর খানিক আগে স্বজন স্বদেশ থেকে বহুদূরে সুদূর লন্ডনে, কাউকে কিছু না বলে তিনি চলে গেছেন না ফেরার দেশে।

সিরাজুর রহমানের জন্ম ১৯৩০ এ নোয়াখালীতে মৃত্যু ২০১৫ এ লন্ডনে। মাঝখানে ৮৫ বছরের সফল সজীব সক্রিয় কীর্তিমান জীবন। সব দিক দিয়েই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাৎপর্যপূর্ণ ও বর্ণাঢ্য এক সাংবাদিক জীবন তিনি উদ্‌যাপন করে গেছেন। তার মতো অতো উঁচুতে ওঠা বাংলাদেশী সাংবাদিকদের পক্ষে আর কখনো সম্ভব হবে কিনা জানি না। ৬০ বছরের সাংবাদিক জীবনের ৩৪ বছর আবার কাটিয়েছেন ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশনে (BBC)। সেজন্য সিরাজুর রহমানের আত্মজীবনী 'এক জীবন এক ইতিহাস' শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির জীবন কথা নয়। এ হলো আমাদের ফেলে আসা সমাজ জীবনের মহামূল্যবান ইতিহাস। আমাদের সাংবাদিকতার জলজ্যান্ত দলিল। আমাদের নিজেদের দেখার ও চেনার আয়না।

শেরে বাংলার পত্রিকা নবযুগে জাতীয় কবি নজরুলের হাত দিয়ে ছাপা হয়েছিল তার গল্প। ৪৬-এর কলকাতার দাঙ্গা তাকে নিয়ে এসেছিল সাংবাদিকতায়। গুরু হিসাবে পেয়েছিলেন মোহাম্মদ মোদাব্বেরের মতো কালজয়ী ব্যক্তিত্বকে। সাংবাদপত্রের রিপোর্টার, সাব এডিটর, বার্তা সম্পাদক, সম্পাদকসহ এমন কোন অবস্থান নেই, যেখানে সিরাজুর রহমান তার ভূমিকা উচ্চকিত করেননি। পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁকে আমরা পেয়েছি। ভাষা আন্দোলনে অংশ নেয়ার অপরাধে তাঁর পারিবারিক জীবনে নেমে আসে বিচ্ছেদ। নিজের ঢোল নিজে পেটানোর বদ খাসলত তার ছিল না বলে সে সব কাহিনী চাপাই পড়ে আছে। আমাদের স্বাধিকার আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন কোথায় নেই তিনি! সবখানেই তো তিনি সবার চেয়ে এগিয়ে।

তার ব্যক্তি জীবনটা যেমন স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন, গতিশীল, তেমনি তার লেখা ও বলার ভঙ্গিটিও। নির্মোহ, নৈর্ব্যক্তিক, সংযত এবং সংহত। আবদুল গাফফার চৌধুরীদের মতো আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সত্য মিথ্যার খিচুড়ি রান্না করা তার রুচির সাথে মিস খায় না। তার ভাষা নির্মেদ, ঝরঝরে। অতিকথন, অতিরঞ্জন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত কিন্তু তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ গভীর গ্রাহী।

২০১০ সালে লন্ডনে তার আশি বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কুইন মেরি ইউনিভার্সিটিতে তাকে যে নাগরিক সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিল, সেই অনুষ্ঠানে ঢাকা থেকে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে অংশ নেয়ার। এর কারণ বোধ করি প্রফেসর ড. কে. এম. এ মালিক ও সাইদ চৌধুরীর ভালোবাসা। সিরাজ ভাইর ব্যক্তিগত আগ্রহও এর পিছনে অনুঘটকের কাজ করেছিল হয়তো। আমি

'সিরাজুর রহমান চির দিনের' কবিতাটি নিয়ে গিয়েছিলাম। সেটাই মানপত্র হিসাবে পঠিত হয়েছিল। যা প্রকাশক বইয়ের শেষ মলাটে সন্নিবিষ্ট করেছেন। দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক আমার দেশের সঙ্গে সিরাজ ভাইর গাটছড়া বাঁধার কাজটিও সম্পাদিত হয় আমা কর্তৃক। অবশ্য পেছনে তাড়া ও তাগাদা ছিল দুই সম্পাদক এ. এম. এম বাহাউদ্দিন ও প্রকৌশলী মাহমুদুর রহমানের।

আমাদের গণমাধ্যম ও জাতীয় ইতিহাসে তার স্থানটি চিরকালই ঢাকার গণমাধ্যমে কর্মরত লিলিপুট ও সাংবাদিকদের নেতা হিসাবে পরিচিত 'বামুন'দের চাইতে বহু উঁচুতে অবস্থান করবে। এই অবস্থান তার যোগ্যতা, মেধা, প্রতিভা, রুচি, শিক্ষা, অঙ্গীকার ও দেশপ্রেমের কারণে। তাছাড়া কর্ম পরিধিও ছিল ব্যাপক, বিশাল। তিনি যেমন মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিব, জিয়াউর রহমানের ঘনিষ্টজন ছিলেন, তেমনি কর্নেল নাসের, মার্শাল টিটো, রাণী এলিজাবেথ, ফিডেল কাস্ট্রো, জ্যাক শিরাক. মাভো বন্দর নায়েকের মতো রাষ্ট্রনেতারাও এক নামে চিনতেন সিরাজুর রহমানকে।

অপরিসীম ভদ্রতাবোধ, সৌজন্যতা ও শিষ্টাচার ছিল তার চরিত্রের অলংকার। আবার ভিতরে ভিতরে ছিলেন সাংঘাতিক দৃঢ়চেতা। বাইরে থেকে বোঝাই যেতো না। আবার নিজেকে গৌরব জাহির করে বেড়ানোর যে স্বভাব বাংলাদেশের গণমাধ্যমের মূর্খ কর্তাদের জেনেটিক্যাল ডিজিজ, বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীদের আত্ম-প্রচারের যে কুৎসিত মহড়া দেশবাসীকে প্রতিনিয়ত সহ্য করতে হয়, সিরাজুর রহমান ছিলেন এই সব রোগ বালাই থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

দলান্ধ, স্বার্থান্ধ, মতলবান্ধ কোন উচ্চাভিলাষ তার ছিল না। ফলে আওয়ামী বুদ্ধিজীবী নামের 'পিরানহা' এবং জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী নামের 'গবেট'দের গোষ্ঠীভুক্তও তিনি ছিলেন না। সব দিক থেকেই তিনি ছিলেন সম্মান ও মর্যাদায় উজ্জ্বল এবং এক মেবাদ্বিতীয়ম।

বর্তমান গ্রন্থটির সব কটি লেখাই তার জীবনের শেষ কয়েক বছরে প্রণীত। সবকটিই জাতীয় পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত। এগুলোর গ্রন্থিত অবয়ব তিনি দিয়ে যেতে পারেননি। সেই দায় কাঁধে তুলে নিয়েছে আমার তরুণ বন্ধু আতিকুর রহমান রুমন। সহযোগিতা করেছেন জনাব মাসুমুর রহমান খলিলী এবং কাশবন প্রকশনার সত্ত্বাধিকারী আমিনুল ইসলাম ভাই। প্রুফ দেখার কষ্টটা স্বীকার করেছেন জহুরুল ইসলাম, তাদের চেষ্টায়ই বইটি আলোর মুখ দেখলো। আমি ধন্যবাদ দিয়ে তাদের ছোট করতে চাই না। তবে সবার উদ্দেশ্যে বলতে চাই সিরাজুর রহমানকে জানা, পাঠ করার অর্থই হলো দেশের কল্যাণের দিকে এগিয়ে যাওয়া। ক্রমাগত দায়িত্বশীল হয়ে ওঠা। সে কাজ এ গ্রন্থের মাধ্যমে আরও খানিকটা ত্বরান্বিত হবে।

সত্য ও সুন্দরের যাত্রী সিরাজুর রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেই শ্রদ্ধার পর্ব শেষ করা যেতো। কিন্তু আমি আরও এগিয়ে বলবো, তার দেশপ্রেম, অঙ্গীকার, মানবপ্রীতি ও দায়িত্ববোধের আলোকছটা ছড়িয়ে পড়ুক আমাদের যাপিত জীবনের দশ দিকে। তবেই তার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো সার্থক হবে।

আবদুল হাই শিকদার

ভূমিকা

চৌত্রিশ বছর চাকরি করেছি বিবিসিতে। এই বছরগুলোর কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যেসব উদ্ভাবন ও অগ্রগতি দেখেছি পূর্ববর্তী হাজার বছরেও ততোটা হয়েছে কিনা সন্দেহ। সারা বিশ্বের অজস্র সাধারণ ও যুগান্তকারী ঘটনার আদ্যোপান্ত জানার সুযোগ হয়েছে। কোন ঘটনার কথা মনে হলেই এখন তার বৃহত্তর, এমন কি বিশ্ব প্রেক্ষিতের কথাও ভাবতে ইচ্ছে করে। বর্তমান বাংলাদেশের সঙ্গে আমার নিবিড় পরিচয় ১৯৪৮ সালে, পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পর থেকেই। তার দু'বছর পর থেকেই পূর্ণকালীন সাংবাদিকতা শুরু। বলতে গেলে এই ভূখণ্ডের প্রথম প্রজন্মের সাংবাদিকদের আমিও একজন। রাজধানী ঢাকা ক্ষুদ্র একটা জেলা শহর ছিলো তখন। প্রথম প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক আমরা। তাও সংখ্যায় খুবই সীমিত। প্রথম কাতারের রাজনীতিকও ছিলেন স্বল্প সংখ্যক। আমাদের মতো নবীশ সাংবাদিকদেরও প্রায় অবাধ প্রবেশাধিকার ছিলো তাদের কাছে।

অবশ্যি তার আগে কলকাতায়ও কোন কোন জ্যেষ্ঠ রাজনীতিককে চিনতাম। মুকুল ফৌজের সক্রিয় সদস্য ছিলাম। সে সুবাদে রিলিফের কাজ ইত্যাদি কারণে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, খাজা নাজিমুদ্দিন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখদের দর্শন পেয়েছি। ছাত্র রাজনীতিক শেখ মুজিবুর রহমান আমার বড়ো ভাইয়ের বন্ধু ছিলেন। সে সুবাদে তখন থেকেই তাকে ভাই ডাকি। ঢাকায় সাংবাদিক হিসেবে এদের, মওলানা ভাসানী, নূরুল আমিন, আতাউর রহমান খান প্রমুখদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠেছে। সাত বছর ব্রিটিশ হাইকমিশনের তথ্যাঙ্গ ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসের সম্পাদক ছিলাম। সে সুবাদেও অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। মোট কথা তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর নখাগ্রে ছিলো দাবি করা অত্যুক্তি হবে না মনে করি।

বাংলাদেশের মানুষের যখন মুক্তিযুদ্ধে কখন কি ঘটছে জানার সুযোগ ছিলো না, পাশের গ্রামের খবরও যখন দুষ্প্রাপ্য ছিলো, তখন বিবিসি বাংলা বিভাগে সাময়িক প্রসঙ্গের দায়িত্বে থাকায় অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থান ছিলো আমার। খণ্ড খণ্ড এবং টুকরো টুকরো খবর জোড়া দিয়ে মোটামুটি নির্ভরযোগ্য পূর্ণাঙ্গ চিত্র বাংলাদেশের ভীত, আতঙ্কিত মানুষকে শোনাতে পেরেছি। বিশ্বের মিডিয়ায় মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত খবরাদি প্রতিদিন সঙ্কলন ও প্রচার শুধু বিবিসির জন্যেই সম্ভব ছিলো তখন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী আমার অনুরোধ ও পীড়াপীড়িতেই লন্ডনে আমাদের আন্দোলনে যোগ দিতে রাজি হন। ভারতে নির্বাসিত অস্থায়ী

বাংলাদেশ সরকার তার পরেই বিদেশে তাকে তাদের প্রধান প্রতিনিধি নিযুক্ত করে। বিচারপতি চৌধুরী আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এ শর্তে যে আন্দোলনের বিশ্ব মিডিয়া সংযোগের দায়িত্ব আমাকে বহন করে যেতে হবে। এসব কারণে সর্বশেষ খবর সংগ্রহের এবং বাংলাদেশের মানুষকে শোনানোর অনন্য সুযোগ আমার ছিলো। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী বাহিনী ঢাকায় আত্মসমর্পণ করবে–এ খবর আমরা বিবিসিতে আগের রাতেই পেয়ে গিয়েছিলাম–ভারত সরকার ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দফতরকে যে ইন্টেলিজেন্স দিয়েছিলো সে সূত্রে। কাজেই স্বাধীন বাংলাদেশের সন্তানদের তাদের স্বাধীন দেশ-মাতৃকার জন্মের খবর দেবার জন্যে বিজয় দিবসে বাংলাদেশ সময় বিকেল চারটায় একটা বিশেষ বাংলা সংবাদ বুলেটিন প্রচারের আগাম ব্যবস্থা করা আমাদের জন্যে সম্ভব হয়েছিলো। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের প্রথম ঘোষণা প্রচারের সময় নয় মাসের ভয়াবহ খবরগুলো মনে ভিড় করছিলো, আবেগে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসতে চাইছিলো।

স্বাধীনতার পরের কয়েকটি বছর প্রায়ই বাংলাদেশে গেছি। সর্বোচ্চ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় পর্যায় পর্যন্তও নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে বহুবার সাক্ষাৎ এবং সংলাপ হয়েছে। তাই বলতে দ্বিধা নেই যে বিক্ষুব্ধ, অশান্তিপূর্ণ এবং সকরুণ এই অধ্যায়টির সঙ্গেও আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ ছিলো। দেশে কী ঘটা প্রয়োজন ছিলো সারা বিশ্বের মিডিয়া বার বার করে বলেছে। বাংলাদেশে যারা একটুও চিন্তা করতেন জানতেন তারাও। কিন্তু ঘটেছে সম্পূর্ণ বিপরীত। পাকিস্তান থেকে মুক্তি পেয়ে শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডনে এলেন এ ধারণা নিয়ে যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তানকে 'অটোনমি' দিতে রাজি হয়েছেন। বাংলাদেশ যে অটোনমি নয়, স্বাধীনতাই অর্জন করেছে, সে খবরটা সর্বপ্রথম আমি তাকে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম সঠিক সংখ্যা জানা সম্ভব ছিলো না, আনুমানিক তিন লাখ লোক মুক্তিযুদ্ধে মারা গেছে। এবং তাকে বলেছিলাম দেশ আকারে ক্ষুদ্র, জনসংখ্যার ভিড় টইটম্বুর। সম্পদও খুবই সীমিত এবং যুদ্ধে অবকাঠামো প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। তার ওপর জনসাধারণের প্রত্যাশা ও ইউফোরিয়া আকাশচুম্বী। সবিনয়ে আশা প্রকাশ করেছিলাম যে দেশে ফিরে তিনি মহাত্মা গান্ধীর মতো জাতির পিতার ভূমিকা নেবেন এবং পুনর্গঠনের ওপর নজর রাখবেন। জাতি তাহলে ধৈর্য ধরে কঠোর পরিশ্রম করবে এবং সমৃদ্ধির ভিত্তি রচিত হবে।

পরবর্তীকালে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত কলামে 'গ্রীক ট্রাজেডি' নাটকগুলোর উল্লেখ করেছি বহুবার। এসব নাটকের কাহিনীর পরিণতি কি হবে সকলেই জানতো। শুধু প্রধান চরিত্রগুলো বাদে। কিন্তু প্রতিবিধানের চেষ্টা কেউ করেনি।

ফলে যা অনিবার্য ছিলো তাই ঘটেছে। রাজা-রাজ্য-রাজবংশে ধ্বংস নেমে এসেছে। গ্রীসের গর্বিত ঐতিহ্য ও ইতিহাস বহুকাল অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিলো। সে রকমেরই একটা ব্যাপার ঘটে গেছে এবং যাচ্ছে বাংলাদেশে। শেখ মুজিবুর রহমান গান্ধী কিংবা জাতির পিতার ভূমিকা নেননি। তার বদলে তথাকথিত মুজিব নগরের (যে মুজিব নগরে যাবার আমন্ত্রণ মুজিব স্বয়ং বহুবার প্রত্যাখ্যান করেছেন) ঘোষণা অনুযায়ী গোড়ায় তিনি রাষ্ট্রপতির পদ অলংকৃত করলেন এবং পরে সংসদ, এমনকি ক্যাবিনেটেরও অনুমোদন না নিয়ে নির্বাহী রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি উল্টে দিয়ে সংসদীয় পদ্ধতি চালু করলেন এবং দলীয় প্রধানমন্ত্রীর বিতর্কিত ভূমিকা গ্রহণ করলেন।

বাংলাদেশের সরকার-প্রধানদের মধ্যে শেখ মুজিবের প্রশাসনই সবচাইতে বেশি গণবিচ্ছিন্ন এবং অসফল ছিলো। প্রকৃত প্রস্তাবে দেশে কি ঘটছে সামান্যতম ধারণাও তার ছিলো না। সারা দিন এবং রাতেরও অনেকখানি তিনি ফুলের মালা নিয়ে এবং স্তব-স্তুতি শুনে ব্যয় করেছেন। তাকে ঘিরে থাকা কর্মকর্তা (যাদের সকলে স্বাধীনতার পক্ষের লোক ছিলেন না) এবং চাটুকাররা যা বলেছেন তাতেই সায় দিয়েছেন তিনি। রক্ষী বাহিনীর পাইকারী হত্যালীলা, চুয়াত্তরের মন্বন্তর, জরুরি ক্ষমতা আইন, পত্রপত্রিকা নিষিদ্ধ করা এবং শেষতক বাকশাল চালু করা, এসবই ঘটতে পেরেছে সে কারণে। সারা বিশ্বের মিডিয়া একাত্তরে বিশ্ব জনমতকে আমাদের স্বাধীনতার অনুকূলে প্রভাবিত করেছিলো। তাদের সম্মিলিত পরামর্শেও কর্ণপাত করেননি শেখ মুজিবুর রহমান। দেশের মানুষের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। সে জন্যেই সেনাবাহিনীর কয়েকজন বিদ্রোহী অফিসার পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড ঘটাতে ভয় পায়নি।

অত্যন্ত কর্মব্যস্ত জীবনে দুটো অভিলাষ আমার ছিলো বলা চলে। মুক্তিযুদ্ধের আনুপূর্বিক ইতিহাস রচনা অবশ্যই ছিলো একটা। তারপর সাধ ছিলো আমার পূর্বপুরুষদের অত্যন্ত বর্ণাঢ্য কাহিনী নিয়ে একটা উপন্যাস লেখার। আমার মায়ের এক পূর্বপুরুষ সম্রাট আকবরের সেনাবাহিনীতে গোলন্দাজ ছিলেন। আকবর তার অমাত্য মানসিংহকে বাংলা জয় করতে পাঠিয়েছিলেন। বাংলার ভূঁইয়াদের পিটুনি খেয়ে অবশেষে মানসিংহ কোনমতে একটা চুক্তি করে মান বাঁচিয়ে দিল্লি ফিরে যান। কিন্তু তার সেনাবাহিনীর অধিকাংশই ছত্রখান হয়ে গিয়েছিলো। অনেকেই বসতি করে বাংলায় থেকে যান। তাদের একজন ছিলেন আমার মায়ের পূর্ব পুরুষ। আমার মায়ের বিবাহপূর্ব বংশগত পদবী ছিলো গোলন্দাজ।

পিতার দিক থেকে আমাদের বংশগত পদবী ভূঁইয়া। তার যুগ হিসেবে আমার দাদা খুবই আধুনিক চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন। সামন্ত যুগের ভূঁইয়া

পদবী তিনি পরিত্যাগ করেন, যদিও এক চাচা সে পদবী আঁকড়ে ছিলেন। অর্থাৎ মোগল-পাঠান দুই ধারার সংমিশ্রণ ঘটেছিলো আমাদের পরিবারে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সে অধ্যায়ে রেলপথ ও সরকারি ডাক সারা দেশে বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু ঠগিদের উৎপাত তখন তুঙ্গে। বাংলার বহু মুসলমান তখনও ইংরেজি শিক্ষা বর্জন করে চলেছে, ইংরেজের সঙ্গে অসহযোগিতা করছে। কিন্তু আমার দাদা ও নানা ছিলেন ভিন্ন চরিত্রের মানুষ। এসব এবং আনুষঙ্গিক অজস্র রোমান্টিক ও অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী শুনেছি দাদী আর আম্মার কাছে। এ পরিবারের পুরুষরা কর্মজীবন নিয়ে এতোই ব্যস্ত থাকতেন যে অতীতকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় ছিলো না তাদের। আমার খুবই ইচ্ছা ছিলো বিবিসি থেকে অবসর নিয়ে এই দুটো বই লেখায় নিজেকে নিয়োজিত রাখবো।

কিন্তু বিধি বাম। বিবিসির চাকরি থেকে অবসরের সময় হবার অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশ ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছিলো। যারা অশাসন-কুশাসন দিয়ে দেশের সর্বনাশ করছিলো তারা গদি ছাড়তে প্রস্তুত ছিলো না। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টা মুজিব ছিলেন পাকিস্তানে। আওয়ামী লীগ নেতারা ভারতে। দেশে কি ঘটেছে জানা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। মুক্তিযুদ্ধ করেছেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কয়েকজন দলত্যাগী বাংলাদেশী অফিসার এবং বিডিআরের কয়েকজন সদস্য। ছাত্র-জনতা স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং অসম যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। দেশকে স্বাধীনতার নৈতিক শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক নায়করা। ২৫ মার্চের কালোরাতেই শীর্ষ বুদ্ধিবৃত্তিক নায়কদের হত্যা করে বর্বর পাকিস্তানী বাহিনী। সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সঙ্গীতশিল্পীদের যারা সক্রিয়ভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন ১২ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে পাকিস্তানীদের ভাড়াটে ঘাতক রাজাকার আলবদরদের হাতে তাদের অনেকে নিহত হন। অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বে বড়ো রকমের একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিলো।

বিজয়ের পরক্ষণেই ভারতে পলাতকরা ফিরে এসে স্বাধীনতার মালিকানা দাবি করে বসলেন। পাকিস্তান থেকে ফেরৎ যাত্রার সময় শেখ মুজিব জানতেনই না যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু গদি গ্রাসকারীরা নিজেদের স্বার্থে তাকে বোঝালো যে স্বাধীনতার এবং বাংলাদেশের একাধিপতি হচ্ছেন তিনি। শেখ মুজিবুর রহমান চাটুকারদের বিদ্রূপ করতেন কিন্তু চাটুকারিতা তিনি আন্তরিক উপভোগ করতেন। তার মাথায় নুন রেখে কুল খাওয়া চাটুকারদের জন্যে কঠিন হয়নি। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে যেসব মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে এবং এখনো ঘটে যাচ্ছে তার চাবিকাঠি পাওয়া যাবে এই দুটো ব্যাপারের মধ্যে।

সন্তানের যারা জন্ম দেন সে সন্তানকে মানুষ করার, জীবনে প্রতিষ্ঠা দেবার অনেকখানি দায়িত্ব তার ওপর বর্তায়। মুক্তিযুদ্ধে আমার ভূমিকা ছিলো। বর্তমান দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা কাটিয়ে দেশটাকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর তাগিদ সব সময় বোধ করেছি। এ তাড়না থেকেই সংবাদপত্রে কলাম লিখতে শুরু করি। আশা ছিলো দেশের মানুষের চেতনা জাগ্রত হলে সে দায়িত্ব তারা নিজেরা কাঁধে নেবে এবং আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আমার সাধের দুখানি বই লেখায় আত্মনিয়োগ করবো। কিন্তু এই ভাগ্যাহত দেশে কোন কিছুই আশাবাদের ছক ধরে চলেনা। ওদিকে দিনে দিনে বয়স বাড়ছে, স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়ছে। প্রতিভাবান পুত্র ও কন্যাকে নিয়ে আমার স্ত্রী ও আমার গর্বের অবধি ছিলো না। তাদের অকালমৃত্যু আমাদের বুক ও সাহস ভেঙে দিয়ে গেছে। এখন আমরা ক্লান্ত। তবু বাংলাদেশকে সন্তান বিবেচনা করেই এতোদিন মানুষ করার চেষ্টা করেছি। আমার সাধের বইগুলোর বক্তব্য সময় এলে অন্য কেউ লিখবেন বলে আশা করি। অপারগতার জন্য পাঠকদের কাছে আমি আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থী।

এ বইতে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলো দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকায় কলাম হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদনা এবং পুস্তক হিসেবে প্রকাশের বেলায় সহযোগিতার জন্যে আমি ভ্রাতৃ-প্রতিম সাহিত্যিক-সাংবাদিক আলফাজ আনামের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার লেখালেখির ব্যাপারে সব সময় গবেষণার কাজে সহায়তা করেন আমার স্ত্রী সোফিয়া রহমান। তাকেও কৃতজ্ঞতা জানাই।

লন্ডন, নবেম্বর ২০১৪

সূচিপত্র

সংবিধানের জন্যে নয় গদি দখলের সর্বনাশা নির্বাচন ১৭
খালেদা জিয়া কি 'মাইনাস ওয়ান' হতে চলেছেন? ২৪
জাতিদ্রোহী 'সুশীল সমাজ' বাংলাদেশের গ্লানি ২৯
এই অসাধু সরকারের ওপর বিশ্বাস রাখা সত্যি অসম্ভব ৩৫
হাসিনা কি ইসলামকেও তালাবন্ধ করে দিতে চান? ৪০
অন্ধের দেশে বধিরের বিচার ৪৫
খালেদা জিয়ার ট্রাইব্যুনাল গঠনের হুঁশিয়ারি ৫২
বাংলাদেশে ইসলাম সত্যি সত্যি বিপন্ন ৫৮
ডাকাতের দেশে নির্দোষ মাত্রই অপরাধী ৬৩
সংলাপ-সংলাপ খেলা কালক্ষেপণের বাহানা মাত্র ৭০
পুত্র জয়কে দিয়ে নির্বাচনে জয় হবে না ৭৫
এখন গার্মেন্ট শিল্পেরই 'গণহত্যা' চলছে ৮১
সার্বভৌমত্বকে সর্বশেষ কবে দেখেছেন? ৮৫
দেশের নেতৃত্ব ভার গ্রহণে তারেক রহমান সম্পূর্ণ প্রস্তুত ৯১
আওয়ামী লীগের কোন দুর্গ নেই বাংলাদেশে ৯৫
জামায়াত কি ডুবন্ত ভাঙ্গা নৌকায় চড়তে রাজি হবে? ১০০
তারেক রহমান তার যথাযোগ্য আসনে অধিষ্ঠিত হবেন ১০৭
দেশটাকে লণ্ডভণ্ড করে দেবেন না, এবারে ক্ষ্যান্ত দিন ১১২
নিজের মরা অন্যের ঘাড়ে চাপানোর হাস্যকর চেষ্টা ১১৯
সরকারের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার এখনই সময় ১২৬
প্রধানমন্ত্রীর টেলিভাষণ বনাম দেশের করুণ বাস্তবতা ১৩২
হাসিনাকে নিয়ে ভারত-বাংলাদেশের স্বার্থ সাংঘর্ষিক ১৪০
গোটা বিশ্বকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছে সরকার ১৪৭
দেশের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংকটের একটা সার্বিক চিত্র ১৫৩
প্রয়োজন গণবিপ্লবের– সুবিবেচক হরতালে কাজ হবে না ১৬০
প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য বুঝতে হবে উল্টো করে ১৬৫
পঙ্কজ-সুজাতা বাংলাদেশীদের মুখ বিস্বাদ করে দিয়েছেন ১৭২
নূহ নবীর কিস্তি এবং জাতিসংঘ সনদের সপ্তম অধ্যায় ১৭৮
গণতন্ত্রের আন্দোলন এখন কোন পথে যাবে ১৮৬
জীবন সায়াহ্নের কিছু অভিলাষ কিছু ভাবনা ১৯৩

যে হাত খেতে দেয় সে হাত কামড়াতে নেই ১৯৯
ক্ষমতার শেষ শেকড়টিও কেটে গেছে উপজেলা নির্বাচনে ২০৭
দেশ চলেছে নাৎসিবাদের পথে ২১৫
নাৎসিরা যেভাবে জার্মান জাতিকে শেকলবন্দী করেছিলো ২২২
ভারতের ভ্রান্ত বাংলাদেশ নীতি পরিত্যাগ খুবই প্রয়োজন ২২৯
সাধারণ নির্বাচন : ভারতে এবং বাংলাদেশে ২৩৫
সংসদের ভাষা এবং স্পিকারের মেরুদণ্ড ২৪২
এ বইয়ের প্রকাশ আওয়ামী লীগের ফাটলকে তুলে ধরেছে ২৪৭
আর কতো লাশ পড়লে আতঙ্কিত হবার অনুমতি পাবো ২৫৪
আইন-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ২৬০
নরেন্দ্র মোদির হাজারো সমস্যা, দেশে ও বিদেশে ২৬৭
শহীদ জিয়ার অভাব এখন তীব্র অনুভূত হচ্ছে ২৭৪
আতঙ্কে ওদের আহার-নিদ্রা হারাম হয়ে যাচ্ছে ২৮০
গণতন্ত্রের যারা শত্রু আর যারা মিত্র তাদের চিনে রাখুন ২৮৭
সুষমা স্বরাজের সফর ও অন্ধের হাতি দেখা ২৯৩
সরকারের ভুয়া প্রতিশ্রুতি এবং বিএনপির দুর্বল আন্দোলন ২৯৯
গাজার গণহত্যা ও নতুন প্রজন্মের জাগ্রত বিবেক ৩০৫
হরিহরের পাঁঠা মানৎ এবং সরকারের পদ্মা সেতু নির্মাণ ৩১১
বাংলাদেশের সিকিমীকরণ দ্রুত এগিয়ে চলেছে ৩১৬
সূর্য্যরশ্মিকে শেকলবন্দী করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে সরকার ৩২৩
হাসিনার নির্বাচনী বিজয়ের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে ৩২৭
বিবেক দংশনে আত্মাহুতি এবং বিবেককে কোরবানী ৩৩৩
পিয়াস করিম ও লতিফ সিদ্দিকী– আওয়ামী বিচারের মাপকাঠি ৩৩৯
শেখ হাসিনার জাদুর কাঠি আর প্রতারিত বাংলাদেশ ৩৪৫
বর্তমান বাস্তবতার আলোকে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ৩৫১
থলির বিড়ালগুলো পাড়াময় লাফালাফি করছে ৩৫৮
শহীদ জিয়ার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়া বর্তমানে জরুরি প্রয়োজন ৩৬৪
পারশিষ্ট-১ : সিরাজুর রহমান : সংক্ষিপ্ত জীবন ৩৭১
পারশিষ্ট-২ : লন্ডনে লাবণ্য : কুইন মেরীতে বাংলাদেশ ৩৭৩

সংবিধানের জন্যে নয় গদি দখলের সর্বনাশা নির্বাচন

মধ্যপ্রাচ্য কিংবা উত্তর আফ্রিকার কোথায় আল কায়েদাসহ যুক্তরাষ্ট্রের কোন কাঙ্খিত সন্ত্রাসী নিজ বাড়িতে আছেন কিংবা গাড়িতে কোথাও যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের কোন ঘাঁটি থেকে কর্মরত অফিসার সেটা দেখতে পান। অবিলম্বে দূর-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে পাইলট বিহীন ড্রোন বিমান পাঠান তিনি। সে বিমান ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে কয়েক হাজার মাইল দূরের উক্ত সন্ত্রাসীকে ঘায়েল করে ফেলে। কৃত্রিম উপগ্রহ প্রযুক্তির দৌলতে এটা সম্ভব হয়েছে। এমনকি আপনি যদি আপনার পুকুর ঘাটে বসে হাত-পা ধোয়ার কাজে ব্যস্ত থাকেন তাহলে ১০ কিংবা ২০ হাজার মাইল দূরে থেকে শুধু যে আপনাকেই দেখা যাবে তা নয়, আপনি কি রংয়ের এবং কি নকশার জামা পরেছেন সেটাও পরিষ্কার দেখা যাবে।

শুধু যুক্তরাষ্ট্রই নয়, বৃটেন ফ্রান্স জার্মানী রাশিয়া চীনসহ অনেকগুলো দেশ এখন এই প্রযুক্তির অধিকারী এবং সেটা তারা নিয়মিত ব্যবহারও করে। শেখ হাসিনার সরকার যে সংখ্যক ভোট পেয়েছে বলে দাবি করছে সেটা যে ভুয়া এই দেশগুলো সেটা ইতোমধ্যেই জেনে গেছে কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ। তাছাড়া মোবাইল টেলিফোন, বহু বহু ব্লগ ও অন্যান্য সামাজিক মিডিয়ার কল্যাণে পৃথিবীর এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত মানুষ ভোট কেন্দ্রগুলোর ছবিও দেখে ফেলেছেন। এসব প্রযুক্তি এবং মিডিয়া বাংলাদেশও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। জ্ঞানান্ধ এবং ভণ্ড প্রতারকরা ছাড়া আর সকলেই এখন জানে অদ্ভুত এক নির্বাচন হয়ে গেলো বাংলাদেশে। যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কমনওয়েলথ, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং জাতিসংঘ ইতোমধ্যেই আওয়ামী লীগের 'সেম-সাইড' নির্বাচন বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে নাকচ করে দিয়েছে।

এ নির্বাচনে মানুষ ভোট কেন্দ্রে যায়নি। একটি ভোটও পড়েনি প্রায় ৫০ টি ভোটকেন্দ্রে। ভোটার আসবে আশা করে পোলিং অফিসাররা বসে বসে নখ খুঁটেছেন কিংবা দাঁত খুঁচিয়েছেন। দু'একজন টেবিলে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছেনও দেখা গেলো। ফাঁকা সেসব কেন্দ্রের খা-খা ছবি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে ভোটদান বন্ধ হবার আগেই। প্রায় সাড়ে ছয়শো ভোটকেন্দ্রে বিভিন্ন কারণে ভোটদান স্থগিত ছিল। কোথাও কোথাও জনকয়েক আওয়ামী লীগ কর্মী সারা দিন ধরে বার বার করে ভোট দিয়েছেন (যেমনটা ১৯৮৮ সালে এরশাদের ভোটারবিহীন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছিলাম, আওয়ামী লীগ

কর্মীরা সারাদিন ধরে ব্যালটে ছাপ মেরেছে এবং সেসব ব্যালট দিয়ে বাক্স ভর্তি করেছেন।

এ নির্বাচনের ওপর কোন দেশে কারোই আস্থা ছিল না। খালেদা জিয়ার এবং বিরোধী দলগুলোর আহ্বানে দেশের মানুষ সার্থকভাবে নির্বাচন বর্জন ও প্রতিহত করেছে। দেড়শোরও বেশি ভোট কেন্দ্র তারা পুড়িয়ে কিংবা ভাঙচুর করে দিয়েছে। বিরোধী দলের অংশ গ্রহণ অসম্ভব করে দিয়ে যে একদলীয় নির্বাচন হলো সেটা পর্যবেক্ষণ করার কোন কারণ কেউ দেখতে পায়নি। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কমনওয়েলথ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও জাপান, এমনকি রাশিয়াও পর্যবেক্ষক পাঠানোর সকল অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে। অর্থাৎ এই দেশগুলো আগে থাকতেই রায় দিয়ে দিয়েছে যে ৫ জানুয়ারির এ নির্বাচন কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বাংলাদেশে যেসব নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থা আছে তারাও আগে থেকে বলে দিয়েছিল যে এ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার কোনো হেতু তারা দেখতে পায় না; কিন্তু সরকারের চাপ ও হুমকির ফলে তারা পর্যক্ষেণ-পর্যবেক্ষণ খেলা খেলতে বাধ্য হয়েছে। নির্বাচনের পরে ফেমা (ফেয়ার ইলেকশন মনিটারিং অ্যালায়েন্স) রায় দিয়েছে গড়পড়তা ভোট পড়েছে দশ শতাংশেরও কম। কেউ কেউ আমাকে বলেছেন এই হাতে- গোনা ভোটদাতারা হয় আওয়ামী লীগের কর্মী, নয়তো শেখ হাসিনার ভোট ব্যাংকের কিছু ছুটকো মানুষ। আওয়ামী লীগ ক্যাডারদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ সংখ্যালঘুদেরও অনেকে ভোট দিতে যাননি।

কি প্রয়োজন ছিল এই সর্বনাশা নির্বাচনের? বিরোধী দলগুলোকে (অর্থাৎ দেশের মানুষের ৯০ শতাংশকে) ভোটাভুটির বাইরে রেখে এক ছাত্রীর ক্লাসে শেখ হাসিনা আগেই ফাস্ট হয়ে গিয়েছিলেন। ভোটাভুটির তিন সপ্তাহ আগেই গরিষ্ঠতা উৎপাদন করে নিয়েছিল সরকার। গরিষ্ঠসংখ্যক ভোটদাতার ভোট দেবার অধিকার তখনই ভণ্ডুল করে দেওয়া হয়। তবু কেন এ নির্বাচন? সব মিলিয়ে এ নির্বাচনে অন্তত হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ভারত সরকার তাদের ঘোষণা অনুযায়ী ব্যয় করেছে হাজার কোটি রুপি। পাঁচশোর বেশি মানুষ খুন হয়েছে নির্বাচনী ইস্যুকে ঘিরে। জখম হয়েছে প্রায় ২৩ হাজার। শতাধিক স্কুল বাড়িসহ বহু সম্পত্তি নির্বাচনের দিনেই বিধ্বস্ত হয়েছে। এদিন নিহত হয়েছেন অন্তত ২৪ জন। এঁদের অধিকাংশই বিরোধী দলের সমর্থক এবং প্রায় সকলেই মারা গেছেন র‍্যাব-পুলিশের গুলিতে। র‍্যাব-পুলিশ আর বিজিবির যৌথ পাশবিকতায় সাতক্ষীরা জেলাটি শ্মশানের মতোই শ্রীহীন ধবংসস্তূপ হয়ে গেছে।

ক্রুদ্ধ দেশ, ক্রুদ্ধ জাতি

বাংলাদেশের মানুষ আজ ভয়ানক ক্রুদ্ধ। 'গোপালী' র‍্যাব-পুলিশ আর বিজিবির ওপর তো তারা ক্রুদ্ধই। তার চাইতেও বেশি ক্রুদ্ধ তারা আওয়ামী লীগ সরকার এবং তাদের গণবিরোধী ও গণধিকৃত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওপর। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভোট দেবার অধিকার যেদিন তারা ফিরে পাবে সেদিনের

কথা ভেবে আওয়ামী লীগের এখন থেকেই নিশ্চয় আতঙ্ক হচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষ সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হতে পারে। কিন্তু ক্ষমাশীলতারও সীমা পরিসীমা আছে।

শেখ হাসিনা গদি দখল করে রাখতে চান। ৩২ বছর আগে দিল্লি তাকে যে মগজ ধোলাই করে বাংলাদেশে পাঠিয়েছিল তার সম্মোহনী শক্তি তিনি এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এখনো দিল্লির হুকুমেই তিনি চলেন বলে মনে হয়। বাংলাদেশের সঙ্গে সদ্ভাব ও সদিচ্ছাই যদি দিল্লির কাম্য হতো তাহলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কোন প্রয়োজন তার ছিল না। এ যাবৎ বাংলাদেশের সকল সরকারই দিল্লির সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলার চেষ্টা করেছে। খালেদা জিয়া আগেও একাধিকবার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। দু'দেশের মধ্যে তখন বিশেষ কোন সমস্যা দেখা দেয়নি। বিএনপি একটি জাতীয়তাবাদী দল। তারা অবশ্যই বাংলাদেশের স্বার্থকে বড়ো করে দেখবে। কিন্তু যেহেতু জনগণের সমর্থন তাদের দিকে সেহেতু তাদের সঙ্গে সমঝোতার ওপর ভারত নির্ভর করতে পারতো-যেটা আওয়ামী লীগের সঙ্গে চুক্তি করে তারা পাবে না। হাসিনার সঙ্গে যেসব গোপন চুক্তি ভারত করছে বাংলাদেশের মানুষ সুযোগ পেলে সেসব চুক্তি ছিঁড়ে ফেলবে। ভবিষ্যতেও সদিচ্ছা থাকলে জাতীয়তাবাদী সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে যে কোন সমস্যার সুসমাধান অবশ্যই সম্ভব হতো। কিন্তু দিল্লির জন্যে সেটা যথেষ্ট নয়। তারা আরো, আরো, আরো চায়।

অনেক আগেই ভারত বাংলাদেশের বাণিজ্যের বাজার দখল করে নিয়েছিল। দু'দেশের বাণিজ্যের ভারসাম্য আকাশ-পাতাল। ভারসাম্য বিধানের প্রতিশ্রুতি তারা বহুবার দিয়েছে, কিন্তু তারা কথা রাখেনি। সেটাও দিল্লির ক্ষুধা মেটানোর জন্যে যথেষ্ট নয়। বিনিময়ে কিছুই সে বাংলাদেশকে দিতে রাজি নয়। এমনকি দু'দেশের মধ্যে সম্পাদিত পুরাতন চুক্তিগুলোও সে মানবে না। শেখ মুজিব ১৯৭৪ সালেই বেরুবাড়ি ছিটমহলটি ভারতকে দিয়ে দিয়েছিলেন। চুক্তি অনুযায়ী বিনিময়ে তিনবিঘা ছিটমহলটি বাংলাদেশ আজো পায়নি। হাসিনা ফারাক্কায় পানি বণ্টন চুক্তি করেছিলেন ১৯৯৬ সালে। সে চুক্তি অনুযায়ী পানি বাংলাদেশ কোন বছরই পায়নি। এখন আবার চুক্তি করতে রাজি হয়েও তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তিতে তারা সই করেনি। ভবিষ্যতেও করবে বলে মনে হয় না। মমতা ব্যানার্জি বলেই দিয়েছেন বাংলাদেশকে এক ইঞ্চি জমি কিংবা নদীর এক ফোঁটা পানিও তিনি দেবেন না।

বাংলাদেশী লেন্দুপ দর্জি?

দিল্লি আবারো হাসিনাকে গদিতে চায়। দিল্লির প্রতি হাসিনার বদান্যতা ইতোমধ্যেই কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। তিনি চার বছর আগে দিল্লিতে গিয়ে গোপন চুক্তি করে এসেছিলেন। সেসব চুক্তির বিষয়বস্তু, এমনকি সংখ্যাও

বাংলাদেশের মানুষকে জানতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু আমরা দেখেছি হাসিনা এশিয়ান হাইওয়েটি দিল্লিকে দিয়ে দিয়েছেন, বাংলাদেশের রেল, সড়ক ও নদীগুলো দিয়েছেন, এমনকি বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দর দুটিও খুলে দিয়েছেন দিল্লির জন্যে। এবং সবই বিনামূল্যে। এখন আর কি কি চায় দিল্লি? দিল্লির হিসেবে শেখ হাসিনা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে লেন্দুপ দর্জির সমকক্ষ হতে পারেননি। বাংলাদেশকে তিনি এখনো সিকিমের মতো দিল্লির হাতে তুলে দেননি। হাসিনা আরো কিছুকাল গদিতে বহাল থাকলে আরো কিছু গোপন চুক্তিতে সই করিয়ে নেবার সময় পাবে দিল্লি। অবশিষ্ট চাহিদাও সে আদায় করে নেবে।

সেজন্যেই হাসিনার ভোটার-বর্জিত নির্বাচনের বৈধতা দেখাতে উঠেপড়ে লেগে গেছে দিল্লির সাউথ ব্লক। পররাষ্ট্র মন্ত্রক এবং তার কূটনীতিকদের বিশাল বাহিনী ইতোমধ্যেই বিশ্বজোড়া ওভারটাইম তৎপরতা শুরু করে দিয়েছে। বিদেশীরা যেন দয়া করে মেনে নেয় যে ৫ জানুয়ারি নির্বাচনী ফলাফল বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে। তা না হলে বিপদ আছে। বিপদ শেখ হাসিনা এবং বাংলাদেশের জন্যে। এবং ভারতের জন্যেও। বাংলাদেশ গণনির্যাতন, বিচার-বহির্ভূত হত্যা, ফ্যাসিবাদী পন্থায় বিরোধীদের মত প্রকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা এবং বিরোধী রাজনীতিকদের কারারুদ্ধ করে রেখে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ বন্ধ করতে এবং সকলের গ্রহণযোগ্য একটা নির্দলীয় নির্বাচন করতে বিদেশীরা হাসিনার সরকারকে দীর্ঘকাল যাবৎ অনুরোধ ও উপরোধ করে আসছে। হাসিনা তাতে কান দেননি। বরং বিশ্বের এক নম্বর পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য কোন কোন রাষ্ট্রকে তিনি সরাসরি অপমান করেছেন।

তার পরিণতি বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই ভোগ করতে শুরু করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন আর যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের মূল আমদানিকারক। তারা ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের পরিবর্তে অন্যান্য দেশে অর্ডার দিতে শুরু করেছে। পদ্মা সেতুর কেলেঙ্কারীর ফলে বিশ্ব ব্যাংক, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মালয়েশিয়া ও জাপান বাংলাদেশকে ঋণ সাহায্য দানের ব্যাপারে হাত গুটিয়ে নিচ্ছে। ইদানীং প্রবাসী শ্রমিকদের রেমিটেন্স উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পড়ে গেছে। শ্রমিক রফতানি পড়ে গেছে অর্ধেক। সুতরাং ভবিষ্যতে রেমিটেন্স আরো পড়ে যাবে। দেশের ভেতরে যেসব বিত্ত-সম্পদ ছিল আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রীরা আর দলের নেতারা সেসব আগেই ভাগাভাগি করে নিয়ে নিয়েছেন এবং বিদেশে পাচার করে দিয়েছেন। বিদেশী ঋণ বন্ধ হয়ে গেলে বাংলাদেশ লাটে উঠবে। এই সরকারের স্বভাব না বদলালে সেটাই হবে-বিদেশীরা আনুষ্ঠানিক অবরোধ আরোপ করুক আর নাই করুক।

শ্মশান নৃত্য নাচিছে শ্মশান কালী

মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ দেশগুলো বাংলাদেশকে সস্তায় জ্বালানি তেল বিক্রি বন্ধ করে দিতে যাচ্ছে। ওদিকে দেশের ভেতরে বিরোধী দল ও জোট যদি পূর্ণ

অসহযোগিতার ডাক দেয় তাহলে দেশের মানুষ সরকারকে কর দেবেনা, তথাকথিত নিরাপত্তা বাহিনীগুলো দেশের অভ্যন্তরে যেতে সাহস পায় না সুতরাং কর দিতে সাধারণ মানুষকে বাধ্য করার নৈতিক ও বাস্তব সামর্থ্যও তারা হারিয়ে ফেলেছে। আওয়ামী লীগ সরকারকে অন্যায় ও একতরফা সমর্থন দেবার খেসারত হিসেবে ব্যবসায়ী সমাজ এখন চোখে সর্ষে ফুল দেখছেন। অর্থাৎ বাংলাদেশ এক অর্থনৈতিক শ্মশানে পরিণত হবে যার ওপর রাজত্ব করবেন শেখ হাসিনা। যেমন করে "শ্মশান নৃত্য নাচিছে শ্মশান কালী"।

অন্যায় ও অত্যাচার যেখানে মাত্রা ছাড়িয়ে যায় প্রতিরোধ ও সহিংসতা সেখানে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি যখন সহিংসভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবি ঠেকিয়ে রাখছিল, নজরুল যখন লিখেছিলেন 'ওদের বাঁধন যতো শক্ত হবে মোদের বাঁধন টুটবে',ভারতবাসী তখন সহিংস স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছে, গান্ধীজীর অহিংসার ডাক তারা সব সময় মেনে চলেনি। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকারের অমানুষিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং নেলসন ম্যান্ডেলা অবশেষে সহিংস প্রতিরোধ ও গেরিলা যুদ্ধ শুরু করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ম্যান্ডেলা স্বয়ং গেরিলা যুদ্ধ করেছেন, শাস্তি হিসেবে ২৭ বছর একটানা জেল খেটেছেন। কিন্তু অত্যাচারী যখন অনুশোচনা করেছে, সঠিক পথে ফিরে এসেছে, ম্যান্ডেলা তখন শান্তি ও সমঝোতার পরামর্শ দিয়েছেন। সদ্যপ্রয়াত ম্যান্ডেলার স্মৃতিকে মানব জাতি দীর্ঘকাল শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। আওয়ামী লীগের ভারতের প্রতি নতজানু আগ্রাসী রাজনীতি, তাদের ক্যাডারদের গুণ্ডাগার্দি, তাদের দলীয়কৃত 'গোপালী' র‍্যাব-পুলিশ আর বিজিবি রাজনৈতিক নির্দেশে বিরোধীদের গণহত্যা চালাচ্ছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের মানুষ এখন আর নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে পারে না। শান্তিপূর্ণ অথবা সহিংস - যে কোন পন্থায় তাদের প্রতিরোধ করতেই হবে।

বিরোধী দলগুলো, বিশেষ করে বিএনপি, তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি ফিরিয়ে আনার আন্দোলনে বহু ভুলভ্রান্তি করেছে। একবার শত্রু চিহ্নিত হয়ে গেলে তার প্রতি অনুকম্পা দেখানো কোন ক্রমেই বিজ্ঞতা নয়। সেটাকে দুর্বলতা বলে ভুল করা হয়। থেমে থেমে এবং জিরিয়ে জিরিয়ে আন্দোলন হয় না। এবং চূড়ান্ত আক্রমণের জন্যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিলম্ব করার ঝুঁকি মারাত্মক। তার ফলে বিএনপির বহু কর্মী হতাশ ও নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন। অবশ্য বিএনপির নিজের কিছু দুর্বলতা ছিল। শৃঙ্খলার অভাব এবং প্রথম কাতারের নেতৃত্বের সকলের আনুগত্য পরীক্ষিত না হওয়ায় আন্দোলন বাধা পেয়েছে। তবু বিএনপির জন্যে আশার কথা, ৫ তারিখের স্বতঃস্ফূর্ত নির্বাচন বর্জন প্রমাণ করে আন্দোলন এখন গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় কর্মী ও সমর্থকরা নিজেদের উদ্যোগে কর্মসূচি ঘোষণা ও পালনে তৎপর হয়েছেন। দু'একজন নেতার বিশ্বাসঘাতকতাও আর আন্দোলনকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না।

শেখ হাসিনা বিনা প্রতিযোগিতায় বাজিমাৎ করতে ভালোবাসেন। তিনি প্রথম হতে চান, সুতরাং ক্লাসে তার একমাত্র ছাত্রী হওয়া প্রয়োজন। শত্রুর হাত-পা পিছমোড়া বেঁধে লড়াই করা তার স্টাইল। পাঁচ বছর ধরে তিনি বিএনপির বক্তব্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ায় সকল প্রকারের বাধা দিয়েছেন। এ দলের সভা-সমাবেশ ও মিছিলে সকল প্রকার বাধা দেওয়া হয়েছে, দলীয়কৃত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীগুলো ছাড়াও আওয়ামী লীগের অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তদের ব্যবহার করা হয়েছে। বস্তুত এ লক্ষ্যে তিনি দেশটির ব্যাপক দুর্বৃত্তায়ন করে ফেলেছেন।

বাক স্বাধীনতা ও গণহত্যা

সরকারের বিরোধী ও সমালোচক মিডিয়ার কণ্ঠরোধের সকল প্রকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চ্যানেল ওয়ান, ইসলামী ও দিগন্ত টেলিভিশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য টিভি চ্যানেলগুলোর ওপরও সরকারি হুকুম অবিরাম বর্ষিত হচ্ছে। সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে বিনা বিচারে কারাবন্দী করে জেলে এবং রিমান্ডে অমানুষিক নির্যাতন করা হচ্ছে তাঁর ওপর, আমার দেশ পত্রিকার ছাপাখানায় তালা দিয়ে মুদ্রণ বন্ধ করেছে সরকার। এই পাঁচ বছরে শাসক দলের দুর্বৃত্তরা দুই ডজন সাংবাদিককে হত্যা করেছে। শত শত সাংবাদিক শাসক দলের গুণ্ডাদের আক্রমণে আহত হয়েছেন। শুধু তাই নয়। নির্বাচনের আগাম বিরোধী দলগুলোর প্রায় সকল শীর্ষ নেতাকে মিথ্যা, সাজানো মামলায় গ্রেফতার করে কারাগারে আটক রাখা হয়েছে, অন্যদের ভয় দেখিয়ে আত্মগোপন করতে বাধ্য করা হয়েছে।

নির্বাচনের ১৩ দিন আগে থেকে খালেদা জিয়াকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে, তাঁর সঙ্গে যাঁরা দেখা করার চেষ্টা করেছেন তাঁরাও গ্রেফতার হয়েছেন। 'গোপালী' পুলিশ দিয়ে তিন বারের প্রধানমন্ত্রীকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং অপমান করানো হয়েছে। বিবিসি, আলজাজিরা, রয়টার, নিউইয়র্ক টাইমস প্রমুখ সম্মানিত বিশ্ব মিডিয়াকে খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। তার পরেই শুধু নির্বাচন করার সাহস পেয়েছিলেন শেখ হাসিনা। সে নির্বাচনেও তাঁর দল ও সরকার দশ শতাংশ ভোটও পায়নি। বিশ্বব্যাপী সাংঘাতিক মার খেয়েছে আওয়ামী লীগের বিশ্বাসযোগ্যতা। এই ধকল কাটিয়ে উঠতে দলটির বহু বছর সময় লাগবে।

গুলি খাওয়া শূয়র মরিয়া হয়ে যাকে তাকে আক্রমণ করে। আওয়ামী লীগেরও হয়েছে সে দশা। যে কয়দিন তারা গদিতে থাকছে গোপালী বাহিনী এবং দলের ঘাতকদের তারা বিরোধীদের ওপর লেলিয়ে দেবে। নির্যাতন-নিপীড়ন চরমে পৌঁছবে। বিরোধী ও ১৮ দলের নেতা-কর্মীদের আত্মরক্ষার জন্যে এখন থেকেই প্রস্তুত হতে হবে। ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় করে আর লাভ নেই। বাংলাদেশে একটা অঘোষিত গৃহযুদ্ধ চলছে। আগে থেকেই প্রস্তুত না হলে অস্তিত্ব সংকট দেখা দেবে।

বিশেষ করে বিএনপি নেতৃত্বকে একটা কাজ অবিলম্বে করতে হবে। তাঁদের ঘোষণা করতে হবে শুধু নতুন সরকারের আমলেই নয়, ২০১০ সাল থেকে শেখ হাসিনা বিদেশের সঙ্গে যেসব চুক্তি করেছেন পরবর্তী নির্বাচিত সরকার সেসব চুক্তি মান্য করতে বাধ্য থাকবে না। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ চায় না বাংলাদেশ। কিন্তু তারা স্বাধীনতাকে ভালোবাসে। কখনোই তারা সিকিম হতে রাজি হবে না।

প্রয়োজন ঈমানদারীর

শেখ হাসিনা এখনো দাবি করছেন যে তিনি সংবিধান রক্ষার্থে নির্বাচন করতে বাধ্য হয়েছেন। সম্পূর্ণ বাজে কথা। সংবিধান কিংবা আদালতকে তিনি সম্মান করেন না, সেগুলোকে তিনি রাজনীতির খেলায় দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করছেন মাত্র। নতজানু এক বিচারপতির অত্যন্ত বিতর্কিত একটা রায়ের একটা অংশ তিনি ব্যবহার করছেন মাত্র। অন্য অংশে স্পষ্ট করে বলা ছিল যে পরবর্তী দুটি (অর্থাৎ দশম এবং একাদশ) সাধারণ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই হবে।

এখনো প্যাঁচের খেলা খেলছেন, বিএনপিকে ফাঁদে ফেলার স্বপ্ন দেখছেন। গত সোমবারের সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন, বিএনপি যদি আন্দোলনের পথ ছেড়ে দেয় এবং জামায়াতের সঙ্গ ত্যাগ করে তাহলে তিনি পরবর্তী নির্বাচন নিয়ে সংলাপে রাজি হবেন। দেশের একটা মানুষও বিশ্বাস করছে শেখ হাসিনার কথা? সংলাপ হবে বলে তিনি জাতিসংঘকেও কথা দিয়েছিলেন। কোথায় গেলো সে সংলাপ? বিএনপি যদি আন্দোলন বন্ধ করে তাহলে সত্যিকারের এবং অর্থবহ সংলাপ করে ঈমানদারী দেখাবেন তিনি? অবশ্যই না। তখন তিনি বগল বাজাবেন এই বলে যে তিনি বিএনপিকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছেন। আর জামায়াতে ইসলামী? বিএনপি কার সঙ্গে মৈত্রী করবে কি করবে না সম্পূর্ণরূপে তার নিজের এখতিয়ার। তারা কেন হাসিনার কথায় ওঠা-বসা করবে?

সকলেই জানে জামায়াত ভারতের বিজেপি এবং তার অঙ্গ দলগুলোর মতোই একটা নিবন্ধিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল। এ দল দিল্লির কাছে নতজানু হতে রাজি নয় বলেই দিল্লি এ দলের অস্তিত্ব লোপ করতে চায়। ভারতের হুকুমেই যে শেখ হাসিনা জামায়াতকে ধ্বংস করতে চান সেটা কার না জানা আছে? শেখ হাসিনাকে একথা বুঝতে হবে, প্যাঁচ-পোঁচ আর ফাঁদের খেলা ছেড়ে দিয়ে ঈমানদারীর পথে না এলে নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা তিনি আর ফিরে পাবেন না।

(লন্ডন, ০৭.০১.১৩)

খালেদা জিয়া কি 'মাইনাস ওয়ান' হতে চলেছেন?

এ সন্দেহ অনেকেরই ছিল। আমি নিজেও কয়েকবার লিখেছি সে সন্দেহের কথা। এক-এগারোর ষড়যন্ত্রে লোক-দেখানো 'মাইনাস টু'র কথা থাকলেও আসল লক্ষ্য ছিল 'মাইনাস ওয়ান'। খালেদা জিয়া এবং সম্ভব হলে বিএনপি দলকেও বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে উচ্ছেদ করে বাকশালী আওয়ামী শাসন চালু করা।

ফখরুদ্দীন-মইন উ বর্ণচোরা সামরিক শাসন অবশ্যই শেখ হাসিনার আন্দোলনের ফসল ছিল। লগি-লাঠি-বৈঠার হত্যাযজ্ঞ, লাগাতার হরতাল আর স্যাবটাজ এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রতি হুমকি না হলে রাষ্ট্রপতি ইয়াজুদ্দিন আহমেদও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করতে রাজি হতেন না। মোক্ষম স্বীকারোক্তি করেছেন শেখ হাসিনা স্বয়ং। ২০০৭ সালের ১৫ এপ্রিল বিদেশ ভ্রমণে যাত্রার আগে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের তিনি বলেছিলেন যে ফখরুদ্দীন-মইন উ সরকার তার আন্দোলনেরই ফসল এবং ক্ষমতা পেলে সে সরকারের যাবতীয় কাজকর্ম তিনি বৈধ করে দেবেন। আসলেও হয়েছে তাই। বহু অপকর্ম-দুষ্কর্ম হয়েছে সে সরকারের দু'বছরে। কিন্তু তার জন্যে কারো কি কোনো শাস্তি হয়েছে? ফখরুদ্দীন আর মইন উকে কি জিজ্ঞাসাবাদের জন্যেও এ সরকার আমেরিকা থেকে ফেরৎ আনতে পেরেছে?

আর সেই যে বিদেশ ভ্রমণের কথা বলছিলাম? মাইনাস-টু অনুযায়ী দুই নেত্রীকেই কিন্তু নির্বাসনে পাঠানোর চেষ্টা হয়নি। চেষ্টা হয়েছিল বিএনপি নেত্রীকে সৌদি আরবে নির্বাসনে পাঠানোর। সৈন্য-সামন্ত গাড়িঘোড়া তার বাসভবনেই এসেছিল তাকে বিমানবন্দরে নিয়ে যেতে। সৌদিদের একখানি বিমানও নাকি প্রস্তুত ছিল বিমানবন্দরে। ইচ্ছে করলে খালেদা জিয়া কতো শক্ত হতে পারেন তার প্রমাণ আবারো তিনি দেখিয়েছিলেন সে সময়। দুই নেত্রীকেই সংসদ ভবন সংলগ্ন বিশেষ কারাগারে বন্দী করা হলো। কিন্তু 'দুই' ব্যাপারটা সেখানেও ছিল লোক-দেখানো। এক নেত্রী বন্দী হয়েই রইলেন, আর অন্যজন গেলেন বিদেশে হাওয়া খেতে।

বলা হয়েছিল যে শেখ হাসিনা চিকিৎসার জন্যে আমেরিকা যাবেন। আমেরিকায় গিয়েওছিলেন তিনি। পুত্র ও তার পরিবার আছে সেখানে। আদরের নাকনি থাকে কানাডায়, সেখানে না গেলেই নয়। আবার বোনের ছেলের বিয়ে

হবে লন্ডনে। বড় খালা হাজির না থাকলে কি চলে? হাসিনাকে লন্ডনে আসতেই হলো। বৌমা ফিনল্যান্ডের মেয়ে। অতএব নাইওর যেতে হলো হেলসিঙ্কিতেও। বলাই বাহুল্য যে সর্বত্রই আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা তাকে সংবর্ধনা দিয়েছেন, তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন নেত্রী, দেশের রাজনীতির নোংরা কাঁথা বিদেশে ঝেড়েছেন। সকলেই জানেন শেখ হাসিনা বক্তৃতা দিতে 'বড়োই' ভালোবাসেন, তার সবচাইতে প্রিয় বস্তু নিজের কণ্ঠস্বর।

বর্ণচোরা সামরিক সরকার আওয়ামী লীগ নেত্রীর বিশ্ব ভ্রমণে বাধা দেয়নি, 'বন্দীদশায়' তার রাজনৈতিক তৎপরতায়ও আপত্তি করেনি। মইন উ আহমেদ জানতেন হাসিনা তাদের অথবা তারা হাসিনার 'নিজের লোক'। খালেদা জিয়াকে মাইনাস-ওয়ান করা না গেলে হাসিনা সেনাশাসনই মেনে নেবেন। নিজ মুখে তিনি বলেছেন খালেদা জিয়ার শাসনের চাইতে সেনা শাসনও মেনে নিতে রাজি তিনি। তার প্রমাণ তিনি অনেক আগেই দিয়েছেন। ১৯৮২ সালে গণতান্ত্রিক ও নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করার জন্যে তিনি লে. জে. এরশাদকে মদদ দিয়েছিলেন। অনেকে তো বলেন সে ষড়যন্ত্রে তিনিও ছিলেন একজন হোতা। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে জেনারেল নাসিমকে দিয়ে সেনা অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন হাসিনা। সৌভাগ্যবশত আগাম খবর পেয়ে কয়েকজন দেশপ্রেমিক সেনা কর্মকর্তা সে অভ্যুত্থান ভণ্ডুল করে দিতে পেরেছিলেন।

দেশের কাজ দেশে, বিদেশে নয় ঃ

অন্য নেত্রী দেশের মাটিকেই বেশি ভালোবাসেন। এটা তার স্বভাব। ক্ষমতায় থাকুন কিম্বা বাইরেই থাকুন খালেদা জিয়া যখন তখন বিদেশে যেতে ভালোবাসেন না। বিদেশে চটক দেখানোর চাইতে দেশে থেকে কিছু কাজ করার গুরুত্ব অনেক বেশি তার কাছে। তিনি জেলেই বন্দী হয়ে রইলেন। জেলের বাইরে কিন্তু অনেক ষড়যন্ত্র চলছিল তার বিরুদ্ধে। তিনি নির্বাসনে যাবেন না, অতএব বিকল্প হচ্ছে তার দলটাকেই ভেঙে দেওয়া। আওয়ামী লীগ সরকারের নিযুক্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার এটিএম শামসুল হুদা অত্যন্ত 'নিমক-হালাল' মানুষ। তিনি রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ চালু করলেন। দেশের মানুষ অবাক-বিস্ময়ে দেখলো যে দল আগেও চারবার ক্ষমতায় ছিল, যে নেত্রী দেশের মানুষের ভোটে তিনবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, তাকে এবং তার দলকে বাদ দিয়ে হেঁদি-পেঁদিদের নিয়ে সংলাপ চলছে।

তাতেও কাজ হয়নি। 'ক্লোক অ্যান্ড ড্যাগার' ষড়যন্ত্র তৈরি হলো তখন। সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী ডিজিএফআই বিএনপি স্থায়ী কমিটির চার কিম্বা পাঁচজন সদস্যকে রাতের আঁধারে ধরে নিয়ে যায় গুলশানে, বৃদ্ধ এবং মৃত্যুপথযাত্রী নেতা সাইফুর রহমানের বাড়িতে। মাঝ রাতের পরে সাইফুর রহমানকে দিয়ে একটা ঘোষণা প্রচার করানো হয়, যার অর্থ ছিল যে নতুন

নেতৃত্বে বিএনপি পুনর্গঠিত হয়েছে। পশ্চিমে হলে হলিউড এই সিনারিও অবলম্বনে ফিল্ম তৈরি করে ফেলতো অনেক আগে। তবে বাংলাদেশের ভাগ্য ভালো। সে দেশের মানুষ হাসিনা-মইন উর ফাঁদে পা দেয়নি, নতুন নেতৃত্বের ভাঁওতাবাজিতে তারা প্রতারিত হয়নি।

মইন উ আর ফখরুদ্দীনরা পালিয়ে আমেরিকায় চলে গেছেন। কিন্তু মাইনাস-ওয়ানের বড়ো তরফ এখনো বাংলাদেশের মাটিতেই আছে। সুতরাং বলা যাবে না যে মাইনাস-ওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। বরং বিগত কিছুদিনের ঘটনাবলীতে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে জিয়া এবং বিএনপিকে পাশ কাটিয়েই 'নির্বাচন' করার পরিকল্পনা বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব হিসেবে খুবই সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু খালেদা জিয়া তার কাঁধ থেকে ভারটা কিছুতেই নামাতে পারলেন না। কারণ? কারণ এই যে বিএনপিতে ভয়ানক দলাদলি। বেশ কিছু লোক আছেন এ দলে যারা কাজ করতে কিম্বা ঝুঁকি নিতে রাজি নন, কিন্তু নেতৃত্ব ও মন্ত্রীত্ব পাবার দারুণ লোভ তাদের। কাকে খুশি করবেন আর কাকে করবেন না খালেদা জিয়ার সেটা মহাসমস্যা।

আমার ভয় হয় বিএনপির ভেতরে র'য়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছে কিনা। ভেতর থেকে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের জন্যে খালেদা জিয়ার আন্দোলন পণ্ড করে দিতে চান। নানা রকমের উদ্ভট কথা বলে তারা আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করছেন। কারো কারো ভাবখানা এই যে আন্দোলন একটা আমগাছ। ফল পাকলে নিজে থেকেই পড়ে যাবে। এমনকি ডালে ঝাঁকানিও দিতে হবে না। কেউ কেউ তো আরো চরমে। রীতিমতো গোঁফ-খেজুরে তারা। তারা খেজুরগাছের তলায় হা-করে শুয়ে আছেন পাকা খেজুর মুখে পড়ার আশায়। তাদের সমস্যা, মুখের লাগোয়া গোঁফটা সরিয়ে দেবে কে?

হাসিনার শক্তি, খালেদার দুর্বলতা

একটা কথা এখানে না বলে পারছি না। বিদেশীরা শেখ হাসিনাকে ভালোবাসে কিম্বা পছন্দ করে মনে করলে ভুল হবে। বরং তার ঔদ্ধত্য, গোঁয়ার্তুমি অনবরত তাদের বিরক্তি ও ক্রোধেরই সঞ্চার করে। ড. ইউনূসের ব্যাপারে মার্কিন সরকার ও বিশ্ববাসী বহু দেন-দরবার করেছে হাসিনার সঙ্গে, মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি করতে, বিচার-বহির্ভূত হত্যা বন্ধ করতে, ইলিয়াস আলীকে মুক্তি দিতে, বিশ্বব্যাংকের নির্দেশিত দুর্নীতিবাজদের শাস্তি দিতে, সর্বশেষ সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের নির্যাতন বন্ধ করতে কতোই তো অনুরোধ করেছে বিশ্ববাসী। শেখ হাসিনা শুনেছেন সেসব অনুরোধ? কান দিয়েছেন কারো কথায়? তবু তারা হাসিনাকে সহ্য করছে। তারা দেখছে হাসিনার মধ্যে অন্তত একটা গুণ আছে, সেটা তার 'ডিসাইসিভনেস'। যা তিনি

করবেন বলেন সেটা করেই ছাড়েন। নেতা ও শাসক হতে গেলে সেটারও প্রয়োজন আছে।

খালেদা জিয়া কখনোই হুট করে কিছু করে ফেলার মানুষ ছিলেন না। কিন্তু একবার সিদ্ধান্ত নিলে তাতে অটল থাকেন তিনি। তার মধ্যে এই গুণটা অনেক আগেই চোখে পড়েছিল। আমি তাকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করেছি এরশাদের সামরিক অভ্যুত্থান ও স্বৈরতন্ত্রের সময় থেকে। অন্য নেত্রী বলেছিলেন সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি 'অখুশি নন', আওয়ামী লীগের মুখপত্র বাংলার বাণী সামরিক শাসনের সাফল্য কামনা করে মোনাজাত করেছিল সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। পদে পদে সমর্থন দিয়ে হাসিনা যে সামরিক শাসনকে নয় বছর টিকে থাকতে সাহায্য করেছেন বাংলাদেশের মানুষ এখনো ভুলে যায়নি আশা করি। কিন্তু খালেদা জিয়া তার লক্ষ্যে অনড় ছিলেন। একটা কাহিনী আপনাদেরও মনে থাকবে। জনৈক লে. কর্নেল এসেছিলেন তাকে গ্রেফতার করতে। খালেদা যেভাবে তাকে ধমক দিয়েছিলেন কর্নেল সাহেব তাতে কিছুক্ষণের জন্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান। ততোক্ষণে খালেদা জিয়া অন্য কোথাও চলে গেছেন।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সরকার আর আওয়ামী লীগের চক্ষুশূল, পথের কাঁটা। অত্যন্ত সার্থকভাবে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরিয়ে আনার আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলে সরকারের সুবিধা। কিন্তু সেটাই একমাত্র বিবেচনা নয়। বেছে বেছে বিএনপির যেসব সফল নেতা আছেন, নির্বাচন হলে মানুষ যাদের ভোট দেবেই, তাদের সরিয়ে দেওয়াই সরকারের কৌশল। আড়াই বছর আগে রাজধানীর ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার চৌধুরী আলম গুম হয়েছেন। সম্প্রতি আবার সে ওয়ার্ডের জনপ্রিয় বিএনপি সম্পাদক রফিকুল ইসলাম মজুমদার গুম-খুন হলেন। সিলেট বিএনপির নেতা এবং দলের সাংগঠনিক সম্পাদক ইলিয়াস আলীর গুম হবার ক্ষত সকলের হৃদয়েই এখনো তাজা, দগদগে।

আচমকা নির্বাচনের প্রস্তুতি

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মতো আরো অনেক নেতা-কর্মীকে ভুয়া মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে গোড়ায় মামলা হয়েছিল দুটো: তিনি নাকি সচিবালয়ের ভেতর ককটেল বোমা ছুঁড়েছিলেন, আর একই সময় এয়ারপোর্ট রোডে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কয়েক'শ গজের ভেতর কেউ একজনের গাড়ি ভাঙচুর করেছিলেন। কিন্তু উভয় ঘটনারই দায় চাপানো হয়েছে তার ওপর। হাইকোর্টে তিনি জামিন পেলেন, কিন্তু জেলগেটে নতুন দুটি মামলা চাপিয়ে দেওয়া হয় তার ঘাড়ে। তারপর থেকে আরো কিছু মামলা চাপানো হয়েছে তার ওপর। যেন বাংলাদেশে যা কিছু সরকার-বিরোধী ঘটছে সব কিছুর জন্যেই দায়ী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। উদ্দেশ্যটা খুবই পরিষ্কার। একেকটা অভিযোগের শুনানি হতে যদি দুসপ্তাহ লাগে তাহলে নির্বাচন কেটে

যাবার পরে অবধি তাকে জেলে পুরে রাখা যাবে। সরকারের পরিবর্তিত অভিযোগ, তিনি 'হুকুমের আসামী'। এই সেদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর প্রকাশ্যে সড়কে নেমে জামায়াতের প্রতিবাদ মিছিলের সঙ্গে দাঙ্গা করার হুকুম দিলেন ছাত্রলীগ আর যুবলীগকে। তারা লাঠিপেটা করে আর কুপিয়ে হত্যা করলো বিশ্বজিৎকে। গুম-খুনের ঘটনাগুলো স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ছাড়া হতে পারে বলে কেউ বিশ্বাস করেন না। কই, তাদের হুকুমের আসামী করে তো কোনো মামলা হচ্ছে না?

যুদ্ধাপরাধের বিচারের নামে জামায়াতে ইসলামীর বহু নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বহু বিতর্কিত তথাকথিত আন্তর্জাতিক আদালতে আরো ছয়শো জনের নামের তালিকা পাঠানো হয়েছে। হরতাল এবং প্রতিবাদ করতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছেন আরো শত শত। বিএনপির গ্রেফতার হয়েছেন ২০ থেকে ২৫ হাজার। এদিকে খালেদা জিয়া এবং তার ছেলেদের বিরুদ্ধে সাজানো দুর্নীতির মামলাগুলো হঠাৎ করে যেন জাগিয়ে তোলা হচ্ছে। সরকারের কৌশল কি এর থেকেও পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে না? তারা চায় বিরোধী দলগুলোর নেতা-কর্মীদের জেলে আটক রেখে চট-জলদি এপ্রিল কিম্বা মে মাসে নির্বাচন দিতে। তাহলে বিরোধী দলগুলো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো যথেষ্ট প্রার্থী খুঁজে পাবে না। সে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে দেবে। এ সময়ে নির্বাচন করা সম্ভব না হলে সরকার দ্রুত বিচার আদালত, ভ্রাম্যমাণ আদালতে বিচার করে ফর্মুলা অনুযায়ী সাজা দিয়ে দেবে বিএনপি ও জামায়াতের বন্দীদের । সে অবস্থাতেও নির্বাচন করা এ দুটি দলের জন্যে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

খালেদা জিয়া পরিস্থিতির এই বাস্তবতা বুঝতে পারছেন না বলে আমি কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু তিনি নিষ্ক্রিয় কেন? মাঝে মাঝে সভা-সমাবেশ করে তিনি 'জনসংযোগ' করছেন। জনসংযোগের প্রক্রিয়া কি চার বছরেও সাঙ্গ হয়নি? দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ এখন তাকে সমর্থন করে। আর কতো সমর্থনের প্রয়োজন তার? প্রয়োজন হচ্ছে সে সমর্থনকে কাজে লাগানো। সৈন্যদের তিনি ডেকে রণাঙ্গনে নিয়ে গেছেন। সেখানে তাদের আর কতোদিন বসে বসে ঝিমুতে দেবেন? খালেদা জিয়া কি বুঝতে পারছেন না শহীদ জিয়া যে মহান দলটি গঠন করেছিলেন তার (খালেদার) নিষ্ক্রিয়তার জন্যে সে দল এখন অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে? শুনছি কেউ কেউ তাকে আশ্বাস দিচ্ছেন আন্দোলন করে সরকার উৎখাতের চেষ্টা করলে বিদেশী রাষ্ট্রদূতরা নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন করতে শেখ হাসিনাকে রাজি করাবেন।

খালেদা জিয়া যদি সেসব আশ্বাসে বিশ্বাস করেন তাহলে বলতেই হবে এক-এগারো, বর্ণচোরা সামরিক সরকার আর তার নিজের জেল খাটা থেকে কিছুই তিনি শিখতে পারেননি।

(লন্ডন, ১৯.০১.১৩)

জাতিদ্রোহী 'সুশীল সমাজ' বাংলাদেশের গ্লানি

ষাট ও সত্তরের দশকে একটি বাণিজ্যিক ব্রিটিশ টেলিভিশন চ্যানেল প্রতি শনিবার বিকেলে 'ওয়েস্টার্ন ফিল্ম' দেখতো। শনিবার ছুটির দিন। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে সোফার ওপর শুয়ে সে ছবিগুলো দেখতে আমার ভালো লাগতো। ইতিহাস অবশ্যই ছিলো। সহজ-সাধারণ কাহিনী। কোন জটিলতা নেই। কে ভালো আর কে মন্দ ছবির শুরু থেকেই মোটামুটি আঁচ করা যেতো। চিন্তা করে কাহিনী অনুধাবনের জন্যে জটিলতা কিছু থাকে না এসব ছবিতে। ভালো লাগলে মনোযোগ দিয়ে দেখতাম। নইলে ঘুমিয়ে পড়তাম ছবি দেখতে দেখতে।

উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয় অভিবাসীরা উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলের লাগোয়া অঞ্চলগুলোতেই বাস করতো। বর্তমানে মধ্যপশ্চিম নামে বর্ণিত অঞ্চল থেকে শুরু করে পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এবং পাহাড়-পর্বত ও মরুভূমিপূর্ণ এলাকা মূলত রেড ইন্ডিয়ান নামে পরিচিত আদিবাসীদের বহু প্রজাতির বাসভূমি ছিলো। পূর্বাংশের জনসংখ্যার ভিড় মিছিল করে ক্রমেই পশ্চিমাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। বৈরী প্রকৃতি এবং হিংস্র রেড ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ক্রমে ক্রমে তাদের গোটা মহাদেশে বসতি স্থাপন শৌর্য-বীর্য আর রোমান্টিকতায় ভরপুর ইতিহাস। সেসব কাহিনী নিয়ে বহু ছায়াছবি তৈরি হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে হলিউডে- নিশ্চয়ই কয়েকশো ওয়েস্টার্ন ছবি তৈরি হয়েছে এ পর্যন্ত।

বাংলাদেশে নিকটতম দৃষ্টান্ত সম্ভবত বঙ্গোপসাগরে জেগে ওঠা নতুন চর দখল আর সেখানে চাষবাস ও বসতি স্থাপন। ছোটবেলায় শুনেছি নোয়াখালী (বর্তমানে ফেনী ও লক্ষ্মীপুর সহ) জেলার লোকেরা সদলবলে নৌকায় করে বঙ্গোপসাগরে জেগে ওঠা নতুন চর দখলে যেতো। অন্য কোন দলের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা গেছে এবং জখম হয়েছে কেউ কেউ। বুনো শূয়রের দাঁতের গোত্তায় কিংবা বাঘের কামড়েও কেউ কেউ প্রাণ দিয়েছে। আরো বেশি মারা গেছে ফসল কাটতে যাবার কিংবা ফসল নিয়ে মূল ভূখণ্ডে বাড়ি ফেরার সময় ঝড়ের কবলে পড়ে। আমেরিকার ওয়াইল্ড ওয়েস্টেও নানাভাবে বহু নতুন বসতিকারী মারা গেছে। প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ইত্যাদি ধীরে ধীরে এই নতুন

বিজিত ভূমিতে বিস্তার লাভ করে অভিযাত্রীদের অনেক পরে, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। ইতোমধ্যে তারা নিজেরাই অবস্থামতো ব্যবস্থা করে নিতো। বন্দুক ছিলো তাদের আইন, চটজলদি উপস্থিত মতো বিচার তারা করে নিতো।

অধিকাংশ ওয়েস্টার্ন ছবিতে একটা দৃশ্য দেখা যাবে। হয়তো কেউ একজন ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলো দূরে কোথাও। এদিকে অন্য কেউ কাছাকাছি কারো লাশ পেলো। ঘোড়সওয়ার লোকটাকে ধরে স্থানীয় দু'চারজন লোক উপস্থিত মতো দোষী সাব্যস্ত করে ফেললো। কাছাকাছি একটা গাছ থেকে দড়ি ঝুলিয়ে তাকে ফাঁসি দিয়ে দেওয়া হলো। ব্যাস! বিচারের প্রক্রিয়া ওখানেই শেষ। চটজলদি, সহজ-সরল, ঝামেলা-বিহীন। পারিবারিক বিরোধ থেকেও মিথ্যা অভিযোগ সাজিয়ে বহু লোককে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। এই বিচার আর এই ফাঁসিকে বলা হতো 'লিঞ্চিং'। কিছুকাল পরে শহরগুলোতে শেরিফ নিয়োগ শুরু হলো। একেকটা বিশাল টেরিটোরিতে (বর্তমানে অঙ্গরাজ্য) একজন করে বিচারপতি নিয়োজিত হতেন। ঘোড়ায় চড়ে কিংবা স্টেজ কোচে (ঘোড়ার গাড়ি) কোথাও কোথাও যেতে তাঁর হয়তো দুই কিংবা তিন সপ্তাহ পর্যন্ত লেগে যেতো।

কিন্তু বিচার ও শাস্তি দেখার জন্যে সাধারণ মানুষ অতো ধৈর্য ধরতে রাজি ছিলো না। সদলবলে শেরিফের অফিসে হাজির হয়ে তারা অভিযুক্তকে তাদের হাতে ছেড়ে দেবার দাবি জানাতো, রক্ত পিপাসু জনতা 'হ্যাং হিম' 'হ্যাং হিম' (ওকে ফাঁসি দাও) বলে শ্লোগান দিতো এবং প্রায়ই তাদের ঠেকানো শেরিফের পক্ষে সম্ভব হতো না। ইতিহাসে এই ফাঁসি-পূজারীরা 'লিঞ্চিং মব' নামে কুখ্যাত হয়ে আছে। ফাঁসি দানের ঘটনাটা প্রায়ই একটা স্থানীয় উৎসবে পরিণত হতো। সপরিবারে লোকে দেখতে আসতো, ফেরিওয়ালাদের দোকান বসে যেতো, ভাঁড়-বাজিকর তাদের তামাশা দেখাতো, রীতিমতো একটা সার্কাসের পরিবেশ গড়ে উঠতে।

প্রাণদণ্ডে বিশ্বময় ঘৃণা

লিঞ্চিংয়ের দুঃস্বপ্নের কথা নতুন প্রজন্মের মার্কিনীরা গল্প-কাহিনী কিংবা ছায়াছবি থেকেই জানে। কথায় কথায় সবচাইতে কাছের গাছটি থেকে কাউকে ঝুলিয়ে দেওয়া অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। আজকের আমেরিকার অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যেই ফাঁসির দণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ওয়াশিংটনের কেন্দ্রীয় সরকার পুরোপুরি প্রাণদণ্ডের বিরোধী। উত্তর আমেরিকার ক্যানাডায় এবং ইউরোপেও শাস্তি হিসেবে কাউকে ফাঁসি দেওয়া হয় না। তুরস্ক প্রভৃতি ইউরোপের বাইরের কোন কোন দেশেও প্রাণদণ্ড নিষিদ্ধ। মানুষ প্রাণ সৃষ্টি করতে পারে না। জীবিত কোন মানুষকে শাস্তি হিসেবে মেরে ফেলা এসব দেশের মানুষের মানবিক অনুভূতিকে আহত করে। আরো একটা কারণ আছে। অনেক ক্ষেত্রে পরে দেখা

যায় যে আদি বিচার ও রায়ে ভুল ছিলো। আসামীকে মেরে ফেলা হলে সেসব ক্ষেত্রে আর প্রতিকার সম্ভব হয় না।

মানব সমাজের এই নতুন স্পর্শকাতরতা আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও প্রভাব ফেলছে। ইউরোপে ও উত্তর আমেরিকার দেশগুলো এখন আর যেসব দেশে প্রাণদণ্ড আছে সেসব দেশে বন্দী প্রত্যর্পণ করে না। শেখ হাসিনার সরকার যে বহু কূটনৈতিক তোলপাড় করে এবং লাখ লাখ ডলার ব্যয়ে একেকটি দেশে লবিস্ট নিয়োগ করেও ক্যাপ্টেন নূর এবং মুজিব হত্যার অন্যান্য আসামীকে ফেরত আনতে পারছে না এই হচ্ছে তার কারণ। আরো একটা কারণ আছে। নোবেল শান্তি পুরস্কার পাননি বলে শেখ হাসিনার হিংস্রতা শতগুণে বেড়ে গেছে। কিন্তু যেদেশে এখনো প্রাণদণ্ড আছে এবং দরাজ ভাবে সে দণ্ড ব্যবহার করা হচ্ছে সে দেশের সরকার-প্রধানকে কোন দেশ নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন দেবে বলে প্রধানমন্ত্রীর চেলাচামুন্ডারা কি করে আশা করতে পারলেন ভেবে আশ্চর্য হই।

বিগত কয়েকদিনে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার ব্যস্ততম এলাকাগুলোর অন্যতম শাহবাগ মোড়ের ঘটনাবলীর যেসব ছবি দেখছি আর বিবরণ পড়ছি টেলিভিশন এবং সামাজিক মিডিয়াগুলোতে তাতে আমার মনে হচ্ছে মধ্য আর পশ্চিম আমেরিকার ১৮৬০ কিংবা ৭০ দশকের ভূত একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের বাংলাদেশের ঘাড়ে চেপে বসেছে।

আশা করি কেউ ভুল বুঝবেন না আমাকে। কাদের মোল্লার বিচার কিংবা সে বিচারের রায় নিয়ে মন্তব্য করতে যাচ্ছি আমি। সরকার ট্রাইব্যুনাল করেছে, বিচারক নিয়োগ করেছে। সে ট্রাইব্যুনাল আর বিচার পদ্ধতি নিয়ে বহু প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে। এখন সে ট্রাইব্যুনাল রায় দিয়েছে। সে রায়ের বিরুদ্ধে শাহবাগে সার্কাস বসেছে, হ্যাং হিম-হ্যাং হিম শ্লোগান উঠছে, সেসব শ্লোগানে চিয়ার-লিডারের ভূমিকা নিয়েছেন তথাকথিত সুশীল সমাজ, সরকারের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম সমাবেশে এসে, আর বাইরে থেকে সকলকে উসকানি দিচ্ছেন স্বয়ং আইনমন্ত্রী ও তাঁর লেজুড় কামরুল ইসলাম প্রমুখরা।

বাংলাদেশ জ্বলছে, রক্ত ঝরছে বাংলাদেশে

পটভূমিও বিবেচনা করুন। বাংলাদেশ জ্বলছে। রক্ত ঝরছে বাংলাদেশে। দেশের সর্বত্র চলছে হরতাল-বিক্ষোভ। যানবাহন ভাঙচুর হচ্ছে, সরকারের গুণ্ডাবাহিনী, পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাহিনী, র‍্যাব ইত্যাদিরা সকলে মিলে প্রতিবাদীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে,ঘাড়ে-মাথায় রিভলবার চেপে ধরে গ্রেফতার করা লোকের ওপর গুলি করছে। দেশের অন্যত্র খুন-খারাপি হচ্ছে, গণধর্ষণ হচ্ছে, অর্থনীতির বারোটা আগেই বেজে গিয়েছিলো, এসব দিকে খেয়াল দেবার

সময় নেই কারো। বাংলাদেশের প্রিন্ট মিডিয়ার ৭০-৮০ ভাগ আর ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ৯৫-৯৬ ভাগ সরকার ও শাসক দলের নিয়ন্ত্রিত, তাদের আজ্ঞাবহ। এসব খবর তারা টুকরো-টুকরো আর ছোটখাটো করে প্রকাশ করছে। দেশের কোথায় কে কাদের মোল্লার ফাঁসি চায় তাদের খুঁজে খুঁজে তাদের বক্তব্য প্রচার করছে মিডিয়া। তাদের সকলের মনোযোগ শাহবাগের সার্কাসের ওপর-যেন বাংলাদেশ বলতে ওই এক চিলতে জমিকেই বোঝায়। বাংলাদেশের সঠিক খবরের জন্যে লোকে এখন ফেসবুক, ইউটিউব, ব্লগ ইত্যাদি সামাজিক মিডিয়ার ওপর নির্ভর করতে শিখছে-একাত্তরে যেমন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ পত্রপত্রিকা আর রেডিও-টেলিভিশন বাদ দিয়ে ট্রানজিস্টর রেডিওতে বিবিসির খবর শুনতে শিখেছিলো।

দেশব্যাপী হরতালের বর্তমান পর্বটি চালাচ্ছে রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী। আর আগেই বলেছি শাহবাগের সার্কাসের মূল গায়েন সরকার। বিষয় উভয়েরই এক। কাদের মোল্লার বিচারের রায়। সরকারের বিতর্কিত ট্রাইব্যুনাল প্রশ্নবিদ্ধ বিচার প্রক্রিয়ার পর তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। জামায়াতে ইসলামী কোন প্রকার শাস্তিরই বিরোধী। মন্ত্রীরা বলছেন ট্রাইব্যুনালের উচিত ছিলো তাঁকে ফাঁসির দণ্ড দেওয়া, সে দণ্ডের দাবিতে তাঁরা তথাকথিত সুশীল সমাজকে লেলিয়ে দিয়েছেন। এই সুশীল সমাজ বিশেষ কোন কারণে আওয়ামী লীগের শিকারী কুকুরের পালের ভূমিকা পালন করছে। তারা মধ্য এবং পশ্চিম আমেরিকার 'লিঞ্চিং মবের' মতো ফাঁসি! ফাঁসি! ধ্বনি তুলে জনতাকে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। তার সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে নতুন শ্লোগান: 'শিবির ধরো, জবাই করো'।

অভিধানে 'সু'-এর অর্থ দেওয়া হয়েছে শুভ, সুন্দর। আর 'শীল' বলতে বোঝানো হয়েছে স্বভাব, চরিত্র, আচার-আচরণ ও রীতিনীতি। অর্থাৎ আভিধানিক অর্থে সুশীল বলতে আমরা বুঝবো যাঁদের স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ ও রীতিনীতি শুভ ও সুন্দর। কাউকেই বোধ করি বলে দিতে হবে না যে আজকের বাংলাদেশে যাদের সুশীল সমাজ বলা হয় অভিধানে লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণত তাদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। যারা ফাঁসি ফাঁসি বলে চিৎকার করতে পারে, যারা মানুষ জবাই করার হুমকি দিতে পারে, সেসব রক্ত-পিপাসুকে আমি একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের চাইতেও জঘন্য মনে করি, তারা সভ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত ভাবতে আমার গা-বমি করে।

জাতিসংঘ এখনো অবিশ্বাসী

সরকার ট্রাইব্যুনাল করেছে, বিচারক নিয়োগ করেছে। গোটা ব্যাপারটাই এখনো প্রশ্নবিদ্ধ। এমনকি জাতিসংঘ এখনো বলছে সে ট্রাইব্যুনালের গঠন,

বিচার প্রক্রিয়া কিংবা রায় স্বচ্ছ নয়। সে ট্রাইব্যুনাল কাদের মোল্লাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। সে রায়ে যদি সরকার সন্তুষ্ট না হয় তাহলে তারা আপিল করতে পারে। আপিলের বিধান যদি তাদের আদালত গঠনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না থাকে তাহলে সেটা ট্রাইব্যুনালের গঠনের খুঁত বলতেই হবে। আপিল না করে তারা যে জনতাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে তার মধ্যে তাদের অসৎ অভিপ্রায় সুস্পষ্ট। বাংলাদেশে বিচার পদ্ধতিকে দলীয়করণ করা হয়েছে। তার ওপর ক্ষেপিয়ে তোলা জনতার চাপের দ্বারা আদালতের রায় যদি প্রভাবিত হয় তাহলে এ দেশ কি মনুষ্য বাসের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে? দেশে সরকারের জনসমর্থন শূণ্যের কোঠায়, শাহবাগ মোড়ে বিশাল একটা জনতা সৃষ্টি করে এবং দলীয় মিডিয়ায় অতিরঞ্জিত প্রচার চালিয়ে সরকার কি আশা করছে যে তারা হারানো জনসমর্থনে অন্তত কিছুটাও ফিরে পাবে?

ফিল্মে দেখা আরেকটা ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিলো গত কয়দিনে। ত্রিশের দশকের জার্মানিতে অ্যাডলফ হিটলার গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে জার্মান জনতাকে ক্ষেপিয়ে তুলতেন, তাদের আবেগকে আকাশে তুলে দিতেন। তার পরেই নির্দেশ আসতো: ইহুদিদের বাড়িতে ঢিল ছোঁড়ো, ইহুদি ও সমকামীদের পেটাও, ইহুদি ও বামপন্থী লেখকদের বই পোড়াও। আরো পরে ক্ষেপিয়ে তোলা জনতাকে দিয়ে জার্মান রাইখস্ট্যাগও (পার্লামেন্ট ভবন) পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো।

এসবের জের ধরেই জার্মান চিন্তানায়ক ও বুদ্ধিজীবীদের জেলে পোরা হয়েছিলো, কয়েক লাখ ইহুদি, সমকামী ও উন্মাদকে বন্দী শিবিরে পাঠানো হয়, নাৎসিবাদ জার্মানীতে গেড়ে বসে। পরবর্তী অধ্যায় আরো ভয়াবহ। নাৎসিদের বিশ্বজয়ের বাসনা থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, মানব সভ্যতা ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। শাহবাগ মোড়ে ৩০ মাইকে অনবরত অনল বর্ষণ থেকে ফ্যাসিবাদের বিভীষিকা কি আপনাদের চোখের সামনে ভেসে আসেনি?

আরো কিছু অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছি শাহবাগের সার্কাসে। উসকানি দিয়ে এ সমাবেশ সৃষ্টি করেছিলেন সরকারের মন্ত্রীরা এবং আওয়ামী লীগের নেতারা। কিন্তু এক পর্যায়ে দেখা গেলো আওয়ামী লীগ নেতারা সমাবেশে ঢুকতে পারছেন না। মন্ত্রীদের কাউকে কাউকে তো পানির বোতল ছোঁড়া হয়েছিলো। আরো বিস্ময় আছে। মন্ত্রীরা এবং আওয়ামী লীগ নেতারা শুক্রবারের মহাসমাবেশের পরে শাহবাগের সার্কাস ভেঙ্গে দিতেই বলেছিলেন। অনেকে চলে গেলেও বহু লোক শাহবাগ মোড়ে থেকেই গেছে। মঞ্চের ওপর না থাকলেও মনে হচ্ছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করছে নেপথ্য থেকে ছাত্রলীগ। অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে এখানে। ছাত্রলীগ কি সরকারের ও আওয়ামী লীগের

নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে এসেছে? তারা কি এখন স্বাধীনভাবে এবং নিজস্ব স্টাইলে হত্যা-লুণ্ঠন, চাঁদা ও টেন্ডারবাজির নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে যাচ্ছে? ঘাদানিক ও বামপন্থীরাও এখনো শাহবাগ মোড়ের অবস্থানে আছেন বলে মনে হয়। সেটা কি আওয়ামী লীগের ভেতরে ডান ও বামের ফাটল সৃষ্টির ইঙ্গিত বহন করে?

সরকার-জামায়াত গাঁটছড়া?

আরো বহু রকমের জল্পনা-কল্পনার জন্ম দিয়েছে শাহবাগের তামাশা। সরকারের আজ্ঞাবহ ট্রাইব্যুনাল কেন কাদের মোল্লাকে ফাঁসির দণ্ড দেয়নি? শাস্তির ব্যাপারে নরম হয়ে সরকার কি সংকেত দিচ্ছে যে তারা আবারো জামায়াতের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত গঠন করতে, নিদেন জামায়াত ও বিএনপির মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করতে চায়? প্রশ্ন হচ্ছে জামায়াতও কি সরকারের তেমন কোন ফাঁদে পা দেবে? ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আন্দোলন করার পরবর্তী কালের ঘটনাবলী থেকে কি জামায়াতের হাত যথেষ্ট পোড়েনি? কোন শিক্ষাই কি হয়নি তাদের?

আগেই বলেছি এ সার্কাস সৃষ্টি করেছে সরকারি নির্দেশে তথাকথিত সুশীল সমাজ। এরা আসলে মোটেই সুশীল নয়, কেননা এদের অনেকে বিভিন্ন সময়ে আওয়ামী লীগের ও সে দলীয় সরকারের পক্ষে হুজুগ সৃষ্টিকারী ও গুণ্ডাবাহিনীর মতো কাজ করেছে। সেটা অপ্রত্যাশিতও নয়। আমরা জানি আজকের বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা বাহিনীগুলোর অবাধ লীলাক্ষেত্র। পাশের দেশ ভারত অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে থাকে। তারা মোটেই গোপন করছে না যে তারা যেকোন মূল্যে শেখ হাসিনাকেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী রাখতে চায়। ভারত জানে হাসিনার পরিবর্তে অন্য কেউ প্রধানমনন্ত্রী হলে তিনি নিজ দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ভারতের স্বার্থের সেবা করবেন না।

ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনী র'য়ের অন্যূন ছয় লাখ তিন হাজার চর আছে বাংলাদেশে। তারা সকল স্তরে এবং সকল ক্ষেত্রে সক্রিয়-প্রধানমন্ত্রীর পারিবারিক কর্মচারীদের থেকে শুরু করে যেসব প্রশাসনিক কর্মকর্তা পররাষ্ট্র মন্ত্রক নিয়ন্ত্রণ করেন এবং যেসব পুলিশ অফিসার বিরোধী দলের চিফ হুইপকে মারপিট করেন এবং বন্দী জামায়াতের সমর্থকের গায়ে বন্দুক ঠেকিয়ে তাকে গুলি করেন তাঁরা অবশ্যই র'য়ের চর হতে পারেন। আর যাঁরা শাহবাগের সার্কাসের পেছনে উসকানি দিয়েছেন ও আয়োজন করেছেন তাঁদের মধ্যে অবশ্যই র'য়ের বহু হাজার অনুচর ছিলেন।

(লন্ডন, ১০.০২.১৩)

এই অসাধু সরকারের ওপর বিশ্বাস রাখা সত্যি অসম্ভব

ইংরেজিতে কথাটা হচ্ছে "কুকিং দ্য বুক"– হিসাবে কারসাজি কিংবা জোচ্চুরি করা। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত বলেছেন তিনি এই কারসাজি করার পরামর্শই দেবেন বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্টকে। মুহিত বলেন, দুর্নীতির দায়ে সাবেক মন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনের বিচার করতে সরকার অস্বীকার করছে বলে পদ্মা সেতুর অর্থায়নে বিশ্ব ব্যাংক যে স্বল্প সুদে প্রতিশ্রুত ১২০ কোটি ডলার ঋণ দিতে অস্বীকার করেছে, সে অর্থ অন্য কোন খাতে বাংলাদেশকে দিতে তিনি বিশ্ব ব্যাংককে অনুরোধ করবেন। অর্থাৎ যে অর্থায়ন সদর দরোজা দিয়ে আসার কথা ছিলো সে অর্থ পেছনের দরোজা দিয়ে আনার চেষ্টা করছেন অর্থমন্ত্রী।

এই জোচ্চুরির প্রস্তাবে বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রাজি হবেন কিনা সেটা তাঁদের ব্যাপার, কিন্তু কথা থেকে যাচ্ছে যে চুরি- জোচ্চুরি, মিথ্যা কথা,ভণ্ডামী আর প্রতারণা ছাড়া বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের কাছ থেকে আর কিছু আশা করা যাচ্ছে না। বর্তমান সরকার ইতোমধ্যেই বিশ্বব্যাপী চোর সরকার হিসেবে কুখ্যাতি লাভ করেছে। ভয় হচ্ছে জাতি হিসেবেও আমরা ভণ্ড প্রতারক ইত্যাদি ভাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবো। বহু শর্ত বাদ দিয়ে বিশ্বব্যাংক শেষ পর্যন্ত মাত্র একটাই শর্ত দিয়েছিলোঃ সাবেক মন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগগুলো তদন্ত করুন, দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁকে শাস্তি দিন, তাহলে বিশ্বব্যাংক তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেতুর অর্থায়ন করবে। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান গোলাম রহমান আবুল হোসেনের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে অস্বীকৃতির কারণ দর্শাতে গিয়ে যেমন বাইন মাছের মতো কসরৎ করেছেন তাতে আর সন্দেহ থাকে না যে, সরকার খুব সম্ভবত স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবুল হোসেন সম্বন্ধে তদন্তে আপত্তি করছেন।

মধ্য রাতে সাবেক রেলমন্ত্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের এপিএসের গাড়ি থেকে ৭০ লাখ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় এ ধারণা প্রবল হয়ে ওঠে যে সরকারের বিভিন্ন বিভাগে দুর্নীতির বখরা ওপরের দিকেও যায়। আবুল হোসেনের ব্যাপারে অভিযোগ শোনা যায় তিনি প্রক্সিতে অন্যের হয়ে দুর্নীতি করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধ

তদন্তে সরকারের আপত্তির খুব সম্ভবত এটাই কারণ। এবং এ প্রশ্ন অবশ্যই ওঠে আবুল হোসেন কার প্রক্সি হয়ে দুর্নীতি করছিলেন।

এই যেখানে অবস্থা সেখানে সরকার 'চোরের মায়ের বড়ো গলা' কথাটা প্রমাণ করার জন্যে উঠেপড়ে না লাগলেও পারতো। খোদ প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব ব্যাংকের বিরুদ্ধে গালিগালাজ করেছেন। সরকার ও তাদের অনুগত মিডিয়া। গত মাসে জোর গলায় ঢাক পেটায় যে বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ প্রত্যাখ্যান করে বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংককে 'স্নাব' (হেনস্থা) করেছে। আসল সত্য এই যে বিশ্বব্যাংক তার আগের দিনই কার্যত বলে দিয়েছিলো সরকারের কৈফিয়তগুলো তাদের গ্রহণযোগ্য হয়নি, সুতরাং ব্যাংক ঋণ দেবে না। পরের কয়েকদিন খুবই তড়পাচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ও অন্য কয়েকজন মন্ত্রী। তাঁরা আবার 'নিজস্ব সম্পদ থেকে' পদ্মা সেতু নির্মাণের দম্ভ করছিলেন, অর্থমন্ত্রী নিজেও সে মিথ্যা দম্ভোক্তি থেকে বাদ যাননি।

ইতোমধ্যে চড়া সুদেও অন্যান্য সূত্র থেকে অর্থ সংগ্রহের বহু চেষ্টা করেছে সরকার। আবারো তারা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, জাপানী উন্নয়ন সংস্থা জাইকা এবং ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকসহ আরো বহু সূত্রে ঋণ পাবার চেষ্টা করেছে। চল্লি-শটি দাতা দেশ ও সংস্থার বৈঠক ডেকেছে ঢাকায়, কিন্তু অর্ধেকেরও বেশি আমন্ত্রিত সে ডাকে সাড়া দেয়নি। যারা এসেছিলো তারাও টাকা দিতে রাজি হয়নি। ভারত সরকারও অর্থায়নের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে। তবে 'বিশেষ সুবিধা হিসেবে' ভারত বলেছে, ১০০ কোটি ডলার ঋণের চুক্তি থেকে অনুদান বাবদ যে ২০ কোটি ডলার ভারত দিয়েছিলো প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ সে অর্থ সেতু নির্মাণ কাজে ব্যয় করতে পারে। কে কাকে হেনস্থা করছে সকলের জন্যেই এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে।

মন্ত্রীরা বলছিলেন যে চলতি বছরেই সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু হবে এবং তিন বছরের মধ্যেই পদ্মার ওপর বহুমুখী সেতুটি তৈরি হয়ে যাবে। তবে যোগাযোগমন্ত্রী ওবায়েদুল কাদের অবশ্যি বলেছিলেন যে নিজস্ব সম্পদ থেকে পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব হবে না। প্রধানমন্ত্রী বুয়েটের প্রকৌশলীদের সেতুর নকশা তৈরির জন্যে ছয় মাস সময় দিয়েছেন। নকশাই এখনো তৈরি হয়নি কিন্তু অর্থমন্ত্রী চলতি মাসের শেষেই টেন্ডার আহবানের কথা বলেছেন। মন্ত্রীদের উক্তি থেকে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে তাঁরা বলতে চাইছেন, আরো এক মেয়াদে আমাদের গদি দাও, গত নির্বাচনের আগে দেওয়া অন্য সব প্রতিশ্রুতির মতো সেতু তৈরির প্রতিশ্রুতিও আমরা এ মেয়াদে পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছি, পরের মেয়াদে পূরণ করবো। কিন্তু এ সরকারের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও ফেরেববাজি বাংলাদেশের মানুষ চিনে ফেলেছে, তারা আর ভুয়া প্রতিশ্রুতিতে ভুলবে না।

শাহবাগের মহাসমাবেশ

শাহবাগের মোড়ে কিছুদিন ধরে যে সমাবেশ-মহাসমাবেশ চলছে তার মধ্যেও সরকারের ধূর্তামি এবং অসৎ উদ্দেশ্য নিহিত আছে। মনে হচ্ছে সমাবেশকারীরাও এখন সরকারের ছল-চাতুরি ধরে ফেলেছে। ব্যাপারটা খুবই পরিষ্কার। সরকারের নিযুক্ত ট্রাইব্যুনাল আর বিচারপতিরা কাদের মোল্লাকে ফাঁসির দণ্ড দেননি, দিয়েছেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। সরকার তাতে নাখোশ হয়ে থাকলে আপিল করতে পারতো তারা, আপিলের বিধান ১৯৭৩ সালের আইনে না থাকলে সে আইন তারা সংশোধন করতে পারতো, যেটা তারা এখন করতে যাচ্ছে বলে মনে হয়। কিন্তু আইনমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রীরা তাদের সৃষ্ট ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে (কার্যত নিজেদের সরকারের বিরুদ্ধেই) বিবৃতি দিতে শুরু করেন। কারোই কোন সন্দেহ ছিলো না যে নিজেদের ক্যাডার ও আজ্ঞাবহ তথাকথিত সুশীল সমাজকে (যাঁদের মধ্যে হাজার হাজার র'য়ের চর আছে বলে মনে করা হয়) ব্যবহার করে গণ-হিস্টিরিয়া সৃষ্টি করাই ছিলো সরকারের উদ্দেশ্য। তারা আশা করেছিলো শাহবাগ মোড়ের সমাবেশের গরম গরম বক্তৃতা তাদের জনপ্রিয়তা ফিরিয়ে আনতে কিছু পরিমাণেও সাহায্য করবে।

অনেকগুলো ভুল ছিলো সরকারের হিসেবে। প্রথমত শাহবাগ মোড় বাংলাদেশ নয়। এখানের হিস্টিরিয়া দশ-এগারো মাস পরের বাংলাদেশ নির্বাচনে সামান্যই প্রভাব ফেলবে। দ্বিতীয়ত বোতলের দানব একবার বের করে আনলে তাকে আবার বোতলে পোরা সম্ভব হয় না। ইতোমধ্যে সরকারও সেটা বুঝে গেছে। তারা গত শুক্রবারই (৮ ফেব্রুয়ারি) সমাবেশের সমাপ্তি ঘটাতে চেয়েছিলো কিন্তু বহু লোক এখনো শাহবাগ মোড়েই অবস্থান করছে। রাজধানীর চলাচল ব্যবস্থা এবং অর্থনীতির ওপর তার প্রভাব গুরুতর হতে বাধ্য। এই অবাধ্য অংশ ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণে বলেই জানা গেছে। অর্থাৎ ছাত্রলীগ এবারে পুরেপুরি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে বলে মনে হয়।

ফ্যাসিস্ট প্রবণতা

সরকার আইনের সংশোধন করতে যাচ্ছে। তারা হয়তো আপিল করবে এবং সুপ্রিম কোর্ট হয়তো সে আপিল মঞ্জুরও করবেন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বিচারপতিদের উদ্দেশ্যে 'জনতার দাবি মেনে নিয়ে অভিযুক্তদের ফাঁসি দেবার পরামর্শ দিয়েছেন। এখানে প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে বিচারপতিরা কি মামলার সাক্ষী-প্রমাণ বিবেচনা করে রায় দেবেন, না জনতার আকার দেখে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে যদি ফাঁসি দিতে হয় তাহলে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং কেন এজলাসে বসে ফাঁসির আদেশ দেন না? তাছাড়া শাহবাগের জনতা বাংলাদেশের একমাত্র জনতা নয়। দেশে আরো

বহু জনতা, হয়তো শাহবাগের চাইতেও বড়ো জনতা হয়েছে এবং হয়। তাদের দাবিগুলোর কথা কিভাবে বিবেচনা করবেন বিচারকেরা? প্রধানমন্ত্রী তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাচ্ছেন কোথায়? গোটা দেশের মানুষই তো নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন চাইছে, তাদের দাবির কি করছেন শেখ হাসিনা? জনতাকে ক্ষেপিয়ে তুলে আদালতের রায়কে প্রভাবিত করার চেষ্টায় দেশে এবং বিদেশে এ ধারণাই সৃষ্টি হবে যে বাংলাদেশের বিচার প্রক্রিয়া শাসক দলের অঙ্গুলি তাড়ণে এবং সড়কের জনতার শ্লোগান ও বক্তৃতা দ্বারা প্রভাবিত হয়। সবচাইতে বড়ো কথা, সরকার বিচার প্রক্রিয়াকে দলীয়করণ করে দেশে-বিদেশে সমালোচিত এবং নিন্দিত হয়েছে। এখন আবার জনতার চাপে বিচারকে প্রভাবিত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকার খুব সম্ভবত নিজেদের অজান্তেই ফ্যাসিবাদের দানবকেও বোতল থেকে বের করে দিয়েছে।

শাহবাগ মোড়ে হুমকি দেওয়া হয়, গরম গরম বক্তৃতা দেওয়া হয়, বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার দাবি ওঠে, কাদের মোল্লার ফাঁসি এবং ধরে ধরে 'শিবিরকে জবাই করার' জন্যে গণ হিস্টিরিয়া সৃষ্টি করা হয়। এক শ্রেণির মিডিয়া সেসব নিয়ে কবিতা করে। এর ভয়াবহতা সম্বন্ধে কি বিশ্বজিৎ দাসের হত্যা থেকেও কেউ শিক্ষা নিতে পারেননি? শিবিরের সদস্য ও সমর্থকরা নিশ্চয়ই গলায় সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে চলাফেরা করবে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পুলিশ কমিশনার বেনজীর আহমেদও বলেছেন বেশ-ভূষা এবং চাল-চলন থেকে এখন আর জামায়াত-শিবিরকে চেনা যায় না। চেনাই যখন যাচ্ছে না তখন বিশ্বজিতের মতো আরো বহু নিরীহ ব্যক্তিকে জবাই করার উন্মাদনা সৃষ্টি করা হচ্ছে না শাহবাগে?

শাহবাগের পরিণতিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে অন্তত তিনটি পত্রিকার বিক্রিতে বাধা দেওয়া হয়েছে, এসব পত্রিকার কপি পোড়ানো হয়েছে, কোন কোন টেলি-চ্যানেলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সবচাইতে জঘন্য ঘটনা ঘটেছে গত মঙ্গলবার দুপুর। ছাত্রলীগের ১৫/২০ জন গুণ্ডা লাঠি-সোটা ইটপাটকেল ও চাপাতি ইত্যাদি নিয়ে মতিঝিল এলাকায় দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকার ওপর হামলা করে। তারা একখানি গাড়ি পুড়িয়ে দেয়, ছাপাখানা ভাঙচুর করে এবং ১০ টন নিউজপ্রিন্ট পুড়িয়ে দেয়।

আগুন নিয়ে খেলবেন না

বহু ভাষাতেই সুপ্রাচীন প্রবাদ বাক্য 'আগুন নিয়ে খেলা অত্যন্ত বিপজ্জনক'। সংবাদপত্রের অফিসে কর্মচারী ও সাংবাদিকেরা ছাড়াও বাইরের বহু লোক আনাগোনা করে। বেপরোয়া আগুন লাগানোয় নিরীহ লোকেদের প্রাণহানির

আশঙ্কা সব সময়ই থেকে যায়। সম্পত্তির কিংবা আত্মরক্ষার খাতিরে যদি সবলে প্রতিরোধ করা হয় তাতেও প্রাণহানির আশঙ্কা বাদ দেওয়া যায় না? প্রধানমন্ত্রী কি তাঁর দলের কৃত দুষ্কৃতের কারণে ঘটা সেসব প্রাণহানির দায়িত্ব নেবেন?

সাংবাদিকদের ওপর হামলা, পত্রিকা পোড়ানো, পত্রিকার অফিসে অগ্নিসংযোগ- এ জাতীয় অপরাধ অত্যন্ত ভয়াবহ কিছু প্রবণতার পরিচয় দেয়। সবচাইতে ভয়াবহ ঘটনাগুলো ঘটেছিল বিগত শতাব্দির ত্রিশের দশকে। অ্যাডলফ হিটলার অসাধু পন্থায় ক্ষমতা লাভের জন্যে ফ্যাসিবাদকে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর আগুন ঝরানো বক্তৃতায় সৃষ্ট হিস্টিরিয়ার বশবর্তী হয়ে ফ্যাসিস্টরা প্রথমে পত্রপত্রিকা ও সাময়িকীতে আগুন লাগিয়েছে, লোকের বাড়ি এবং লাইব্রেরী থেকে বই এনে স্তূপাকৃতি করে পুড়িয়েছে, মুক্ত-মন লেখক ও চিন্তাবিদদের ধরে ধরে মারপিট করেছে, তাঁদের এবং ইহুদিদের বাড়িতে আগুন লাগিয়েছে, এমনকি জার্মান রাইখস্ট্যাগও (পার্লামেন্ট ভবন) পুড়িয়ে দিয়েছিলো তারা। এরই জের ধরে জার্মানিতে পূর্ণাঙ্গ নাৎসিবাদ আসে। বিশ্বজয়ের বাসনা থেকে হিটলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করেন, কোটি কোটি মানুষ মারা গেছে সে যুদ্ধে এবং মানব সভ্যতাই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু অন্যায় কখনো চিরস্থায়ী হয় না। ফ্যাসিবাদের কবর রচিত হয়েছিলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেই এবং সস্ত্রীক আত্মহত্যা করে হিটলারকেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিলো।

ক্ষমতার অন্ধ লোভে শেখ হাসিনা একের পর এক ভুল করে চলেছেন। এসব ভুলের খেসারত একদিন না একদিন তাকে দিতেই হবে। কিন্তু ততোদিনে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে। দেশ ও দেশের স্বাধীনতাকে যদি তিনি বাঁচাতে চান তাহলে শেখ হাসিনার উচিত হবে এখুনি নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে সাধারণ নির্বাচনের দাবি মেনে নিয়ে, দেশে ফ্যাসিস্ট প্রবণতাগুলো পরিহার করে এবং অন্য সকল দলের সহযোগিতায় দেশে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনা। তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতির নির্বাচনে পরাজিত হলেও দেশবাসী তাঁকে ক্ষমা করবে এবং পরবর্তীতে তাঁর আবার ক্ষমতা পাবার সম্ভাবনা কেউ বাদ দেবে না। কিন্তু বর্তমানে যে পথে তিনি চলেছেন সে পথে তাঁর জনপ্রিয়তা ফিরে পাবার কোন সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকবে না।

(লন্ডন, ১২.০২.১৩)

হাসিনা কি ইসলামকেও তালাবন্ধ করে দিতে চান?

কয়েক বছর আগে কোপেনহাগনের এক পত্রিকা ইসলামের মহানবী হজরত মোহাম্মদের (দ) কিছু কার্টুনচিত্র প্রকাশ করে। ডেনমার্কে মুসলিম অভিবাসীরা সংখ্যায় খুবই কম, মাত্র কয়েক হাজার। তাঁরা প্রতিবাদ করেছিলেন কিন্তু ডেনিশ সরকার তাতে কান দেয়নি। কিন্তু ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন থেকে শুরু করে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বহুদেশের মুসলমানরা প্রতিবাদ তুলেছিলেন। বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে কোন কোন দেশে ডেনমার্ক ও তার সঙ্গে একাত্মতা দেখানো বিভিন্ন পশ্চিমা দেশের দূতাবাস ইত্যাদিতে অপমানিত, ক্রুদ্ধ জনতা পুলিশের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। পুলিশের গুলিতে বেশ কিছুসংখ্যক মুসলমান মারা যায়। হিন্দু রাষ্ট্র ভারতেও প্রায় এক ডজন মুসলমান মহানবীর (সা) মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন।

চব্বিশ বছর আগে ১৯৮৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ইরানের ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লা খোমেনী পথভ্রষ্ট লেখক সালমান রুশদিকে হত্যার নির্দেশ দিয়ে ফতোয়া জারি করেন। স্যাটানিক ভার্সেস নামক উপন্যাসে রুশদী মহানবী হজরত মোহাম্মদ (দ) সম্বন্ধে অবমাননাকর মিথ্যা কাহিনী লিখেছিলেন। গোটা মুসলিম বিশ্বে এ উপন্যাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ব্রিটেনসহ বহু দেশে মুসলমানরা প্রতীকীভাবে সে উপন্যাসের কপিতে আগুন ধরিয়ে দেন। খোমেনী তাঁর ফতোয়া জারী করেন তার পরে। তারপর থেকে কয়েক বছর রুশদী মূলত আত্মগোপন করে ছিলেন। দিবারাত্রি তাঁর প্রাণরক্ষার জন্যে ব্রিটিশ সরকার বিপুল অর্থ ব্যয়ে বিশেষ পুলিশ থেকে দেহরক্ষী নিযুক্ত করেছিল।

মাত্র দুটি দৃষ্টান্তই উল্লেখ করলাম। আশা করি যথেষ্ট হবে। আমার প্রায় ৬৩ বছরের সাংবাদিক জীবনে এ জাতীয় ঘটনার খবর বহুবার প্রকাশ করেছি, শুনেছি অনেক বেশি। সেসব ঘটনা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ আছে, শিয়া-সুন্নী ভিন্নমত আছে, কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অমর্যাদা কোন মুসলমানই সহ্য করতে রাজি নয়। সে মর্যাদা রক্ষার জন্যে তারা প্রাণ দিতেও রাজি আছে। লক্ষণীয় এই যে মুসলমানদের এই দৃঢ় প্রত্যয় ইসলাম সম্বন্ধে পশ্চিমা বিশ্বে আগ্রহ বহু গুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। গোটা পশ্চিমা বিশ্বে-

বিশেষ করে বৃটেনসহ ইউরোপে-খৃস্টানদের ইসলাম গ্রহণ অনেক বেড়ে গেছে। এসব দেশের ধর্ম ও সমাজনায়করা সে ব্যাপারে রীতিমতো উদ্বিগ্ন। তাঁরা ভয় করছেন এ হারে খৃস্টান যুবক-যুবতীদের ইসলাম গ্রহণ চলতে থাকলে ইউরোপে কোন এক সময় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাবে। সত্যিকারের শিক্ষিত মানুষ সব সময়ই পরমতসহিষ্ণু হন। কারো মান-মর্যাদার ওপর আঘাত দৈহিক আঘাতের চাইতেও বেশি পীড়াদায়ক হতে পারে। তার ওপর সাম্প্রতিক প্রবণতা থেকে কোন কোন পশ্চিমা খৃস্টান মনে করছেন, ইসলাম এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি অবমাননা দেখানো এ ধর্মের প্রতি আগ্রহই বাড়িয়ে দিচ্ছে। সুতরাং বিশেষ করে মিডিয়াকে ইসলাম বিরোধী মতামত সংযত করতে হবে।

সালমান রুশদীকেও ছাড়িয়ে গেছে এরা

দুর্ভাগ্যের কথা, সালমান রুশদীর উপন্যাস এবং ডেনিশ কার্টুনগুলোর চাইতে বহু গুণে বেশি আল্লাহ্ ও রাসূল বিরোধী অশ্লীলতা ছড়ানো হয়েছে ও হচ্ছে বাংলাদেশে, যে দেশের ৯০ ভাগ অধিবাসী মুসলমান। আরো দুর্ভাগ্য সংখ্যা গরিষ্ঠের ধর্মীয় অনুভূতির ওপর যারা এমন জঘন্য আঘাত হানছে এ দেশের সরকার তাদের প্রতি আনুকূল্য দেখাচ্ছে, তাদের সংরক্ষণ দিচ্ছে। অন্যদিকে পশ্চিমা বিশ্বের দৃষ্টান্ত না টেনেও বলা যায় এই চরম আঘাতের ফলে বাংলাদেশের মুসলমানের ধর্ম বিশ্বাস আরো গভীর হবে, মুরতাদ ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের ধবংস অনিবার্য করে তুলবে তারা।

বিষয়টির ওপর ব্যাপক আলোকপাত হয়েছে বিগত ১৫ ফেব্রুয়ারি শুক্রবারের পরে। সেদিন রাতে রাজিব ওরফে থাবা বাবা নামে এক ব্লগার নৃশংস ভাবে খুন হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকার জামায়াতে ইসলামী এবং সার্বিকভাবে ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর মনে হয়। জামায়াতকে এই সরকারের প্রচণ্ড ভয়। পাশের দেশের সরকার হাসিনার পৃষ্ঠপোষক। জামায়াতকে তারাও কুনজরে দেখে। তাদের ধারণা জামায়াতের প্রভাবেই বাংলাদেশের মানুষ ভারত-বিদ্বেষী হয়ে পড়ছে। ২০১১ সালের জুলাই মাসে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছেন সে কথা।

প্রকৃত কারণটা মনমোহন সিংয়ের কিংবা শেখ হাসিনার সরকার স্বীকার করতে ভয় পায়। সে কারণ এই যে জামায়াতের প্রভাবে নয়, ভারতের আধিপত্যবাদের কারণেই বাংলাদেশের মানুষ সে দেশকে ভয় পায়। ২০১০ সালে শেখ হাসিনা দিল্লিতে গিয়ে অজ্ঞাতসংখ্যক গোপন চুক্তি করে এসেছিলেন। সেসব চুক্তির কোন বিবরণ সংসদেও প্রকাশ করা হয়নি, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ দেখছে তাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক এলাকা ও সম্পদের ওপর ভারতের হস্তক্ষেপ ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

ব্লগার থাবা বাবার হত্যার পরদিনই প্রথমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর ও তারপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা থাবা বাবার বাড়িতে গিয়ে প্রকাশ্য সহানুভূতির আতিশয্য দেখান। স্পষ্টতই এই হত্যার দায় জামায়াত কিংবা শিবিরের ওপর চাপিয়ে জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করার স্বপক্ষে আরো কিছু যুক্তি দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন তারা। পরবর্তী ঘটনাবলী কিন্তু সরকারের অভিপ্রায়ের পক্ষে যাচ্ছে না। পুলিশ এ যাবৎ যাদের ঘিরে তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে তাতে মনে হতে পারে যে থাবা বাবার ব্যক্তিগত চরিত্র তাঁর হত্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারে।

তারপর তার কম্পিউটার থেকে তার ব্লগের যেসব বিবরণ পাওয়া গেছে সেটাকে মুসলিম ধর্মবিশ্বাসের ওপর অ্যাটম বোমা নিক্ষেপের সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে। আমার দেশ, নয়া দিগন্ত প্রভৃতি পত্রিকা আল্লাহ্ রাসূল আর ইসলাম সম্বন্ধে থাবা বাবার ব্লগ থেকে তার যেসব মন্তব্য উদ্ধৃত করেছে বার বার আস্তাগ ফিরুল্লা না বলে সেগুলো পড়া যায় না। সে ব্লগ থেকে পাওয়া আসিফ মহিউদ্দিন নামে অন্য এক ব্লগারের কিছু মন্তব্যও প্রায় সমপর্যায়ে পড়ে। মনে হতে পারে এ দু'জন ব্লগার সুপরিকল্পিতভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর অবস্থান কি ইসলামের বিরুদ্ধে?

এর পরেও প্রধানমন্ত্রী হাসিনা এবং তাঁর সরকার ইসলামের বিরুদ্ধে এবং তাঁদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন বলে মনে হয়। এই দু'জনসহ মোট ১৯ জন ব্লগারের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্যে সংশ্লিষ্ট পুলিশ বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে জনপ্রিয় ব্লগ সোনার বাংলাদেশ বন্ধ করা হয়েছে এবং সে ব্লগের সম্পাদককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার চার দিন পরেও তাঁকে কোন আদালতে হাজির করা হয়নি, তাঁর কোন খোঁজও পাওয়া যাচ্ছে না। শাহবাগ মোড়ের সমাবেশে থাবা বাবাকে শহীদ বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে, সেখানে তার স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের প্রস্তুতি চলছে। বিচারপতি মিজানুর রহমান ভূইয়া থাবা বাবার ব্লগের সমালোচনামূলক একখানি চিঠি পাঠিয়েছিলেন সহ-বিচারকদের কাছে। তার বিরুদ্ধ শাহবাগ সমাবেশে ক্রুদ্ধ হুঙ্কার উঠেছে। বলাই বাহুল্য যে সরকার তাৎক্ষণিকভাবে সে হুঙ্কারে সাড়া দিয়েছে। আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদ বলেছেন, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করে বিচারপতি মিজানুর রহমান ভূইয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্বন্ধে তিনি এখন আলাপ-আলোচনা করছেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে থাবা বাবা এবং আসিফ মহিউদ্দিন শাহবাগ সমাবেশের প্রধান উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের ব্লগ থেকেই জানা যাচ্ছে যে

থাবা বাবা ইসলাম বিরোধী এবং আসিফ মহিউদ্দিন নাস্তিক। গোড়া থেকে এই তথ্যগুলো জানা থাকলে বাংলাদেশের কতোজন তরুণ-তরুণী শাহবাগে সমাবেশ করতে আসতেন সন্দেহ আছে। সেসব তথ্য এখন জানা গেছে এবং তার ফলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। রাজনৈতিক জীবনের গোড়ার দিকে তিনি নিজেই বলেছিলেন তাঁর পিতা হত্যার জন্যে বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতেই তিনি রাজনীতিতে এসেছেন।

বিশেষ করে বর্তমান দফায় গদি পেয়ে তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছেন বলে মনে হয়। প্রথমে ইসলামী সন্ত্রাস দমনের নামে বহু মুসলমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁরা কোথায় কি অবস্থায় আছেন কে জানে? তারপর শুরু হলো একাত্তরের যুদ্ধাপরাধের বিচারের কথা। জামায়াতে ইসলামের নয়জন ও বিএনপির দু'জন নেতাকে গ্রেফতার করা হয় প্রথম পর্বে। অথচ যেসব যুদ্ধাপরাধী আওয়ামী লীগের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের বিচার প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না। এঁদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কন্যার শ্বশুর এবং প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেনের নাম সাধারণ্যেই আলোচিত হয়।

দ্বিতীয় পর্বে ইসলামী ভাবাপন্নদের পাইকারী গ্রেফতার শুরু হয়। টুপি-দাড়ি পরিহিত এবং মসজিদের জামাতে শরিক হওয়া হাজার হাজার লোক গ্রেফতার হয়েছেন। তাদের মধ্যে আপাতত আরো ছয়শো জনের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে বিচারের আয়োজন চলছে। মাদ্রাসা এবং ধর্মীয় শিক্ষালয়গুলোর বিরুদ্ধে সরকার ও শাসক দলের নির্যাতনের অবধি নেই। বিচার-বহির্ভূতভাবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুছাত্রকে হত্যা করা হয়েছে, অনেকের লাশ পাওয়া গেছে জলাভূমিতে। কিছু ছাত্রকে র‍্যাব গুম করেছে। গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে সাভারে র‍্যাব ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে দু'জন ছাত্রকে বহু যাত্রীর সামনে গ্রেফতার করে আজ পর্যন্ত তাদের কোন খবর পাওয়া যায়নি। ছাত্রলীগ এ বিশ্ববিদ্যালয়ে গত চার বছর ধরে যে তাণ্ডব চালাচ্ছে তার তুলনা হিটলারের আমলেও দেখা যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাঙচুরের খবর প্রায়ই পত্রিকায় পাওয়া যায়। ছাত্রলীগ কর্মীরা অধ্যাপক-উপাচার্যকে পর্যন্ত মারপিট করে।

আর কিছুই বোঝেন না তিনি ঃ

জামায়াতকে অবৈধ ঘোষণার মারাত্মক পরিণতি সম্বন্ধে বিদেশীরাসহ অনেকেই সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। সর্বশেষ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বৃটিশ পররাষ্ট্র দফতরের মন্ত্রী ব্যারনেস ওয়ার্সি। তিনিও বলে গেছেন রাজনীতির মোকাবিলা রাজনীতি দিয়েই করতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ দলটিকে নিষিদ্ধ

করার সংকল্প শেখ হাসিনা ছাড়তে পারছেন না। পত্রিকায় কোন সমালোচনা হলে সে পত্রিকা নিষিদ্ধ করার কিংবা সে সাংবাদিককে জেলে পাঠানোর ইচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর মনে প্রবল হয়ে ওঠে। লেখার জবাব যে লেখা দিয়েই করতে হয় সেটা তাঁর মাথায় ঢোকে না। মারপিট ও গুলি করে জামায়াত ও শিবিরের সদস্যদের হত্যার খবরও প্রায়ই পত্রিকায় দেখা যায়। এদেশে প্রধানমন্ত্রী আল্লাহর শোকরিয়া আদায়ের কথা ভাবতে পারেন না। ফসল ভালো হলে তিনি তাঁর 'মা-দুর্গার' প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। যেসব মিডিয়া মাঝে মধ্যে ইসলামের কথা বলে এবং সরকারের সমালোচনা করে তাদের বিরুদ্ধে নির্যাতন-নিপীড়ন তো লেগেই আছে।

বর্তমানেও শাহবাগে দিগন্ত টেলিভিশন, দৈনিক আমার দেশ, নয়া দিগন্ত, দিনকাল, সংগ্রাম ও ইনকিলাবের বিরুদ্ধে হুমকি শোনা যায়। তার পরেই খবর পাওয়া যায় দেশের কোথাও দিগন্ত টেলিভিশনের সম্প্রচার জবরদস্তি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, হকারদের মারপিট করে উপরোক্ত পত্রিকাগুলোর কপি কেড়ে নিয়ে তাতে আগুন লাগানো হচ্ছে। ইদানীং আবার ইসলামী ব্যাংকের বিরুদ্ধে হুঙ্কার শুরু হয়েছে। সুপরিকল্পিতভাবেই দেশের কোথাও না কোথাও এ ব্যাংকের শাখা কার্যালয়ে তালা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবং প্রায় অনিবার্যভাবেই প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে তিনি কি কুলুপ এঁটে ইসলামকেও বন্ধ করে দিতে চান? শেখ হাসিনার মনে রাখা উচিত বহু বলদর্পী অতীতে সে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। সর্বশেষ দৃষ্টান্ত ছিলেন যোসেফ স্ট্যালিন। আজ তাঁরা কোথায়? এবং কোথায় ইসলামের মহিমা?

(লন্ডন, ২০.০২.১৩)

অন্ধের দেশে বধিরের বিচার

মতভেদ-মতান্তর ঘরে ঘরেও ঘটে, বৃহত্তর সমাজে এবং রাজনীতিতে তো বটেই। মতান্তরকে ঘিরে যদি আমরা একে অন্যের চোখ উপড়ে ফেলি তাহলে এইচ জি ওয়েলসের গল্পের মতো একটা অন্ধের দেশ সৃষ্টি হতে বিলম্ব হবে না।

বাংলাদেশ কি অন্ধের দেশ হতে যাচ্ছে? আমার দেশ পত্রিকা বহু ব্যাপারে বর্তমান সরকারের সমালোচনা করে। এ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের ওপর সরকার নানা কারণে ক্রুদ্ধ। যে বিরোধ নীতি ও আদর্শের ব্যাপারে তার সুরাহা হওয়া উচিত নীতিগত ও আদর্শিকভাবে– অন্তত সভ্য মানুষের দেশে সেটাই হওয়া উচিত। ইতিহাসে ধিকৃত বহু ডিক্টেটরের মতো বাংলাদেশের বর্তমান সরকার তাদের সমালোচনা ও বিরুদ্ধ মতামতের গলা টিপে মারার কোন চেষ্টারই ত্রুটি রাখছে না। এক সত্য প্রকাশ করে মাহমুদুর রহমান নয় মাস জেল খেটেছেন। আরেক সত্য প্রকাশ করে এখন তিনি নিজের আফিসে বন্দী হয়ে আছেন। লক্ষণীয় যে তাঁর প্রকাশিত সত্যকে সরকার মিথ্যা প্রমাণ করতে পারেনি।

বাংলাদেশে বর্তমানে মিডিয়ার ৯০ শতাংশ সরকারের অনুগ্রহ-নির্ভর বললে অত্যুক্তি হবে না। তার ওপর রাষ্ট্রায়ত্ত প্রচার মাধ্যম তো আছেই। তারা যে আমার দেশের সমালোচনা এবং মাহমুদুর রহমানের ওপর আক্রমণ করছে না তা নয়। সাধারণ বুদ্ধিতে বলে মাহমুদুর রহমান যা লিখছেন আয়তনে তার নয়-দশ গুণ বেশি লেখা ও প্রচার করা হচ্ছে সরকারের অনুগত মিডিয়া থেকে তাঁর বিরুদ্ধে। এমতাবস্থায় সেসব পড়ে এবং হজম করে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ শ্রোতা ও পাঠকদের দেয়া উচিৎ ছিল। এবং মনে রাখতে হবে ভোটদাতারা কেউ নাবালক নন, তাঁদের সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে শাহবাগে 'মুক্ত মন, মুক্ত মন' বলে হামড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই।

শেখ হাসিনার সরকারের কাজকর্ম মনে হওয়া স্বাভাবিক নিজেদের নীতি ও কর্মপদ্ধতির ওপর তাদের আস্থা নেই। সরকার মনে করে তাদের কথা, তাদের অনুগত মিডিয়ার কথা দেশের মানুষ বিশ্বাস করে না, তারা বিশ্বাস করে সরকারের সমালোচক যে মাত্র তিন-চারখানা পত্রিকা আছে তাদের কথা।

ভারতীয় চর এবং ধর্মদ্রোহী ও ইসলাম-বিরোধী কিছু ব্যক্তির উদ্যোগে শাহবাগের মোড়ে একটা সার্কাস শুরু হয়েছিল। ভারতের নেতৃ-স্থানীয় পত্রিকা টাইমস অব ইন্ডিয়া সে দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শিবশংকর মেননের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছে যে শাহবাগের সমাবেশ সবচাইতে জোরালো সাহায্য পাচ্ছে ভারত থেকে। সে সার্কাস এখন 'ফ্লাইং সার্কাসে' পরিণত হয়েছে, সেখান থেকে গলা ফাটিয়ে আমার দেশ নিষিদ্ধ এবং মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতার করার দাবি করা হচ্ছে।

রাণী রাশমণি ও রইশ্যার নানী

ছিয়ান্নব্বুইয়ে ক্ষমতায় ছিল বিএনপি, খালেদা জিয়া ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সে সরকারকে টেনে নামাতে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল আওয়ামী লীগ। জনতার মঞ্চ স্থাপিত হয়েছিল সেজন্যে। সে মঞ্চ থেকে ছড়ানো হয়েছে মিথ্যা এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতায় উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী নিযুক্ত রাষ্ট্রের কর্মচারীদের নির্বাচিত সরকারকে অমান্য করতে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। একাত্তরে যিনি কোলাবোরেটর ছিলেন এবং বর্তমানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেই মহিউদ্দিন খান আলমগীর জনতার মঞ্চের একজন বড়ো পাণ্ডা ছিলেন। বর্তমানে ক্ষমতায় আছে আওয়ামী লীগ এবং শেখ হাসিনা এখন প্রধানমন্ত্রী। (অবশ্যি মঙ্গল গ্রহ থেকে কোন পর্যটক এলে বুঝতে পারবে না যে বাংলাদেশে কেউ ক্ষমতায় আছে, কেউ এদেশ শাসন করছে, কেননা কার্যত একটা নৈরাজ্যের এবং গৃহযুদ্ধের অবস্থা বিদ্যমান এদেশে)। এখন মনে হচ্ছে শাহবাগের সমাবেশ এবং এ মঞ্চ সে মঞ্চ গড়ে উঠেছে ঠ্যাকা-ঠুকা দিয়ে শেখ হাসিনার নড়বড়ে ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে।

তাহরির স্কোয়ারের তুলনা দিয়ে শাহবাগের পাণ্ডারা নিজেদের মিথ্যা গৌরব দিতে চেয়েছিলেন। রাণী রাশমণির সঙ্গে রইশ্যার নানীর তুলনা আর কি! কেউ কেউ আবার অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলনের নাম করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সে চেষ্টা জমেনি। বর্তমানের শাসক চক্র এবং তাদের পা-চাটারা এমনি করেই বাংলাদেশের মানুষকে সাপের পাঁচ পা দেখাতে চায়। তাহরির স্কোয়ার আর অকুপাই ওয়ালস্ট্রিট ছিল প্রতিবাদের। তাহরির স্কোয়ার প্রতিবাদ তুলেছিল মিসরের ৩০ বছরের স্বৈরশাসক অত্যাচারী হোসনি মোবারককে উৎখাৎ করার লক্ষ্যে। সে উৎখাৎ তারা করে ছেড়েছে। ধনতন্ত্রীদের যে সীমাহীন লালসা ২০০৮ সালে পশ্চিমা ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে সংকট সৃষ্টি করেছিল অকুপাই আন্দোলন শুরু হয় তার প্রতিবাদে। কিন্তু তাহরির স্কোয়ারের মতো কোন চাঞ্চল্যকর সাফল্য তাদের কপালে জোটেনি।

অন্যদিকে কোন প্রতিষ্ঠিত অনুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, ক্ষমতাসীন সরকারের অঙ্গুলী তাড়নে এবং পাশের দেশ ভারতের 'জোরদার সাহায্যে' শাহবাগের সমাবেশ সৃষ্টি হয়। সরকার কিছু নিজের এবং কিছু পৃষ্ঠপোষক প্রতিবেশী দেশের এজেণ্ডা বাস্তবায়ন করতে চায়। দেশে তাদের কোন জনসমর্থন নেই। 'কিচেন সংসদও' কর্তৃত্বহীন। কিছু বিদেশী চর, আওয়ামী লীগের কিছু ক্যাডার আর ইসলামের শত্রু কিছু চালচুলোহীন ব্যক্তিকে নিয়ে তারা সমাবেশ শুরু করে। সে সমাবেশ পরে মঞ্চে পরিণত হয় এবং ফ্লাইং সার্কাসের রূপ নেয়। আজ মীরপুর, কাল মতিঝিল এসব করেই এখন তাদের দিন কাটবে, শাহবাগের স্থায়ী ঠিকানা এখন আর তাদের জন্যে নিরাপদ নয়।

প্রধানমন্ত্রীর নাটক ও নাট্যমঞ্চ

বর্তমান সরকার এবং শাসক দল নাটক করতে ভালোবাসে। প্রধানমন্ত্রী হাসিনা নাটক আর চটক ছাড়া কথাই বলতে পারেন না। নাটক করতে মঞ্চের প্রয়োজন। এ মঞ্চ-সে মঞ্চ নামে মঞ্চ তৈরি এদের পুরনো টেকনিক। ছিয়ানব্বইতে তারা জনতার মঞ্চ করেছিল। রাষ্ট্রকে অচল করে দেয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। সে মঞ্চ থেকে খোলাখুলি রাষ্ট্রদ্রোহিতা প্রচার করা হচ্ছিলো, নির্বাচিত এবং সাংবিধানিক সরকারকে অমান্য করার ডাক দেওয়া হয়েছিল রাষ্ট্রের কর্মচারীদের। তবে এবারে আর মঞ্চগুলো কারো বিপক্ষে নয়, সরকারের স্বপক্ষে। সরকারকে চাড়া দিয়ে খাড়া রাখার মতলবে। বর্তমান সরকার সাঁতার পুকুরের শিশুর মতো। নিজের ওপর ভরসা নেই, সামনে এগুবার সাহস তাদের নেই। সামনে থেকে কেউ হাত বাড়িয়ে না ডাকলে কি করে আর এগুনো যায়? সরকার বলে দিচ্ছে কি তারা করতে চায়। ঠিক ঠিক সে জিগির উঠছে শাহবাগ থেকে। কৃত্রিম সাহস পেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সরকার। দেশকে এবং বিশ্বকে তারা হাইকোর্ট দেখাচ্ছে। বলছে এই তো, দেশের জনমত এ দাবি করছে, তাই তো আমরা এ কাজটা করতে যাচ্ছি। এক কালের স্বৈরতন্ত্রীরা বলতো, দেশ মানে তো আমি! এখনকার বাকশালীরা বলে দেশ হচ্ছে শাহবাগ।

সরকারের পোষা এবং র'য়ের ভর্তুকি-খোর লেখকরা দিস্তা দিস্তা কলাম লিখছেন সরকারের পোষা পত্রিকায়, তাদের আপনজনেরা টেলিভিশনের টকশোর পর্দা অলংকৃত করছেন। কিন্তু সরকার এখন বুঝে গেছে তাদের কথায় কেউ বিশ্বাস করছে না। করবে কি করে? প্রতীতি ছাড়া যা লেখা কিম্বা বলা হয় সেটা বাহ্যতই হিপোক্রেসি, আর হিপোক্রেসি সার্কাসের ক্লাউনের মেক-আপের মতোই ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত হবে। বেদিশা, উপায়ান্তর-বিহীন সরকার এখন অন্য পথ নিয়েছে। আমার কথা যদি কেউ না শোনে তাহলে ওদের মুখ বন্ধ করো, ওদেরও কথা বলতে দিয়োনা।

শাহবাগের সার্কাস থেকে তাই হুংকার উঠেছে অমুক অমুক আর তমুক পত্রিকা পোড়াও। বাস, যায় কোথায়! এলাকায়-এলাকায় সরকারের ক্যাডার আর শাসক দলের গুণ্ডারা অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেলো। বেচারা হকারদের কাছ থেকে নয়া দিগন্ত, আমার দেশ আর সংগ্রাম পত্রিকার কপি ছিনিয়ে নিয়ে আগুন লাগাও তাতে। এসব পত্রিকার বিক্রেতা হকাররা দিন-কয়েক সহ্য করেছিল। কিন্তু তাদের চোখের সামনে অন্য পত্রিকাগুলো বিক্রি হচ্ছে, তারা খাবে কী? সুতরাং তারাও এগিয়ে এলো। সরকারের দালাল পত্রিকাগুলোর কপি কেড়ে নিয়ে তারাও আগুন জ্বালালো। সমালোচক পত্রিকা যদি পাঠক পড়তেই না পেলো তাহলে দালাল পত্রিকাও তাদের পড়তে দেওয়া হবে না। চমৎকার প্রতিশোধ! আমার চোখে তুমি আঙ্গুল দিয়েছো, আমাকে অন্ধ করে দিয়েছো। আমিও আঙ্গুল দিয়ে তোমার চোখ উপড়ে ফেলবো, তোমাকে অন্ধ করে দেবো। সকল রাজনৈতিক বিবাদ-বিতর্ক শেষ হয়ে গেলো। সকলেই এখন বুদ্ধিবৃত্তিক অন্ধের দেশে বাস করবে।

আইন-শৃঙ্খলা, ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচার আওয়ামী লীগের শাস্ত্রে নেই। তারা সংসদ বর্জন করে, লাগাতার হরতাল করে। হাজার-হাজার লগি-লাঠি-ধারী ভাড়াটে গুণ্ডাকে তারা রাজধানীতে আমদানী করে, দিবালোকে রাজপথে পিটিয়ে মানুষ মারে। সড়ক সেতু ও বন্দর অবরোধ করে তারা, রেল লাইনের ফিশপ্লেট ও রেল উপরে ফেলে। প্রতিপক্ষ সেসব করতে গেলে তাদের আঁতে ঘা লাগে, তাদের ট্রেড মার্কের অবমাননা হয়। গত কয়দিনে জামায়াতের হরতালের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হুংকার ছাড়ার সময় তাদের ২০০৬ সালের অক্টোবরের কথা মনে হয় না, মনে হয় না যে জামায়াতকে নিয়ে ১৯৯৬ সালে এ রকমই ধ্বংসাত্মক হরতাল তারা করেছিল।

বিচার বনাম আওয়ামী লীগ ঃ

গণতন্ত্রকে কলা দেখিয়ে তারা মিলিটারীর ডিক্টেটরশিপকে স্বাগত করে। ক্ষমতা হাতে পেলে তারা নৈরাজ্য ডেকে আনে, পুলিশের কাজে গুণ্ডাদের আর গুণ্ডামী করতে পুলিশকে পাঠানো হয়। তারা খালেদা জিয়ার ছেলেদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মিথ্যা মামলা দিয়ে ডামাডোল সৃষ্টি করে আর সে সুযোগে দেশের সর্বস্ব লুটপাট করে। এ বি এম মূসা আজীবন আওয়ামী লীগের সমর্থক, সে দলের সংসদ সদস্য এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নিয়মিত সফরসঙ্গী ছিলেন। বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে সে মূসার পরামর্শ: আওয়ামী লীগার দেখলে 'চোর-চোর' ধ্বনি তুলবেন। হয়তো অন্যদের হুঁশিয়ার করার লক্ষ্যে।

আইনের ওপর যাদের আস্থা নেই তারা বিচার, বিশেষ করে ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচার সহ্য করবে কি করে? বিচার ও বিচারকের প্রতি আওয়ামী

লীগের আস্থা কখনই ছিলো না। ছিয়ানব্বইয়ের সরকারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন মোহাম্মদ নাসিম। কোন কোন বিচারক তখন বোধ হয় হাসিনার সরকারের হুকুম মেনে চলতে রাজি ছিলেন না। গজারি কাঠের লাঠিধারী দুর্বৃত্তরা বিচারকদের বিরোধী স্লোগান দিয়ে হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্ট প্রদক্ষিণ করে। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন কে? ঠিকই ধরেছেন। নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম।

বর্তমান দফায় গতি পেয়েই আঁটঘাট বেঁধে উচ্চ আদালতকে পোষ মানানো হয়। কট্টর আওয়ামী লীগপন্থী বিচারক দিয়ে আদালত ও বিচার ব্যবস্থাকে ভারাক্রান্ত করে ফেলা হয়। সরকার ও শাসক দলের স্বার্থের অনুকূলে সুয়োমোটো ক্ষমতা ব্যবহার কোন কোন বিচারপতির বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। ন্যায় বিচার করার, দেশের মানুষের ফরিয়াদ শোনার সময় তাঁরা কোথায় পাবেন? ন্যায় বিচার আজকের বাংলাদেশে 'নীরবে নিভৃতে কাঁদে'।

সকল নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালনে শোচনীয় ব্যর্থ হয়েছে সরকার। এমনকি পদ্মা সেতুও তৈরি করতে পারেনি। সরকারের শীর্ষ ব্যক্তিদের হয়ে প্রক্সিতে দুর্নীতি করার দায়ে অভিযুক্ত সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনের বিচারে সরকার বাধা দিচ্ছে বলে। এ লোকটার বিচার না হলে বিশ্ব ব্যাংক সেতু তৈরির টাকা দেবে না এবং সরকারও তার বিচার করতে দেবে না। নির্বাচনের কয়েক মাসের মাথায় এসে এখন সেতু নির্মাণ নয়, 'নদী-শাসনের' নামে কিছু মাটি কাটাকাটি করে মানুষকে হাইকোর্ট দেখানোর ব্যর্থ চেষ্টা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, আবার তাদের ভোট দেয়া হলে আগামীতে তারা পদ্মা সেতু তৈরি করবে। দেখা যাচ্ছে, দেশের চাইতে সরকার বড়ো এবং সরকারের চাইতেও বড়ো আবুল হোসেন।

প্রতিশোধ বিচার নয়

অতএব তারা 'বিচার' করবে, অর্থাৎ বিচারের নামে ব্যক্তিগত প্রতিশোধবাসনা ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবে। যে কোনো আইনবেত্তা আপনাকে বলে দেবে প্রতিশোধের সামান্যতম সন্দেহ যেখানে উঁকিঝুঁকি মারে বিচারের কথা সেখানে উঠতেই পারে না। আর এ বিচার কাদের বিচার? একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের? ঠিক হলো না। যেসব যুদ্ধাপরাধী প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয় নন এবং যারা আওয়ামী লীগের ছাতার নিচে আশ্রয় নেননি এ বিচার তাদের বিচার। বিচারের জন্যে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হলো, 'কানা ছেলের পদ্মলোচন' নামের মতো করে তার নাম রাখা হলো 'আন্তর্জাতিক'। সরকার বেছে বেছে মনের মতো বিচারকদের নিয়োগ করলো, প্রধান বিচারপতি করা হলো এমন

একজনকে যিনি ১৯৯৩ সালে শাহরিয়ার কবিরের গণআদালতের বিচারপতি ছিলেন।

আন্তর্জাতিক আইনবেত্তারা বললেন, আন্তর্জাতিক আইনে তো নয়ই, বাংলাদেশের আইনেও এ ট্রাইব্যুনালের গঠন পদ্ধতি সঠিক হয়নি। কোনো বিদেশী আইনজ্ঞকে, এমনকি কোনো বিদেশী পর্যবেক্ষককেও ট্রাইব্যুনালে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি। তুরস্কের একটা প্রতিনিধিদল সরকারের অসতর্কতার কারণে ট্রাইব্যুনাল দেখে গিয়েছিল। তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিল সরকার। এবং ট্রাইব্যুনাল গঠনের আগে থেকেই প্রধানমন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রীরা সমস্বরে ঘোষণা করে চললেন যে অভিযুক্তদের সকলকে ফাঁসি দেওয়া হবে।

আইনের এবং বিচার ব্যবস্থার গোড়ার কথা এই যে রায় কি হবে সেটা বিচার শেষ হবার আগে বিচারকও জানবেন না। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের বক্তব্য শুনে সাক্ষ্য-প্রমাণ ও আইনের ভিত্তিতে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জুরিদের মতামত নিয়ে, বিচারক তার রায় দেবেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে সরকার আগে থেকেই বিচারকদের বলে দিলো বিচার-বিচার খেলার পর কি রায় তাদের দিতে হবে। সে খেলাও বিচারকরা ঠিক মতো খেলতে পারলেন না। উপরোক্ত প্রধান বিচারপতি ব্রাসেলসে এক ব্যক্তির সঙ্গে সুদীর্ঘ স্কাইপ-সংলাপ করে মামলা পরিচালনা, রায় দান ইত্যাদি বহু বিষয়ে পরামর্শ নিলেন। সে সংলাপে আরো পরিষ্কার হয়ে যায় যে অভিযুক্তদের ফাঁসির দণ্ড দিলে প্রধান বিচারপতি পুরস্কৃত হবেন বলে আশা করেন।

এ সরকার এমনই আনাড়ি যে ষড়যন্ত্রগুলোও তারা নিখুঁত, নিশ্চিতভাবে করতে পারে না। এতো আটঘাঁট বাঁধার পরও দেখা গেলো কাদের মোল্লা সে ষড়যন্ত্রের জাল কেটে বেরিয়ে গেছেন; সরকারের গঠিত আদালতে সরকারের নিযুক্ত প্রসিকিউটারদের পরিচালিত মামলায় সরকারের নিযুক্ত বিচারকও কাদের মোল্লাকে ফাঁসির দণ্ড দিলেন না। কল্পনা করে নিতে দোষ নেই বিবৃতিতে মন্ত্রীদের গাল রক্ত-রাঙা হয়ে গিয়েছিল। আন্তর্জাতিক ফৌজদারী আদালতের আইনে প্রাণদণ্ডের বিধান নেই। কিন্তু প্রতিহিংসার ফাঁসি সরকার দেবেই। সুতরাং আইন পরিবর্তন করতে হবে। সমস্যা হলো তাহলে সরকারের মান থাকবে কিনা। অতএব শাহবাগে একটা দঙ্গল সৃষ্টি হলো। সরকারের ক্যাডার আর র'য়ের চরেরা সদাই প্রস্তুত থাকে হাসিনার সরকারকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে।

তারা হাঁক দিলো কাদের মোল্লার ফাঁসি চাই, সকলের ফাঁসি চাই। শিশুদের কপালে আর গালে তারা লিখে দিলো ফাঁসি চাই, জবাই করো। কাদের মোল্লার পরে রায় বেরিয়েছে মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বিরুদ্ধে। তাকে ফাঁসির দণ্ড দেওয়া হয়েছে। না দিয়ে কি উপায়ে ছিল বিচারকদের? শাহবাগের

দঙ্গল সরকারের হাতে হাতুড়ি তুলে দিয়েছে, সে হাতুড়ি সরকার ধরে রেখেছে বিচারকদের মাথার ওপর। ফাঁসির হুকুম না দিলে হাতুড়ি নেমে আসবে, তাদের মাথার ঘিলু মাটিতে গড়াগড়ি যাবে। বিচারকরা বধির। তারা আইনের কথা, যুক্তির কথা শোনেন না, তারা শুধু মাথার ওপরে ঝুলে থাকা হাতুড়িটির ভয়ে তটস্থ থাকেন।

বাংলাদেশী জালিয়ানওয়ালাবাগ

আইনের কিম্বা আদালতের প্রয়োজন কি? প্রয়োজন হচ্ছে মানুষ যে সুখে-শান্তিতে বেঁচে থাকতে চায় তাদের জন্যে সে সুযোগ সৃষ্টি করা। কিন্তু আইনের নামে যদি বৈষম্য এবং হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়, শান্তি রক্ষার নামে যদি গণহত্যা হয়, তাহলে সে সমাজকে সভ্য সমাজ বলবো কি করে? তার চাইতে আরণ্যক যুগে ফিরে যাওয়া কি শ্রেয়তর হবে না?

দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর রায়ের জের ধরে বাংলাদেশ ফুঁসছে। বাংলাদেশে রক্ত ঝরছে। বস্তুত গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে বাংলাদেশে। জামায়াতীরা এবং সরকারের প্রতিশোধের বিচারকে যারা ন্যায্য বলে মেনে নিতে পারছে না ফুঁসছে তারা। সরকারের দালাল মিডিয়া ঢাক-ঢোল বাজিয়ে প্রচার করছে: জামায়াতের সহিংসতায় ওখানে অতোজন নিহত। আসলে কি তাই? লাশগুলো পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে তারা মারা যাচ্ছে পুলিশের গুলিতে। 'শুট অন সাইট' (দেখামাত্রই গুলি) নির্দেশ সরকার আগেভাগেই দিয়ে দিয়েছিল। মানুষ প্রতিবাদ করতে চাইলেই প্রতিবাদ করবে। তাই বলে দেখামাত্রই গুলি করতে হবে তাদের? এ কোন বর্বর যুগে ফিরে গেছি আমরা? ২০১৩ সালের বাংলাদেশে কি ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগ ফিরে এলো?

শেখ হাসিনা কি ভাবছেন ইংরেজ যে নীতি অনুসরণ করে ব্যর্থ হয়েছিল সে নীতি দিয়ে তিনি সফল হবেন? বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার ব্যর্থ ও অন্যায় নীতির দরুন। তাকেই নীতি পরিবর্তন করে সঠিক পথে ফিরে আসতে হবে। এখনো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হয় হাসিনাকে অবিলম্বে ঘোষণা দিতে হবে যে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে রাজি আছেন। কালবিলম্ব না করে সরকারকে বিএনপির সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে। পুনর্বিবেচনার জন্যে তথাকথিত আন্তর্জাতিক আদালতের কার্যক্রম স্থগিত করতে হবে এবং শাহবাগের জঞ্জাল-আবর্জনাগুলো পরিষ্কার করতে হবে। তা না হলে দেশে যা ঘটবে কিম্বা ঘটতে যাচ্ছে বলে মনে হয় তার পুরো দায়িত্ব বহন করতে হবে শেখ হাসিনা ও তার সরকারকে।

(লন্ডন, ০৩.০৩.১৩)

খালেদা জিয়ার ট্রাইব্যুনাল গঠনের হুঁশিয়ারি

আমার ছোটবেলায় নোয়াখালীর আমিশাপাড়া বাজারে হাটের দিন এক পাগল আসতো। হাটের মধ্যেখানে দাঁড়িয়ে সে আঙুর তুলে সকলকে বলতো, তুই পাগল, তুই পাগল, সব পাগল। তার নিশ্চয়ই মনে হতো হাটের জমজমাট জনতার মধ্যে সে একলাই সুস্থবুদ্ধির ছিল, আর সকলেই উন্মাদ।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গত সোমবারের সভায় আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য তোফায়েল আহমেদ বিরোধী দলের নেতা, বিএনপি ও ১৮ দলীয় জোটের নেত্রী এবং ইতিপূর্বেই তিনবারের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে বলেছেন তিনি নাকি জয়ী হবেন না, কেননা তিনি জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। আওয়ামী লীগের এখন দুর্দিন, নৌকা ডোবে-ডোবে। খুন-খারাপি, গুম, লুটপাট আর সর্বময় দুর্নীতিতে দেশের মানুষ অতিষ্ঠ, বিদেশীরা সমালোচনা মুখর।

এই সরকার আর তার প্রধানমন্ত্রী একদলীয় বাকশালী শাসন এবং আজীবন ক্ষমতা চান। কিন্তু বিদেশী পৃষ্ঠপোষকরাও বলছেন সরকারের মেয়াদ শেষে নির্বাচন দিতেই হবে এবং বিশ্ব সমাজে গ্রহণযোগ্য করার জন্যে সে নির্বাচনে সকল দলের অংশগ্রহণ থাকতেই হবে। সেখানেই হয়েছে মুশকিল। সরকারও জানে নির্বাচন দিলে আওয়ামী লীগের ভোটব্যাংক হিন্দুদের আনুমানিক দশ শতাংশ ছাড়া আর কেউ এ দল আর এ সরকারকে ভোট দেবে না। শেখ হাসিনার তত্ত্বাবধানে মাস্টারপ্ল্যানের নির্বাচন করেও বড়জোর ২০-৩০ শতাংশ ভোটের হেরফের করা যায়, কিন্তু অবশিষ্ট ৭০ শতাংশ ভোট চুরি করাতো খুব সহজ নয়!

স্বাভাবিক অবস্থায় বাংলাদেশের ভোট মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক-তৃতীয়াংশ ভোট বিএনপির, এক-তৃতীয়াংশ জামায়াতে ইসলামীসহ বর্তমানে সরকারের বিরোধী অন্য সবগুলো দলের, আর আওয়ামী লীগ পায় এক-তৃতীয়াংশ। আওয়ামী লীগের অংশে তাদের ভোটব্যাংক হিন্দু এবং উপজাতীয় ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের বাদ দিয়ে সংখ্যাগুরু ভোটের ১৬-১৭ শতাংশ মাত্র পড়ে। বিগত সোয়া চার বছরে এ সরকার শোষণ ও নির্যাতনের জন্যে জনসংখ্যার ৯০

শতাংশ মুসলমানদেরই বেছে নিয়েছে। নাইন-ইলেভেন সন্ত্রাসের পরবর্তী কালে মার্কিন সমাজের ইসলামী জুজুর ভয়ভীতির অপসুযোগ নিতে শেখ হাসিনার সরকার প্রথম দিন থেকেই 'ইসলামী সন্ত্রাস' দলনের নামে টুপি-দাড়ি পরিহিত লোকদের ধরে ধরে জেলে পুরেছে। এমন সব নামের সংস্থার লোকজনকে গ্রেফতার করা হচ্ছে বলে সরকার দাবি করছে যেসব সংস্থার নাম কেউ কখনো শোনেনি।

ভারতকে করিডোর আর সামুদ্রিক বন্দরগুলো ব্যবহারের অবাধ অধিকার দেওয়ায় বাংলাদেশের মানুষ ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ। তারা সেটাকে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অঞ্চল বিদেশীদের হাতে তুলে দেবার সামিল বলেই মনে করে। ভারত সরকারের বিবেচনায় জামায়াতে ইসলামী দল বাংলাদেশে মানুষকে ভারত-বিরোধী করে তুলছে বলেই তারা করিডোরের এমন ঘোরতর বিরোধী হয়ে উঠছে। সুতরাং জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামপন্থী দল ও গোষ্ঠীগুলোকে খতম করার কাজে ওঠেপড়ে লাগলো নতজানু বাংলাদেশ সরকার।

সরকারের পরিকল্পনায় চালুনির ফুটো

জামায়াতকে ঘায়েল করার লক্ষ্যে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে সরকার সুবিধাজনক বিবেচনা করেছিল। কিন্তু সে বিবেচনার সারা গায়ে চালুনির মতো ফুটো ছিল। প্রথমত হাসিনার পিতা শেখ মুজিবুর রহমান জঘন্যতম যুদ্ধাপরাধী বলে শনাক্ত করা ১৯৫ জন পাকিস্তানী সৈন্যকে ক্ষমা করেছিলেন এবং দেশের ভেতরের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের জন্যে সাধারণ ক্ষমা (অ্যামনেস্টি) ঘোষণা করেছিলেন। দ্বিতীয়ত শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে জামায়াতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি চালুর দাবীতে আন্দোলন করেছিলেন। সে বছরের জুন মাসের নির্বাচনে একক গরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়ে জামায়াতের সংসদ সদস্যদের সমর্থনে সরকার গঠন করেছিলেন। সরকার গঠনের পরও যুদ্ধাপরাধের দায়ে জামায়াত সদস্যদের বিচার করা প্রয়োজনবোধ করেননি প্রধানমন্ত্রী হাসিনা। তৃতীয়ত সোয়া চার বছর আগে দ্বিতীয় বার প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্যে এমন কয়েকজনকে বেছে নিলেন যাঁরা বর্তমানে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক বিরোধী, অর্থাৎ জামায়াত এবং বিএনপির সদস্য। যেসব রাজাকার ও আল বদর আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছেন তাঁদের কাউকে অভিযুক্ত করা হয়নি। এঁদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং মন্ত্রী সভার সদস্যও আছেন কেউ কেউ।

চতুর্থত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্যে সরকার যে পদ্ধতিতে ট্রাইব্যুন্যাল গঠন করেছে এবং যে পদ্ধতিতে সে ট্রাইব্যুনালের বিচার চলছে দেশে ও বিদেশে

আইন-বিশেষজ্ঞরা তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। সরকারের নিয়োজিত বিচারকরা সরকারের নিযুক্ত প্রসিকিউটারের তৎপরতার পরও কাদের মোল্লাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিলেন কিন্তু সরকার সে রায়ও মানেনি। বিচারপতিদের ওপর চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে শাহবাগে একটা কৃত্রিম প্রতিবাদ ক্যাম্প গঠন করে তাণ্ডব সৃষ্টি করা হয়। পরিষ্কার হয়ে যায় যে এ বিচার রাজনৈতিক বিচার এবং সরকার বিচারকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে ইচ্ছেমতো রায় আদায় করতে বদ্ধপরিকর। এটা বিচার প্রক্রিয়াকে কর্দমাক্ত করা ছাড়া আর কিছু নয়।

বলা হয় ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। শাহবাগী তাণ্ডবেও হয়েছে তাই। ধরা পরে যায় যে এ তাণ্ডবের নেতাদের অনেকে ইসলাম বিরোধী। তাঁদের কেউ কেউ ব্লগে আলাহ্ রাসূল আর ইসলামকে নিয়ে পর্নোগ্রাফি প্রচার করেছেন। আরো কেউ কেউ ধর্মদ্রোহী ও নাস্তিক। আমার দেশ পত্রিকা এই তথ্যগুলো ফাঁস করে দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী ও সরকার এ কারণেই রেগে টং হয়ে আছেন। সরকারের উচিত ছিল কালবিলম্ব না করে সংশ্লিষ্টদের শাস্তি দিয়ে দেশবাসীর ক্রোধের আগুন প্রশমিত করার চেষ্টা করা। সেটা সরকার করেনি, কেননা তারা মনে করেছিল তাদের বিদেশী পৃষ্ঠপোষকরা সেটাকে ইসলাম-তোষণ বলেই দেখবে। তাছাড়া সরকার আশা করেছিল পুলিশ-র‍্যাব-বিজিবি এবং ছাত্রলীগ গুণ্ডাদের প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে ভয় পেয়ে তারা পিছপা হয়ে যাবে। এই সরকার যে দেশের মানুষকে চিনতে কতোখানি ব্যর্থ এটা হচ্ছে তার প্রমাণ। ইসলামের অপমানের প্রতিবাদ করতে গিয়ে একদিনেই ৬৬ জন পুলিশের গুলিতে মারা যায়, অন্যদিকে সরকার ধর্মদ্রোহীদের তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেয়।

সরকার ভীত, আতঙ্কিত

এ পরিস্থিতিতে মুসলিম ভোটদাতারা আরো একটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট দেবে বলে কল্পনা শুধু উন্মাদেই করতে পারে। অন্তত এটুকু উপলব্ধি আওয়ামী লীগ নেতাদেরও আছে। তাঁরা এখন ভীত, আতঙ্কিত। সেটা চাপা দেবার জন্যেই প্রধানমন্ত্রী এবং অন্য মন্ত্রীরা সকাল-সন্ধ্যা বিএনপির বিরুদ্ধে আবোল-তাবোল বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে বেড়াচ্ছেন, দেশবাসীর প্রতিবাদকে জামায়াতের সন্ত্রাস বলে জাহির করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু মন্ত্রীরাও এখন বুঝে গেছেন যে তাঁদের বিবৃতি আর হুংকারে কেউ কান দিচ্ছে না।

হাসিনার বর্তমান সরকারের মেয়াদে তোফায়েল আহমেদ এ যাবৎ মুখ খোলেননি। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আওয়ামী লীগের সোমবারের সভায় তোফায়েল আহমেদের বক্তৃতা দেওয়া সে কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ। সরকার

বিএনপির বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্যে যেন একটা নতুন কামান আমদানী করলো। কিন্তু রোগীর নাভিশ্বাস উঠলে হোমিওপ্যাথির বড়ি খাইয়ে লাভ হয় না। আওয়ামী লীগের নতুন কামান হোমিওপ্যাথিক কামান মাত্র। খালেদা জিয়া গণবিচ্ছিন্ন বলে তোফেয়েল আহমেদ আমার ছোটবেলায় দেখা পাগলটার মতো মানুষ হাসাবেন মাত্র। খালেদা জিয়া যেখানেই যাচ্ছেন দূরদূরান্ত থেকে লাখে লাখে মানুষ আসছে তাঁর কথা শুনতে। তোফায়েল আহমেদ ইচ্ছান্ধ, চোখ থাকতেও তিনি দেখেন না।

আলোচ্য সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে অহেতুক কিছু অসৌজন্যপূর্ণ কটূক্তি করেছেন। তাতে কেউ বিস্মিত হয়নি। হাসিনা ও তাঁর ছোটবোন প্রায় ছয় বছর দিল্লিতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে ছিলেন। তখন তাঁদের অভিভাবক ছিল ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'। বস্তুত র-এর লোকজন ছাড়া আর কারো সঙ্গে-সাক্ষাতের সুযোগ ছিলো না দু'বোনের। তখন 'র' তাঁদের মগজ ধোলাই করে দিয়েছিল। তারা যা যা বাৎলে দিয়েছিল বাংলাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে হাসিনার জ্ঞান তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দু'বোনকে নির্বাসন থেকে দেশে ফিরিয়ে এনেছিলেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। কিন্তু দেশে ফিরেই র'য়ের শিক্ষা অনুযায়ী সেই যে তিনি জিয়া ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে গালি-গালাজ শুরু করেছিলেন আজো তার বিরতি নেই। জিয়ার পরিবার এবং তাঁর স্থাপিত রাজনৈতিক দল বিএনপির নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে গালি-গালাজ না করলে বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর পেটের ভাত হজম হয় না।

জিয়া হত্যার ষড়যন্ত্র

হাসিনার দেশে ফেরার ১৩ দিনের মাথায় এক সামরিক ষড়যন্ত্রে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হন। সেদিন শেখ হাসিনাকে পাওয়া গিয়েছিল গ্রামের মহিলাদের মতো পোশাক পরিহিত অবস্থায় ভারত সীমান্তের কসবায়। হাসিনা দেশের রাজনীতিতে প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধকে মূলনীতিতে পরিণত করেছেন, রাজনীতিকে তিনি সংসদ বর্জন করে ও লাগাতার হরতাল দিয়ে সংসদ থেকে পথে টেনে নামিয়েছেন। গুণ্ডাগার্দি এবং সশস্ত্র ক্যাডার ব্যবস্থা শেখ হাসিনাই চালু করেছেন। প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতাদের তিনি শাড়ী পরতে বলে পরিহাস করেছিলেন, একটির বদলে দশটি লাশ ফেলার তাগিদ দিয়েছিলেন।

সে সরকারের আমলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গডফাদার পদ্ধতি চালু হয়। ফেনীর জয়নাল হাজারী, লক্ষ্মীপুরের আবু তাহের, নারায়ণগঞ্জের শামীম ওসমান এবং ঢাকার মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার খুন-খারাপি ও

অত্যাচারে দেশের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টা উত্থাপন করায় প্রধানমন্ত্রী হাসিনা সাংবাদিকদের রীতিমতো ধমক দিয়েছিলেন। হাসিনার প্রথম সরকারের আমলে খুনের অভিযোগে পরবর্তীকালে আদালত প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন এমন প্রায় দু'ডজন খুনিকে বর্তমান দফায় ক্ষমতায় এসে শেখ হাসিনা মুক্তি দিয়েছেন।

হাসিনার বর্তমান সরকারের আমলে রাজনৈতিক হত্যা দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী লীগের সশস্ত্র ক্যাডাররা বেছে বেছে সরকারের বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী ও সমালোচককে হত্যা করেছে। সাংবাদিকই হত্যা করা হয়েছে ১৭ জন। বাংলাদেশের পুলিশ বিরোধী ঠ্যাঙানোর ফুলটাইম কাজে ব্যস্ত। তাই সরকারের গুণ্ডাদের খুন-খারাপির প্রতিকার, এমনকি সংখ্যা নিরূপণের সময়ও তাদের নেই। অন্যদিকে বহু ক্ষেত্রে এসব হত্যার সঙ্গে র‍্যাব ও পুলিশ সরাসরি যুক্ত বলে অভিযোগ হয়েছে। 'ক্রসফায়ারের' নামে র‍্যাব দুই শতাধিক রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করেছে। গুম করা হয়েছে বহু মানুষকে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় কারো কারো লাশ পাওয়া গেছে নদীতে কিম্বা জলাভূমিতে। অনেকের কোন সন্ধানই পাওয়া যায়নি।

মশা বনাম ড্রাকুলা

একাত্তরে ঠিক এ ধরনের ঘটনার জন্যেই ট্রাইব্যুনাল করে সরকার প্রহসনের বিচার করছে। বনানী থেকে র‍্যাবের ছিনতাই করা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ইলিয়াস আলী কিম্বা গাড়ির ড্রাইভারের কোন হদিস আজ অবধি পাওয়া যায়নি। ঢাকার ৫৬ নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার চৌধুরী আলম প্রায় দুবছর ধরে আজো নিখোঁজ। এই গুম আর খুনের ঘটনাগুলোর জন্যে র‍্যাবই দায়ী বলে সর্বসাধারণের বিশ্বাস। অনেকগুলো ক্ষেত্রে তার সাক্ষ্য-প্রমাণও পাওয়া গেছে। এতো কিছুর পরেও শেখ হাসিনা যখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সভায় খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে সহিংসতার অভিযোগ তোলেন তখন মশাকে রক্তচোষা বলে ড্র্যাকুলার মুখে অভিযোগের মতোই 'রিডিকিউলাস' (হাস্যকর) শোনায়।

খালেদা জিয়া একাধিক সভায় বলেছেন, ইসলামের অমর্যাদার প্রতিবাদ-কারীদের গণহত্যার বিচারের জন্যে ক্ষমতায় গেলে তিনি ট্রাইব্যুনাল গঠন করবেন। এ ঘোষণা নানা কারণে অভিনন্দনযোগ্য। বিএনপি নেত্রী শেখ হাসিনার মতো প্রতিশোধ-লিপ্সু কিম্বা প্রতিহিংসাপরায়ণ নন। জাতীয় ঐক্য এবং দেশের শান্তির খাতিরে তিনি প্রায়ই অতীতের অন্যায়-অবিচারের কথা ভুলে গিয়ে ভবিষ্যতের জন্যে গঠনমূলক চিন্তা করেন। কিন্তু তাঁর প্রতিপক্ষ তেমন কোন মাহাত্ম্য কিম্বা ঔদার্য দেখাতে পারেনি। বহু সহৃদয় পাঠক ইমেইলে এবং

টেলিফোনে আমার কাছে অভিযোগ করেছেন খালেদা জিয়া ক্ষমতা পেয়েও পূর্ববর্তী সরকারের জঘন্যতম অন্যায়েরও বিচার করেননি। এমনকি তাঁর স্বামী শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হত্যার ষড়যন্ত্রেরও তদন্ত করেননি তিনি।

তথ্য সংগ্রহের এখুনি সময়

শুধু এ মাসের গণহত্যাই নয়, আরো অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অপরাধের জন্যেই বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে তদন্ত এবং এ সরকারের বিচার অত্যাবশ্যকীয়। একটা অবশ্যই বিডিআরের বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহের পেছনে এ সরকারের এবং তাদের বিদেশী পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা সম্বন্ধে কোন তদন্ত হয়নি। অথচ সে ঘটনায় ৫৭ জন সিনিয়র সেনা কর্মকর্তাসহ প্রায় ৮০টি মূল্যবান প্রাণ নষ্ট করা হয়েছে। হত্যায় জড়িত মাথায় রুমাল বাঁধা বিদেশী লোকগুলোর রহস্যও উদঘাটিত হয়নি। মন্ত্রীদের কারো কারো ভূমিকা সম্বন্ধেও ব্যাপক অভিযোগ আছে। সেসব অভিযোগ অন্তত তদন্ত করা প্রয়োজন।

বর্তমান সরকারের আমলের বিচার-বহির্ভূত হত্যাগুলোর বিচার অবশ্যই করতে হবে। বিশেষ করে ইলিয়াস আলী ও চৌধুরী আলমকে গুম করার জন্যে দায়ী র‌্যাব কর্মকর্তাদের বিচার ও শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক হতে হবে। বিএনপির উচিৎ হবে অবিলম্বে তাদের প্রধান কার্যালয়ে একটা শাখা স্থাপন করা যেখানে বর্তমান সরকারের মানবতা বিরোধী অপরাধ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সংগৃহীত হবে। জনসাধারণেরও কর্তব্য হবে গণহত্যা ও অন্যান্য মানবতা বিরোধী ঘটনায় সংশ্লিষ্ট পুলিশ ও র‌্যাব কর্মকর্তা এবং অন্যদের পরিচয়সহ ঘটনাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখে রাখা। খালেদা জিয়া তাঁর প্রতিশ্রুত ট্রাইব্যুনাল গঠন করলে সেসব বিবরণ খুবই মূল্যবান প্রমাণিত হবে।

(লন্ডন, ২০.০৩.১৩)

বাংলাদেশে ইসলাম সত্যি সত্যি বিপন্ন

একজন সহৃদয় পাঠক আক্ষেপের সঙ্গে ইমেইল করে জানিয়েছেন, ঢাকার যে পাড়ায় তিনি থাকেন সে পাড়ার কয়েকজন নারী এবারের হোলির দিনে হল্লা করে রং মাখামাখি ও আবির ছোড়াছুড়ি করেছেন, যদিও সে পাড়ায় কোন হিন্দু বাস করেন বলে তিনি জানেন না।

সাধারণ অবস্থায় ব্যাপারটাকে কয়েকজন অবিবেচক নারীর 'বোরডম'-প্রসূত উচ্ছলতা বলে উড়িয়ে দেয়া যেতো, কিন্তু বিগত সোয়া চার বছর বাংলাদেশের অন্য অনেক প্রবণতার প্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে যে আলামতটি বেরিয়ে আসে সেটা দেশের ৯০ শতাংশ মুসলমানের জন্যে গভীর উদ্বেগ ও আশঙ্কার বিষয়।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এক শ্রেণির ভারতীয় টেলিভিশন ও ফিল্মের দৌরাত্ম্যে পাইকারীভাবে অপসংস্কৃতি যেন বাংলাদেশী, বিশেষ করে ইসলামী সংস্কৃতিকে গিলে খাচ্ছে। সরকার নানাভাবে এই অপসংস্কৃতির আমদানিতে সাহায্য ও উৎসাহ দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন ফসল ভালো হবার জন্যে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তাঁর মা দুর্গাকে ধন্যবাদ দেন তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না যে, শুধু আগ্রাসী ধর্মনিরপেক্ষতাই নয়, সংখ্যাগুরুর ধর্ম বিশ্বাসকে বিলুপ্ত, অন্তত অপমান করার একটা সুপরিকল্পিত চেষ্টা চলছে। এবং এই শেখ হাসিনাই মুসলমানদের ভোটের প্রত্যাশায় কয়েকবারই সৌদি আরবে ওমরা শেষে হেজাব পরে ঢাকা বিমান বন্দরে নেমেছিলেন।

বর্তমান সরকারের সূচনা থেকেই ছাত্রলীগের গুণ্ডারা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টি ধ্বংস করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ছাত্র ও শিক্ষকদের মারপিট, ভাংচুর ইত্যাদি নিত্যকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মাঝে মাঝেই বন্ধ থাকে। পুলিশ ও র‍্যাব এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রায়ই ধরপাকড় করে, বেশ কয়েকজন ছাত্রকে হত্যাও করা হয়েছে। সার্বিকভাবেই এখন বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষাকে সক্রিয়ভাবে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। ভারতে মুদ্রিত বাংলাদেশের পাঠ্যবই ইসলামের অপব্যাখ্যার অভিযোগও উঠেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত খবরে বলা হয় যে, অষ্টম ও নবম শ্রেণির পাঠ্য বইতে মুদ্রিত হয়েছে যে, হিন্দু দেব-দেবীদের উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া প্রাণীর মাংস মুসলমানদের জন্যে হালাল!

ফেব্রুয়ারি মাসের ৫ তারিখে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং উদ্যোগে কিছু লোক ঢাকার শাহবাগ মোড়ে প্রথমে সমাবেশ ও পরে বিভিন্ন নামের মঞ্চ বলে একটা দঙ্গল সৃষ্টি করে। ফলাও করে প্রচার করা হয় যে, সেখানে তারা সর্বক্ষণ

'মঙ্গল প্রদীপ' জ্বালিয়ে রেখেছিলো। ধীরে ধীরে এই দঙ্গল সম্বন্ধে বহু জঘন্য ও বেদনাদায়ক তথ্য বেরিয়ে আসে। মিডিয়ায় প্রকাশিত হয় যে, দঙ্গলের পাণ্ডাদের কয়েকজন ইন্টারনেট ব্লগে আল্লাহ্, রাসূল আর ইসলাম নিয়ে কদর্য পর্নোগ্রাফী প্রচার করছিলো।

আরো কয়েকজন ধর্মদ্রোহী এবং নাস্তিকের অপকর্মের কথাও জানাজানি হয়ে গেলো। শাহবাগের দঙ্গল সম্বন্ধে আবেগপরায়ণ তরুণদের মোহ তাতে ছুটে যায়। ক্রমে ক্রমে এসব বিধর্মী তৎপরতার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদ গড়ে উঠতে শুরু করে। এই দুস্কৃতকারীদের যথাযোগ্য শাস্তি দান সর্বজনীন দাবি হয়ে ওঠে। জনসাধারণের প্রতিবাদে উপযুক্ত সাড়া দান ও তাদের উদ্বেগ দূর করার ব্যবস্থা নেবার পরিবর্তে সরকার প্রথমেই ইসলামের এই দুশমনদের ত্রিতল নিরাপত্তার হুকুম দেয়, তারপর অস্ত্রবলে দেশবাসীর প্রতিবাদ গুঁড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়। ৩ মার্চ সারা দেশে প্রতিবাদীদের ওপর পুলিশের বেপরোয়া গুলিবর্ষণে ৬৬ জন মারা যায়। তার আগের ও পরের কয়েকদিন নিয়ে এই প্রতিবাদের ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রীয় গণহত্যায় মারা গেছে ১৭০ জনেরও বেশি। সর্বসাধারণের মনে এ ধারণা এখন গেড়ে বসেছে যে, এই সরকার ইসলামে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে গণহত্যা শুরু করেছে। তার সঙ্গত কারণও আছে।

গদি পাবার প্রায় প্রথম প্রহর থেকে এ সরকার চাকরি-বাকরিসহ সর্বক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু নাগরিকদের বিরুদ্ধে বৈষম্য শুরু করে। প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে বেছে বেছে সংখ্যালঘু কর্মকর্তাদের নিয়োগদান শুরু হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এসব সংখ্যালঘু কর্মকর্তাকে ডবল ও ট্রিপল পদোন্নতিও দেয়া হয়েছে। সেসব পদে যেসব অভিজ্ঞ ও জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ছিলেন তাঁদের ওএসডি করে রাখা হয়। শুনেছি এখন ছয় শতাধিক প্রবীণ কর্মকর্তা ওএসডি হয়ে আছেন।

ইসলাম এখন কোণঠাসা

প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে এই বৈষম্যের কুফল এখন জলজ্যান্ত, পরিষ্কার। প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে সহসচিব, উপসচিব ও সচিব পদে সংখ্যালঘু কর্মকর্তার সংখ্যা অনানুপাতিকভাবে বেশি। জেলা প্রশাসক ডেপুটি কমিশনারদের এবং পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর থেকে পুলিশ সুপার পর্যন্ত নির্বাহী স্তরের কর্মকর্তাদের সিংহভাগই অমুসলিম এবং হিন্দু। আওয়ামী লীগ এ পরিকল্পনা নিয়েই গদিতে বসেছিলো যে, নিজেদের ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে তারা এমন বহু ব্যবস্থা নেবে দেশের গরিষ্ঠ মানুষ যা সমর্থন করতে পারবে না। সে জন্যেই তারা তাদের ভোটব্যাংক হিন্দুদের মধ্য থেকে এসব কর্মকর্তা নিয়োগ করেছেন-এ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে যে, তারা সরকারের ইসলাম-বিরোধী এবং নিপীড়নমূলক যে কোন নির্দেশ বিনা প্রতিবাদে মেনে নেবে, প্রয়োজনবোধে সাজানো নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে কারচুপি ও কারসাজি করবে। এ ব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদে যে

সংখ্যাগুরুদের ভেতর 'ব্যাকল্যাশ' দেখা দিতে পারে সেটা সরকার একবারও ভেবে দেখেনি।

এরপর তারা ইসলামকে কোণঠাসা করার কাজে হাত দেয়। সংবিধান থেকে বিসমিল্লাহ এবং ইসলামের নাম পরিত্যক্ত হয়। একই সঙ্গে দেশজোড়া বিভিন্ন কাল্পনিক সন্ত্রাসী দলের সদস্য অপবাদ দিয়ে দাড়ি ও টুপি পরিহিত ব্যক্তিদের ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। যাঁরা নিয়মিত মসজিদে নামাজ পড়তে যান তাঁদের ওপর গোয়েন্দা পুলিশের নজরদারি চালু হয়। এ প্রক্রিয়ায় এ যাবৎ বহু হাজার মুসলমানকে গ্রেফতার করে জেলে বন্দী রাখা হয়েছে।

আওয়ামী লীগের পরেই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রাচীনতম রাজনৈতিক দল। একাত্তরে তারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলো। সে অধিকার তাদের ছিলো, কেননা তারা তখন পাকিস্তানী ছিলো এবং পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা তাদের কেউ কেউ দেশপ্রেম বিবেচনা করেছিলো। তাদের হিসেবে ভুল হয়েছিলো এবং চূড়ান্ত ফলাফল দৃষ্টে তারা সে প্রমাণ পেয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার পরে তারা বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেছে বলেই মনে হয়। সে হিসেবে এ দেশে রাজনীতি করার অধিকার তাদের আছে। ধর্মীয় রাজনীতি বর্তমানে আলজেরিয়া ছাড়া অন্য কোন দেশে নিষিদ্ধ বলে আমার জানা নেই। তবে আলজেরিয়াকে সাংঘাতিক খেসারৎ দিতে হয়েছে সে জন্যে। ১৯৯২ সাল থেকে সে দেশটিতে হত্যা ও সংঘাতে লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ দিয়েছে এবং বহু দেশই প্রমাণ পেয়েছে যে জনসাধারণের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত দেয়ার ফলাফল মারাত্মক হতে পারে।

যুদ্ধাপরাধের বিচারের নামে নয়জন জামায়াতে ইসলামী এবং দু'জন বিএনপি সদস্যের বিচার করছে সরকার। অধিকাংশ মানুষই অপরাধের, বিশেষ করে মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার চায়। কিন্তু বিচার প্রক্রিয়া থেকে সরকারের দুরভিসন্ধি ও রাজনৈতিক অসাধুতাই বড়ো হয়ে উঠেছে। প্রমাণ হয়ে গেছে যে বিচার নয়, প্রতিহিংসাই তাদের কাম্য। প্রথমত তারা বেছে বেছে সরকারের বিরোধীদেরই অভিযুক্ত করেছে। বহু আপাত যুদ্ধাপরাধী মুজিব কোট পরে আওয়ামী লীগে ভিড়ে গেছেন, মন্ত্রী ও সংসদ হয়েছেন কেউ কেউ, সরকারের শীর্ষ মহলের সঙ্গে আত্মীয়তাও করেছেন কেউ কেউ। এঁদের কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়নি, আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে তাঁরা যেন নির্দোষ, নিষ্পাপ হয়ে গেছেন।

দ্বিতীয়ত, ট্রাইব্যুনাল গঠন ও বিচার পদ্ধতির ত্রুটি দেশী ও বিদেশী আইন বিশেষজ্ঞরা বার বার ধরিয়ে দিলেও সরকার তাদের মতামতকে গ্রাহ্য করেনি। এ যাবৎ তিনজন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হয়েছে। দুজনকে প্রাণদণ্ড দেয়া হলেও কাদের মোল্লাকে ট্রাইব্যুনাল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন। তাঁকে প্রাণদণ্ড দেয়া হয়নি বলে সরকার তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছে। শাহবাগে কিছু দুর্বৃত্তকে দিয়ে দঙ্গল সৃষ্টি সরকারের সে ক্রোধেরই প্রতিফলন। শাহবাগে দিনের পর দিন

'ফাঁসি চাই', 'জবাই করো' ইত্যাদি বীভৎস শ্লোগান উঠেছে। এবং জামায়াতে ইসলামী, ছাত্রশিবির এবং সার্বিকভাবে ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবিও উঠেছে শাহবাগ থেকেই।

কর্তৃক-বিহীন পুলিশ

সংখ্যাগুরুর ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে সরকারের এই সুপরিকল্পিত নির্যাতন কোন না কোন পর্যায়ে অসহনীয় হয়ে ওঠা প্রত্যাশিত ছিলো। কার্যতও হয়েছে তাই। দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। সরকার জালিয়ানওয়ালা বাগের অনুকরণে বুলেটের জোরে তার মোকাবিলার পথ ধরেছে। বিগত কয়েক সপ্তাহ পুলিশের গুলিতে নিহতের সংখ্যা একশোর কাছাকাছি পৌঁছেছে। কিন্তু তার ফল যে শুভ হবে না তার আলামতও ইতমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ এখন আর আওয়ামী লীগের গুণ্ডা আর পুলিশে কোন তফাৎ দেখছে না। একটা গণবিরোধী সরকারের নির্দেশে জনসাধারণের ওপর গুলি-গোলা চালিয়ে পুলিশ তাদের কর্তৃত্ব ও মান্যতা (অথরিটি) হারিয়ে ফেলেছে। পুলিশ সরকার বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতার করতে এলে স্থানীয় লোকেরা পুলিশকেই আক্রমণ করছে। চাঁপাই নবাবগঞ্জের শিবপুর, সিরাজগঞ্জের বেলকুচি আর খুলনায় যে ঘটনাগুলোতে সাতজন গ্রামবাসী পুলিশের গুলিতে মারা গেছে সেসব ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিলো।

সরকারের সার্বিক ইসলাম-বিরোধী নীতির কারণেই দলমত-নির্বিশেষে দেশের মানুষ আগামী কালের (৬ এপ্রিল) লং মার্চে শরিক হতে চাইছে। এ ইস্যুতে সরকারের দিকে বেশি কেউ নেই। এ জাতীয় ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার সাধারণত সভা-সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ করে, আওয়ামী গুন্ডা বাহিনী ও পুলিশ পাঠিয়ে লাঠি-গ্যাস আর গুলি দিয়ে জনতাকে প্রতিহত করতে চায়। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা সড়ক ও নৌপথে রাজধানীতে আসার পথ রুদ্ধ করে দেয়। একথা সরকার বুঝতে পারছে না যে ঢাকা বাংলাদেশ নয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের বাস রাজধানীর বাইরে, বিশেষত পল্লী অঞ্চলে। সে অঞ্চলগুলো এখন সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বলেই মনে হয়।

থাইল্যান্ডের দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। থাইল্যান্ডের অন্যতম ধনাঢ্য ব্যবসায়ী থাকসিন সিনাওয়াত্রা থাই রাক থাই পার্টি গঠন করে পল্লী অঞ্চলে সংগঠনের কাজ শুরু করেন। ২০০১ সালের নির্বাচনে বিপুল গরিষ্ঠতায় বিজয়ী হয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী হন। রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতে পেয়ে তিনি পল্লী অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগ দেন। ব্যাংকক ভিত্তিক এলিট শ্রেণি ও তাদের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া সিনাওয়াত্রার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন শুরু করে। সিনাওয়াত্রার গরিষ্ঠতা বিপুল পরিমাণে বেড়ে যায়, যদিও রাজধানী ব্যাংককে লঘিষ্ঠ সংখ্যক ভোটই পেয়েছিলো থাই রাক থাই পার্টি।

ব্যাংককের এলিট শ্রেণি ও তাদের মিডিয়া সেনাবাহিনীকে দলে টানে। সামরিক অভ্যুত্থান করে থাই রাক থাই পার্টিকে নিষিদ্ধ করা এবং সিনাওয়াত্রাকে

নির্বাসনে পাঠানো হয়। কিন্তু সে দেশের পল্লী অঞ্চলের মানুষ এখনো এলিট শ্রেণির বিরোধী। থাকসিনের বোন ইউংলাক সিনাওয়াত্রা ভিন্ন নামে রাজনৈতিক দল করে নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন এবং বর্তমানে তিনি থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী।

শেখ হাসিনার সরকার যদি আগামী কালের লং মার্চে কোন প্রকার বাধা দেয় তাহলে যে কোন বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। এমনিতেই দেশের পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। বাংলাদেশের দেশী এবং বিদেশী শুভকামীরা বরাবরই বলে এসেছেন যে সংলাপের মাধ্যমে সকলের গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচন পদ্ধতি উদ্ভাবন করাই সঙ্কট নিরসনের একমাত্র উপায়। তাঁরা বিশেষ করে একটা নির্দলীয় কর্তৃত্বের অধীনে নির্বাচনেরই পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু সরকার, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী কোনমতেই সংলাপে রাজি নন। বর্তমান সঙ্কটের সেটাই হচ্ছে কারণ।

অপ্রতিরোধ্য প্রতিবাদী ঝড়

বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী একগুঁয়েমি ছাড়া আর কিছু বোঝেন না। বিশ্ব রাজনীতিতে ইসরাইলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহু ছাড়া তাঁর আর তুলনাও দেখি না। ইসরাইলের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ নির্ভর করে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর। কিন্তু মার্কিন সমাজে কিছু জায়োনিস্ট লবির সমর্থনের জোরে নেতানিয়াহু প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকেও হেনস্থ করেছেন একাধিকবার। বাংলাদেশে শেখ হাসিনাও সমানেই একগুঁয়েমি দেখাচ্ছেন। অন্তত দুই দশক ধরে দেশের এবং বিদেশের শুভকামীরা তাঁকে সংলাপ ও সমঝোতার পথ ধরার পরামর্শ দিয়ে আসছেন। কিন্তু গত সোমবার তিনি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, প্রধান বিরোধী দল বিএনপির সঙ্গে সংলাপ করবেন না তিনি। শুধু তাই নয়, কিছু ভারতীয় এজেন্ট, যুক্ত বাংলার কিছু সমর্থক, কয়েকজন ধর্মদ্রোহী এবং হিন্দু ভোটব্যাংকের সমর্থনের জোরে ইচ্ছাকৃতভাবেই যেন সংখ্যাগুরু মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসের ওপর দিয়ে তিনি ট্যাঙ্ক চালিয়ে দিয়েছেন। দেশজোড়া প্রতিবাদের ঝড় বইছে সে কারণেই। সে ঝড় প্রতিরোধ করা শেখ হাসিনার সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়।

মুদ্রণ প্রমাদ ঃ গত শুক্রবার প্রকাশিত 'ইতিহাস বিকৃত করা ওদের বদঅভ্যাস' শীর্ষক কলামে অনবধানতাবশত কয়েকটা ভুল ছাপা হয়েছে। উল্লেখযোগ্যগুলো মূলত এ প্রকারের। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান জাসদ প্রসঙ্গে বলেছিলেন 'লাল ঘোড়া দাবাইয়া দিব'- দাবড়াইয়া দিব নয়। 'কমলা লেবু তখন মধ্যবিত্তেরও সাধ্যাতীত ছিলো। সে সময়কার কিছু বর্ণনা আমার একাধিক বইতেও আছে।' এখানে একাধিক আর বইয়ের মাঝে একটা অবান্তর 'কারণ' শব্দ ঢুকে গেছে। শেখ মুজিব চারখানি ছাড়া অন্য সকল পত্রপত্রিকা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন, 'প্রায় অন্য সকল' নয়। মুজিব বাকশাল পদ্ধতি চালু করে নিজেকে সাত বছরের জন্যে নির্বাহী রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন, নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি নয়। এই ভুলগুলোর জন্যে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

(লন্ডন, ০২.০৪.১৩)

ডাকাতের দেশে নির্দোষ মাত্রই অপরাধী

ইউরোপীয় অভিবাসীরা উনবিংশ শতকের আগে পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের অতলান্তিক উপকূলের কাছাকাছিই থেকেছে। মধ্য ও পশ্চিমের বিশাল এলাকা রেড ইন্ডিয়ান নামে পরিচিত আদিবাসীদের এবং লক্ষ লক্ষ বুনো মোষের বিরাট বিরাট পালের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে ছিল। প্রথম ইউরোপীয় অভিবাসীদের রেড ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে তো বটেই, নবাগত শ্বেতাঙ্গ দুর্বৃত্তদের সঙ্গেও লড়াই করে টিকে থাকতে হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত কোন প্রশাসন কিম্বা গ্রহণযোগ্য কোন আইন ছিল না। আইন ও বিচার ব্যবস্থা আসতো মূলত বন্দুকের নলের ভেতর দিয়ে।

উনবিংশ শতকের ষাটের দশকে আবার ক্রীতদাস ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে দক্ষিণের কনফেডারেট রাজ্যগুলোর সঙ্গে উত্তরের ইউনিয়নিস্ট রাজ্যগুলোর গৃহযুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধের শেষে সেনাবাহিনী থেকে ছাড় পাওয়া উত্তর ও দক্ষিণের লক্ষ লক্ষ সৈন্য দেশজোড়া ঘুরে বেড়ায়, যে যেভাবে পারে বিত্ত-সম্পদ অর্জনের চেষ্টায় মরিয়া হয়ে ওঠে। ওয়াইল্ড ওয়েস্ট নামে পরিচিত এই লাখ লাখ বর্গমাইল এলাকার অজস্র কাহিনী নিয়ে বহু 'ওয়েস্টার্ন ফিল্ম' তৈরি হয়েছে। জন ওয়েন অভিনীত রিও লোবো নামক ছায়াছবিখানি অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বলতে হবে।

ছবির কাহিনীতে ইউনিয়নিস্ট বাহিনীর এক সার্জেন্ট তার অধীনস্থ কয়েকজন প্রাক্তন সৈনিককে নিয়ে রিও লোবোতে আস্তানা গেড়ে বসে। এই লোকগুলোকে দিয়ে সে বাজারে নিয়ে যাবার পথে গোরু কিম্বা ঘোড়ার পাল ছিনিয়ে নিতো। চারপাশের খামার মালিকদের ওপর জোর-জুলুম করে নিজেদের জোত-জমা উক্ত সাবেক সার্জেন্টের নামে লিখে দিতে বাধ্য করা হতো। এলাকার মূল শহরে সে নিজের লোকদের শেরিফ (পুলিশ প্রধান), ডেপুটি ও জজ নিয়োগ করেছিল। কেউ সার্জেন্ট এবং তার দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গেলে উল্টো তাকেই মারপিট করা কিম্বা গুলি করে খুন করা হতো।

আজকের বাংলাদেশের সঙ্গে রিও লোবোর মিল চোখে না পড়েই পারে না। এদেশের বিশাল পুলিশ বাহিনী রিও লোবোর শেরিফ ও ডেপুটিদের মতো। চোরে চুরি করলে দোষ নেই, কিন্তু চুরির খবর যদি কেউ প্রকাশ করে পুলিশের চোখ উল্টে তার ওপরই গিয়ে পড়ে। বাংলাদেশের বিচার পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে

দলীয়কৃত। সুতরাং সুবিচার পাবার আশা নেই এখানে। শাসক যা হুকুম দেবেন বিচারকরা ঠিক ঠিক সে রায়ই দেবেন। শাসকের ওপরেও এখন হাতির ঘাড়ের ছারপোকার মতো উৎপাত সৃষ্টি করেছে শাহ্‌বাগীরা। সরকার নিজেদের অন্যায় কাজের প্রতি মেকি সমর্থন হিসেবে দেখানোর জন্যে এদের খোরপোষ আর অর্থ দিয়ে শাহবাগে বসিয়ে দিয়েছিল। তারা এবং তাদের পালের গোদা ডা. ইমরান সরকার এখন সে সরকারের ওপরেই তম্বি করে, সরকারকে লাল চোখ দেখায়।

সরকার মূলত শাহবাগীদের ওখানে বসিয়েছিল কাদের মোল্লা এবং যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত অবশিষ্টদের সকলকে ফাঁসির দণ্ড দিতে তথাকথিত আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের বিচারকদের ওপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। কিন্তু রাজার ওপরের রাজার মতো শাহবাগীরা একের পর এক হুকুমের তালিকা বাড়িয়েই চলেছে। কাদের মোল্লার ফাঁসি চাই-এর পরে জিগির উঠলো শিবির ধরো জবাই করো। তারপরে জামায়াতকে বেআইনী করো। আরো পরে ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করো। এসবের জের ধরে আমার দেশ, নয়া দিগন্ত, দিনকাল ও সংগ্রাম পত্রিকা নিষিদ্ধ করার এবং আমার দেশ সম্পাদককে গ্রেফতারের দাবি উঠলো। স্বাধীন সংবাদের টুঁটি টিপে মারা এ সরকারের পুরাতন প্রকল্প, সুতরাং শাহবাগীদের দাবি তাদের মনঃপূতই হয়েছিল।

অপরাধী নয় এজাহারকারীই শাস্তি পাবেন

আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান এখন গ্রেফতার হয়েছেন। সুতরাং ইমরান সরকার এবং তার শাহবাগীরা বগল বাজাতেই পারে। তারা এখন বলছে, আগেই বলেছিলম মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতার করো। তাকে তখুনি গ্রেফতার করা হলে এতো গোলমাল আর অশান্তি হতো না। মাহমুদুর রহমানের ওপর বিশেষ আক্রোশ আছে শাহবাগীদের। তিনি এবং তার পত্রিকাই প্রথমে ফাঁস করেছিলেন যে শাহবাগীদের প্রধান পান্ডাদের কয়েকজন নাস্তিক ও ধর্মদ্রোহী এবং তারা আল্লাহ্-রাসূল (দঃ) ও ইসলামকে নিয়ে ইন্টারনেট ব্লগে পর্নোগ্রাফি প্রচার করছিল। তার জের ধরেই বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় গণহত্যায় প্রায় ১৮০টি প্রাণ নষ্ট হয়েছে এবং হেফাজতে ইসলাম নামে একটা স্বতঃস্ফূর্ত মহা-আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এ আন্দোলন এখন সরকারের জন্যে উটের পিঠের বোঝার ওপর শাকের আঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে সরকারের অভিযোগের সংখ্যা এখন বোধ করি ৬৩টি। বিভিন্ন ব্লগে এবং আমেরিকা থেকে পাওয়া নানা সূত্রে প্রচারিত হয়েছিল যে একটা মার্কিন তেল কম্পানিকে বিনা টেন্ডারে তেল সন্ধানের একটা ব্লক ইজাড়া দেওয়া বাবদ প্রধানমন্ত্রীর পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় পাঁচ মিলিয়ন (৫০ লাখ) ডলার পেয়েছেন। আমার দেশ সে খবরটা ছেপেছিল। সম্পাদক মাহমুদুর

রহমানের ওপর তখন থেকেই সরকারের আক্রোশ। সরকারের ইচ্ছা পূরণের আদালত তাকে মানহানির দায়ে ছয় মাসের কারাদন্ড দিয়েছিলেন কিন্তু মাহমুদুর রহমানকে জেলে রাখা হয় দশ মাস। কিছুদিন রিমান্ডেও রাখা হয় তাঁকে। বর্তমান সরকারের আমলে রিম্যান্ড সরকারের আক্রোশ ঝাড়ার উপায় বলেই সর্বসাধারণের বিশ্বাস। রিমান্ডে তারেক রহমানের কোমর ভেঙে দেবার কথা বাংলাদেশের মানুষ ভুলে যায়নি আশা করি।

সরকারের গাত্রদাহের বড়ো কারণটি ঘটে গত বছরের ডিসেম্বর মাসে। লন্ডনের বিশ্ববিখ্যাত সাময়িকী ইকোনমিস্ট বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে অবস্থানকারী জনৈক আহমেদ জিয়াউদ্দিনের সঙ্গে তথাকথিত আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারপতি নিজামুল হকের সুদীর্ঘ স্কাইপ আলোচনার বিবরণ প্রকাশ করে। বিষয়টি অবশ্যই বাংলাদেশের গণস্বার্থে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সে বিবেচনায় আমার দেশ ইকোনমিস্টে প্রকাশিত বিবরণটি প্রকাশ করে। সংবাদের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী সকলেই সেটাকে জনসেবার পরাকাষ্ঠা হিসেবে দেখেছেন।

বিভিন্ন সময়ে কয়েক ঘন্টার এই স্কাইপ কথোপকথনে কি ছিল? বিচারপতি নিজামুল হক আহমেদ জিয়াউদ্দিনের কাছ থেকে বিচার পরিচালনা পদ্ধতি, সে কাজে কার কার পরামর্শ কিম্বা সাহায্য নেওয়া যেতে পারে, রায় লেখার ঠিকা কাকে দেওয়া যেতে পারে ইত্যাদি নিয়ে পরামর্শ চেয়েছিলেন। আলোচনায় বিচার সম্বন্ধে সরকারের পূর্ব-নির্ধারিত মনোভাবেরও আভাস ছিল। সরকার আশা করছিল যে তাদের রাজনৈতিক ঘোষণা অনুযায়ী আদালত অভিযুক্তদের সকলকে ফাঁসি দেবেন। বিচারপতি নিজামুল হক ব্রাসেলসের আহমেদ জিয়াউদ্দিনকে এ আভাসও দিয়েছিলেন যে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রায় দিলে তিনি পুরষ্কৃত হবেন, অর্থাৎ পদোন্নতি পেতে পারেন।

সরকারের আক্রোশ অযথা ও অন্যায্য

আইন সম্বন্ধে সামান্যতম ধারণাও যাদের আছে তারা অবশ্যই জানেন রায় দেবার আগে পর্যন্ত বিচারপতি মামলা সম্বন্ধে তার চিন্তা-ভাবনার কথা অন্য কাউকে বলতে পারেন না এবং অন্য কারো তার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা গুরুতর অপরাধ। বিচারপতি নিজামুল হক পদত্যাগ করে প্রমাণ করেন যে তার সেই স্কাইপ সংলাপগুলো অনুচিত ছিল বলে তিনিও মনে করেন। তথাকথিত আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের গঠন এবং গোটা বিচার পদ্ধতি নিয়ে আগে থেকেই বাংলাদেশী এবং বিদেশী আইন বিশেষজ্ঞরা সমালোচনা করেছেন। ইকোনমিস্ট সেসব সংলাপের অনুলিপি প্রকাশ করে দেওয়ায় গোটা দুনিয়ার মানুষ বিষয়টি জানতে পারে। এমনকি ইন্টারনেটের দৌলতে বাংলাদেশেরও বহু মানুষ সেটা জেনে গিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় আমার দেশ-এর বিরুদ্ধে

সরকারের ক্রুদ্ধ হবার কিম্বা মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে মামলা করার কোনো সঙ্গত যুক্তি থাকতে পারে না।

উইকিলিস ব্লগের দৃষ্টান্ত এ ব্যাপারে খুবই প্রাসঙ্গিক হবে। অস্ট্রেলিয় নাগরিক জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ কয়েক বছর ধরে মার্কিন দূতাবাসগুলোর বহু হাজার তারবার্তা ফাঁস করে দেন। মার্কিন সরকারের প্রতিশোধের ভয়ে অ্যাসাঞ্জ এখন লন্ডনের ইকুয়াডর দূতাবাসে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু গার্ডিয়ানসহ বৃটেনেরও কয়েকটি পত্রিকা তাঁর ফাঁস করা বহু দলিল প্রকাশ করেছে। এসব প্রকাশনীর বিরুদ্ধে বৃটিশ বা মার্কিন সরকার কোনো আইনী ব্যবস্থা নেয়নি। মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে মামলা করে, কমান্ডো অভিযানের মতো করে তাকে গ্রেফতার করে দিয়ে এবং আমার দেশের ছাপাখানা তালাবদ্ধ করে দিয়ে বাংলাদেশ সরকার কি অতিমাত্রিক স্পর্শকাতরতার পরিচয় দেয়নি? যদ্দুর জানি সরকার আমার দেশ পত্রিকাটি নিষিদ্ধ করার ঘোষণা দেয়নি। পত্রিকার ছাপাখানায় তালা লাগানো এবং সংগ্রাম পত্রিকার ছাপাখানায়ও আমার দেশের মুদ্রণ বন্ধ করে দেওয়া সরকারের আক্রোশের বাড়াবাড়ি বলেই আমার মনে হয়েছে।

মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে আরেকটা মামলা শাহবাগের কয়েকজন শীর্ষ সংগঠকের ইসলাম-বিরোধী ব্লগগুলোর বিবরণ ফাঁস করা সম্বন্ধে। বিশ্বে মুসলমানের সংখ্যা ১০২ কোটি। বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের ৯০ শতাংশ মুসলিম। এতো মানুষের ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে পর্নোগ্রাফি প্রচার যে কতো বড়ো গুরুতর অপরাধ ভাষায় ব্যক্ত করা সহজ নয়। আমরা এবং আরো বহু সুচিন্তক ব্যক্তি অজস্রবার বলেছেন ধর্মনিরক্ষেতা নিয়ে যারা দম্ভ করে তাদের উচিত ছিল কোনো ধর্মের বিশ্বাসীদের অনুভূতিতে আঘাত দানের বিরুদ্ধে বিশেষ সতর্ক থাকা।

বর্তমান সরকার সংশ্লিষ্ট ব্লগগুলো সম্বন্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এ ব্যাপারে প্রধান অপরাধী ব্লগার রাজিব দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা নিহত হলে প্রথমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পরে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তার বাড়িতে গিয়েছিলেন সমবেদনা জানাতে। প্রধানমন্ত্রীর এই কাজটা সকল ধর্মপ্রাণ মানুষকে ব্যথিত করেছে। এমতাবস্থায় এই ব্লগগুলোর বিবরণ ফাঁস করে দিয়ে আমার দেশ মুসলিম উম্মাহর একটা উৎকৃষ্ট সেবাই করেছে। সেটা যে সরকারের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেছে সেজন্যে এ পত্রিকা কিম্বা তার সম্পাদক দায়ী হতে পারেন না, দায়ী হচ্ছে সরকারের অবিবেচনা, অযোগ্যতা ও অপদার্থতা। মাহমুদুর রহমান ও তার পত্রিকাকে শাস্তি দিয়ে সরকারের ইমেজের কালিমা দূর করা যাবে না।

মুজিবের শাসন স্বর্ণযুগ ছিল না

আমার দেশের ছাপাখানা তালাবদ্ধ করা এবং সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের গ্রেফতারে সরকার যে হিংস্রতার পরিচয় দিয়েছে তার কারণ সম্ভবত অন্য একটি

বিষয়। যেদিন এই ঘটনাগুলো ঘটে সেদিনের সংস্করণে আমার দেশ ঘোষণা দিয়েছিল যে উইকিলিকস ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ সম্বন্ধে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরে পাঠানো মার্কিন রাষ্ট্রদূতদের যেসব টেলিগ্রামের বিবরণ ফাঁস করেছিল আমার দেশ ধারাবাহিকভাবে সেগুলো প্রকাশ করবে। সরকারের যে তাতে আতঙ্কের কারণ ঘটেছিল সেটা পরিষ্কার। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর এবং বর্তমান সরকার কখনোই গোপন করার চেষ্টা করেননি যে তারা প্রধানমন্ত্রী পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের অনুকরণে একটা একদলীয় বাকশালী পদ্ধতি চালু করতে চান এবং সেজন্যে যে কোনো প্রকারে গদি আঁকড়ে থাকাই তাদের পরিকল্পনা।

বর্তমান সরকার নতুন প্রজন্মের দেশবাসীকে বিশ্বাস করাতে চায় যে শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল একটা স্বর্ণযুগ এবং তখনকার বাংলাদেশ প্রকৃতই সোনার দেশ ছিল। কিন্তু প্রকৃত পরিস্থিতি তার ধারেকাছেও যাবে না। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। কতিপয় চাটুকার সুপরিকল্পিতভাবে ফুলের মালা আর স্তব-স্তুতি দিয়ে তাঁকে ব্যস্ত রেখেছে এবং সে সুযোগে নিজেরা দুর্নীতি ও কুশাসন দিয়ে দেশের সর্বনাশ করেছে। প্রধানমন্ত্রীর পরিবারও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছিল বলে তখন ব্যাপক বলা-কওয়া হচ্ছিলো। সর্বব্যাপী দুর্নীতির কারণে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন হয়নি, অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. অমর্ত্য সেন লিখেছেন, বাংলাদেশে যথেষ্ট খাদ্য মওজুদ থাকা সত্ত্বেও কুশাসনের কারণে ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। সে দুর্ভিক্ষে ৭০ হাজার বাংলাদেশী অনাহারে ও অপুষ্টিতে মারা গেছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে একদিকে বিদেশীদের সমর্থন লাভ আর অন্যদিকে দেশের মানুষের আশাবাদ ধরে রাখার লক্ষ্যে বুদ্ধিজীবীরা শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘিরে একটা জাদুর মায়াজাল সৃষ্টি করেছিলেন। আমি নিজেও তাতে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। সে কারণে স্বাধীনতার পরবর্তী বছর-দুয়েক লেখক-সাংবাদিকরা মুজিবের ব্যক্তিপূজা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। তাদের যখন চোখ খুললো সর্বনাশ তখন বহুদূর এগিয়ে গেছে। ব্যক্তিপূজা ছেড়ে তারা তখন সমালোচনা শুরু করেন। স্তব-স্তুতির ঘুমঘোর থেকে জেগে ওঠা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে সেটা সহ্য করা সহজ ছিল না। বিশেষ ক্ষমতা আইন পাস করে তিনি সমালোচকদের ধরে ধরে জেলে পাঠান। চল্লিশ হাজার বুদ্ধিজীবী তখন কারাবরণ করেছিলেন।

তার ওপরেও শেখ মুজিব চারখানি সরকারি মালিকানাধীন পত্রিকা (ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা, বাংলাদেশ টাইমস ও বাংলাদেশ অবজারভার) ছাড়া অন্য সকল পত্রপত্রিকা বন্ধ করে দেন। লন্ডনে এক সাক্ষাৎকারে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে নিউজ প্রিন্টের ব্ল্যাকমার্কেট বন্ধ করার জন্যেই তিনি এ ব্যবস্থা নিয়েছেন।

ঐতিহাসিক ভুলের অন্ধ অনুকরণ

বর্তমান সরকারও প্রথম দিন থেকে মুজিবের ভ্রান্ত পথ ধরেই চলেছে। সর্বব্যাপী দুর্নীতি দিয়ে দেশের সম্পদ আওয়ামী লীগ নেতা-নেত্রীদের পকেটস্থ করা হয়েছে। নানা নামে নানা অছিলায় প্রায় এক লাখ বিরোধী ও সমালোচককে কারাবন্দী করা হয়েছে। হয়তো দুর্নীতির কিছু বখরা দিয়েই মিডিয়ার দালাল অংশের আনুগত্য ধরে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে যারা মাথা বন্ধক দিতে রাজি হয়নি তাদের বিরুদ্ধে অহরহ নির্যাতন চলছে। টেলিভিশন সাংবাদিক দম্পতি সাগর আর রুনি কুইক রেন্টাল কেলেঙ্কারির বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন। অত্যন্ত নৃশংসভাবে তাদের হত্যা করা হয়েছে। দেশজোড়া সকলেরই হত্যাকারীদের সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা আছে। কিন্তু রিও লোবোর শেরিফ আর ডেপুটিদের মতো বাংলাদেশের দলীয়কৃত পুলিশ হত্যাকারীদের ধরেনি।

সরকারের, আওয়ামী লীগের, এমনকি ছাত্রলীগেরও সামান্যতম সমালোচনার কারণে এই সরকারের আমলে অন্তত ১৭ জন সাংবাদিক খুন হয়েছেন, আহত হয়েছেন শত শত। বহু সাংবাদিককে দিবারাত্রি ভয়ে ভয়ে কাটাতে হচ্ছে। কিন্তু সরকারের হিংস্রতা এবং প্রতিশোধ লিপ্সার জ্বলন্ত প্রমাণের কারণে মাহমুদুর রহমান এবং আমার দেশ পত্রিকার বিরুদ্ধে নির্যাতন এমন বড়ো হয়ে উঠেছে। বাক ও সংবাদের স্বাধীনতা এবং সাংবাদিক নির্যাতনের ব্যাপারে বর্তমান সরকার হিটলারের নাৎসিদেরও ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু তাতে তাদের কোনো লাভ হচ্ছে কি?

নিজেদের কৃত কাজের পরিণতি তাদের জন্যে কেমন মারাত্মক হচ্ছে সেটা বোঝার মতো বিজ্ঞতাও নেই এই সরকারের। এ সরকার সম্বন্ধে প্রায়ই একটা উপমা আমার মনে আসে। এরা বাঘের লেজে চিমটি কেটে নিজেদের সংকট ডেকে আনে। সরকার ও মন্ত্রীরা এখন সবচাইতে ভীত হেফাজতে ইসলামকে নিয়ে। কিন্তু দেশের সকল মানুষের ক্রোধের উদ্রেক কি সরকার নিজে করেনি? কি প্রয়োজন ছিল সংবিধান থেকে বিসমিল্লাহ্ ও ইসলামকে বাদ দেওয়ার? কি কারণে এই সরকার চাকরি-বাকরি ইত্যাদি সকল ব্যাপারে সংখ্যাগুরুর বিরুদ্ধে বৈষম্য করছে?

আইন-শৃঙ্খলা সাধারণ মানুষ হাতে তুলে নিচ্ছে

যে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের আগে ওমরাহ করে হিজাব পরে বিমান থেকে নামেন কি কারণে তিনি ফসল ভালো হবার জন্যে তার মা-দুর্গাকে ধন্যবাদ দিলেন? ব্লগারদের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষপাতিত্বের এবং প্রতিবাদীদের পাইকারী হত্যার কি প্রয়োজন ছিল? অথচ মূল সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার বিধান নিয়ে তো বাংলাদেশের মুসলমান সন্তুষ্ট ছিল, তারা কোনো আপত্তি করেনি। এখন আবার প্রধানমন্ত্রী 'মদীনা সনদ' অনুযায়ী দেশ শাসনের কথা

বলছেন। আমি যদ্দুর জানি মদীনা সনদে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা আল্লাহ ও রাসূলের ওপর ন্যস্ত বলে উল্লেখ ছিলো। প্রধানমন্ত্রী কি সেটা মেনে চলছেন? ইসলাম ইসলাম করে হানিফের মুখে খই ফুটছে। এসব কি সরকারের ভীতি আর আতঙ্কের পরিচয় দেয় না? লক্ষ্য করার বিষয় যে তার আগের রাতেই হানিফের বাড়িতে নাকি 'ডামি বোমা' ছোঁড়া হয়েছিল। আমার মনে হয় বোমাবাজারা অযথা সময় ও সামর্থ্য নষ্ট করছে। শুনেছি হানিফের পরিবার দু-তিন মাস আগেই কানাডার টরোন্টোয় চলে গেছে, অন্য মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতারাও পরিবার-পরিজনদের দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বাংলাদেশে এখন আইন-শৃঙ্খলা নেই, বিচার নেই, প্রশাসন নেই। কিছু লোক মন্ত্রীত্বের গদিতে বসে থাকলেও প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলাদেশে সরকারও নেই। দেশের মানুষ এখন পুলিশের এবং আদালতের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। তারা এখন আওয়ামী লীগের ক্যাডার, ছাত্রলীগ, যুবলীগ আর পুলিশকে একই দলভুক্ত অত্যাচারী আর নির্যাতক মনে করে। চাঁপাই নবাবগঞ্জে, সিরাজগঞ্জে, খুলনায়, যশোরে আমরা দেখেছি কেউ তাদের ওপর অত্যাচার করতে আসছে মনে হলে স্থানীয় জনসাধারণ পুলিশের ওপরও ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কে পুলিশ আর কে আওয়ামী লীগ বাছবিচার করছে না। ফটিকছড়ির ঘটনা সম্বন্ধে শাসক দল এবং তাদের দালালরা বহু অপপ্রচার চালাচ্ছে। আসলে এখানেও স্থানীয় জনসাধারণ আওয়ামী লীগের গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

মাহমুদুর রহমানের গ্রেফতার আর আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়াকেও দেশের মানুষ সরকারের অত্যাচারের আরেকটা দৃষ্টান্ত হিসেবেই দেখছে। দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। সাংবাদিকরা গত সোমবার প্রতীকী অনশন ধর্মঘট করেছেন। প্রতিবাদ করছে রাজনীতি-নিরপেক্ষ মানুষ, বিএনপি-জামায়াতসহ ১৮ দলের সমর্থকরা এবং হেফাজত আন্দোলনের সকল সমর্থক। অবশিষ্ট থাকছে সরকারের ভোট ব্যাংক- যারা জনসংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। এদের সমর্থনের জোরেই কি গদি আঁকড়ে থাকতে চান শেখ হাসিনা ও তার সরকার?

ছায়াছবি রিও লোবোর সমাপ্তি শুভ হয়েছিল। নায়ক জন ওয়েন অভিনয় করেছিলেন ইউনিয়নিস্ট বাহিনীর একজন সাবেক কর্নেলের ভূমিকায়। তিনি এবং আরো দু'জন প্রাক্তন সৈনিক দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাদের সমুচিত শাস্তি দিয়ে অপহৃত সম্পত্তি প্রকৃত মালিকদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। প্রমাণ হলো কিছু মানুষ দৃঢ় সংকল্প নিয়ে রুখে দাঁড়ালে অত্যাচারীর পতন হবেই।

(লন্ডন ১৬.০৪.১৩)

সংলাপ-সংলাপ খেলা কালক্ষেপণের বাহানা মাত্র

বাংলাদেশের মানুষের অবস্থা মহা-খরার দেশের চাতকের মতো। 'ফটিক জল, ফটিক জল' করে চাতক আকাশের দিকে তাকিয়ে উড়েই চলেছে। বাংলাদেশের মানুষ বরাবরই গণতন্ত্র চেয়ে এসেছে। গণতন্ত্রের দাবিতেই তারা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে। দুর্ভাগ্যবশত গণতন্ত্র দূরে দূরেই থেকে যাচ্ছে। মানুষগুলো আঙ্গুল উঁচিয়ে আছে, কিন্তু সেসব কারণ দূর করতে সংশ্লিষ্টরা এগিয়ে আসছেন না। অবস্থা অনেকটা গ্রীক ট্র্যাজেডির মতো। প্রথম কারণ রাজনীতিকদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অভাব। গণতন্ত্র বাস্তবায়িত হতে পারে আলোচনার ভিত্তিতে। কিন্তু শ্রদ্ধাবোধই যদি না থাকলো তাহলে আলোচনা হবে কি করে? বাঘে-সিংহে যদি লড়াই চলতেই থাকে তাহলে শিকারের প্রাণীটাকে অবশ্যই খেয়ে যাবে শেয়ালে-শকুনে। বাংলাদেশেও তাই হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সরকারের আমলে নির্বাচন করার যুক্তি হিসেবে বলে থাকেন যে অন্য গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে বিদায়ী সরকারের অধীনেই নির্বাচন হয়। তাঁর বক্তব্যের পাল্টা যুক্তি খুবই সহজ। বাংলাদেশে গণতন্ত্র এখনো শেকড়ই গেড়ে বসতে পারেনি। গণতন্ত্রের প্রসূতি সদন বলে পরিচিত বৃটেনেও গণতন্ত্র এক দিনে আসেনি। রাজা প্রথম চার্লস পার্লামেন্ট সদস্যদের গ্রেফতারের জন্যে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে পার্লামেন্ট ভবনে ঢুকেছিলেন। তার জের ধরে অলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে পার্লামেন্ট রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পরিণতিতে প্রথম চার্লসের শিরচ্ছেদ হয়েছিলো। যে বিতর্কিত রায়কে সম্বল করে সরকার ত্রয়োদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি বাতিল করেছে তাতেও আরো দুটো সাধারণ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতিতে অনুষ্ঠানের সুপারিশ করা হয়েছিলো। কেন? সে বিতর্কিত প্রধান বিচারপতিও আশা করেছিলেন যে আরো দুটো নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হলে সে অবকাশে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি শেকড় গেড়ে বসতে পারবে। তাঁর রায়ের এক অংশকে অগ্রাহ্য করে সরকার অন্য অংশ নিয়ে মাতামাতি করছে।

বাংলাদেশে যে গণতন্ত্র শেকড় গেড়ে উঠতে পারেনি এবং পারছে না সেজন্যে শেখ হাসিনার দায়িত্ব অনেকখানি। ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে একটা সেনা-অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হন। তার জের ধরে কয়েকটা অভ্যুত্থান এবং আরো বেশি অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার পর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর

রহমান গণতন্ত্র ফিরিয়ে এনেছিলেন। বাকশাল পদ্ধতি চালু করতে গিয়ে শেখ মুজিব সবগুলো বেসরকারি পত্রপত্রিকা বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং আওয়ামী লীগসহ সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

প্রথম সুযোগেই জিয়াউর রহমান পত্রপত্রিকার প্রকাশের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন এবং নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলোকে বৈধ করে দেন। ভারতে প্রায় ছয় বছর রাজনৈতিক আশ্রয়ে থাকার পর রাষ্ট্রপতি জিয়া আওয়ামী লীগের দু'জন সিনিয়র নেতা- সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. কামাল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাককে দিল্লি পাঠিয়ে হাসিনা ও তাঁর ছোটবোন রেহানাকে দেশ ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু তার ১৩ দিনের মাথায় এক সামরিক ষড়যন্ত্রে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান অত্যন্ত নৃশংসভাবে নিহত হন। সে ষড়যন্ত্রে কারা কারা জড়িত ছিলো সে সম্বন্ধে কোন তদন্ত হয়নি, বহু মানুষের মনে এখনো নানা সন্দেহ উঁকি-ঝুঁকি দেয়।

জিয়া হত্যার পরেও কিছুকাল সাংবিধানিক পদ্ধতি ও গণতন্ত্র কার্যকর ছিলো। সংবিধান অনুযায়ী উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হন। সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যেই নবেম্বর মাসে (১৯৮১) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. কামাল হোসেন। তাঁকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে বিচারপতি আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। সেনাপ্রধান লে. জে. হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এই বিজয়ের জন্যে তাঁকে অভিনন্দিত করলেও কয়েক দিনের মধ্যেই একটি জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মারফত ক্ষমতা ভাগাভাগির দাবি তোলেন। ১৯৮২ সালের ১৫ জানুয়ারি এরশাদ তাঁর ভগ্নিপতির মারফৎ আমাকে জানান যে তাঁর দাবি মেনে নেওয়া না হলে তিনি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবেন।

এরশাদ তার ঠিক ৬৮ দিন পরে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রিভলবারের ভয় দেখিয়ে রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তারকে পদত্যাগে বাধ্য করেন এবং ক্ষমতা দখল করেন। শেখ হাসিনা বলেছিলেন যে এই সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি অখুশি নন। আওয়ামী লীগের মুখপত্র বাংলার বাণী এই অভ্যুত্থানকে স্বাগত করে এবং সামরিক স্বৈরতন্ত্রের সাফল্যের জন্যে মোনাজাত করে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া গোড়া থেকেই সামরিক স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা প্রায়ই সামরিক স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন বলে এরশাদের শাসন নয় বছর স্থায়ী হতে পেরেছিলো।

গণআন্দোলনে এরশাদের সামরিক সরকারের পতনের পরে দেশবাসী আশা করেছিলো এরপর থেকে গণতন্ত্রের যাত্রা অব্যাহত থাকবে। কিন্তু সেটা হয়নি শেখ হসিনার কারণে। তাঁর ধারণায় তিনি গদি পেলে দেশে গণতন্ত্র থাকে, অন্য সময়ে নয়। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতায় জীয় হয়। সারা বিশ্বের পর্যবেক্ষকরা সে নির্বাচনকে নিখুঁৎ এবং

আদর্শ বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁদের সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়ে হাসিনা ঘোষণা করেন তাঁর কাছ থেকে বিজয় ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। খালেদা জিয়ার প্রথম সরকারের আমলে আওয়ামী লীগ প্রায় সময়ই সংসদ বর্জন করেছে, মোট ১৭৩ দিন হরতাল করেছে। লাগাতার হরতাল কথাটা শেখ হাসিনাই চালু করেছিলেন।

এটা গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নয়

সে নির্বাচনে পরাজিত হয়ে হাসিনা সিস্টেমের ত্রুটি আবিষ্কার করলেন। জামায়াতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি চালু করার জন্যে আন্দোলন, হরতাল ও খুনখারাপির লাগাম খুলে দেন। তিনি ১৯৯৬ সালের ২০ মে সেনাপ্রধান জেনারেল নাসিমকে দিয়ে একটা অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন। সৌভাগ্যবশত কয়েকজন দেশপ্রেমিক অফিসারের সতর্কতায় সে অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়। দেশজোড়া হানাহানি ও রক্তপাত বন্ধ করার লক্ষ্যে খালেদা জিয়া ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচিত সংসদে জরুরিভাবে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী (তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন) পাস করেন। জুন মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অল্প কয়েকটি আসনের ব্যবধানে একক গরিষ্ঠ দল হয়ে বেরিয়ে আসে কিন্তু নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয় বলে জামায়াতের সদস্যদের সমর্থনে শেখ হাসিনা সরকার গঠন করেন।

আওয়ামী লীগ নেত্রীর দৃষ্টিতে তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি তখন খুবই উত্তম ছিলো। কিন্তু ২০০১ সালের অক্টোবরে সে পদ্ধতির অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পরাজয়ের পর সে পদ্ধতির ওপর শেখ হাসিনার আস্থা চলে যায়। শেখ হাসিনা নিজেই স্বীকার করেছেন ২০০৭ সালের বর্ণচোরা সামরিক সরকারটা ছিলো তাঁরই 'আন্দোলনের ফসল'। সে সরকার শেখ হাসিনাকে বিশ্ব ভ্রমণের অনুমতি দিলেও বেগম জিয়াকে কারারুদ্ধ করে রাখে। বিএনপিকে ধ্বংস করার এবং সে দলকে বাদ দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সকল চেষ্টা করেছে ফখরুদ্দিন-মইন উ সরকার। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে একটা মাস্টারপ্ল্যানের নির্বাচনে জয়ী হয়েই শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি বিলুপ্ত করার চেষ্টা শুরু করেন।

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিবর্তন ইংলন্ডে রাজা চার্লসের আমলের চাইতে বেশি অগ্রসর হতে পারেনি। শিশুকে বড়ো করতে অনেক যত্ন ও সতর্কতার প্রয়োজন হয়। ফলের চারাগাছ লাগালে সেদিক বেড়া দিয়ে রক্ষা করতে হয়, নইলে ছাগলে মুড়িয়ে খাবার ভয় থাকে। গণতন্ত্রের ব্যাপারেও সে উপমা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বরে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর রোডের বাড়িতে এক সাক্ষাৎকারে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর পিতা শেখ মুজিবুর রহমান আমাকে বলেছিলেন "গণতন্ত্র নিজের গতিতে চলে, গণতন্ত্রকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অধিকার কারো নেই।" দুর্ভাগ্যবশত তাঁর সে অভিমত শেখ মুজিব নিজেই মেনে চলেননি, সেজন্যে তাঁকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। শেখ হাসিনা ১৯৯১ সালের পর থেকে

'পরীক্ষা-নিরীক্ষাই' করে চলেছেন গণতন্ত্র নিয়ে। সে নিরীক্ষার মূল লক্ষ্য হলো তাঁর গদি পাবার নামই হচ্ছে গণতন্ত্র, তিনি গদি না পেলে সেটা গণতন্ত্র নয়।

শেখ হাসিনা কখনো গালাগাল না করে তিনবারের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী এবং বর্তমানে বিরোধী দলের নেতা খালেদা জিয়ার নামোল্লেখ করতে পারেন না। ১৯৯১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি টেলিভিশনে তিনি ঝাড়া ৪৫ মিনিট শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, বেগম জিয়া এবং তাঁদের পরিবারকে অশ্রাব্য গালাগাল করেছিলেন। বর্তমান সংসদের উদ্বোধনী দিনেও তাই করেছেন তিনি। সামাজিক ভাবেও তিনি সে আচরণ বজায় রেখেছিলেন। খালেদা জিয়ার মাহাত্ম্য, তিনি শেখ হাসিনার কন্যা পুতুলের বিয়ের মামুলি আমন্ত্রণেও বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে দুটো কথা বলার মতো সৌজন্যও কনের মাতা শেখ হাসিনা দেখাতে পারেননি। গত শুক্রবারের সংবাদ সম্মেলনেও বার বার তিনি বেগম জিয়াকে খুনের চেষ্টার অপবাদ দিয়েছেন।

এই প্রেক্ষিতে শেখ হাসিনার আমন্ত্রণ "আসুন, আমরা বসি, আলাপ করি" আকস্মিক বজ্রপাতের মতোই নাটকীয় ঠেকেছে বাংলাদেশের মানুষের কাছে। শেখ হাসিনার কি অভাবনীয় চরিত্রগত পরিবর্তন হয়েছে রাতারাতি? কিন্তু সমকালীন ঘটনাবলীর সঙ্গে যাঁদের সামান্যতম পরিচয় আছে তাঁরা জানেন যে প্রায় ছয় বছরে দিল্লিতে যে শিক্ষা তাঁর ধমনীতে ইনজেকশান করে দেওয়া হয়েছিলো সেটা ভোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। বরং ব্যাপারটা হচ্ছে 'বেকায়দায় পড়লে বাঘেও ঘাস খায়'।

গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক টেলিভিশন সংস্থা সিএনএন থেকে প্রচারিত সাক্ষাৎকারে ক্রিশ্চিয়ান আমানপোর প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে যেরকম 'হামানদিস্তা' করে ছেড়েছেন তার থেকেই প্রমাণ পাওয়া যাবে বহির্বিশ্ব শেখ হাসিনা ও তার সরকার সম্বন্ধে কেমন ধারণা পোষণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন বহুদিন যাবৎ বাংলাদেশের বর্তমান সরকার সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন। হাসিনা ড. ইউনূসের ব্যাপারেও মার্কিন সরকারকে যেমন হেনস্থা ও অপমান করেছেন কোন না কোনদিন তার প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য।

বাঘ যে কারণে ঘাস খাবার কথা বলছে

যুক্তরাষ্ট্র এবং ২৭টি ইউরোপীয় দেশের সংস্থা ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) প্রায় দু'বছর যাবৎ আলোচনা ও সংলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক সংকটের অবসান এবং সকল দলের অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন করার পরামর্শ দিয়ে আসছে। কিন্তু তাঁর স্বভাব-সুলভ একগুঁয়েমির কারণে হাসিনা তাদের পরামর্শে কর্ণপাত করেননি। কিন্তু সাভারের রানা প্লাজার ট্র্যাজেডির কারণে প্রেক্ষিত সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। সরকার হঠাৎ করে চোখে অন্ধকার দেখছে। ওয়ালমার্ট গত নবেম্বর তাজরিন ফ্যাশন্স কারখানার অগ্নিকাণ্ডে ১১২ টি প্রাণের শোচনীয় মৃত্যুর পরেই বাংলাদেশ থেকে পোশাক আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে।

রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির (যেটাকে অর্থমন্ত্রী মুহিত দিল্লিতে 'তেমন গুরুতর কিছু নয়' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন) পরে ব্রিটিশ জনমতের চাপে প্রাইমার্ক প্রভৃতি

ব্রিটিশ কম্পানি হতাহতদের ক্ষতিপূরণ দানের ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়েছে। বিদেশে উৎপাদকদের অবহেলার কারণে এমন মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির জন্যে ক্ষতিপূরণ দান ব্যবসায়ীদের জন্যে আদর্শ পরিস্থিতি নয়। কারখানাগুলোর পরিবেশ যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত না হলে বাংলাদেশ থেকে পোশাক আমদানি তাদের জন্যে লাভজনক হবে না। মার্কিন ডিজনি কর্পোরেশনও ঘোষণা করেছে যে তারা বাংলাদেশর পোশাক শিল্পে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নতি না হলে ইইউ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক অবরোধ আরোপের কথা বিবেচনা করবে।

অর্থাৎ বিদেশ থেকে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য থেকে বাংলাদেশী শ্রমিক বহিষ্কারের ফলে বিদেশী রেমিটেন্স মারাত্মক রকম পড়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে পোশাক রফতানি বাবদ বিদেশী মুদ্রা অর্জনের বৃহত্তম উৎসও শুকিয়ে যাবার ভয় দেখা দিয়েছে। এদিকে দেশের ভেতর সরকার বলে কিছু নেই। দেশ চলছে না। প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও ধর্মঘট-হরতাল এবং খুনখারাপি চলছে। বিএনপি ও ১৮ দলের সমাবেশ-হরতালগুলো সেই কবেই সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। এমনকি জনমতকে ধাপ্পা দেবার জন্যে শাহবাগে যে দানবটাকে সরকার বোতল থেকে বের করেছিলো সে দানব এখন আর বোতলে ফিরে যেতে রাজি নয়, শেয়াল এখন নিজেকে বাঘ ভাবতে শুরু করেছে।

শেখ হাসিনা ও তাঁর উপদেষ্টারা বরাবরই যে ভুলটা করে থাকেন এবারেও ঠিক সেটাই করছেন তাঁরা। তাঁরা আশা করছেন খালেদা জিয়া ও বিএনপিকে সংলাপে বসানো গেলে বিদেশীদের ধাপ্পা দেবার একটা বাহানা পাওয়া যাবে। অন্যদিকে দেশজোড়া আন্দোলন যদি তাতে কয়েকদিনও স্থগিত থাকে তাহলে সে আন্দোলনের গতিশীলতা স্তিমিত হয়ে আসবে এবং সরকার দেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবে। কিন্তু তাঁরা হিসাবে মারাত্মক ভুল করছেন। আন্দোলন এখন খালেদা জিয়া, বিএনপি, জামায়াত, এমনকি হেফাজতে ইসলামেরও নিয়ন্ত্রণে নেই। আন্দোলন এখন সাধারণ মানুষের হাতে চলে গেছে। খালেদা জিয়া এবং বিএনপির সঙ্গে সত্যিকারের এবং অর্থবহ একটা রফা হলে তাঁরা আন্দোলনকে বিশেষ একটা খাতে পরিচালিত করার চেষ্টা করতে পারেন।

খালেদা জিয়া সরকারের সঙ্গে বসে কি নিয়ে কথা বলবেন? বিলেতে হলে না হয় আবহাওয়া একটা আলোচ্য বিষয় হতে পারতো। তাছাড়া বিএনপির শীর্ষ নেতাদের সকলকে সরকার ধরে ধরে জেলে বন্দী করে রেখেছে। খালেদা জিয়া কাকে সঙ্গে নিয়ে বৈঠক যাবেন, কে তাঁকে পরামর্শ দেবেন? বিষয় এখন একটাই। সরকার যদি অবিলম্বে কারারুদ্ধ বিরোধী দলীয় নেতাদের মুক্তি দেয় এবং ঘোষণা দেয় যে তারা একটা নির্দলীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে নির্বাচন করতে রাজি আছে তাহলে সে কর্তৃপক্ষের গঠন নিয়ে আলোচনা সম্ভব। তত্ত্বাবধায়ক কথাটাতে যদি তাদের এতোই আপত্তি তাহলে আলোচনার মাধ্যমে সে কর্তৃপক্ষকে অন্য কোন নাম দেওয়া যেতে পারে। শেকস্‌পিয়র লিখে গেছেন গোলাপকে যে নামেই ডাকা হোক সে সমানেই সুগন্ধ বিতরণ করে।

(লন্ডন, ০৪.০৫.১৩)

পুত্র জয়কে দিয়ে নির্বাচনে জয় হবে না

আমরা যখন পত্রিকায় সাংবাদিকতা করতাম তখন নির্বাচন ছিল ভিন্ন রকমের এবং সাংবাদিকতাও। নির্বাচন এগিয়ে এলে সবগুলো পত্রিকাই 'ভোট রঙ্গ' 'নির্বাচনী রঙ্গ' জাতীয় কলাম প্রচার করতো। নির্বাচন নিয়ে এখন আর রঙ্গ হয় না, এখন শুধু রক্ত ঝরে। মিডিয়া সাংবাদিকরা মালিক পক্ষের চাকরি করেন। মালিকদের সমৃদ্ধি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়। রুটি-রুজির গরজে সাংবাদিকদের ঢাল-তলোয়ার নিয়ে সরকারের পক্ষে লড়াই করতে হয়। ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতা যাঁরা করেন কিম্বা বাইরে থেকে যাঁরা কলাম লেখেন তাঁদের কেউ কেউ সরকার ও শাসক দলের কাছ থেকে অতীতে যেসব বদান্যতা পেয়েছেন এবং বর্তমানেও পেয়ে থাকেন। তাঁরাও রুটি-রুজির গরজে সরকারের তাগিদে রক্তারক্তি করে যাচ্ছেন। বলতে গেলে তাঁদের কারো কারো অস্তিত্ব নির্ভর করে এই সরকারের হাজার অন্যায়-অবিচারের যুক্তি সন্ধানের ওপর।

নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকার আর শাসক দলও প্রচুর রক্তারক্তি করেছে। ৫-৬ মে ভোররাতে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে যে গণহত্যা হয়ে গেলো সেটাও এই নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্ক-বর্জিত নয়। সরকার গদি আঁকড়ে থাকতে চায় বিদেশী প্রভুদের অনুগ্রহে। সে অনুগ্রহ অর্জনের জন্যে ইসলামের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অবস্থান নিয়েছে শেখ হাসিনার সরকার। হেফাফত ইসলামের ২০/৩০ লাখ সমর্থকের শাপলা চত্বরে অবস্থান ধর্মঘট বিদেশী প্রভুদের আতঙ্কিত করে। সুতরাং পাইকারী হত্যা এবং আতঙ্ক দিয়ে এই আন্দোলনকে সাময়িকভাবে হলেও ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া নিতান্তই প্রয়োজনীয় ছিল সরকারের জন্যে। শোনা যায় সে গণহত্যায় বিদেশীরাও মদদ দিয়েছিল সরকারের ঘাতক বাহিনীকে।

এই সরকার গোড়া থেকেই ফাউলের ওপর নির্ভর করে রাজনীতির খেলা খেলেছে। সামনা-সামনি এবং নিরপেক্ষ খেলার সাহস নেই তাদের। তারা প্রতিপক্ষের হাত পিঠমোড়া বেঁধে লড়াই করতে চায়। বিরোধী দলগুলোর কতো হাজার কর্মীকে কয়েদ করে রাখা হচ্ছে তার সঠিক হিসেব এই সরকারের কাছ থেকে আশা করা যায় না। সত্যতা এবং স্বচ্ছতা এই সরকারের বৈশিষ্ট্য নয়। বিদেশী প্রভুদের মনোরঞ্জনের লক্ষ্যে ইসলামী সন্ত্রাসী কিম্বা জামায়াতী বলে

কয়েক হাজার টুপি-দাড়ী পরিহিত এবং মসজিদে যাওয়া লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে। লক্ষণীয় যে জামায়াতে ইসলামী আজো পর্যন্ত নিষিদ্ধ দল নয়। কিন্তু পৌনে পাঁচ বছর ধরে শুধু জামায়াতের নেতা-কর্মী, এমনকি সাধারণ সদস্য হবার কারণে কয়েক হাজার লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের হত্যা করার খবর তো প্রায়ই পাওয়া যায়।

শাসক দলে, এমনকি মন্ত্রী সভাতেও এমন এমন লোক আছেন মুক্তিযুদ্ধের সময় হত্যা ও অন্যান্য যুদ্ধাপরাধের বহু অভিযোগ আছে তাঁদের বিরুদ্ধে। তাঁরা সকলেই আওয়ামী দীঘিতে পুণ্য স্নান করে নবজন্ম লাভ করেছেন। এখন তাঁরা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। অন্যদিকে যুদ্ধাপরাধের বিচারের নামে বিতর্কিত ট্রাইব্যুনালে এবং অধিকতর বিতর্কিত পদ্ধতিতে বিচার করে জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের ফাঁসির দণ্ড দেওয়া হচ্ছে। একজনকে ফাঁসির বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ায় সরকারি উসকানিতে তাদের কর্মীরা এবং শাহবাগে সরকারের অবৈধ সন্তানরা 'ফাঁসি ফাঁসি' ধ্বনি তুলে রক্তলিপ্সা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। বিএনপির দুই প্রৌঢ় নেতাও আছেন এই তথাকথিত বিচার প্রক্রিয়ায় আসামীর তালিকায়। দেশে এবং বিদেশে সেজন্যেই এই বিচারকে বলা হচ্ছে রাজনৈতিক বিচার।

•

হুকুমের আসামীর বিচার ভবিষ্যতেও হবে

কারাবন্দী বিএনপি নেতা-কর্মীর সংখ্যা আরো বেশী। এই সরকার ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে সোয়া সাত হাজার দুর্নীতির মামলা মওকুফ করে দিয়েছে। খুন-খারাপী চুরি-ডাকাতি সব রকমের মামলা ছিল তার ভেতর। ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত ডজন দুয়েক আসামীকে রাষ্ট্রপতির নামে মুক্ত করা হয়েছে। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মিগ-২৯ এবং কোরিয়া থেকে ফ্রিগেট ক্রয় ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাপারে দুর্নীতির পাঁচটি মামলা ছিল সে তালিকায়। কিন্তু গদি পাবার পর থেকে বিএনপি ও অন্যান্য দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে অসংখ্য ভুয়া মামলা সাজিয়েছে সরকার। বাংলাদেশের সকল মানুষই জানেন ককটেল বোমা নিক্ষেপ গাড়ি ভাঙা ইত্যাদি কর্ম করে থাকে সর্বনিম্ন স্তরের কর্মীরা এবং হুজুগে পড়ে পাড়ার ও রাস্তার বেকার ছেলেরা।

কিন্তু সচিবালয়ে ককটেল বোমা ছোঁড়া এবং এয়ারপোর্ট রোডে গাড়ি ভাঙচুর করার ব্যাপারে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ এ দলের ৪০-৫০ জন শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে মামলা করেছে সরকার। অভিযোগ হয়েছে তাঁরা নাকি 'হুকুমের আসামী'। এবং এই অলীক অভিযোগে তাঁদের দীর্ঘ দিন ধরে কাশিমপুর জেলে কয়েদ করে রাখা হয়েছে, মাঝে মাঝে 'রিম্যান্ডে' নিয়ে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়েছে তাঁদের

ওপর। বাংলাদেশের মানুষ আশা করে আছে কোন না কোন দিন অজস্র হত্যা-দুর্নীতি-নির্যাতনের, শাপলা চত্বরের গণহত্যার দায়ে হুকুমের আসামী প্রধানমন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রীদের বিচার হবে।

প্রশাসন আর পুলিশ তো বটেই। বাংলাদেশের দলীয়কৃত আদালত এবং নির্বাচন কমিশনও সরকারের ইচ্ছা পূরণের জন্যে সদাই উদগ্রীব। আদালত রায় দিয়েছেন এবং নির্বাচন কমিশন সে রায় পালনের জন্যে উদগ্রীব যে রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতের নিবন্ধন বাতিল করতে হবে। সরকারের অভিযোগ জামায়াত নাকি সন্ত্রাসী দল। নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশীদের জন্যে আমার করুণা হয়। এই দেশ স্বাধীন করার, এ দেশের গোড়ার বছরগুলোর সর্বনাশা কর্মকাণ্ডের ইতিহাস জানার সুযোগ তাদের দেওয়া হয়নি। কিন্তু যাঁরা সে ইতিহাস মোটামুটিও জানেন তাঁরা অবশ্যই জানেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক সহিংসতা, গুপ্তহত্যা এবং পর্বত-প্রমাণ দুর্নীতি আমদানী করেছে আওয়ামী-লীগ। অন্য দলগুলো অপেক্ষাকৃত নতুন। ছোটখাটো আকারে কিছু অপকর্ম তারা আওয়ামী লীগের কাছ থেকেই শিখেছে।

জামায়াতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আসল রহস্য

কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার সরকারের প্রকাশ্য যুদ্ধের ইতিহাস অন্য রকমের। ২০০৭-৮ সালে দু'বছর বাংলাদেশে একটা বর্ণচোরা সামরিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মার্কিন নাগরিক ফখরুদ্দিন আহমেদ। সে সময় মার্কিন নাগরিক সজীব ওয়াজেদ জয় এবং অন্য একজন মার্কিন নাগরিক কার্ল চিয়াভাচো যৌথভাবে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সে প্রবন্ধে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের গদি সুরক্ষিত করার জন্যে যে রূপরেখা দেওয়া হয়েছিল ধর্মীয় রাজনীতি নির্মূল করা ছিল তার একটা প্রধান দিক-নির্দেশ। জয় বিদেশে নিজেকে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলে পরিচয় দেন এবং সে পরিচয়ে ব্যবসা করেন। হয়তো তাঁর 'ডিজিটাল' পরামর্শেই শেখ হাসিনা গোড়া থেকেই জামায়াতকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন-জামায়াতের কোন 'সন্ত্রাসের' কারণে নয়।

সজীব ওয়াজেদ জয় শৈশবে মায়ের সঙ্গে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর শিক্ষাও হয়েছে ভারতের স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। আরো পরে তিনি যুক্তরাষ্ট্র যান, মার্কিন মহিলাকে বিয়ে করেন এবং মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রচুর বিত্ত-সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন তিনি। বস্তুত তাঁর বিপুল সম্পদের উৎস সম্বন্ধে মার্কিন ও কানাডীয় সরকার কৌতূহলী। সুতরাং বাংলাদেশ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান প্রশস্ত হবার কোন কারণ নেই এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাঁর বর্তমান আগ্রহ স্বার্থক-সংশ্লিষ্ট হতে বাধ্য।

শেখ-ভগ্নীদ্বয়ের সন্তানরা পিতৃ-পরিচয়ের চাইতে নানার পরিচয়েই পরিচিত হতে ভালোবাসেন। সজীব ওয়াজেদ জয় এবারে অন্তত পিতার গ্রামের কথা মনে করেছেন, রংপুরের পীরগঞ্জে দাদার বাড়ি যাবার তাগিদ বোধ করেছেন তিনি। কিন্তু রহস্যটা কারোই জানতে বাকি নেই। জয় পীরগঞ্জ থেকে সংসদ নির্বাচনে দাঁড়াতে চান, পিতার পরিচয়ে তিনি ভোট ভিক্ষা করেছেন। বাংলাদেশের আইনেও আছে নির্বাচন প্রার্থীরা রাষ্ট্রীয় যানবাহন ইত্যাদিসহ কোন রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহার করতে পারবেন না। জয় সপরিবারে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে থাকছেন, প্রধানমন্ত্রীর দেহরক্ষী বাহিনীর নিরাপত্তা ভোগ করছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সরকারি হেলিকপ্টারে পীরগঞ্জ গিয়েছিলেন। শ্বশুরবাড়ি দূরের কথা, স্বামীকেও পাত্তা দিতেন না শেখ হাসিনা। ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী হবার পর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অণুবিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ মিয়াকে তিনি তাঁর নিজের বাড়ি সুধাসদন থেকে বের করে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে জীবনের অবশিষ্ট বছরগুলো তিনি বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির অতিথি হয়ে ছিলেন। সাড়ে চার বছর পর এবারে হঠাৎ প্রধানমন্ত্রীর শ্বশুরবাড়ি যাবার শখ হলো। নির্বাচনের সময় স্বামীর পিত্রালয়ের কথা তাঁর মনে পড়ে ভোটের আশায়। কিন্তু পীরগঞ্জের মানুষ কি এতই বোকা যে শ্বশুরবাড়ি এবং দাদার বাড়ির জন্যে হঠাৎ দরদে তারা গলে যাবে?

আওয়ামী লীগ কি বাংলাদেশের

অনেকেই বলেছেন এবং এই লেখক একাধিকবার লিখেছেন, যুদ্ধাপরাধের বিচার এবং জামায়াতের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সরকারের সর্বাত্মক যুদ্ধ নিতান্তই রাজনৈতিক ব্যাপার। প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের উক্তি থেকে সেটা আরেকবার প্রমাণ হলো। জামায়াতের নিবন্ধন বাতিলের রায়ে উল্লসিত জয় বলেছেন, 'জামায়াতের নিবন্ধন বাতিল আওয়ামী লীগের জন্যে অসাধারণ বিজয়।' এই নিবন্ধন বাতিলের প্রতিবাদ হয়েছে পাকিস্তান থেকে। জয় তাই ঘোষণা করেছেন, "জামায়াত বাংলাদেশের নয়, পাকিস্তানের"। আওয়ামী লীগ ১৯৪৯ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত ছিল পাকিস্তানের একটা রাজনৈতিক দল। কিন্তু কয়েক বছর যাবৎ এ দলের সমর্থন বাংলাদেশের চাইতে ভারতে বেশি। ভারতীয় নেতারা এখন আর গোপন করেন না যে যেকোন মূল্যে তাঁরা শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগকে গদিতে রাখতে চান। জয়ের সর্বশেষ উক্তির পর বাংলাদেশীরা এখন আওয়ামী লীগকে ভারতীয় কোন দলের শাখা বলে মনে করবে।

নিবন্ধন বাতিলের বিষয়টা এখন উচ্চ আদালতে আপিল সাপেক্ষ। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কি হবে এখনো বলা যাবে না। কিন্তু মন্ত্রীরা আর আওয়ামী লীগ নেতারা

জামায়াতের ভবিষ্যৎ নিয়ে হাইকোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতে উল্টা-পাল্টা মন্তব্য করে যাচ্ছেন। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাসমুল হক টুকু বলেছেন, জামায়াত কোন রাজনৈতিক দল নয়। টুকু সাহেব হয়তো স্টুপিড নয়তো ইতিহাস কাকে বলে তিনি জানেন না। অতীতে এই দলের সঙ্গে আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনা যেসব লেনদেন করেছেন সেগুলো তাহলে কিসের ভিত্তিতে হয়েছিল? কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলে কি তাঁর মস্তিষ্কে কিছু জ্ঞানের আলো ঢুকবে?

উনিশশো ছিয়াশি সালের এপ্রিল মাসে বিএনপি, আওয়ামী লীগ এবং জামায়াতসহ সবগুলো রাজনৈতিক দল এক বৈঠকে জেনারেল এরশাদের সংসদ নির্বাচন বর্জন করতে একমত হয়েছিল। কিন্তু জামায়াতকে দলে টেনে শেখ হাসিনা সে ঐকমত্য ভঙ্গ করে সে বছরের ৬ মে তারিখের নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৯৫-৯৬ সালে জামায়াতকে দলে নিয়ে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি চালুর দাবিতে দেশজোড়া সহিংস আন্দোলন করেছিলেন। সে বছরের জুন মাসের নির্বাচনে সাফল্যের জন্যে অধ্যাপক গোলাম আজমের দোয়া চাইতে হাসিনা ইন্দিরা রোডের একটা বাড়িতে গিয়েছিলেন। আর নবনির্বাচিত সংসদে জামায়াতের চারজন সদস্যের ভোট না পেলে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হবেন বলে কোন নিশ্চয়তা ছিল না।

বালির উত্তাপ

সূর্য যখন মধ্যাকাশে থাকে তার উত্তাপে বালি এতোই গরম হয় যে তাতে পা দেওয়া যায় না। কিন্তু সূর্য ডুবলে হিম হয়ে যায় সে বালি। আওয়ামী লীগ নেতাদের বর্তমানের লম্ফন-কুর্দন আর হাঁক-ডাকও বালির উত্তাপের মতো। দেশে তাঁদের কোন সমর্থন নেই। একটি বিদেশী শক্তির সমর্থনের জোরে এতো বেশি তড়পাচ্ছেন তাঁরা। কিন্তু বাংলার সুপ্রাচীন একটা প্রবাদের কথা তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন: "চোরের দশদিন আর গৃহস্থের একদিন"। সোফোক্লিসের এক নাটকে একটি সংলাপের অনুবাদ আমি করেছিলাম, "কাল হবে অন্যদিন, যে দিনেতে শেষ হবে অতীতের সব অবিচার"।

কিন্তু সে দিনের প্রতীক্ষায় বাংলাদেশের মানুষকে আরো কিছু অবিচারের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। মনে হচ্ছে সরকার প্রধান বিরোধী দল বিএনপিকে বাদ দিয়ে নির্বাচন করার ষড়যন্ত্র করছে। তাদের নির্বাচন কমিশন তো ইতোমধ্যেই জামায়াত নেতাদের প্রার্থীত্ব অবৈধ ঘোষণা করেছে। তারা আশা করছে লোক দেখানো নির্বাচন করে কোন রকম একটা ফল ঘোষণা করলেই বিদেশী প্রভুদের খুঁটির জোরে সে ফলাফল তারা বহাল রাখতে পারবে।

এমতাবস্থায় বিএনপি এবং ১৮ দলের জোটের উচিৎ ছিল অবিলম্বে তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি ফিরিয়ে আনতে সরকারকে বাধ্য করা, নতুবা সরকারকে উপড়ে ফেলা। সে ভয় সরকারের আছে। সেজন্যেই বিএনপিতে ভাঙন ধরানোর

কোন চেষ্টার ত্রুটি তারা করছে না। মন্ত্রীদের এবং শাসক দলের নেতাদের উল্টা-পাল্টা কথাবার্তার সেটাও একটা উদ্দেশ্য। তাঁরা বিরোধী দলের সমর্থকদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছেন। তাছাড়া শোনা যাচ্ছে একটা সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীকেও এ লক্ষ্যে সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০০৮ সালের অক্টোবরে বিএনপিকে ভেঙে যাবার যে চেষ্টা ডিজিএফআই করেছিল সেকথা বাংলাদেশের মানুষের, বিশেষ করে বিএনপি নেতাদের ভুলে যাওয়া উচিৎ নয়।

মওদুদ কার উপকার করছেন?

বিএনপির আন্দোলন প্রায়ই আমাকে একটা কাহিনী মনে করিয়ে দেয়। বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। ডাকাতরা কাচারি ঘরের সামনে আসতেই লোকটা অন্দর মহলে গিয়ে লুকোয়। তারপর ডাকাতরা ঘরে ঢুকলে সে টংয়ে উঠে লুকিয়ে থাকে। এ কাহিনী বন্ধুদের বলার সময় সে বার বার করে বলছিল, "আমি কি সাহস ছাড়ি?" বিএনপির আন্দোলনও সে রকমেরি– তারা কখনো এগোয় আর কখনো পেছায়। খালেদা জিয়া চূড়ান্ত আন্দোলনের কয়েকটি সময়সূচি ঘোষণা করেছিলেন কিন্তু ঘোষিত সময়ে কিছুই ঘটেনি। তার ওপর নেতাদের পরস্পর-বিরোধী কথাবার্তা কর্মী ও সমর্থকদের মনেও হতাশা এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হবে।

বেগম জিয়া ওমরাহ্ করতে সৌদি আরবে গিয়েছিলেন। তার আগে পর্যন্ত ঘোষণা ছিল যে ঈদের পরেই চূড়ান্ত আন্দোলন শুরু হবে। কিন্তু তাঁর বিদেশে অবস্থানের কয়দিনের মধ্যে সিনিয়র নেতা মওদুদ আহমেদ কয়েক প্রকারের উক্তি করেছেন। তিনি প্রথমে বলেছেন অক্টোবর মাসে লাগাতার হরতাল করা হবে। তার পরেই আবার তিনি বলেছেন সেপ্টেম্বর মাসে আন্দোলন শুরু হবে, প্রয়োজনবোধে অক্টোবর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত লাগাতার হরতাল হবে। সাধারণ মানুষ জানে ঈদের পরে আগস্ট মাসেরও প্রায় তিন সপ্তাহ অবশিষ্ট আছে। এ সময়টা বিএনপি নেতারা কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবেন? শেখ হাসিনা যদি সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে কিম্বা অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন ডেকে বসেন (খুব সম্ভবতঃ সেটাই তাঁর পরিকল্পনা) তাহলে তার পরে লাগাতার হরতাল ডেকে কার কি লাভ হবে? মওদুদ সাহেবরা উল্টা-পাল্টা সময়সূচি ঘোষণা করে কার উপকার করছেন জানি না, কিন্তু বিএনপির কোন উপকার তাঁরা করছেন না।

ভবিষ্যতে কি হবে, বাংলাদেশের মানুষের কপালে কি আছে আল্লাহই জানেন। ইতোমধ্যে আপনাদের সকলকে পবিত্র ঈদের আন্তরিক মোবারক।

(লন্ডন, ০৫.০৫.১৩)

এখন গার্মেন্ট শিল্পেরই 'গণহত্যা' চলছে

রানা প্লাজা গণহত্যার খবর দিনের পর দিন বিশ্ব মিডিয়ায় শিরোনাম হয়েছিলো। বিশ্বের যেসব দেশে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানি হয় সেসব দেশের ক্রেতারা দিনের পর দিন দেখেছে যেসব পোশাক তারা সস্তা দামে কিনছে সেগুলো তৈরি করেছে অমানুষিক পরিবেশে এবং বলতে গেলে ক্রীতদাস শ্রমিকদের মতো অবস্থায় বাংলাদেশের নারী ও শিশুরা। দেখে তারা আঁৎকে উঠেছে। অনেকেই বাংলাদেশে তৈরি পোশাকের আমদানীকারক ও খুচরা বিক্রেতাদের দোকানে বিক্ষোভ করেছে। গত সপ্তাহান্তে আরেকটি বিক্ষোভ হয়েছে লন্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রিটে। পত্রপত্রিকায় বহু প্রতিবেদন, নিবন্ধ, সম্পাদকীয় মন্তব্য এবং চিঠিপত্র ছাপা হয়েছে এ সম্বন্ধে।

শুধু রাণা প্লাজা নয়, তার পরেও গার্মেন্ট কারখানায় আগুনে পুড়ে শ্রমিক মারা গেছে। গত বছরের তাজরিন ফ্যাশনের কারখানায় আগুনে পুড়ে যে ১১২ জন শ্রমিক মারা গেছে এবং পূর্ববর্তী পাঁচ-ছয় বছরে বিভিন্ন কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে যে আরো প্রায় সাতশো শ্রমিক পুড়ে মরেছে ইউরোপ-আমেরিকার অধিকাংশ মানুষই এখন সেটা জেনে গেছে। লেবেলে বাংলাদেশের নাম দেখলে খদ্দেররা সে পোশাক কিনতে চাইছেন না, তাঁদের গা ঘিনঘিন করছে।

আমদানীকারকরা সক্রিয় হতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁরা সক্রিয় ব্যবস্থা নিচ্ছেন বলে খদ্দেরদের বোঝানো না গেলে তারা আর বাংলাদেশী পোশাক কিনবে না, তাঁদের ব্যবসায় লাটে উঠবে। রাতারাতি 'লেবার বিহাইন্ড দ্য লেবেল' (পোশাকের লেবেলের পেছনের শ্রমিক) নামে একটা সংগঠন গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশ পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মাইনে, আগুন থেকে কারখানা ও শ্রমিকদের সংরক্ষণ এবং সর্বোপরি কারখানা ভবনগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এ সংস্থার লক্ষ্য। সেজন্যে তারা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে নিজেদের ব্যয়ে বাংলাদেশের শ্রমিকদের কল্যাণে এগিয়ে আসছে। বৃটেনের প্রায় সবগুলো বড় বড় আমদানীকারক ও খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান 'লেবার বিহাইন্ড লেবেল' সংস্থায় যোগ দিয়েছে।

আমেরিকার আমদানীকারকরা এ সংস্থায় যোগ দিয়েছে বলে শুনিনি। তবে নিজস্ব উদ্যোগে বহু ব্যবস্থা নিয়েছে তারা। তাজরিন ফ্যাশনসের ট্র্যাজেডির পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম রিটেলার ওয়ালমার্ট বাংলাদেশ থেকে পোশাক আমদানী বন্ধ রেখেছে। তারা এবং অন্যান্য মার্কিন আমদানীকারক বলে দিয়েছে শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং তাদের মানবিক মাইনে-মজুরি সুনিশ্চিত না হলে তারাও বাংলাদেশে তৈরি পোশাক আমদানী করবে না। সবচাইতে সোচ্চার দাবি জানাচ্ছে মার্কিন সরকার। তারা বলেছেন কারখানা ভবনের নিরাপত্তা, আগুন ইত্যাদি দুর্ঘটনায় তাদের আত্মরক্ষার উপায়, শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন এবং তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে ইউনিয়ন গঠন করা না হলে মার্কিন বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত রফতানী সীমিত, হয়তো বন্ধ করে দেওয়া হবে।

বাংলাদেশের গার্মেন্ট রফতানীর অন্যতম বৃহত্তম খোলা বাজারটি হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। তারাও সম্প্রতি প্রস্তাব পাস করে যুক্তরাষ্ট্রের মতো দাবি জানিয়েছে। বলেছে তা না হলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭ দেশও বাংলাদেশে তৈরি পোশাক রফতানী কমিয়ে দেবে। কিন্তু স্পষ্টতঃই উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইউরোপীয় পুঁজিবাদীদের মতো সংকীর্ণ স্বার্থের গার্মেন্ট মালিকদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে সরকার ইউরোপ-আমেরিকার দাবিগুলো এড়িয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প এখন বাজার হারিয়ে ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

যে গরু দুধ দেয় তার লাথিও সহ্য করতে হয়– এটা বাংলাদেশের প্রচলিত প্রবাদ এবং বিশ্বাস। পশ্চিমে অনুরূপ প্রবাদটি হচ্ছে 'যে হাত খেতে দেয় সে হাত কামড়াতে নেই'। কিন্তু অতো দূরদৃষ্টি এবং সুবুদ্ধি যাদের আছে তারা বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী হতে যাবে কেন? নমুনা হচ্ছেন পাট ও বস্ত্রমন্ত্রী আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী। তিনি মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে চিঠি লিখে প্রশ্ন করেছেন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কথা বলার তিনি কে? অন্য কোন কোন মন্ত্রী বস্ত্রমন্ত্রীর মন্তব্যের ভয়াবহতা হয়তো বুঝতে পেরেছেন, নতুবা কেউ তাঁদের বলে দিয়েছে। তাঁরা বস্ত্রমন্ত্রীর সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। বলেছেন– লতিফ সিদ্দিকীর বক্তব্য তাঁর নিজের অভিমত, সরকারের নয়।

তারেকের পায়ের নখও তারা ছুঁতে পারবেনা

বর্তমান সরকারের মন্ত্রীরা যেন পোকা-মাকড় ভর্তি বৈয়াম। ঢাকনা খুলে দিলে পোকাগুলো যার যেদিকে খুশি ছোটাছুটি করে। এ সরকারের মন্ত্রীরাও সে রকম একেকজন একেক সুরে কথা বলে থাকেন। ইদানীং এ ব্যাপারটা বহুগুণে বেড়ে গেছে। আরেকটা দৃষ্টান্ত দেখা গেছে তারেক রহমানের ব্যাপারে। মন্ত্রীদের

দুএকজন (সরকারের আইন-অজ্ঞ আইন প্রতিমন্ত্রীসহ) দু'একজন মন্ত্রী জিগির তুলেছেন। তাঁরা তারেক রহমানকে লন্ডন থেকে ফিরিয়ে আনবেন বলে তড়পাচ্ছেন। মনে মনে নিশ্চয়ই তারেককে শিল- নোয়ায় পিষে ভর্তা বানিয়ে খেয়ে ফেলার স্বপ্নও দেখছেন কেউ কেউ। চুরি করে ধরা পড়া সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেছেন– তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে এনে দেশের আদালতে তাঁর বিচার করবেন তিনি।

এটা নতুন কিছু নয়। এই সরকার যখনই দুর্নীতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যান তখনই তারা তারেক ও কোকোর জিগির তোলে। আশা করে যে খালেদা জিয়ার পুত্রদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ নিয়ে প্রচারণা চালানো হলে দেশের মানুষের দৃষ্টি ভিন্নমুখী হবে। হয়তো খালেদা জিয়াও ভাববেন যে তিনি চাপে আছেন।

এই মন্ত্রীরা জানেন যে তারেক রহমান তাঁদের যে কারো চাইতেই বেশি দক্ষ এবং সফল রাজনীতিক। তারেক ময়দানে এসে রাজনীতিতে সক্রিয় হলে তাঁদের বিপদ শত গুণে বেড়ে যাবে। ২০০১ সালের নির্বাচনে নিজের সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় তিনি দিয়েছেন। অন্যদিকে চুরি ছাড়া আর কোন ব্যাপারে এ সরকারের কোন মন্ত্রী সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেননি। তাঁরা এতোই স্থূলমতি যে আন্তর্জাতিক আইন ও বিচার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সামান্যতম ধারণাও তাঁদের নেই। নইলে ইন্টারপোলের মাধ্যমে তারেক রহমানকে গ্রেফতার করার মতো স্টুপিড কথাবার্তা তাঁরা বলতে পারতেন না। সেটা যদি তাঁরা পারতেন তাহলে লবিষ্ট নিয়োগ এবং দীপু মনির বিশ্ব ভ্রমণে দরিদ্র দেশের বিরল সম্পদ ব্যয় করেও কেন তাঁরা সাড়ে চার বছরেও শেখ মুজিবের ঘাতকদের ফাঁসি দিতে ফিরিয়ে আনতে পারলেন না?

প্রকৃত পরিস্থিতি এই যে একবিংশ শতকে মানবাধিকার এবং বন্দী প্রত্যর্পণ সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক আইন এতোই বদলে গেছে যে কোন অভিযুক্তকে ফিরিয়ে আনা অনেক কঠিন হয়ে গেছে। এই বৃটেনের দৃষ্টান্তই ধরা যাক। আলজেরিয়ায় প্রাণদণ্ড আছে বলে সে দেশের একজন নাগরিককে ব্রিটিশ সরকার নব্বুইয়ের দশক থেকে স্বদেশে ফেরত পাঠাতে অস্বীকার করে আসছে। সে সরকারই আবার নয় বছর ধরে জর্দানী কট্টর ইমাম আবু ক্বাতাদাকে স্বদেশে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছে। জর্দান এখনো রাজবন্দীদের নির্যাতন করে বলে ব্রিটিশ এবং ইউরোপীয় আদালত সরকারের সকল চেষ্টা ভণ্ডুল করে দিয়েছেন।

'হাতিঘোড়া গেল তল, ছুঁচো বলে কতো জল'। বর্তমান বাংলাদেশী মন্ত্রীদের হাঁক-ডাক থেকে সে কথাই মনে হয়। নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং সাধ্য-সামর্থ্য সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা অতিমাত্রায় স্ফীত। তারেক রহমানকে ব্রিটিশ সরকার

রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছে। কারণ এই যে শেখ হাসিনার সরকার গদি পেয়েই তারেক রহমানের ওপর অকথ্য নির্যাতন করেছে। সাজানো অভিযোগে গ্রেফতার করে রিম্যান্ডের নামে তাঁর কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। বিশ্বব্যাপী কে না জানে সেসব খবর? বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের মতো নির্যাতক সরকার বিশ্বের আর কোথাও আছে বলে জানি না। তাদের অনুরোধে ব্রিটিশ সরকার তারেককে প্রত্যর্পণ করবে বলে কোন আইনবেত্তা বিশ্বাস করেন না।

প্রকৃত পরিস্থিতি এই যে বাংলাদেশ এখন আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে জনগণ এই দল আর এই সরকারকে আবর্জনার মতোই ফেলে দেবে। আওয়ামী লীগ গোটা বিশেকের বেশি আসন পাবে বলে কেউ বিশ্বাস করে না। তখন হয়তো মন্ত্রী ও নেতারা পালিয়ে বিদেশে চলে যাবেন। কিন্তু তাঁদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার করা মোটেই কঠিন হবে না, কেননা নির্যাতনের ব্যাপারে দুর্নাম বিএনপির নেই। তাদের সরকারের আমলে অভিযুক্তদের প্রত্যর্পণে কোন সরকারই আপত্তি করবে না। আশঙ্কায়, ভয়ে মন্ত্রীরা ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো পাগল হয়ে গেছেন। এখন তাঁরা আবোল-তাবোল বকছেন।

(লন্ডন, ২৮.০৫.২০১৩)

সার্বভৌমত্বকে সর্বশেষ কবে দেখেছে?

[বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি ভারতের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। গত কয়েক বছরে ইন্দো-বাংলাদেশ সম্পর্ক আন্তঃরাষ্ট্রীয় হুমকির পথ উন্মুক্ত করলেও বর্তমান সরকার সন্ত্রাসবাদ দমনে আঞ্চলিক সহযোগিতার বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছেন। —মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর]

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালের জানুয়ারিতে ভারত সফর করেন। পরে শোনা যায় যে দিল্লিতে তিনি কতগুলো চুক্তি করে এসেছেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক চুক্তিগুলো অনুমোদনের জন্যে সংসদে পেশ করা হয়। কম গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিগুলো সংসদের পাঠাগারে রাখা হয়। কোন সদস্য আগ্রহী হলে পাঠাগারে গিয়ে সে চুক্তির বিবরণ পাঠ করতে পারেন। কিন্তু শেখ হাসিনার স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলোর বিবরণ নিয়ে তো আলোচনা হয়ইনি, এমনকি চুক্তিগুলো সংসদের পাঠাগারে রাখা হয়েছে বলেও শোনা যায়নি। শুধু তাই নয়, সে সফরে তিনি কতগুলো চুক্তিতে সই করে এসেছেন তার সংখ্যাও এ যাবৎ জানা যায়নি।

কয়েকটি কলামে তখন লিখেছিলাম, সন্দেহ করা যুক্তিযুক্ত হবে যে শেখ হাসিনার স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলোতে এমন কিছু আছে যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী বলে জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য হবে না। সে সন্দেহ করার বিশেষ কিছু কারণ ছিল। আগের বছর (২০০৯) ২৫ ফেব্রুয়ারি বিডিআর বিদ্রোহে বহু রহস্যময় ঘটনা ঘটেছে। সেসব রহস্য উদঘাটন করার চেষ্টা তো দূরের কথা, ধামাচাপা দেবার চেষ্টাই বেশি করে চোখে পড়েছে। জনমত যাচাইয়ের কোন চেষ্টা না করে তড়িঘড়ি ঐতিহ্যমণ্ডিত বিডিআর বাহিনীকে ভেঙে দিয়ে ভুঁইফোঁড় একটা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বাহিনী গঠন করা হয়।

আরো একটা মারাত্মক পরিণতি হয়েছে সে বিদ্রোহের। ক্যাপ্টেন থেকে মেজর জেনারেল পর্যন্ত বিভিন্ন মধ্য ও উচ্চ পদমর্যাদার ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তা মর্মান্তিকভাবে নিহত হয়েছেন সে বিদ্রোহে। তারপর থেকে সেনাবাহিনীকে যেন পর্দার আড়াল করে রাখা হয়েছে। স্বাধীনতা দিবস প্রভৃতি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোতে সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ সকল দেশেই আনুষ্ঠানিক ব্যাপার।

এসব অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনী পারদর্শিতা ও সৌকর্যের কিছু দৃষ্টান্ত দেখিয়ে জনসাধারণকে আপ্যায়িত করে। তাতে জাতি ও তার স্বাধীনতার প্রহরীদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু ২০০৯ সালের সে অভিশপ্ত ২৫ ফেব্রুয়ারির পর থেকে তেমন কোন প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে দেখা যাচ্ছে না। নিহত এতো বেশি কর্মকর্তার শূন্যতা আদৌ পূরণ করা হয়েছে কি না কিংবা কিভাবে পূরণ করা হয়েছে ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন রকম জল্পনা-কল্পনা ও কানাঘুষা শোনা যায় প্রায়ই। কেউ কেউ বলছেন আওয়ামী লীগের সমর্থক অফিসারদের পদোন্নতি দিয়ে সেসব পদে নিয়োগ করা হয়েছে। সে গুজব খুবই বিশ্বাসযোগ্য। ক্ষমতা পাবার পর থেকে এ সরকার প্রশাসন, পুলিশ, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো, এমনকি বিচার বিভাগেরও চূড়ান্ত দলীয়করণ করে ফেলেছে। তাছাড়া অতীতে কয়েকবার আওয়ামী লীগ সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা লাভের চেষ্টা করেছে।

জাতীয় সেনাবাহিনী না ভাড়াটে সৈনিক?

আরেকটি কানাঘুষা এই যে সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে জাতিসংঘের ভাড়াটে সৈনিক হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী করে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। অর্থাৎ দেশের প্রতিরক্ষায় এই গৌরবময় বাহিনীর জন্যে কোন ভূমিকা রাখা হচ্ছে না। সেটা অবশ্যই অত্যন্ত ট্র্যাজিক ব্যাপার হবে, কেননা একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানী পক্ষ ত্যাগ করে যে স্বল্পসংখ্যক অফিসার ও জওয়ান মুক্তিযুদ্ধে অসম সাহস ও শৌর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁদের পুণ্যস্মৃতি ইতিহাসের পাতা থেকেও মুছে যাবে।

এই আলোচনাগুলোর কিছু বিশেষ তাৎপর্য আছে। একাত্তরের ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে পাকিস্তানী বাহিনী বাংলাদেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে আওয়ামী লীগ নেতারা সকলেই পালিয়ে ভারতে চলে যান। তাঁদের আশ্রয়, আহার, বাসস্থান, অর্থাৎ তাঁদের সামগ্রিক অস্তিত্বই নির্ভর করছিল ভারত সরকারের দাক্ষিণ্যের ওপর। ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে যাওয়া এই অসহায় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভারত সরকার তাঁদের অসহায় অবস্থায় পুরোপুরি সুযোগ নিয়েছিল। তাজউদ্দিন আহমদের 'নির্বাসিত সরকারকে' একটা সাত দফা চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে দিল্লি সরকার।

সে চুক্তির কতগুলো বিধান ছিল এরকম: স্বাধীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি এবং প্রতিরক্ষার দায়িত্ব নেবে ভারত। অর্থাৎ বাংলাদেশের নিজস্ব কোন পররাষ্ট্র নীতি কিংবা সেনাবাহিনী থাকবে না। এবং বিডিআর বাহিনীকে ভেঙে দিয়ে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের তত্ত্বাবধানে একটা বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড বাহিনী গঠন করা হবে। মনে রাখতে হবে যে, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর

বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও পরের বছরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীই ছিল বাংলাদেশে সর্বেসর্বা। বাহাত্তরের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষার্ধে আমি সড়ক পথে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাচ্ছিলাম বিবিসির সফরে। গোটা পথে আমার কোন অসুবিধা কিংবা সমস্যা হচ্ছে কি না খোঁজখবর নিচ্ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর লে. কর্নেল ভানোট।

জানুয়ারি মাসে পাকিস্তান থেকে মুক্তি পেয়ে শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফেরেন। তাজউদ্দিন আহমেদের স্বাক্ষরিত সাত দফা চুক্তিটি তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। সে চুক্তি মেনে নিতে তাঁকে রাজি করাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ং ঢাকায় এসেছিলেন। কিন্তু মুজিব ভারতীয় সেনাবাহিনী অপসারণের দাবিতে অটল থাকেন। তখন বাংলাদেশের প্রতিটি নরনারী, এমনকি হয়তো উদ্ভিদ এবং তৃণলতাও মুজিবের অনড় সমর্থক। তাঁর দাবি মেনে না নিয়ে ভারতের উপায় ছিল না। লক্ষ্য করতে হবে যে কোন দেশের সরকার যদি জনপ্রিয় হয় তাহলে সে সরকারকে অপ্রিয় কিছু মেনে নিতে রাজি করানো ভিন্ন কোন দেশের পক্ষে সম্ভব হয় না। সরকারের অপ্রিয়তার সুযোগ নিয়েই কোন দেশে বিদেশী অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। বাংলাদেশেও হয়েছে ঠিক তাই। ভারত জানে তাদের (এবং ওয়াশিংটনের) খুঁটির জোরেই শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। সুতরাং তাঁর ওপর আবার সাত দফা চুক্তি চাপিয়ে দেয়া তারা সহজ মনে করেছে। শেখ হাসিনা খুব সম্ভবত দিল্লিতে সে চুক্তিও করে এসেছিলেন।

বিডিআর বিদ্রোহ এবং প্রধানমন্ত্রীর দিল্লি সফর

বিডিআর বিদ্রোহ বলতে গেলে কলমের এক আঁচড়ে তাজউদ্দিন আহমেদের স্বাক্ষরিত সাত দফা চুক্তির দুটি দফা পূরণ করে দিলো। বিডিআর বাহিনীকে অবলুপ্ত করে ভারতের বশংবদ একটা বর্ডার গার্ড বাহিনী গঠন করা হলো। সেজন্যেই বিএসএফ যখন বাংলাদেশী মানুষের ওপর পাখির মতো অবলীলায় গুলি চালায় তখন বিজিবির দিক থেকে টুঁ শব্দটি শোনা যায় না। অথচ বিডিআরের আমলের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তখনকার অবস্থা ছিল 'ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হবে' গোছের। দ্বিতীয়ত, এক সঙ্গে ৫৭ জন সিনিয়র অফিসারের হত্যা অবশ্যই বাংলাদেশের নিজস্ব সেনাবাহিনীকে মারাত্মক রকম দুর্বল করে ফেললো। এ বাহিনীর অবলুপ্তির পথও তৈরি হলো কি না কে জানে?

শেখ হাসিনা দিল্লি সফরে গেলেন বিডিআর বিদ্রোহের ১১ মাস পরে। তার আগেই অত্যন্ত ত্বরিত এশিয়ান হাইওয়ের গতি পরিবর্তন করে ফেলা হয়। মূল নীল নকশা অনুযায়ী কথা ছিল যে, এশিয়ান হাইওয়ে পশ্চিমবঙ্গের বনগাঁও হয়ে বেনাপোলের পথে ঢাকায় আসবে এবং চট্টগ্রাম ও টেকনাফ হয়ে মিয়ানমারের ভেতর দিয়ে দক্ষিণ চীনে চলে যাবে। কিন্তু রাতারাতি ঘোষণা হয় যে, প্রস্তাবিত

হাইওয়ে এক ধারায় নয়, দুই ধারায় বাংলাদেশে ঢুকবে। এক ধারা বেনাপোল হয়ে এবং অন্য ধারা উত্তর-পশ্চিমের বুড়িমারী হয়ে। কিন্তু উভয় ধারাই গিয়ে শেষ হবে ভারতের আসাম রাজ্যে। অর্থাৎ এশিয়ান হাইওয়ে বাংলাদেশকে মিয়ানমার ও চীনের সঙ্গে সংযুক্ত করবে না। নীল নকশা পরিবর্তনের এই উদ্ভটতা ও অযৌক্তিকতা সকলকে বিস্মিত করেছিল। অনেকেই (এই লেখকসহ) তখন তার তীব্র সমালোচনা ও করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর দিল্লি সফরের পর ঘটনাবলী নাটকীয় রকম পরিবর্তিত হতে থাকে। একে দুয়ে ঘোষণা আসতে থাকে যে, ভারতকে উত্তরপূর্বের সাতটি রাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে করিডোর দেওয়া হবে বিনা মাশুলে (কেননা মাশুল নেওয়া নাকি অসভ্যতা হবে); সে লক্ষ্যে ভারত বাংলাদেশের সড়ক, রেল, নদীপথ এবং সমুদ্র বন্দর মংলা ও চট্টগ্রাম অবাধে ব্যবহার করতে পারবে। আরো ঘোষণা হয় যে সড়ক, সেতু ইত্যাদি অবকাঠামো তাদের ব্যবহারোপযোগী করার জন্যে ভারত বাংলাদেশকে একশো কোটি ডলার ঋণ দেবে। তবে প্রয়োজনীয় কাজগুলো করবেন ভারতীয় প্রকৌশলীরা তাদের নিজেদের যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ব্যবহার করে। সেসব কাজ থেকে বাংলাদেশের কোন অর্থনৈতিক লাভ হবে না, কিন্তু সেসব সড়ক, সেতু ইত্যাদির নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ভার বহন করতে হবে বাংলাদেশকেই।

কার স্বার্থে মাহমুদুর জেলে আর ইলিয়াস গুম

দু' হাজার এগারো সালে ভারত বাংলাদেশের গোমতি নদী এবং ১৪টি খালে বাঁধ তৈরি করে। ১৩৪ চাকার ট্রেইলারযোগে অস্বাভাবিক প্রশস্ত ও ভারী যন্ত্রপাতি ত্রিপুরা রাজ্যে নিয়ে যাওয়া হয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা স্থাপনের জন্যে। বাংলাদেশের পরিবেশের ওপর তার মারাত্মক ক্ষতির বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান এবং বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ইলিয়াস আলী। স্পষ্টতই তাঁরা একযোগে শেখ হাসিনা এবং ভারত সরকারের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ান। মাহমুদুর রহমান এখন কারাগারে নির্যাতিত হচ্ছেন। ইলিয়াস আলীকে এক বছরেরও বেশি আগে তাঁর গাড়ি থেকে ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া হয় গাড়ির চালকসহ্। তাঁরা দুজন কোথায় কিভাবে আছেন কে জানে?

তারপর থেকে বাংলাদেশের নদী ও সড়ক পথ ব্যবহার করে ভারতের এক অংশ থেকে অন্য অংশে পণ্য চলাচলের খবর প্রায়ই পাওয়া যায়। বিগত কয়েক দিনে খবর পাওয়া গেছে যে এক চালান খাদ্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাদেশের নদীপথ ও আশুগঞ্জ স্থল বন্দর ব্যবহার করে ত্রিপুরা রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। আরেকটা খুবই উদ্বেগজনক খবর এই যে বাংলাদেশের অনুরোধ কিংবা অনুমতি ছাড়াই ভারত নারায়ণগঞ্জে একটা কন্টেইনার টার্মিন্যাল নির্মাণের উদ্যোগ শুরু

করেছে। এটা কোন রকেট বিজ্ঞানের কথা নয় যে ভারতীয় পণ্য দিয়ে বাংলাদেশের বাজার সয়লাব করা এবং বাংলাদেশের শিশু শ্রমশিল্পের টুঁটি টিপে মারাই এই টার্মিন্যাল নির্মাণের লক্ষ্য।

বাংলাদেশের মানুষ প্রতিনিয়ত যা লক্ষ্য করছে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের প্রতিবেদনে এখন সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নেওয়া হলো: বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতি ভারতের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। একই আওয়ামী লীগের দুই সরকার, এক পিতা এবং এক পুত্রী। কিন্তু কি আকাশ-পাতাল তফাৎ পিতা পোকায় কাটা সার্বভৌমত্ব নিয়ে খুশি থাকতে রাজি ছিলেন না। তিনি তাজউদ্দিন আহমেদের স্বাক্ষরিত চুক্তি মেনে নিতে অস্বীকার করেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করতে ডাকসাঁইটে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকেও বাধ্য করেন। সম্ভবত সাত দফা চুক্তিতে সই করেছিলেন বলেই শেখ মুজিব তাজউদ্দিন আহমদকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করেছিলেন। অন্যদিকে গণবিচ্ছিন্ন শেখ হাসিনা গদি আঁকড়ে থাকার আশায় ভারতের স্বার্থকে বড়ো করে দেখছেন, সার্বভৌমত্বকে তিনি নয়া দিল্লির সরকারের কাছে বন্ধক রেখেছেন। বাংলাদেশের মানুষ এখন অবাক বিস্ময়ে ভাবছে স্বাধীনতার জন্যে অতো ত্যাগ স্বীকার করার কোন প্রয়োজন আদৌ ছিল কিনা।

লাল জুজু, ইসলামী সন্ত্রাস

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের প্রতিবেদনে সন্ত্রাস দমন বাবদ বর্তমান সরকারের প্রশংসা করা হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের কাছে সেটা মর্মঘাতী মনে হবে। মানবাধিকার সংস্থা অধিকার তাদের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলেছে স্বদেশে রাজনৈতিক হত্যাগুলোকে সরকার বিদেশে সন্ত্রাস দমন হিসেবে দেখাতে চায়। শাপলা চত্বরের গণহত্যার পরই পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মণি জাতিসংঘে গিয়েছিলেন। ১৯৩ সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের তিনি বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করেছেন যে আসলে সরকারের অভিযান ছিল ইসলামী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে।

ওয়াশিংটনে এবং যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু দেশগুলোতে এই অপপ্রচারের বহু ইচ্ছুক খদ্দের আছে। তার কারণও আছে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে স্নায়ু যুদ্ধে মার্কিন সমরাস্ত্র নির্মাণ শিল্প ফেঁপে-ফুলে ওঠে। ক্ষুদ্রতর দেশগুলোকে লাল জুজুর ভয় দেখিয়ে সম্পূর্ণ বিনা প্রয়োজনে শত শত কোটি ডলারের সমরাস্ত্র কিনতে বাধ্য করা হয়। এ শিল্প মার্কিন ধনতন্ত্রের খুঁটি হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৮৯ সালে আকস্মিকভাবে সোভিয়েত সাম্রাজ্য ভেতর থেকে ধসে পড়লে সমরাস্ত্র নির্মাতারা প্রমাদ গুনেছিল। তাদের পোষা বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীগুলো (থিংকট্যাঙ্ক) এবং সমরাস্ত্র নির্মাতাদের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া তখন ইসলামকে পশ্চিমী ধনতন্ত্রের পরবর্তী শত্রু রূপে চিহ্নিত করে প্রচার শুরু করে। নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে আল কায়েদাদের ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী আক্রমণের (নাইন-

ইলেভেন) পর ইসলাম নামটাই মার্কিন জাতি ও তাদের মিত্রদের আক্রমণের টার্গেট হয়ে দাঁড়ায়। এখন মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম স্বৈরশাসকরাও আরব বসন্তের আতঙ্কে হাজার হাজার কোটি ডলার সমরাস্ত্র কিনছেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। ইসলাম নামে মার্কিন জাতির রক্তে আগুন ধরে। শেখ হাসিনার সরকার যখন দাবি করে যে তারা ইসলামী সন্ত্রাসীদের খতম করছে তখন মার্কিন জাতি ও মিত্ররা কিছুটা হলেও আশ্বস্ত বোধ করে। যবনিকার অন্তরালে যে অস্ত্র নির্মাতারা খুশিতে আটখানা হয়ে উঠছে সে খবর রাখার প্রয়োজন কেউ বোধ করে না। প্রকৃতপক্ষে সন্ত্রাস দমনের দাবির আড়ালে এই সরকার যে তাদের রাজনৈতিক বিরোধীদেরই গণহত্যা চালাচ্ছে সেটা বিবেচনা করার ধৈর্য মার্কিন জাতি কিংবা মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের নেই।

ওয়াশিংটনের চীনা জুজু

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র নীতি ভারতের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় ওয়াশিংটনের বিশেষ কিছু স্বার্থ আছে। পঞ্চাশের দশকে যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঘিরে একটা বলয় শক্তি বলয় গঠন করেছিল। সোভিয়েত-উত্তর যুগে তারা সে রকমেরই একটা সৃষ্টি করছে চীনকে ঘিরে। এ ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে আমেরিকার স্বার্থ অভিন্ন। চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠতা প্রতিরোধে ওয়াশিংটন সত্যি সত্যি সচেষ্ট।

এদিকে বাংলাদেশে এখন মানুষের জীবনের কোন মূল্য নেই। সরকার মনে করে দেশে মানুষ আছে শুধুমাত্র তাদের গদি দেবার এবং সে গদিতে থিতু রাখার প্রয়োজনে। বাংলাদেশের পুলিশ বিভাগের এবং অধিকারের হিসেবে দেখা যাচ্ছে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের চার বছর পাঁচ মাসে বাংলাদেশে খুন হয়েছে ১৮২৮৯ জন। এর মধ্যে রাজনৈতিক হত্যা হয়েছে ১০৮২ টি। বিচারবহির্ভূত হত্যা হয়েছে ৬৫২টি। সাংবাদিক খুন হয়েছে ১৭ জন। গুম করার ঘটনাও ঘটেছে অনেকগুলো। এর মধ্যে আছেন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ইলিয়াস আলী, ঢাকার ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার চৌধুরী আলম এবং বিএনপি ও অন্যান্য বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা।

সরকারের হাতে ক্ষমতা আছে, তাদের কূটনীতিকরা আছেন, দরিদ্র জাতির অর্থে পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মণি কথায় কথায় বিদেশ সফরে যাচ্ছেন, দেশে আছে তাদের মিডিয়া। ভিন্ন মত প্রকাশের সকল চ্যানেল এখন অবরুদ্ধ। সুতরাং তারা বিদেশীদের যা খুশি তাই বোঝাতে পারেন। অন্যদিকে দেশে আছে মানুষ। এ সরকারের ভাগ্য নির্ধারিত হবে তাদের আদালতে।– স্টেট ডিপার্টমেন্টে কিংবা জনতার মঞ্চে নয়।

(লন্ডন, ০৪.০৬.১৩)

দেশের নেতৃত্ব ভার গ্রহণে তারেক রহমান সম্পূর্ণ প্রস্তুত

বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। আমাদের দুর্ভাগ্য, বিবিসি থেকে আমরা তাঁর বক্তৃতার রেকর্ডিং সংগ্রহ করতে পারিনি। কিন্তু আমি ফরাসি রেডিও-এর কাছ থেকে তার রেকর্ডিং সংগ্রহ করেছি। অবশ্য যারা বিএনপি-র বিরুদ্ধে তারা ওটা আর স্বীকার করবেন না। তারা বলেন যে শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চ তারিখে বক্তৃতায় স্বাধীনতার কথা বলেছেন। তা তিনি বলেছেন ঠিকই কিন্তু পরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন যেন খুব শীঘ্রই জাতীয় সংসদের বৈঠক ডাকা হয় এবং তাঁকে পাকিস্তানের প্রাতিষ্ঠানিক প্রধানমন্ত্রী করা হয়। এবং তারও আগে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার কথাটা সর্বপ্রথম উচ্চারণ করেছিলেন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। আর আমরা এটা জানি বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের জনক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। কেননা, তিনি খুলে বলেছিলেন আমরা বাঙালী জাতীয়তাবাদী নই। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী। অবশ্য তার আগেও এটা আমি বলবো যে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বিষয়টি তাঁর কাজে শেখ মুজিবুর রহমানও দেখিয়েছেন। আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, তাজউদ্দিন সাহেব ১৯৭১ সালে আশ্রিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভারতের সঙ্গে ৭ দফা চুক্তি করেছিলেন। সে চুক্তিতে কথা ছিল যে দেশ স্বাধীন হলে বাংলাদেশের নিজস্ব কোন পররাষ্ট্র নীতি থাকবে না। বাংলাদেশের নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী থাকবে না। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ করবে ভারত। এবং আরো বলা হয়েছিল বিডিআর-কে ভেঙ্গে দিতে হবে এবং বিডিআরের পরিবর্তে ভারতীয় বি এস এফ বাহিনীর তত্ত্বাবধায়নে একটা বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড বাহিনী গঠন করা হবে। কিন্তু তারপরে আপনারা দেখুন, শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান থেকে ছাড়া পেয়ে যখন বাংলাদেশে গেলেন তখন বাংলাদেশের সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে। আমার মনে আছে, সে বছরের এপ্রিল মাসেও (১৯৭২ সালে), আমি যখন স্বাধীন বাংলাদেশে যাই আমি চাঁটগাঁ যাচ্ছিলাম সড়ক পথে, বিভিন্ন জায়গায় দেখা হলো ভারতীয় সেনাবাহিনীর লেফটেনেন্ট কর্নেল ভগতের সঙ্গে, তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন আমার কোন অসুবিধা

হচ্ছে কি না। যাই হোক, শেখ মুজিবুর রহমান ৭ দফা চুক্তি মেনে নেননি। তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে চলে যেতে বাধ্য করেন। এরপর তাঁকে ৭ দফা চুক্তি রাজি করানোর জন্য ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকা পর্যন্ত এসেছিলেন। কিন্তু মুজিব তাতে রাজি হননি। তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সরিয়ে দিয়েছিলেন, বাংলাদেশের স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি গঠন করেছিলেন, বিডিআর বাহিনী তিনি ভেঙে দেননি। কাজেই আমি তাঁকে একজন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী বলবো। তাঁরপরেও উনি যখন বাকশাল করলেন, কতিপয় সেনা কর্মকর্তা বিদ্রোহ করে তাকে হত্যা করেছিল এবং তারপরে যিনি রাষ্ট্রপতি হলেন, তিনি খন্দকার মোশতাক আহমেদ। শেখ মুজিবের হত্যায় ভারতীয়রা মনে মনে কিন্তু খুশীই হয়েছিল। কারণ, মুজিবুর রহমান যে একটা জাতীয়তাবাদী অবস্থান নিয়েছিলেন, তাতে ভারতের উদ্দেশ্য সাধন হয়নি। তারা আশা করেছিল পরবর্তী যিনি আসবেন তিনি হয়তো ভারতের ওপর বেশী নির্ভরশীল হবেন। কিন্তু খন্দকার মোশতাক তা প্রত্যাখান করেন। ভারত তাড়াতাড়ি তা বুঝে গিয়েছিল। কাজেই তার প্রতি তারা নাখোশ হয়েছিল। এরপর দেখা গেল মোশতাকের বিরুদ্ধে একটা সামরিক অভ্যুত্থান হলো যাতে খালেদ মোশারফ নেতৃত্ব দেন। সেদিন দিল্লির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়েছিল। বিবিসিতে সে সংবাদ আমি প্রচার করেছিলাম। সেটাকে ব্যাপকভাবে মনে করা হতো সে অভ্যুত্থান ভারতের অনুকূলে হয়েছিল এবং ভারতের অনুপ্রেরণায় সেটা সংগঠিত হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জওয়ানরা যারা মুক্তিবাহিনীর আদর্শের অনুসারী ছিল, তারা তাকে মেনে নিতে পারেনি। কয়েকজন সেনা কর্মকর্তাও তাদের সঙ্গে ছিলেন। খালেদ মোশারফ পালিয়ে ভারত চলে যাবার সময় সিপাহিরা তাকে ধরে ফেলে এবং গুলি করে হত্যা করে। তারপর এই সিপাহিরাই গৃহবন্দী দশা থেকে মুক্ত করে জিয়াউর রহমানকে সেনা সদর দপ্তরে ফিরিয়ে আনেন। এই হচ্ছে ব্যাপার। এখন, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ আর বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাঙালি জাতীয়তাবাদ কি করে হতে পারে? বাঙালি সংস্কৃতি হতে পারে। কিন্তু জাতীয়তাবাদ বিমান বন্দরে আপনাকে যখন Nationality জিজ্ঞেস করে, তখন আপনি বলেন বাংলাদেশী অথবা বৃটিশ। বাঙালি তো বলেন না। ভারতে আমার বহু বন্ধু বান্ধব আছেন। তারা নিজেদেরকে বাঙালি বলেন না। তারা নিজেদেরকে ইন্ডিয়ান বলেন। তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদ আমাদের মধ্যে কোথা থেকে আসতে পারে? সে মোহটা ভঙ্গ করে দিয়েছেন জিয়াউর রহমান। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ দর্শন মানেই জিয়াউর রহমান।

জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। আমি প্রথম বার তার সাক্ষাৎকার নিতে যাই ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। তখন কর্নেল

ওলি ছিলেন তাঁর Personal Secretary. তিনি টেপ রেকর্ডার টা কর্নেল ওলির হাতে দিয়ে বলেন, Oli, you have to look after Mr Rahman's tape recorder. Guard it with your life. It is as important to him as a Rifel to you. তারপরে উনি বললেন, আপনার সাথে আমি কিছু কথা বলতে চাই। ভাব বিনিময় করতে চাই। আমরা দীর্ঘক্ষণ কথা বলেছিলাম, তার সার কথা খুব সহজ। তিনি গোড়াতেই বাংলাদেশের সমস্যাগুলো নিয়ে বলেছিলেন।

বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সেনা সদস্যদের নিয়ে জাতীয় সেনা বাহিনী গঠন করা হয়েছে। কিন্তু এতে আওয়ামী লীগ সদস্যরা এসে রক্ষী বাহিনী করলো। জাতীয় সেনাবাহিনীর সৈনিকদের ইউনিফর্ম নাই, বুট নাই। কিন্তু সব আধুনিক সরঞ্জাম রক্ষী বাহিনীকে দেয়া হয়েছে। এই রক্ষী বাহিনী এবং জাতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে টানাপোড়েন ছিল। তারপর পাকিস্তানে যেসব বাংলাদেশী সেনা কর্মকর্তা বন্দী হয়েছিলেন, তারা এসে দেখলেন তাদের জুনিয়ররা তাদের সিনিয়র হয়ে গেছেন, সেখানেও একটা টানাপোড়েন শুরু হলো। বাইরের কিছু লোক সমস্যাটাকে আরো জটিল করে তোলে। কর্নেল তাহের তাদের মধ্যে একজন– তারা বলছিলেন বাংলাদেশে কোন সেনাবাহিনী থাকার দরকার নেই। শুধু একটা ভলান্টিয়ার সেনাবাহিনী থাকবে। গণচীনের মতো। গণচীনে তখন ভলান্টিয়ার বাহিনী ছিল। এখন আর নেই। জিয়া তখন বললেন যে, সেনাবাহিনীতে এসব নিয়ে বড় একটা সমস্যা আছে। সেনাবাহিনীতে 'Chain of command' পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা জরুরি। তারপর, তিনি বলেছিলেন, আরো একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধ কে করেছে, কে করেনি তা নিয়ে সংশয়। কেউ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল, কেউ ছিল না। যারা মুক্তিযুদ্ধ করেনি, স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল, তারা তো তখন ভুল করেছিল। এখন তো তারা এখানে আছে। এদেরকে যদি আমি জাতীয় জীবনে সম্পৃক্ত না করি, তবে এরা যাবে কোথায়? উনি আমাকে বললেন, আপনি তো বিলেতে থাকেন, আপনি কি বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে বলে দেখবেন তারা এদের নেবে কিনা? আর যখন কেউ নেবে না তখন আমি কি করবো? আমি কি তখন এদের সকলকে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিয়ে আসবো? তা যদি না পারি, তাহলে প্রতি মুহূর্তে আমাকে আমার পিঠ পাহারা দিতে হবে। পিঠে কে কখন ছুরি বসায়। তার চেয়ে ভালো হবে যদি আমরা তাদেরকে জাতীয় জীবনে সম্পৃক্ত করি। আমরা সকলে মিলেমিশে এক জাতি হয়ে যাই। এদেশে বহু সমস্যা, সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করবো। তারপরে উনি আমাকে বলেছিলেন, আমি জানি বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্র চায়। আমরা জানি, শেখ মুজিবুর রহমান পত্রিকা বন্ধ করে দিয়ে ভুল করেছেন। আমি খুব শীঘ্রই পত্রিকাগুলোর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে চাই। বাকশাল করে

সবগুলো রাজনৈতিক দলকে বেআইনী করে দেয়া হয়েছিল, আমি সবগুলো রাজনৈতিক দলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র যথাসত্ত্বর চালু করার জন্যে আমি বিশেষজ্ঞদের সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু করে দিয়েছি। তিনি আরেকটি বড় সমস্যার কথা বললেন, শিক্ষিত বেকারদের নিয়ে। দেশ ছোট জনসংখ্যা বিরাট। শিক্ষিতরা লেখাপড়া শেষ করে আশা করেছিল তারা ভাল চাকুরী পাবে। কিন্তু এখন যে অবস্থা আছে, আমি তাদেরকে চাকুরী দিতে পারছি না। এদেরকে যদি আমি জাতীয় জীবনে এবং গঠনমূলক কাজে না লাগাতে পারি, তবে এরা বিদ্রোহ করবে। দেশ রক্ষার্থে আপাতত এগুলোই প্রধান কাজ। জিয়াউর রহমানের অর্জন আপনরা সবাই জানেন। তিনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বইটিতে জিয়াউর রহমান ছাড়াও তারেক রহমানের কথা আছে। তারেক রহমান সারাজীবন জাতীয়তাবাদী দর্শন পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে আমি ১৯৯৯ – ২০০০ সাল থেকে ভালোভাবে জানা শুরু করি। তখন তিনি তৃণমূল পর্যায়ে সাংগাঠনিক কাজ করেছিলেন। তিনি দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে আবার জনকল্যাণমূলক কাজে সম্পৃক্ত করেছেন নিজেকে। তারপরে উনার হাওয়া ভবন নিয়ে, উনি কাজ করেছেন, রাজনীতি নিয়ে কাজ করলে শুধু হবে না, রাজনীতি নিয়ে গবেষণামূলক কাজ করতে হবে। গবেষণা ভিত্তিক এবং তৃণমূলকে নিয়ে যে রাজনীতি করা হয়, তারেক রহমান সে রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন। ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে আমরা তার সুফল দেখেছি। তার সাংগঠনিক দক্ষতা সম্পর্কে তখন আমি বেশী করে অবগত হয়েছি। এখন, বাংলাদেশের সমস্যা নিয়ে প্রতিদিন আমরা পড়ছি ও উদ্বিগ্ন হচ্ছি। প্রশ্ন হচ্ছে এই সমস্যা মোকাবিলা করতে তারেক রহমান প্রস্তুত কি না। আমি মনে করি, দেশের নেতৃত্ব ভার গ্রহণে তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

(২১ জুন ২০১৩ লন্ডনে আখতার মাহমুদের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও তারেক রহমান শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির দেয়া ভাষণে)

আওয়ামী লীগের কোন দুর্গ নেই বাংলাদেশে

গাজীপুর আওয়ামী লীগের ভোটদুর্গ, বিগত কিছুদিন এ কথাটা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হবার উপক্রম হয়েছিলো। অবশ্যই অতীতের আওয়ামী লীগ থেকে বর্তমান আওয়ামী লীগের দূরত্ব হাজার যোজন। বর্তমান সরকার ও শাসক দলটি শুধুমাত্র জনরোষেই পড়েনি জাতির শত্রুতে পরিণত হয়েছে তারা। এবং এ কথাও সত্যি জাতি-বিরোধী শক্তির দুর্গগুলো যে তাসের ঘরের মতো খসে পড়ে ইতিহাসে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

রোববার ৭ জুলাই ভোর হবার আগেই গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের ফলাফল প্রচার হয়ে যায়। কিন্তু রোববারে প্রকাশিত একখানি নেতৃস্থানীয় পত্রিকায় আওয়ামী লীগের সমর্থক কলামিস্ট একথা ধরে নিয়েই লিখেছেন যেন এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগেরই জয় হয়েছে এবং এ দলের সমর্থিত প্রার্থী এডভোকেট আজমত উলাহ্ খান মেয়র নির্বাচিত হয়েছে। অথচ ঘোষিত হয়েছে এবং সারা বিশ্ব ততোক্ষণে জেনে গেছে যে বিএনপি ও ১৮ দল সমর্থিত অধ্যাপক এম এ মান্নান বিপুল ভোটাধিক্যে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। এবং অধিকাংশ কাউন্সিলার পদেও নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীরা।

আওয়ামী লীগ নেতারা এবং তাঁদের সমর্থক ও প্রচারবিদরা আত্মপ্রতারণা করেছেন- শুধুমাত্র একথা বললেই কি এর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে? প্রকৃত কারণ বুঝতে হলে আরো গভীরে যেতে হবে। বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী ও সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে বেদম মার খেয়েছে আওয়ামী লীগ। সে সঙ্গে চুন-কালি লেপে গেছে সরকারেরও গালে। চারটি সিটিতেই মেয়র এবং অধিকাংশ কাউন্সিলার নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীরা, এবং জয়ী হয়েছেন বিপুল গরিষ্ঠতা নিয়ে। মন্ত্রীরা এই শোচনীয় পরাজয়ের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আবোল-তাবোল বকছেন। আওয়ামী লীগের কর্মী এবং যে কয়জন সমর্থক এখনো অবশিষ্ট আছেন তাঁরা সকলেই ভয়ানক হতোদ্যম হয়ে পড়েছেন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে দেখা গেছে যে দেশে আওয়ামী লীগের সমর্থন (কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকার ভাষায়) তলানীতে ঠেকেছে। অনেকেই বলাবলি শুরু করেছেন জনসমর্থন নেই জেনেই সরকার নিরপেক্ষ এবং নির্দলীয় সাধারণ নির্বাচনে রাজি হতে অস্বীকার করছে।

সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো যে অন্তত নতুন সৃষ্ট গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে যে কোন মূল্যে তাদের জয়ী হতেই হবে। সেজন্যে কোন আয়োজনের ত্রুটি রাখেনি তারা। বিরোধী দলগুলোর বহু নেতাকর্মীকে ধরপাকড় করা হয়েছে। শিবিরের আটজন নেতাকে আগেই গুম করে ফেলা হয়েছিলো। এমনকি আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী জাহাঙ্গীরকে গুম করা নিয়ে জটিল একটা নাটক সৃষ্টি করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের ৭২ জন সংসদ সদস্য দিনের পর দিন গোটা নির্বাচনী এলাকা চষে বেড়িয়েছে। এমনকি সরকারি কর্মচারী ও পুলিশকেও আজমতের পক্ষে ভোট ক্যানভাসে পাঠানো হয়েছে। দিনের পর দিন খবর পাওয়া গেছে যে চষা ক্ষেতে ধানের বীজ ছড়ানোর মতো করে টাকা ছড়ানো হয়েছে ভোট ক্রয়ের উদ্দেশ্যে। বিচিত্র নয় যে উক্ত খ্যাতিমান কলামিস্ট ধরেই নিয়েছিলেন সরকারের এতোসব 'প্রস্তুতির' পরে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীরা জয়ী হতে বাধ্য।

এ নির্বাচনও সুষ্ঠু কিংবা অবাধ হয়নি

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়েছে– অন্তত ভোটের দিন কোন খুনখারাপি হয়নি - সেটা স্বস্তির কথা। তাই বলে নির্বাচন সুষ্ঠু কিম্বা অবাধ হয়েছে কিছুতেই বলা যাবে না। ভোট গ্রহণ শেষ হবার আগে থেকেই খবর আসতে থাকে যে আজমত উলাহ খানের সমর্থকদের বিপুলসংখ্যক ব্যালট দেওয়া হয়েছে এবং ছয়টি ভোট কেন্দ্রের দরোজা বন্ধ করে তাঁরা ভুয়া ভোট দিয়েছেন। টঙ্গীতে সরকারের সমর্থকরা ভোট গণনায় বাধা দিয়েছেন, গুলি-গোলা চলেছে সেখানে। নির্বাচনী কর্মকর্তারা যে হারে ভোট পড়েছে বলে ঘোষণা দিয়েছেন মোট ভোটার সংখ্যার সে হিসেবের চাইতে দেড় থেকে দুই লাখ বেশি ভোট পড়েছে বলে দেখা যাচ্ছে। এই বাড়তি ভোটগুলো কোত্থেকে এলো সে রহস্য রীতিমতো উদ্বেগের ব্যাপার। সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী যে আরো অনেক কম ভোট পেতেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বিগত কিছুদিনে আরো কয়েকটি মিউনিসিপ্যালিটিতেও নির্বাচন হয়েছে। ফলাফলে দেখা যাচ্ছে সর্বত্রই আওয়ামী লীগের সমর্থিত প্রার্থীরা বিপুল ভোটে হেরে গেছেন। বাংলাদেশে এখন শাসক দলের নৌকাডুবি চলছে মড়ক-মহামারীর মতো। ভাষ্যকার ও বিশ্লেষকরা কারণ বিশ্লেষণের চেষ্টা করছেন। আওয়ামী লীগের সর্বব্যাপী দলীয়করণ ও আত্মীকরণ, জেল-জুলুম আর হত্যাকাণ্ড দিয়ে রাজনৈতিক বিরোধিতা স্তব্ধ করে দেবার চেষ্টা, শেখ মুজিবের বাকশালী শাসনের মতো গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালনে ষোলোআনা ব্যর্থতা, ভারত তোষণ এবং ভারতকে খুশি করার জন্যে সংখ্যাগুরুর ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, এবং হিমালয় পর্বতের মতো আকাশচুম্বী দুর্নীতি আওয়ামী লীগের ভরাডুবি অনিবার্য করে তুলেছিলো।

শেয়ার বাজার লুণ্ঠনে যে ৩৫ লাখ মানুষ সর্বস্ব হারিয়েছেন, আওয়ামী লীগের ক্যাডার ও অঙ্গ সংগঠনগুলোর তস্করতায় যাঁরা প্রাণ কিম্বা সম্পত্তি হারিয়েছেন, বিদেশী পৃষ্ঠপোষকদের মনোরঞ্জনের জন্যে যেসব ধর্মপ্রাণ মুসলমান নির্যাতিত ও নিপীড়িত হয়েছেন, বিচারের নামে সরকারের প্রতিহিংসা যাঁদের বিরুদ্ধে ধাবিত হচ্ছে, শাপলা চত্বরের গণহত্যায় যাঁদের জীবন প্রদীপ অকস্মাৎ নিভে গেছে এবং সাধারণভাবেই সরকারের দুর্নীতি ও ব্যর্থতার ফলে যাঁদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকেরই নিশ্চয়ই বহু আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু ও শুভকামী আছেন। শেখ হাসিনার সরকারের প্রতি অবশ্যই তাঁরা প্রসন্ন নন। একরোখা ও গোঁয়ার অপদার্থ সরকার সেকথা ভেবে দেখেনি। তাঁদের সকলকে বাদ দিলে দেশে শেখ হাসিনার সরকার কিম্বা আওয়ামী লীগের সমর্থক বেশি থাকার কথা নয়।

ওরা সে জন্যেই বাকশাল চায়

এই নৈরাজ্য, এই অরাজকতাকে জিইয়ে রাখতেই তারা বাকশালী শাসন ফিরিয়ে আনতে চায়। সেজন্যেই তারা নিজেদের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন করে আবারো ভোট ডাকাতি করতে চায়। অন্যদিকে দেশের মানুষ চায় আওয়ামী শাসনের কাল-রাত্রির অবসান করে দেশে সত্যিকারের গণতন্ত্র এবং সুশাসন ফিরিয়ে আনতে। তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি ফিরিয়ে আনার দাবির প্রতি প্রায় সার্বজনীন সমর্থন সেজন্যেই।

বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী ও সিলেট সিটি কর্পোরেশনের পর গাজীপুরেও ভরাডুবিরতে মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের নেতাদের প্রতিক্রিয়া কৌতুককর। অবশেষে তাঁরা আবিষ্কার করেছেন যে সরকারে ও দলে 'কিছু ভুলভ্রান্তি' ছিলো। কেউ কেউ ভুল স্বীকার করে আরো এক মেয়াদে ক্ষমতা চাইছেন। কিন্তু তাঁরা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। সাড়ে চার বছর ধরে অন্যায়-অবিচার আর দুর্নীতি তাঁরা মুখবুঁজে সহ্য করেছেন। হয়তো·নিজেদের দুর্নীতিও ধরা পড়ে যাবার ভয়ে তাঁরা মুখ খোলেননি। বিকৃত মস্তিষ্ক নেতৃত্বের সকল অন্যায় তাঁরা নীরবে সহ্য করে গেছেন। শাসক মহল থেকে বলাবলি হচ্ছে 'নেত্রী' (প্রমোদ ভ্রমণ থেকে) দেশে ফিরে এলে দলের আত্মজিজ্ঞাসা শুরু হবে। কিন্তু কিসের সে আত্মজিজ্ঞাসা?

এতোকাল যাঁরা মুখ বুঁজে ছিলেন মুখ খুলে নেত্রীকে চ্যালেঞ্জ করার সৎ সাহস তাঁদের কয়জনের হবে? অথচ সাড়ে চার বছরের সকল অন্যায় আর সকল অবিচারের জন্যে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী সেই নেত্রী। আওয়ামী লীগের অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দিয়েছে এখন। ঐতিহাসিক এই দলটিকে টিকিয়ে রাখতে এবং পুনরুজ্জীবিত করতে এখন প্রয়োজন এই ব্যক্তিকে নেতৃত্ব থেকে এবং বাকশালী

চিন্তাকে মগজ থেকে নির্বাসিত করা। সেটা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। দীর্ঘকাল ধরে স্বৈরতন্ত্রের কাছে নতি স্বীকার করে দলের নেতাদের মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে গেছে। তাঁরা আর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারবেন বলে ভরসা হয় না।

প্রদীপ নেভার আগের শেষ দপদপানি?

এখন সকলেই জানেন যে পিতৃ-মাতৃ-হত্যার জন্যে তিনি বাংলাদেশের মানুষের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছেন। বিন্দুমাত্র দেশপ্রেমও শেখ হাসিনার হৃদয়ে থাকলে তাঁর উচিত হতো অবিলম্বে তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি ফিরিয়ে এনে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা। কিন্তু আগেই বলেছি, তিনি ক্ষমতা ছাড়তে নারাজ অথচ দেশের মানুষ তাঁকে ও তাঁর দলকে শত্রু মনে করে। এমতাবস্থায় সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে শেখ হাসিনা কিছুতেই রাজি হতে পারেন না। গত বৃহস্পতিবার ৪ জুলাই সে কথা তিনি আবার বলে দিয়েছেন। সেদিন শেষ বিকেলে তিনি লন্ডনে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম হেগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মিঃ হেগ বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীকে সকল দলের গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করা এবং সে লক্ষ্যে সংলাপ শুরু করার পরামর্শ দেন। সরকারিভাবে এই বৈঠকের জন্যেই শেখ হাসিনা রাষ্ট্রের ব্যয়ে ৪৩ জন চেলাচামুণ্ডা নিয়ে বৃটেনে এসেছিলেন। অথচ এই একই পরামর্শ ব্রিটিশ সরকার, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন সরকারসহ বহু মহল অজস্রবার শেখ হসিনাকে দিয়েছেন। পুরাতন পরামর্শ নতুন করে নেবার জন্যে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর দরিদ্র দেশের বিপুল সম্পদ ব্যয় করে এতোদূর আসার প্রয়োজন ছিলো না।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এবারের পরামর্শও শেখ হাসিনা শোনেননি। তিনি নাকি মিঃ হেগকে বলে দিয়েছেন যে ব্রিটিশ পদ্ধতিতে (শাসক দলের অধীনে) বাংলাদেশের নির্বাচন হবে। কিন্তু শেখ হাসিনা ভুলে যাচ্ছে রইশ্যার নানী ভনিতা করলেই তিনি রাণী রাশমনি বলে স্বীকৃতি পাবেন না। তিনি ভুলে যাচ্ছেন যে ব্রিটিশ গণতন্ত্র আর নির্বাচন পদ্ধতির ঐতিহ্য হাজার বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং জনসাধারণের সংযত আচরণের ফল। বাংলাদেশে গণতন্ত্র যে এখনো শেকড় গজাতে পারেনি এবং নির্বাচন পদ্ধতিও ত্রুটিমুক্ত নয় তার জন্যে শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ অনেকখানি দায়ী। বাকশালী পদ্ধতি চালু করে শেখ মুজিব গণতন্ত্রকে হত্যা করেছিলেন। শেখ হাসিনা দফায় দফায় সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে ক্ষমতা পেতে চেয়েছেন। এসব কারণেই গণতন্ত্র শেকড় গজাতে পারেনি, গণতন্ত্রের ভিত মজবুত হতে পারেনি। সাময়িক সুবিধা মতো কখনো তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি কখনো এ পদ্ধতি-সে পদ্ধতি নিয়ে লুকোচুরি খেলা খেলতে গিয়ে তিনি নিজেরই বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর খেয়ালখুশি মতো নির্বাচনের ওপর দেশের মানুষ আর আস্থা স্থাপন করতে পারছে না।

লন্ডন থেকে শেখ হাসিনা গেছেন তিন দিনের সফরে বেলারুসে। সেখানে নাকি তিনি সামরিক ও যোগাযোগ যন্ত্রপাতি ক্রয়চুক্তি নিয়ে আলোচনা করবেন। বেলারুস ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। জনসংখ্যা বড়জোর ঢাকা মহানগরীর সমান হবে। সমরাস্ত্র উৎপাদন ও রফতানির জন্যে তার সুনাম নেই। সে দেশ থেকে কিছু যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ব্যাপরে আলোচনা করার জন্যে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীকে কেন সশরীরে তিন দিনের সফরে যেতে হবে সাধারণ বুদ্ধিতে কুলায় না। তবে একটা ব্যাপারে বেলারুস সরকার আর শেখ হাসিনার রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণায় কিছু সমতা আছে। বেলারুস একমাত্র অবশিষ্ট স্ট্যালিনপন্থী দেশ। প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কা আজীবন রাষ্ট্রপতি। ১৯৯৪ সাল থেকে তিনি স্বপদে বহাল আছেন।

এখন কী করবেন শেখ হাসিনা?

অবশ্য রাষ্ট্রের ব্যয়ে ৪৩ জন সাঙ্গপাঙ্গো নিয়ে শেখ হাসিনার আট দিনের ইউরোপ সফরের প্রকৃত কারণ কারো অজানা নেই। বোনঝি এবং শেখ রেহানার কন্যা টিউলিপ সিদ্দিকের বিয়ের সংবর্ধনায় যোগ দিতেই তিনি এসেছিলেন। কিন্তু আজকাল দেশে কিম্বা বিদেশে যেখানেই তিনি যান সর্বত্রই তিনি দেখতে পান যে বাংলাদেশীরা তাঁর বিরুদ্ধে চলে গেছে। ৪ জুলাই যুক্তরাজ্য বিএনপির নেতাকর্মীরা পার্ক লেন হিল্টন হোটেলের সামনে বিরাট প্রতিবাদ মিছিল করেছিলেন। বাধ্য হয়ে পেছনের দরোজা দিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে হোটেলে ঢুকতে হয়েছিলো। রোববার (৭ জুলাই) পূর্ব লন্ডনের একটা সুপরিসর অনুষ্ঠান কেন্দ্রে টিউলিপের বিয়ের সংবর্ধনার বাইরেও বিশাল জনতা প্রতিবাদ জানাতে হাজির ছিলো। ফলে হাসিনার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে বিলম্ব হয়েছিলো। অনুষ্ঠানে তিনি যখন গৌরি চৌধুরী আর হীমাংশু গোস্বামীর গান শুনছিলেন বাইরে তখন তাঁর এবং তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে শ্লোগান চলছিলো।

শেখ হাসিনার এই গোঁয়ার্তুমির কারণে বাংলাদেশের সরকার বিরোধী রাজনীতিকদের সামগ্রিক পরিস্থিতি নতুন করে এবং জরুরিভাবে ভাবতে হবে। বিরোধী দলগুলোর ঢিলে-ঢালা প্রতিবাদ বহাল থাকলে তিনি গায়ের জোরে তাঁর নিজের হেফাজতেই নির্বাচন ঘোষণা করবেন। একবার ঘোষণা হলে বিরোধী দলগুলো যদি বাধা দিতে চায় হাসিনা খুব সম্ভবত কোন না কোনভাবে ক্ষমতা সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করবেন অথবা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে গদি আঁকড়ে থাকবেন। বিরোধী দলগুলো যদি তাঁকে আরো কিছুদিন সময় দেয় তাহলে তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের আশা অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের জন্যে ভুলে যেতে হবে।

(লন্ডন, ০৯.০৭.১৩)

জামায়াত কি ডুবন্ত ভাঙ্গা নৌকায় চড়তে রাজি হবে?

জামায়াতের নীতি-নির্ধারক পর্যায়ের তিন নেতা ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক, কর্মপরিষদ সদস্য ও সাবেক এমপি ড. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের এবং এডভোকেট মতিউর রহমান গত ৭ জুলাই রোববার সন্ধ্যোয় ভারপ্রাপ্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন। একই সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীও সে চায়ের মজলিসে আমন্ত্রিত ছিলেন। স্বভাবতঃই এই চায়ের আসর নিয়ে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে। বলাবলি হচ্ছে যে জামায়াতের সঙ্গে নতুন একটা আঁতাত করতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ। সেসব জল্পনা আরো গভীর হয়েছে এ কারণে যে পরের দিন সাবেক সামরিক ডিক্টেটর এবং বর্তমানে জাতীয় পার্টির মূল অংশের নেতা লে. জে. হোসেন মুহম্মদ এরশাদকে নৈশভোজে আপ্যায়িত করেছেন উপরোক্ত মার্কিন কূটনীতিক।

কূটনীতিকরা স্বাগতিক দেশের রাজনীতিক থেকে শুরু করে সে সমাজের বহু স্তরের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। এটা প্রচলিত এবং স্বীকৃত রীতি। রাজনীতিকরাও নিজেদের নীতি ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে কূটনীতিকদের অবহিত করতে চান। এটাও স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক হচ্ছে এ দুটো মজলিস হয়েছে এমন সময় যখন বাংলাদেশের রাজনীতির সঙ্কট এবং আসন্ন সাধারণ নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা একটা শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় আছে। এবং প্রশ্ন উঠেছে, আমেরিকা কি বিএনপিকে পাশ কাটিয়ে সাধারণ নির্বাচন করার প্রস্তুতি হিসেবে জামায়াতকে ১৮ দলীয় জোট থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে?

আরো কিছু কারণ ঘটেছে এই শিশু রাষ্ট্রটির স্বল্পদৈর্ঘ্য ইতিহাসে। সাত বছর আগে তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে উৎখাৎ করার জন্যে লাগাতার সন্ত্রাসী আন্দোলন সৃষ্টি করে, যদিও সে পদ্ধতি চালু হয়েছিলো ১৯৯৫ – ৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতের সম্মিলিত আন্দোলনের জের ধরে। ২০০৬ সালের আন্দোলনের পরিকল্পনা অনেক আগেই করা হয়েছিলো কিনা বলা কঠিন। কিন্তু তার কয়েক মাস আগে থেকেই ভারতের

হাইকমিশনার বীণা সিক্রি এবং মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস অস্বাভাবিক এবং সন্দেহজনক রকম ঘন ঘন বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদের সঙ্গে বৈঠক এবং শলাপরামর্শ করছিলেন। বীণা সিক্রি এতো ঘন ঘন সুধা সদনে যাতায়াত করছিলেন যে তিনি সে ভবনটির ভাড়াটে বলে ভুল হতে পারতো।

এই দুই রাষ্ট্রদূত, ঢাকার প্রথম আলো পত্রিকার সম্পাদক মতিউর রহমান ও ডেইলি স্টার পত্রিকার সম্পাদক মাহফুজ আনাম এবং তৎকালীন সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদ আওয়ামী লীগের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের যোগসাজশে এমন একটা জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন যে বাংলাদেশের রাজনীতি এখনো তিক্ততা ও ১৯ এপ্রিল প্রতিহিংসার বিষবাষ্পে ভারী হয়ে আছে। শেখ হাসিনা সে ষড়যন্ত্রকে তাঁর 'আন্দোলনের ফসল' বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বর্তমান সঙ্কট ও অনিশ্চয়তার কারণগুলো তখনই সৃষ্টি হয়েছিলো। ওই দুই দেশের রাষ্ট্রদূতরা কোন বাংলাদেশী রাজনীতিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে সে কারণেই অনেকের বুকে আতঙ্ক হয়।

সুবিধাবাদী সেকুলারিজম

দ্বিতীয় কারণটি হলো আওয়ামী লীগ সব সময় সেকুলার রাজনীতির কথা বলে। কিন্তু শেখ হাসিনা প্রায়ই কোন না কোন ভাবে ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করেছেন। সব সময়ই তিনি সংখ্যালঘু হিন্দুদের ভোট ধরে রাখার জন্যে তাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। তা সত্ত্বেও সাময়িক রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে ধর্ম-ভিত্তিক মুসলিম দলগুলোর সঙ্গে জোট বাঁধতে আওয়ামী লীগ কার্পণ্য করেনি। লে. জে. এরশাদের সামরিক অভ্যুত্থানকে আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনা স্বাগত করেছিলেন। বিশ্বের চোখে বৈধতা পাবার লক্ষ্যে এরশাদ ১৯৮৬ সালের ৬ মে সংসদ নির্বাচন দেন। বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও জামায়াতসহ সকল রাজনৈতিক দল ১৯ এপ্রিল এক যৌথ বৈঠকে বসে নির্বাচন বর্জন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

কিন্তু দুদিন পরে হঠাৎ করে আওয়ামী লীগ ও জামায়াত ঘোষণা করে যে তারা সে নির্বাচনে অংশ নেবে। তখন জানা গিয়েছিলো যে শেখ হাসিনার প্ররোচণাতেই জামায়াত ঐকমত্য থেকে সরে এসেছিলো। ১৯৯৫-৯৬ সালে যখন খালেদা জিয়ার বিএনপি সরকারকে পরাজিত করা সম্ভব মনে হচ্ছিলো না তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি চালু করার দাবিতে জামায়াতের সঙ্গে জোট বেঁধে আন্দোলন করেছিলো আওয়ামী লীগ। তেমনি ২০০৬ সালে সাধারণ নির্বাচন সামনে রেখে মহাজোট গঠনের লক্ষ্যে খেলাফত মজলিসের সঙ্গেও সমঝোতা চুক্তি করেছিলো আওয়ামী লীগ।

অবশ্যি লক্ষণীয় যে নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার পর শেখ হাসিনার ইসলাম-প্রীতি ছুটে যায়। ১৯৯৬ সালে জামায়াত-আওয়ামী লীগের ধ্বংসাত্মক

আন্দোলনে দেশ অচল হয়ে গেলে খালেদা জিয়ার সরকার সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী পাস করে তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি চালু করে। সে বছরের জুন মাসে সে পদ্ধতির অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংসদে একক গরিষ্ঠতা পেলেও নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পায়নি। জামায়াতের এমপিদের সমর্থনে শেখ হাসিনা সরকার গঠন করেন। সংরক্ষিত আসনগুলোর মহিলা সাংসদদের সমর্থন লাভের পর আর জামাতের প্রয়োজন রইলো না। শেখ হাসিনা তখন আবারো জামায়াত বিরোধী হয়ে ওঠেন। তাঁর সেকুলারিজম-প্রীতি আবারো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

বহু প্রশ্নের ভিড়

অনেকগুলো প্রশ্ন ভিড় করে দেখা দিচ্ছে মার্কিন কূটনীতিকের বাসায় শেখ হাসিনার বিতর্কিত উপদেষ্টার সঙ্গে সঙ্কটাপন্ন জামায়াতের তিনজন শীর্ষ নেতার চা-পান প্রসঙ্গে। আমেরিকা কি আরো একবার বাংলাদেশে রাজনৈতিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চেষ্টা চালাচ্ছে? অন্য রাষ্ট্রের রাজনীতিকে নিজেদের স্বার্থের উপযোগী করে ঢেলে সাজানো মার্কিন কূটনীতি এবং তাদের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইয়ের পুরাতন বদঅভ্যেস। গোয়েন্দাগিরি আর কূটনীতির ব্যবধান এখানে স্পষ্ট নয়। কূটনীতির ছদ্মাবরণে সিআইয়ের তৎপরতা এখন স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে স্বাধীনতার উদগাতা এবং গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক বলে দাবি করে। কিন্তু অন্য দেশে রাজনৈতিক ইঞ্জিনিয়ারিং করার সময় সেকথা তার মনে থাকে না। সুতরাং উপরোক্ত চায়ের মজলিস অবশ্যই সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে।

কিন্তু আওয়ামী লীগ কিম্বা সে দলের নেত্রীকে কি ওয়াশিংটন নিজেদের স্বার্থের অনুকূল বিবেচনা করে? এটা এখন সর্বজনস্বীকৃত যে ইন্দো-মার্কিন চক্রান্তের ফলেই ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়েছিলো এবং শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু গদি পাবার পর থেকে বর্তমান সরকার, বিশেষ করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আপাত দৃষ্টিতে বার বার মার্কিন সরকারকে অপমানই করেছেন। নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে অপমান বন্ধ করা এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংক হস্তক্ষেপ না করার জন্যে মার্কিন প্রশাসন দফায় দফায় শেখ হাসিনাকে অনুরোধ করেছে। সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিন্টন এ ব্যাপারে কয়েক দফায় শেখ হাসিনাকে টেলিফোন করেছেন, স্বয়ং ঢাকাতেও এসেছিলেন। হাসিনা সেসব অনুরোধ-উপরোধে কর্ণপাত করেননি। হিলারি এখনো মার্কিন প্রশাসনে সম্মানিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। ২০১৬ সালে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন বলে আশা করা যায়। সুতরাং অতীতের অপমানগুলোর কথা ওয়াশিংটন ভুলে গেছে মনে করা যায় না।

গার্মেন্ট শ্রমিক নেতা আমিনুল ইসলামের হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে সরকারের ব্যর্থতা, এ শিল্পের শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠনের অধিকার দান এবং সাধারণভাবেই গার্মেন্ট শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ ও শর্ত উন্নত করার জন্যে মার্কিন সরকারের অনুরোধ শেখ হাসিনার সরকার উপেক্ষা করে চলেছে। জনৈক মার্কিন উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী দর্শন দান করেননি, মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনা শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে প্রায় চার মাস ধরে অপেক্ষা করছেন। সম্প্রতি আবার যুক্তরাষ্ট্র কিম্বা চীনের পরিবর্তে রাশিয়া থেকে সমরাস্ত্র এবং বেলারুস থেকে সমরোপকরণ ক্রয় করে শেখ হাসিনা প্রকারান্তরে ওয়াশিংটনের প্রতি বিদ্রূপই করেছেন। এসব ব্যাপার থেকে মনে করা স্বাভাবিক হবে যে শেখ হাসিনা গদিচ্যুত হলেই বরং ওয়াশিংটনের হাড় জুড়ায়।

রাজনৈতিক প্রয়োজন এবং মান-মর্যাদা

কিন্তু কূটনীতিতে বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে ক্ষুদ্রতর বিবেচনাগুলোকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াই নিয়ম। মার্কিন কূটনীতির বৃহত্তর স্বার্থ বর্তমানে এশিয়ায়। চীনের বিস্ময়কর অর্থনৈতিক উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্র খুবই শঙ্কিত। শুধু তাই নয়। তার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি এবং সমরাস্ত্র নির্মাণ শিল্পের প্রসারও ওয়াশিংটনের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকলেই এখন স্বীকার করে অতি শীঘ্র যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে চীন বিশ্বের এক নম্বর পরাশক্তি হতে চলেছে। ল্যাটিন আমেরিকা এবং আফ্রিকা মহাদেশের অর্থনৈতিক বিবর্তনে বেইজিংয়ের ভূমিকাকে ওয়াশিংটন ভালো চোখে দেখছে না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড়ো উদ্বেগের কারণ ঘটছে পূর্ব এশিয়ায়। এসব দেশে চীনের রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সামরিক প্রভাব বিস্তার প্রতিরোধ করাই এখন ওয়াশিংটনের সবচাইতে বড়ো নিরাপত্তা বিবেচনা।

এতদঞ্চলের দেশগুলোকে নিয়ে ওয়াশিংটন যে এশিয়া-প্যাসিফিক বাণিজ্যিক জোট করেছে বলতে গেলে ঢাকঢোল পিটিয়েই চীনকে সে জোট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। চীনের প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যূহ তৈরির লক্ষ্যে চীন সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন নৌশক্তি কয়েক গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ফিলিপাইনকে উন্নততর মার্কিন সমরাস্ত্র দেওয়া হয়েছে। ওয়াশিংটনের সঙ্গে উন্নততর সম্পর্কের কারণে এই দেশগুলো ইতোমধ্যেই অনেক বেশি সাহসী ও উচ্চাভিলাষী হয়ে উঠেছে। এতদঞ্চলের বিতর্কিত কয়েকটি দ্বীপের ওপর নিজেদের দাবি ঘোষণা করে তারা প্রকারান্তরে চীনকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে।

ভারতের সঙ্গে অতীতে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক বিশেষ ভালো ছিলো না। সোভিয়েত কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি রোধের জন্যে যুক্তরাষ্ট্র যখন তুরস্ক,

পাকিস্তান প্রভৃতি কতগুলো দেশকে নিয়ে সেন্টো ও সীয়েটো সামরিক জোট গঠন করেছিলো ভারত তখন জোট বেঁধেছিলো সোভিয়েত ইউনিয়েনের সঙ্গে। অধিকাংশ সমরাস্ত্র ভারত এখনো রাশিয়া থেকেই ক্রয় করে। পাকিস্তানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারত পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করেছে ওয়াশিংটনের বহু অনুরোধ-উপরোধ, এমনকি হুমকি অগ্রাহ্য করে।

কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন হয়েছে। এশিয়ার এক নম্বর পরাশক্তি হবার ব্যাপারে চীনের সঙ্গে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। তার ওপরও অরুণাচল অঞ্চলে হিমালয়ের বিশাল এলাকার মালিকানা নিয়ে দুদেশের ঐতিহাসিক বিরোধের জের ধরে ১৯৬২ সালে দুদেশের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিলো। কোন রকম মীমাংসা ছাড়াই তখন একটা যুদ্ধবিরতি হয়। সে অবস্থা এখনো বজায় আছে। বিগত বছরগুলোতে প্রায়ই খবর পাওয়া যাচ্ছিলো যে উভয় পক্ষই সে অঞ্চলে সমরশক্তি বৃদ্ধি করে চলেছে। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত, আরেকটি চীন-ভারত যুদ্ধ অনিবার্য এবং আসন্ন। দিল্লি থেকে অহরহ অভিযোগ হয় যে চীন উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্যের বিদ্রোহীদের গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করছে।

কখনো শত্রু, কখনো মিত্র

এসব কারণে চীনের প্রভাব সীমিত করার ব্যাপারে ওয়াশিংটন অতীতের অসদ্ভাবের কথা ভুলে গিয়ে ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছে। দিল্লি আর ওয়াশিংটনের মধ্যে এখন পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তি হয়েছে। বাংলাদেশে ২০০৬-২০০৮ সময়ের রাজনৈতিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যাপারে এই দুই দেশের সহযোগিতার ইতিহাস এখন সকলেরই জানা আছে। শেখ হাসিনার দেওয়া অপমানগুলো ভুলে গিয়ে ওয়াশিংটন যদি তাঁকে গদিতে রাখার জন্যে আবারো ভারতের অনুরোধে রাজি হয় তাহলে বিস্ময়ের কারণ ঘটবে না।

বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশনগুলো নির্বাচনে লজ্জাকর পরাজয়ের পর প্রধানমন্ত্রী হাসিনা এখন গদি বাঁচানোর চিন্তায় মরিয়া হয়ে উঠেছেন। সাধু এবং অসাধু যে কোন উপায়ে আসন্ন নির্বাচনে জয়লাভ এখন তাঁর একমাত্র চিন্তা। ডুবন্ত ব্যক্তি যেমন খড়কুটো যা পায় আঁকড়ে ধরে সে রকম অবস্থা হয়েছে শেখ হাসিনার। সুতরাং সম্ভব হলে ১৮ দলের জোটে ভাঙ্গন ধরানোর, বিশেষ করে বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের সম্পর্কে ফাটল ধরানোর যে কোন চেষ্টা তিনি করবেন। কিন্তু বিগত সাড়ে চার বছরে জামায়াতের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার সরকারের নজীরবিহীন নির্যাতন ও দমন নীতির কারণে আপাত দৃষ্টিতে জামায়াত-আওয়ামী লীগ গাঁটছড়া বাঁধা অস্বাভাবিক মনে হতে পারে।

এমন কোন অত্যাচার ও নির্যাতন নেই যা এ সরকার জামায়াতের বিরুদ্ধে চালায়নি। ইসলামী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তিনি তৎপর– এ ধারণা সৃষ্টি করে দিল্লি ও ওয়াশিংটনের মন পাবার লক্ষ্যে টুপি-দাড়ি পরিহিতদের বিরুদ্ধে নির্যাতন এ সরকার গোড়ার দিনগুলো থেকেই শুরু করেছে। যুদ্ধাপরাধের বিচারের নামে জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে বিচারকে দেশে-বিদেশে রাজনৈতিক অভিসন্ধি হিসেবেই দেখা হচ্ছে। একটা কারণ এই যে যেসব যুদ্ধাপরাধী আওয়ামী লীগের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে তাঁদের বিচারের দাবি সরকার বরাবরই এড়িয়ে গেছে। ট্রাইব্যুনালের রায়ে ইতোমধ্যেই অভিযুক্তদের দু'জনকে ফাঁসির দণ্ড এবং একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষ ৯১ বছর বয়স্ক অধ্যাপক গোলাম আযমকে দেওয়া হয়েছে ৯০ বছরের কারাদণ্ড। আরো ক'জন জামায়াত নেতার বিচারের রায় আসন্ন বলে মনে হচ্ছে।

জামায়াতকে যা ভাবতে হবে

দাবি করা হয় যে এ যাবৎ জামায়াতের ৪৩ হাজার নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেছে এ সরকার। জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের ২৩১ জন নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। জামায়াত ও শিবিরের সদস্য-সমর্থক মিলিয়ে পাঁচ লক্ষাধিক ব্যক্তিকে আসামী করে ২৬ হাজার মামলা রুজু করা হয়েছে। নিপীড়নের এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। সাধারণ বুদ্ধিতে বলে এতো সবের পর জামায়াতকে দলে টানার চেষ্টা আওয়ামী লীগের পক্ষে জঘন্য ধৃষ্টতা হবে, সে চেষ্টায় জামায়াতের সাড়া দেওয়া অসম্ভব বলেই আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে।

কিন্তু রাজনীতিতে অসম্ভব বলে কোনো কথা নেই। যুদ্ধাপরাধের দায়ে দণ্ডিত নেতাদের ফাঁসি আপাতত কার্যকর না করা এবং অবশিষ্টদের বিচার ধামাচাপা দেওয়াসহ রাজনৈতিক সুবিধার টোপ জামায়াতের বর্তমানে সক্রিয় নেতাদের লোভনীয় মনে হতে পারে। তবে তাঁরা নিশ্চয়ই ভেবে দেখবেন এ সরকার এ যাবৎ শত শত কর্মীকে হত্যা করেছে, যে হাজার হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে এবং যে লক্ষ লক্ষ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজানো হয়েছে। তাঁদের পরিবার-পরিজন এবং বন্ধু-বান্ধব কিছুতেই আওয়ামী লীগের সঙ্গে জামায়াতের জোট বাঁধাকে সমর্থন করবে না। ময়দানে বর্তমান নেতারা তেমন কোন ভুল করলে তাঁরা সকলেই জামায়াতের বিপক্ষে চলে যাবেন। সাধারণ সমর্থকরাও তেমন বিশ্বাসঘাতকতাকে ক্ষমা করবে না। বিগত সাড়ে চার বছর গণতন্ত্রের ও তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতির সমর্থনে আন্দোলন করে জামায়াতের জনপ্রিয়তা প্রকৃতই বেড়ে গিয়েছিলো। সে জনপ্রিয়তাকে জলাঞ্জলি দেওয়া দলটির পক্ষে আত্মঘাতী হবে।

আরো মনে রাখা দরকার যে সংবিধান থেকে ইসলাম ও বিসমিল্লাহকে বাদ দিয়ে, সরকারি চাকরি-বাকরিতে সংখ্যালঘুদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে, ভালো ফসলের জন্যে তাঁর মা-দুর্গাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এবং শেষত কয়েকজন ব্লগারের আল্লাহ্-রাসূল (দ) ও ইসলামের কুৎসা রটনাকে সমর্থন দিয়ে শেখ হাসিনার সরকার প্রকৃতই ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আল্লামা শফীর নেতৃত্বে হেফাজতে ইসলাম আন্দোলন বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ নাগরিক মুসলমানদের সত্যিকারের অভিব্যক্তি এবং একটি প্রকৃত তৃণমূল আন্দোলন। শাপলা চত্বরে গত ৬ মে ভোর রাত্রের গণহত্যা তাঁরা কোনদিনই ভুলে যেতে পারবেন না।

শেখ মুজিবুর রহমান বাকশাল করার উদ্দেশ্যে সকল বেসরকারি পত্রপত্রিকা আইন করে নিষিদ্ধ করেছিলেন। শেখ হাসিনা আইন করেননি সত্যি, কিন্তু বিভিন্ন আইনের ফাঁক-ফোকর ব্যবহার করে এবং কখনো কখনো গায়ের জোরে বিরুদ্ধ মতের অনুসারী মিডিয়াকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বাকরুদ্ধ করে দিয়েছেন। নাৎসি জার্মানির মতো এখন রাজত্ব করছে সরকারের আজ্ঞাবহ মিডিয়া। তাদের ব্যবহার করে হেফাজতে ইসলাম এবং আল্লামা শফীর বিরুদ্ধে দিনরাত্রি অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। সেটাই প্রমাণ করে এ আন্দোলনকে সরকার কত ভয় পায়। সাম্প্রতিক সিটি কর্পোরেশনগুলোর নির্বাচনেও দেখা গেছে হেফাজতে ইসলাম সত্যি সত্যি খুবই প্রভাবশালী। জামায়াতে ইসলাম যদি সকল বিচার-বিবেচনা অগ্রাহ্য করে আওয়ামী লীগের ডুবন্ত এবং ভাঙ্গা নৌকোয় চড়তে চায় তাহলে বাংলাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি জামায়াতের পরিবর্তে হেফাজতে ইসলামের মাধ্যমে অভিব্যক্তি পাবে। জামায়াতে ইসলামীর অস্তিত্ব সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়বে।

(লন্ডন, ১৬.০৭.১৩)

তারেক রহমান তার যথাযোগ্য আসনে অধিষ্ঠিত হবেন

বাংলাদেশের মানুষের এখন এক নম্বর ভাবনা গণতন্ত্র রক্ষা করার উপায় নিয়ে। দিন যতই গড়িয়ে যাচ্ছে সরকারের কুৎসিত রূপ ততই প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। তারা উঠেপড়ে লেগে গেছে ক্ষমতা চিরস্থায়ী করতে। পন্থা যতই অসাধু হোক না কেন গদি তারা ছাড়বে না। এ সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে তারা যে কোনো ধরনের দুর্নীতি করে গদি আঁকড়ে থাকবেই (যা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত)। ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে সরকার গঠনের সময় থেকে তারা সেজন্যে প্রস্তুতি নিয়েছে। তাদের ভোটব্যাংক সংখ্যালঘু অফিসারদের তারা সুপরিকল্পিতভাবে প্রশাসন ও পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে নিয়োগ করে রেখেছে। সে লক্ষ্যে প্রায় সাতশ' সিনিয়র ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তাকে তারা ওএসডি করে রেখেছে।

বাংলাদেশের নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসার হন ডেপুটি কমিশনাররা। মাত্র কিছুদিন আগে এক হিসেবে দেখেছি, দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৪২টিতেই ডেপুটি কমিশনার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। পুলিশবাহিনীতে ওসি থেকে শুরু করে এসপি পর্যন্ত নির্বাহী পদগুলোতেও গরিষ্ঠ সংখ্যক কর্মকর্তা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। নির্বাচনের সময় যত অনিয়মই হোক না কেন, এমনকি ভোটকেন্দ্রের ব্যালট বাক্সগুলো সরিয়ে নিয়ে যদি আগে থাকতেই ভরাট করা বিকল্প ব্যালট বাক্স গণনার জন্যে হাজির করা হয়, রিটার্নিং অফিসাররা টুঁ শব্দটি করবেন না। বিরোধী দলগুলো যদি কোনো ধরণের প্রতিবাদ করে, সরকারের ভোটব্যাংক থেকে নিযুক্ত পুলিশ তাদের নীরব করে দেবে। আদালতেও প্রতিকারের আশা নেই। বেছে বেছে সরকারের সমর্থক ব্যক্তিদের দিয়ে বিচার বিভাগ ভারাক্রান্ত করে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে খবর পাওয়া গেছে, ডজনে ডজনে সাবেক ছাত্রলীগ নেতাকে সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই ও এনএসআইতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ঠিক এসব কারণেই বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ রাজি হতে পারে না। নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি সেজন্যেই দুর্বার হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের মানুষের দুই নম্বর বড় ভাবনা রাজনীতিতে উত্তরাধিকারের বিষয়টি নিয়ে। খালেদা জিয়া এর আগে তিন বার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। নির্বাচন সুষ্ঠু হলে তিনি চতুর্থ বার প্রধানমন্ত্রী হবেন। কিন্তু তিনি বাকশালী নন, বরাবরের জন্যে গদি দখল করে থাকতে চাইবেন না। বাংলাদেশের মানুষ মনেপ্রাণে আশা

করে, স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জ্যেষ্ঠ ছেলে তারেক রহমান খালেদা জিয়ার উত্তরাধিকারী হিসেবে বিএনপির নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন। মিথ্যা মামলা, কারাগারে নির্যাতন এবং শেষে তাকে নির্বাসিত রাখার প্রতিবাদে বাংলাদেশে প্রায়ই প্রতিবাদ মিছিল হচ্ছে। তারেকের চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে দেশে এবং বিদেশে প্রায়ই আলোচনা সভা হচ্ছে, কয়েকটি পুস্তকে জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিরা তারেক রহমানের মূল্যায়ন করেছেন।

ওরা কেন তারেকের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত?

শেখ হাসিনার সরকার যে তারেকের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত তার আরও অনেক কারণ আছে। শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ গোড়া থেকেই ধরে রেখেছিল, বাংলাদেশের রাজত্ব শেখ পরিবারের মধ্যেই ধরে রাখতে হবে এবং সজীব ওয়াজেদ জয়কে যুবরাজের মতো সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করার কৃত্রিম চেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছিল। জয় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলে কার্ড ছাপিয়ে ওয়াশিংটনে মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে দহরম-মহরম করার চেষ্টা করেছিলেন। খুব সম্ভবত তাতে বিশেষ কোনো লাভ হয়নি। জানা গেছে, বিভিন্ন দায়ে মার্কিন পুলিশ এফবিআইয়ের খাতায় জয়ের সম্বন্ধে রিপোর্ট ভালো নয়। বিশেষ করে পদ্মা সেতু দুর্নীতি ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ জয়ের বিপুল পরিমাণ সম্পদের উৎস সম্বন্ধে তদন্ত করছে বলে জানা গেছে।

সজীব ওয়াজেদ জয় পিতৃপরিচয়ে পরিচিত হতে চান না, যদিও তার বাবা ড. ওয়াজেদ মিয়া আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরমাণু বিজ্ঞানী এবং বাংলাদেশ পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। নির্বাচন আসন্ন। এ সময়ে আওয়ামী লীগ সরকার জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থনের গভীর সংকটে আছে। হঠাৎ করে জয় স্ব-পরিবারে ঢাকা গিয়ে হাজির হন। তিনি গণভবনে মায়ের অতিথি হিসেবে এবং প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থান করছিলেন। তারপর হঠাৎ করেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর হেলিকপ্টারে চড়ে রংপুরের পীরগঞ্জে ড. ওয়াজেদ মিয়ার গ্রামের বাড়িতে গিয়ে হাজির হন। তার আগেই খবর প্রচার করা হয়েছিল, জয় আগামী নির্বাচনে পীরগঞ্জ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। কারোরই আর বুঝতে বাকি ছিল না, ভোটের গরজেই অবশেষে বাবার কথা এবং বাবার গ্রামের বাড়ির কথা জয়ের মনে হয়েছে। অর্থাৎ জয় আকাশ থেকে নাজিল হওয়ার মতো আমেরিকা থেকে উড়ে এসে বাংলাদেশের অ্যাপ্রেন্টিস প্রধানমন্ত্রী হতে চান।

বাংলাদেশকে যে তিনি চেনেন না, বাংলাদেশ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না জয়ের কথাবার্তায় বাংলাদেশের মানুষ সেটা বুঝে গেছে। বাংলাদেশে বসে তিনি ঘোষণা করলেন, তার কাছে ইনফরমেশন আছে, আওয়ামী লীগ আবারও

সরকার গঠন করবে। তাঁর সে উক্তিতে বিতর্কের ঝড় ওঠে। অনেকেই বলেছিলেন, যেসব অসাধু ষড়যন্ত্র দিয়ে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার ষড়যন্ত্র করছে, সেগুলোর খবর জানা ছিল বলেই জয় সে উক্তিটি করতে পেরেছিলেন। তারপর জামায়াত ও অন্যান্য প্রসঙ্গে আরও কিছু অজ্ঞতাপ্রসূত কথাবার্তা বলেন তিনি। জয় বলেছেন, জামায়াত নাকি পাকিস্তানি পার্টি, বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দল নয়।

জয় বাংলাদেশের পরিস্থিতি জানবেন কী করে? অতি শৈশবে তিনি ছিলেন বাবা-মায়ের সঙ্গে জার্মানিতে। তারপর নয়াদিলিতে ভারতের রাজনৈতিক আশ্রয়ে। তাঁর স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ভারতে। ভারত থেকে তিনি চলে যান আমেরিকায় এবং মার্কিন মহিলাকে বিয়ে করে সে দেশের নাগরিকত্ব নিয়েছেন। বাংলাদেশের নেতৃত্ব করার যোগ্যতা তার আসবে কোত্থেকে?

অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ তারেক

অন্যদিকে তারেক জিয়া বড় হয়েছেন সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশে। জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষক ছিলেন। কয়েকটা সামরিক অভ্যুত্থান আর পাল্টা অভ্যুত্থানের পর সেনাবাহিনীর জওয়ানরা গৃহবন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত করে তাকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদে বসায়। সেদিন থেকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি বাংলাদেশের কল্যাণ কাজে ব্যস্ত ছিলেন। প্রথমে সেনাবাহিনীতে চেন-অব-কমান্ড ফিরিয়ে আনা, সমাজে হিংসা-প্রতিহিংসার অবসান করে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন করে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তিনি।

কৈশোরে তারেক রহমান দেখেছেন সেনাবাহিনীর অন্তর্বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্যে তাঁর বাবা কী করে এক ক্যান্টনমেন্ট থেকে অন্য ক্যান্টনমেন্টে ছুটে বেড়িয়েছেন। আর তারই ফলে একটা সামরিক-বেসামরিক ষড়যন্ত্রে তিনি প্রাণ দিয়েছেন। প্রথম সুযোগেই জিয়া পত্রপত্রিকা ও বাকস্বাধীনতার ওপর থেকে সব নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। তারপর আওয়ামী লীগসহ সব রাজনৈতিক দলকে তিনি আবার বৈধ ঘোষণা করেন। আওয়ামী লীগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. কামাল হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাককে দিল্লি পাঠিয়ে তিনি শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে দেশে ফিরিয়ে আনেন।

দেশে সার্বিক সমঝোতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি স্বাধীনতার পক্ষের ও বিপক্ষের বিতর্ক ও সংঘাত বন্ধ করে যুদ্ধবিধ্বস্ত রাষ্ট্রের পুনর্গঠনে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। শহীদ জিয়া বুঝেছিলেন, সমাজের সব স্তরের মানুষকে, বিশেষ করে শিক্ষিত বেকারদের গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা না গেলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। সে লক্ষ্যে তিনি তাঁর ঐতিহাসিক উনিশ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কখনও ভয়াবহ বন্যা আর

কখনও মারাত্মক খরা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে রেখেছিল। সে অবস্থার প্রতিকারের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তার খাল খনন ও নদী সংস্কারের কর্মসূচি চালু করেন। নিজের হাতে তিনি মাটি কেটেছেন। তাঁর দেখাদেখি সচিবালয়ের কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী, বিভিন্ন মহিলা সমিতির সদস্যসহ দেশের সর্ব স্তরের মানুষ সে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারেক রহমান তখন দেখেছেন তৃণমূল বাংলাদেশকে তাঁর বাবা কীভাবে দেশ ও জাতির মেরুদণ্ড বিবেচনা করতেন।

পিতৃশোকে শোকাতুর তারেক দেখেছিলেন, রাজনীতিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ তাঁর মা কী করে শক্ত হাতে বিএনপির হাল চেপে ধরেছিলেন। আগে যে সামরিক-বেসামরিক ষড়যন্ত্রের কথা বলছিলাম, তার জের ধরে জেনারেল এরশাদ অভ্যুত্থান করে ক্ষমতা দখল করেন। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা সে ষড়যন্ত্রের অংশ ছিলেন বলে অনেকে সন্দেহ করেন। অন্তত এ কথা সত্যি, জেনারেল এরশাদের অভ্যুত্থানকে তিনি স্বাগত করেছিলেন এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সে সামরিক স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন।

স্বৈরতন্ত্র বনাম খালেদা জিয়া

সে নয় বছর ধরে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সামরিক স্বৈরতন্ত্রের অবসান করে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্যে আপসবিহীন সংগ্রাম করেন। আওয়ামী লীগের সহযোগিতা না পেলে এরশাদের সামরিক শাসন এতদিন টিকে থাকতে পারত না। স্বৈরতন্ত্রের টিকে থাকার একমাত্র উপায় গণতন্ত্রের শিকড়গুলো নষ্ট করে ফেলা। শেখ হাসিনার সহায়তায় এরশাদ ঠিক সেটাই করেছেন। বেগম জিয়ার আন্দোলনের ফলে ১৯৯০ সালের নভেম্বরে সামরিক স্বৈরশাসনের পতন হয়। পরের বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশের নরনারী ভোটকেন্দ্রে এসেছিল 'খালেদা জিয়াকে' ভোট দিতে। নির্বাচনের দিন অনেক ভোটকেন্দ্রে সে কথা অনেকে আমাকে বলেছেন।

দীর্ঘ আন্দোলন করতে গিয়ে খালেদা জিয়া বাংলাদেশের মানুষকে চেনার সুযোগ পেয়েছিলেন। এ দেশের মানুষের সংসদীয় গণতন্ত্রপ্রীতির কথা তিনি জানতেন। সরকার গঠন করে তাই তিনি প্রথম সুযোগেই সংবিধান সংশোধন করে সংসদীয় পদ্ধতি চালু করেন। গণতন্ত্রে কোনো সরকার একটানা গদি দখল করে থাকবে বলে কথা নেই। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেত্রী এ কথাটা মেনে নিতে পারছেন না। তাঁর মতে যেহেতু তাঁর বাবা স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সেহেতু বাংলাদেশ তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি এবং এদেশ শাসনের অধিকার তাঁর ও তাঁর বংশধরদের। এরশাদ-উত্তর প্রথম নির্বাচনে পরাজয়ের পর তিনি জামায়াতে ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে দেশজোড়া সন্ত্রাসী আন্দোলন শুরু করেন।

বেগম জিয়া ও বিএনপি তখন দেশের শান্তির কথা বিবেচনা করে তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি চালু করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে শেখ হাসিনা বুঝে গেলেন, সে পদ্ধতি তাকে স্থায়ীভাবে গদিতে রাখার জন্যে যথেষ্ট নয়। এখন তিনি তাঁর এবং তাঁর অনুগত সংখ্যালঘু অফিসারদের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন করে তাঁর বিজয় সুনিশ্চিত করতে চান। বর্তমান সংকটের এই হচ্ছে কারণ।

বাবার এবং মায়ের রাজনৈতিক চিন্তা, তাঁদের প্রচেষ্টা খুবই কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন তারেক রহমান। তিনি আরও বুঝেছিলেন, সনাতনী পন্থায় অজ্ঞতার ভিত্তিতে রাজনীতি আর বেশি দিন চলতে পারে না। অন্তত দেশের ও দশের কল্যাণ সে পন্থায় করা যাবে না। তাই তিনি রাজনীতি শুরু করেন তৃণমূল স্তরে, গ্রামের মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণের কাজে আত্মনিয়োগ করে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক গবেষণা, ইতিহাস পর্যালোচনা এবং জনমত জরিপের গুরুত্বপূর্ণ কাজও তিনি শুরু করেন।

এসবের সুফল এবং তারেক রহমানের সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় বাংলাদেশের মানুষ পেয়েছে ২০০১ সালের অক্টোবর মাসের নির্বাচনে। তারেক সম্বন্ধে আওয়ামী লীগের ভয়ভীতি শুরু হয় তখন থেকেই। তারেক রহমান ও হাওয়া ভবন সম্বন্ধে আওয়ামী লীগের সর্বাত্মক অপপ্রচারের সূচনাও তখন থেকে। বাংলাদেশের মানুষ তারেক রহমানকে ভালোবাসে, তারেক রহমান রাজনীতির অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বাংলাদেশের আস্থা অর্জন করেছেন। তাঁর এই ভাবমূর্তি বিনষ্ট করা না গেলে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এজন্যেই তারেক এবং তাঁর মা ও ভাইয়ের বিরুদ্ধে একের পর এক দুর্নীতির মিথ্যা মামলা সাজিয়ে তাঁদের ইমেজ নষ্ট করার সুপরিকল্পিত অভিযান শুরু হয়। আর এজন্যেই শেখ হাসিনার আন্দোলনের ফসল ফখরুদ্দীন, মইন-উ-আহমেদের বর্ণচোরা সামরিক সরকার জেলের এবং রিমান্ডের নির্যাতনে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র এঁটেছিল।

বিএনপির সদস্যরা এবং বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ খালেদা জিয়ার পর পরই তারেককে দলের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্টের পদে গ্রহণ করেছে তাঁর অনুপস্থিতিতে। দলের নীতি ও কর্মপন্থাকে সুপরিচালিত করার জন্যে যোগ্য ব্যক্তি তিনি। তিনি দেশে ফিরে গেলে রাজনৈতিক অঙ্গনের ছবি পুরোপুরি পাল্টে যাবে। এ ভয়েই শেখ হাসিনার গণধিকৃত সরকার তারেকের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ঘোরতর বিরোধী। দেশে ফিরে গেলেই তাঁকে গ্রেফতারের ভয় দেখানো হচ্ছে। এ সরকার একদিকে, আর দেশের মানুষ অন্যদিকে। এ মোকাবিলায় চূড়ান্ত পর্যায়ে কোন পক্ষের জয় হবে, কাউকে বলে দিতে হবে না। তেমনি সুনিশ্চিত যে তারেক রহমানও তাঁর যথাযোগ্য আসনে অধিষ্ঠিত হবেন। এরই মধ্যে বাংলাদেশের মানুষ সেই প্রতীক্ষায় আছে।

(লন্ডনের ইউনিভার্সিটি অব ল' বাংলাদেশ সমিতির আলোচনা সভায় ১৬ আগষ্ট ২০১৩ পঠিত)

দেশটাকে লণ্ডভণ্ড করে দেবেন না, এবারে ক্ষ্যান্ত দিন

কয়েকদিন ছুটিতে জার্মানীতে গিয়েছিলাম। ছুটিতে ল্যাপটপ কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া এ বয়েসে আর সম্ভব নয়। ইন্টারনেটে নিয়মিত বাংলাদেশের খবর পড়ার সুযোগ ছিল না। জার্মানীর মিডিয়া থেকে আজকের বাংলাদেশ সম্বন্ধে কোন ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়। স্টুটগার্ট এক জার্মান মহিলা চা খেতে ডেকেছিলেন। মহিলা এক জার্মান কম্পানিতে চাকরি করেন। সে সুবাদে মাঝে মাঝে তাঁকে ভারতে যেতে হয়। সীমিত কিছু হিন্দি বলতে পারেন। বলেছিলেন আমাদের তিনি ভারতের ব্রুকবণ্ড চা খাওয়াবেন। আমাদের জন্যে সুস্বাদু একটা কেকও তৈরি করেছিলেন তিনি।

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে সংকটের খবর শুনে বললেন, আশ্চর্য! জার্মান মিডিয়াতে তো এসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার লেশমাত্র পাই না। সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সম্বন্ধে একমাত্র রানা প্লাজার ট্র্যাজেডির খবরই তিনি জানেন। তাও অসম্পূর্ণ। জার্মানীতে কয়েক হাজার বাংলাদেশী আছেন। তাঁদের নানা কর্মকাণ্ডের খবর প্রায়ই বাংলা পত্রিকায় পড়ি। তাঁদের তৎপরতা নিজেদের মধ্যে। নিজেদের নিয়ে এতোই ব্যস্ত যে মূল ধারার জার্মান মিডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের কথা তাঁদের মাথায় আসে না। বাংলাদেশের বর্তমানের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি বরাবরই মিডিয়া সম্বন্ধে এবং মিডিয়াকে ব্যবহারের আর্ট সম্বন্ধে অজ্ঞ বলতেই হবে। একই দুর্বলতায় ভুগছেন বিএনপির প্রবাসী সমর্থকরাও। খুবই দুর্ভাগ্যের কথা।

লোক পরম্পরায় হলেও জার্মানীতে বসে বাংলাদেশের কিছু খবর পেয়েছি। খবরগুলো এ রকম: (এক) জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন সকলের গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচন পদ্ধতি সম্বন্ধে সমঝোতায় আসতে অনুরোধ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বিরোধী দলের নেতা বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে টেলিফোনে দীর্ঘ ব্যর্থ আলাপ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর দিক থেকে অনুকূল কোন সাড়া মেলেনি। (দুই) অনুরূপ অনুরোধ নিয়ে বিদেশী রাষ্ট্রদূত ও দাতা সংস্থার প্রতিনিধিরা নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সঙ্গে বৈঠক করেছেন। কিন্তু ইসি তাঁদের কোন প্রকারে আশ্বস্ত করতে পারেনি। (তিন) বাংলাদেশের প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এবং সারা বিশ্বে সম্মানিত অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস

তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতিতেই নির্বাচন হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করে বিপাকে পড়েছেন, এবং (চার) প্রধানমন্ত্রী হাসিনা অসংখ্য বারের মতো আরো একবার জেদ ধরেছেন যে সংবিধান অনুযায়ী (অর্থাৎ তাঁর অধীনে) ছাড়া নির্বাচন হবে না এবং বর্তমান সংসদ বজায় রেখেই নির্বাচন হবে।

বাংলাদেশের মূল সংবিধানের রচয়িতা এবং শেখ মুজিবুর রহমানের এক কালের আইন উপদেষ্টা ড. কামাল হোসেনও বলেছেন সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী হচ্ছে সকল নষ্টের মূল; বর্তমান সংকটের জন্যে পঞ্চদশ সংশোধনীই হচ্ছে প্রকৃত দায়ী। পঞ্চদশ সংশোধনী কিভাবে পাস হয়েছে বাংলাদেশে কারো অজানা নয়। দু'হাজার আট সালের ডিসেম্বরে ভারত-মার্কিন-আওয়ামী লীগ ত্রিমুখী ষড়যন্ত্রে যে মাস্টারপ্ল্যানের নির্বাচন হয় তাতে কার্যত একটা একদলীয় সংসদই সৃষ্টি করা হয়েছে। এমনই সুকৌশলে মাস্টারপ্ল্যান করা হয়েছিল যে বিএনপি মোট প্রদত্ত ভোটের ৩০ শতাংশ (অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশের কিছু কম) ভোট পেয়েছে, কিন্তু তাদের আসন দেওয়া হয়েছে সংসদে মোট আসনের দশ ভাগের এক ভাগের মতো। তার ওপর প্রধানমন্ত্রী পূর্ব পরিকল্পিতভাবে বিরোধী দলের নেতা এবং তিন বারের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে এমন অশ্লীল গালি-গালাজ শুরু করেন যে বিরোধী দল সংসদ বর্জন করতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ বিরোধী দল বিহীন সংসদে শেখ মুজিবুর রহমানের বাকশালী সংশোধনের মতো করে বিনা আলোচনায় পঞ্চদশ সংশোধনী পাস করা হয়।

সংবিধান নিয়ে ছেলে-খেলা

আমার স্কুল জীবনের শেষের দু'বছর (১৯৪৬-৪৭) কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা লেগেই থাকতো। আমি একটা বেসরকারি হিন্দু স্কুলে পড়তাম। স্বভাবতই হিন্দু বন্ধু অনেক ছিলেন। কতোদিন আর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা না দিয়ে থাকা যায়? আরো অনেকের মতো আমিও একটা ধূতি কিনেছিলাম। হিন্দু পাড়ায় যেতে কোচা দিয়েই ধূতি পরতাম, আর মুসলমান পাড়ায় কোচা খুলে পেঁচিয়ে লুঙ্গির মতো পরতাম সে ধূতি। সংবিধান পবিত্র দলিল, জাতির অস্তিত্বের সনদ। কিন্তু শেখ হাসিনা সংবিধানকে ব্যবহার করেন নিছক একখানা ধূতির মতো সাময়িক সুবিধার উপকরণ হিসেবে। ১৯৯৬ সালে তিনি মনে করেছিলেন সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি চালু হলে তাঁদের নির্বাচনী বিজয়ে সুবিধা হবে।

তিনি জামায়াতে ইসলামের সঙ্গে জোট বেঁধে আন্দোলন করেছিলেন, অনেকগুলো মানুষ খুন করেছিলেন, দেশ অচল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ২০০৬ সালে তিনি বুঝে গিয়েছিলেন তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতিতেও তিনি জয়ী হতে পারবেন না। লগি-লাঠি-বৈঠার আন্দোলন করে দেশ অচল করে দেওয়া হয়, প্রকাশ্য

দিবালোকে পিটিয়ে রাজপথেই অনেকগুলো মানুষ খুন করা হয়, শেষতক একটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র করে বর্ণচোরা সেনাশাসন ডেকে আনা হয়। মাস্টারপ্ল্যানের নির্বাচনে দ্বিতীয় দফা প্রধানমন্ত্রী হয়ে শেখ হাসিনা বুঝে গেলেন যে তাঁর নিজের অধীনে ষোলোআনা দুর্নীতির নির্বাচন ছাড়া তাঁর আর আওয়ামী লীগের জয়ের কোন সম্ভাবনা নেই। পঞ্চদশ সংশোধনী পাস করা হয় সে উপলব্ধি অনুযায়ী।

এ সংশোধনী পাস করার হাতিয়ার হিসেবে সরকার ব্যবহার করেছে তাদের ইচ্ছা পূরণের আদালতের একজন বিদায়ী প্রধান বিচারপতির একটি বিতর্কিত রায়কে, যে রায়েও বলা হয়েছিল যে রাজনীতির বাস্তবতা বিবেচনা করে পরবর্তী দুটি সাধারণ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ সরকার এই বিতর্কিত রায়েরও মাত্র অর্ধেক ব্যবহার করেছে, অন্য অর্ধেককে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয়েছে। এই সংশোধনীতে শেখ হাসিনা শুধু একটা কথাই লিখতে বাকি রেখেছেন: সেটা এই যে তাঁকে গদি ছেড়ে দিতে বলা যাবে না, আজীবন তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে বহাল থাকবেন। এই আধা-খেঁচড়া সংশোধনী অন্ধভাবে আঁকড়ে থেকে শেখ হাসিনা প্রমাণ করছেন যে মুখে গণতন্ত্রের ধুয়া তুললেও আসলে তিনি নিকৃষ্ট স্বৈরতন্ত্রী, পিতার মতো গণতন্ত্রকে হত্যা করে গদি আঁকড়ে থাকাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য।

ইউনূস মুখ খুললেই কেন আঁতে ঘা লাগে?

তত্ত্বাবধায়ক অথবা ভিন্ন কোন নামে একটা নির্দলীয় নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষের অধীনে নির্বাচন হওয়া উচিৎ-এটা বাংলাদেশের প্রায় সকল বুদ্ধিমান মানুষেরই মনের কথা। মুখ ফুটেও বলেছেন অনেকে। ড. ইউনূস সে একই কথা বললে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে অধিকাংশ মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের নিরেট মস্তিষ্ক নেতারা সহুঙ্কারে তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেছেন। জার্মানীতে বসে একটা উপমা আমার মনে হয়েছে। পাঁচ-ছয় বছর আগে পর্যন্তও বৃটেনে হাউন্ড (এক প্রজাতির হিংস্র শিকারি কুকুর) নিয়ে শেয়াল শিকার বৈধ ছিল। লাল কোট আর কালো হ্যাট পরা ডজন-খানেক ঘোড়সওয়ার শিকারি একপাল হাউন্ড নিয়ে পল্লী ইংলন্ডে শিকারে বেরুতেন। শেয়াল দেখা গেলে (কখনো কখনো খাঁচায় বন্দী শেয়াল ছেড়ে দিয়ে) তারা হাউন্ডগুলোকে তার দিকে লেলিয়ে দিতেন। চল্লিশ-পঞ্চাশটা কুকুর মুহূর্তের মধ্যেই শেয়ালটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতো। ইউনূসের বিরুদ্ধে সরকারি আক্রমণও হয়েছে সে গোছের।

ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর অনুচরদের এই বিশেষ 'অনুগ্রহের' বিশেষ কারণ আছে। আগেরবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে শেখ হাসিনা বিভিন্ন দেশের নাম-না-জানা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডজন-খানেক অনারারী ডক্টরেট কিনেছিলেন। দ্বিতীয় দফায় প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি দৃষ্টি আরো ঊর্ধ্বমুখী করলেন। তিনি স্থির করলেন যে তাঁর একটা নোবেল পুরস্কার ক্রয় করা উচিত। রাষ্ট্রের

ব্যয়ে রাষ্ট্রের কূটনীতিক ও আমলাদের তদ্বির করার জন্যে দেশ-বিদেশে পাঠানো হলো। তাঁরা সবাই ফিরে এলেন শূন্য হাতে।

অন্য দিকে নোবেল কমিটি শান্তি পুরস্কার দিলো মুহাম্মদ ইউনূসকে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীরা থেকে শুরু করে সকল মহাদেশের শক্তিধর ও মানী-গুণী ব্যক্তিরা তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। সকল বাংলাদেশীরও উচিত ছিল তাঁর জন্যে গৌরববোধ করা। কিন্তু এ দেশের প্রধানমন্ত্রী করলেন ঠিক উল্টোটা। শিক্ষক ক্লাসের ভালো ছাত্র-ছাত্রীদের বেশি স্নেহ করলে ঈর্ষাতুর রদ্দি ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন জ্বলে-পুড়ে মরে শেখ হাসিনার হয়েছে সে অবস্থা। যে কোন প্রকারে পারা যায় ইউনূস ও তাঁর গুণগ্রাহীদের হয়রানি ও হেনস্থা করা এ সরকারের এবং এই প্রধানমন্ত্রীর ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের এতোই স্বল্পবুদ্ধি যে যতোবার তারা ইউনূসকে ছোট করতে চাইছেন ততোবার তারাই যে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর প্রমাণিত হচ্ছেন সেটাও তারা বুঝে উঠতে পারেন না।

চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী

জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুনের কথায় শেখ হাসিনা কান দেবেন কেমন করে? বাংলাদেশের তথ্যাভিজ্ঞ ও সুশীল সমাজের সকলেই বলছেন নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ সংসদে ২০ থেকে ৫০ টির বেশি আসন পাবে না। সংখ্যাটা নির্ভর করছে আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার প্রতি কার কতোখানি সহানুভূতি তার ওপর। নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে তিনি ও তাঁর দল যে হেরে নাস্তানাবুদ হয়ে যাবেন শেখ হাসিনা নিজেও সেটা বোঝেন। নিজের কবর নিজে তিনি খোঁড়েন কি করে? নইলে কিছুকাল আগে বান কি মুনের সহকারী যখন সশরীরে ঢাকায় এসে তিন-চারদিন কাটিয়ে গেলেন তখনই সরকার নির্বাচন পদ্ধতি সম্বন্ধে বিরোধীদের সঙ্গে সংলাপে বসতে পারতো। মুখে তারা বলেও ছিল যে তারা সংলাপে বসবে, সংলাপের আমন্ত্রণ জানিয়ে বিএনপিকে চিঠি লিখবে। কিন্তু সহকারী মহাসচিবের বিমান নিউইয়র্কে নামার আগেই সরকার তাদের প্রতিশ্রুতি গিলে খেলো। আওয়ামী লীগের মহাসচিব সৈয়দ আশরাফ ও অন্যান্য মন্ত্রীদের সুর বদলে গেলো। তাঁরা বলতে শুরু করলেন, কিসের সংলাপ? কার সঙ্গে সংলাপ? অথচ বিএনপি বর্তমান সংকটের শুরু থেকেই বলে এসেছে যে অশান্তি ও হানাহানি এড়ানোর লক্ষ্যে তারা যে কোন সময় সংলাপে বসতে রাজি আছে। বান কি মুন এবং তার আগে তাঁর সহকারীকেও সে কথা বিএনপি জানিয়ে দিয়েছে। এখন আবার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি সংলাপে বসার তাগিদ দিয়ে শেখ হাসিনা ও বেগম জিয়াকে চিঠি লিখেছেন। খালেদা জিয়া তো আগে থাকতেই রাজি হয়ে আছেন কিন্তু শেখ হাসিনা রাজি হবেন কিনা সন্দেহ। 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'।

বেচারা নির্বাচন কমিশন! সরকারের পরিকল্পনা (কিংবা ষড়যন্ত্র) কার্যকর করার জন্যে তাদের নিয়োগ করা হয়েছে। কমিশনারদের হাত-পা বাঁধা গণ ভবনের কাছে। সেখান থেকে যে নির্দেশ আসে তার বাইরে কিছু করার শক্তি তাঁদের নেই। বিদেশী রাষ্ট্রদূত আর দাতা সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিদের অনুরোধ রক্ষা করার কিংবা নির্দলীয় নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেবার সাধ্য তাঁদের কোথায়? তাঁরা তো আর বৃটেনের কিংবা ইউরোপের কোন দেশের মতো স্বাধীন ও সার্বভৌম নির্বাচন কমিশন নন!

ঢাকায় বিশ্বের সকল গুরুত্বপূর্ণ দেশের রাষ্ট্রদূত আছেন। বাংলাদেশে কি হচ্ছে আর কি ঘটতে যাচ্ছে সেটা তাঁরা সব সময়ই স্ব স্ব দেশের সরকারকে জানিয়ে রাখেন। ইউনূস প্রসঙ্গ, পোশাক শ্রমিকদের প্রতি অমানুষিক আচরণ, ইসলামপন্থীদের নিষ্পেষণ, শাপলা চত্বরের গণহত্যা, পদ্মা সেতুর ব্যাপারে দুর্নীতি ইত্যাদি বহু ব্যাপারে প্রায় সকল দেশের সঙ্গে হাসিনা সরকারের সম্পর্ক সর্বনিম্ন (ভারতীয় সাংবাদিকদের ভাষায় তলানি ছুঁয়ে গেছে)। প্রধানমন্ত্রী হাসিনা যে আপাত দৃষ্টিতে সেটা গ্রাহ্য করছেন না তার কারণ মাত্র একটা বিদেশী খুঁটির ওপর তিনি ঈমান এনেছেন, সে শক্তির ওপর তাঁর অপরিসীম ভরসা। বাংলাদেশকে আরেকটা সিকিম করার অভিপ্রায়ে ভারত ২০০৬-২০০৮ সালে মার্কিন প্রশাসন ও ছয় ঘোড়া উপহারপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী করেছে।

ভারতকে তিনি কি দিলেন আর কি পেলেন না

হাসিনা আশা করছেন ভারতকে সব কিছু দিতে তার আরো কিছু বাকি আছে, সুতরাং ভারত কিছুতেই মাঝ পথে তাকে রিক্ত হাতে বিদায় করবে না। বাংলাদেশের সীমান্তে অনুপ্রবেশ অথবা ফেলানী হত্যার মতো অমানুষিকতা বিডিআর কখনোই সহ্য করেনি। শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রী হবার ৫০ দিনের মধ্যেই অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে বিডিআর বিদ্রোহ হলো, ৫৭ জন উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা নিহত হলেন, হত্যালীলার মাঝপথে বিদ্রোহীরা গণভবনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ করলো, সেনাবাহিনী বিদ্রোহ দমন করতে আসছিল কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মাঝপথে তাদের থামিয়ে দিলেন, অকস্মাৎ মাথায় রুমাল বাঁধা কিছু অপরিচিত লোকের আবির্ভাব হলো পিলখানায় এবং হঠাৎ করেই আবার তারা হাওয়া হয়ে গেলো। মুক্তিযুদ্ধের পুরোধা বিডিআর বাহিনীকে রাতারাতি ভেঙ্গে দেওয়া হলো, শত শত বিডিআর জওয়ানকে শাস্তি দেওয়া হলো, কয়েদখানায় মারা গেলো অনেকে, কিন্তু বিদ্রোহের কারণ ও দায়িত্ব নির্ধারণের জন্যে কোন তদন্ত হলোনা।

নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ বেদম মার খাবে, শেখ হাসিনা আর প্রধানমন্ত্রী থাকবেন না-এই ধ্রুব সত্য নিয়ে ভারতের মিডিয়া ইতোমধ্যেই মরা

কান্না জুড়ে দিয়েছে। তারা যে দিল্লির সরকারের হৃদপিণ্ডের তড়পানির প্রতিধ্বনি করছে সেটাও জানা কথা। সত্য বটে শেখ হাসিনা দুই ধারায় এশিয়ান হাইওয়েকে ভারত থেকে আবার ভারতে নিয়ে শেষ করতে রাজি হয়েছেন। সত্য বটে রেল, সড়ক ও নদীপথে ভারতের মূল অংশ থেকে উত্তর-পূর্বের সাতটি অঙ্গরাজ্যে যাবার করিডোর এবং বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দর দুটিকে অবাধ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এবং ভারত এসবই পাচ্ছে বিনা ব্যয়ে, কেননা প্রধামনন্ত্রীর উপদেষ্টার মতে ভারতের কাছ থেকে টাকা নেওয়া অসভ্যতা হবে। কিন্তু ভারত এখনও আতঙ্কমুক্ত হতে পারছে না। ভারতীয়রা জানে বিনিময়ে তারা বাংলাদেশকে কিছুই দিতে পারেনি এবং বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এখন আগের যে কোন সময়ের চাইতে অনেক বেশি ভারত-বিরোধী।

শেখ মুজিব ১৯৭৪ সালেই বেরুবাড়ি ছিটমহলটি ভারতের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। বিনিময়ে ভারত নানা বাহানায় তিনবিঘা ছিটমহলটি বাংলাদেশকে দিতে অস্বীকার করে আসছে। তিস্তা নদীর পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরের কথা বলে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকা এসেছিলেন, বাংলাদেশের সংবর্ধনা পেয়েছিলেন। কিন্তু সে চুক্তি আজ অবধি স্বাক্ষরিত হয়নি। ইতোমধ্যে ৫৩টি অভিন্ন নদীতে ভারত কয়েকশো বাঁধ তৈরি করেছে, টিপাইমুখে বাঁধ তৈরি করে সুরমা ও কুশিয়ারাসহ মেঘনা নদীকে শুকিয়ে মারার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। দিল্লির সরকার জানে নির্বাচনে বিএনপি জয়ী হলে খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হবেন। শেখ হাসিনা ২০১০ সালের জানুয়ারিতে দিল্লি গিয়ে যেসব গোপন চুক্তি করে এসেছিলেন সেগুলো সংসদে পেশ করার জন্যে দলের ও দেশের দাবি প্রতিরোধ করা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জন্যে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। শেখ হাসিনার উপহার করিডোর ভোগ করা সে ক্ষেত্রে ভারতের ভাগ্যে নাও জুটতে পারে।

শেখ হাসিনা আশা করছেন আন্দোলন করে সরকার হঠাতে বিএনপি ও ১৮ দল এতোকাল ব্যর্থ হয়েছে। নির্বাচনের আগের কয়েক মাসও তারা বিদেশী দূতাবাসগুলোর এবং জাতিসংঘের চাপে বড়ো মাপের আন্দোলন করা থেকে বিরত থাকবে। তিনি তাঁর অতি পরিচিত কৌশলে বিভিন্ন বাহানা সৃষ্টি করে যদি কালক্ষেপণ করতে পারেন তাহলে শেষ মুহূর্তে তার পরিকল্পনা অনুযায়ী একটা লোক-দেখানো সাজানো-পাতানো নির্বাচন করে ঘোষণা দেবেন যে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়েছে এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন।

উন্মাদ গণ পলায়ন

শেখ হাসিনার বিকল্প নীল নকশা হচ্ছে দেশে অরাজকতা দেখা দিয়েছে অজুহাত দেখিয়ে তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করবেন এবং বর্তমান সংসদই

বহাল আছে বলে ঘোষণা দেবেন। নিশ্চয়ই এ লক্ষ্যেই তিনি সংসদ বহাল রেখে নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছেন। দেশের সকল সংবিধান বিশেষজ্ঞ তাতে বিস্মিত, স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। নির্বাচন কমিশনার আবু হাফিজও বলেছেন যে আগে থেকে সংসদ ভেঙ্গে না দিলে নির্বাচনে নানান জটিলতা দেখা দেবে।

জার্মানী থেকে ফিরে এসে খবর পেলাম কুয়ালালামপুর, দুবাই ও লন্ডনে বাড়ি ও ফ্ল্যাট কিনেছেন অনেক আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী। বিগত দু'তিন মাসে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার আওয়ামী লীগার বিভিন্ন দেশের ভিসা নিয়েছেন। বিগত পৌনে পাঁচ বছরে দেশ থেকে যে বহু হাজার কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে সেগুলো এখন বিদেশে সম্পত্তি ক্রয়ে কাজে লাগছে। শেখ হাসিনার নীল নকশা যাই হোক আওয়ামী লীগাররা বুঝে গেছেন গণ জোয়ারের মুখে নির্বাচন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না, শেখ হাসিনার গদিও বেহাত হলো বলে। অতএব 'সময় থাকিতে দাদা হও সাবধান'।

ইতোমধ্যে মন্ত্রীদের কথাবার্তা একেবারে বেসামাল হয়ে গেছে। মনে হতে বাধ্য তাঁরা সব উন্মাদ হয়ে গেছেন। হেফাজতে ইসলামকে হতমান করার লক্ষ্যে কোন কোন মন্ত্রী বলেছেন ইসলামের হেফাজত করবেন আল্লাহ্, হেফাজত নয়। ইসলাম সম্বন্ধে সামান্যতম জ্ঞান যাঁদের আছে তাঁরাই জানেন আল্লাহ্ নিজের হাতে কোন কিছু করেন না, সব কিছুই করান তাঁর বান্দাদের মাধ্যমে। এমনকি ইসলামের বাণীও তিনি মানুষের কাছে পাঠিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহর (দ) মারফত। আর বিরোধী দল, বিশেষ করে বিরোধী দলের নেতা বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যেসব গালাগাল করছেন কোন যুক্তিতর্ক দিয়ে তার জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। জবাব দিতে হলে শেখ হাসিনার এক-একটি উক্তির পাল্টা মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর আমার ফাঁসি চাই বইখানির এক-একটি অধ্যায় উদ্ধৃত করতে হয়।

শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হবার অনেক আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর পিতামাতা ও ভাইয়েদের হত্যায় বাংলাদেশের মানুষ কাঁদেনি: প্রতিশোধ নিতেই তিনি রাজনীতিতে এসেছেন। তাঁর সরকার ও ক্যাডাররা বহু হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। তাদের সন্তানরাও যে প্রতিশোধ নিতে চাইতে পারেন সেকথা কি শেখ হাসিনা কখনো ভেবে দেখেছেন? গণভবনে বসে তো অনেক কাঁদিয়েছেন বাংলাদেশের মানুষকে। আর কেন, প্রধানমন্ত্রী? এবারে ক্ষ্যান্ত দিন? দেশটাকে লণ্ডভণ্ড করে দেবেন না।

(লন্ডন, ১০.০৯.১৩)

নিজের মরা অন্যের ঘাড়ে চাপানোর হাস্যকর চেষ্টা

তথ্য মন্ত্রী হাসানুল হক ইনুর উক্তিতে কান না দেওয়াই আমি সঠিক বিবেচনা করেছি, তাঁর কথায় হাসা বা কাঁদার তো প্রশ্নই ওঠেনি। ইনু গত শুক্রবার কুষ্টিয়ায় এক প্রাথমিক স্কুলের ভবন উদ্বোধনকালে এমন একটা উক্তি করেছেন ঢাকার আদিবাসীদের একটা রসিকতা যাতে অপরিহার্য রকম প্রযোজ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। সে রসিকতা হচ্ছে 'ঘোড়ায় হুনলে হাসবো'। সম্ভাব্য যাত্রী অসম্ভব রকম হাস্যকর এবং অবাস্তব ভাড়া দিতে চাইলে ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান নাকি এ মন্তব্যটি করতো -'আস্তে কন সাব, ঘোড়ায় হুনলে হাসবো'।

হাসানুল হক ইনু বলেছেন 'মহাজোট সরকার দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না। এ বক্তৃতা দেবার আগে তথ্যমন্ত্রী বোধ হয় সেদিনের কোন পত্রিকার প্রথম পাতায়ও চোখ বুলাননি। কেননা সেদিনের সবগুলো পত্রিকায় একটা বড়ো খবর ছিল কানাডার আদালত পদ্মা সেতু দুর্নীতির দায়ে পূর্ববর্তী আওয়ামী লীগ সরকারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেছেন। প্রকাশিত সংবাদে আরো বলা হয়েছে, এ মামলায় আরো তদন্ত চলছে এবং সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনের বিরুদ্ধেও গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হতে পারে।

যোসেফ গোয়েবলসের সমগোত্রীয় বলে বর্ণনা করে আমি হাসানুল হক ইনুকে গৌরব দিতে চাইনা, কেননা তাঁকে আমি গোয়েবলসের সমগ্রোত্রীয় প্রতিভাধর বিবেচনা করিনা। তবে চেষ্টার জন্যে তাঁকে হয়তো সান্ত্বনা পুরষ্কার দিতে হবে। তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে বার বার উচ্চারিত হলে লোকে মিথ্যাকেও সত্যি বলে বিশ্বাস করবে। সে হিসেবে তাঁকে বড়জোর পাতি গোয়েবলসের সঙ্গে তুলনীয় বলা যেতে পারে। নইলে ইনু কি করে আশা করতে পারেন যে পদ্মা সেতু নিয়ে বিগত দেড়-দুই বছরের কেলেঙ্কারিগুলো সাধারণ মানুষ এতো তাড়াতাড়ি ভুলে যাবে? আরো একটা বিষয়। বিগত নির্বাচনের ইশতেহারে আওয়ামী লীগ মন্ত্রী ও সাংসদদের সম্পদের তালিকা প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সরকার যদি এতোই দুর্নীতি-বিরোধী হবে তাহলে সে প্রতিশ্রুতিটা কেন গিলে খাওয়া হলো?

গোয়েবলসীয় মিথ্যা প্রচারের তাণ্ডবকে বর্তমান সরকার ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো ধরে বাঁচতে চাওয়ার মতো বেপরোয়া প্রচেষ্টা হিসেবে গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী হাসিনা দিনের পর দিন বলে বলে বেড়াচ্ছেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে দেশের উন্নতি হয়, সাধারণ মানুষের ভাগ্য খুলে যায়, আর বিএনপি ক্ষমতা পেলে দেশে আকাল আসে, বিদেশে দেশের কুখ্যাতি রটে। তাঁর এই শেষ দাবিটাই খতিয়ে দেখা যাক। বিচার-বহির্ভূত হত্যার দরুন এই সরকারের মেয়াদের শুরু থেকেই দেশে দেশে হাসিনা সরকারের দুর্নাম রটেছে, এই অবৈধ হত্যা বন্ধ করার জন্যে বহু দেশের সরকার এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো জরুরি দাবি জানিয়েছে। পুলিশ ও র‍্যাবের হাতে সরকারের রাজনৈতিক বিরোধীদের গুম হয়ে যাওয়ারও বহু সমালোচনা হয়েছে বিশ্বজোড়া। যুক্তরাষ্ট্র বৃটেন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের কয়েকটি দেশের সংসদ থেকে ইলিয়াস আলীর মুক্তি দাবি করেছে। কিন্তু বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর সব অনুরোধ-উপরোধ অরণ্যে রোদনের শামিল হয়েছে।

পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু হবার আগেই ব্যাপক দুর্নীতির কারণে বিশ্ব ব্যাংক সেতুর অর্থায়ন করতে অস্বীকার করেছে। একই সঙ্গে জাপান এবং এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকসহ সকল দাতা দেশ ও সংস্থা সেতু নির্মাণের টাকা দিতে অস্বীকার করেছে। বিকল্প অর্থায়ন সংগ্রহের সকল সরকারি চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে এসে পরবর্তী মেয়াদে নিজস্ব সম্পদে সেতু নির্মাণ, কিছু মাটি কাটার কাজ এবং সেনাবাহিনীকে দিয়ে সেতু তৈরি করানো ইত্যাদি নানা কথা বলে ভোটদাতাদের প্রতারণা করার চেষ্টা হচ্ছে।

সরকারের ভয়ের আসল কারণ

বিশ্ব ব্যাংক দুর্নীতিতে জড়িতদের নামের তালিকা দিয়েছে সরকারকে, বলেছে এদের বিচার ও শাস্তি হলে বিশ্ব ব্যাংক আবার সেতুর অর্থায়ন করবে। কিন্তু তালিকার কোন কোন ব্যক্তির বিচার করতে সরকার কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। তারা ভয় করছে তাহলে এ দুর্নীতিতে সরকার ও আওয়ামী লীগের শীর্ষ ব্যক্তিদের দুর্নীতির কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়ে যাবে। কিন্তু এখানেই ব্যাপরটার পরিসমাপ্তি হচ্ছে না। বিষয়টি কানাডার আদালতে বিচারাধীন আছে। কানাডার পুলিশ তাদের দেশে, বাংলাদেশে, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে তদন্ত করছে। দুর্নীতিবাজ সরকার হিসেবে বাংলাদেশের নাম প্রায় প্রতিদিনই বিশ্ব মিডিয়ায় প্রচারিত হচ্ছে।

শেখ হাসিনা প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে সরকারি অর্থ ব্যয় করে আমলা ও কূটনীতিকদের দিয়ে তদ্বির করিয়ে ডজনখানেক অনারারী ডিগ্রি কিনেছিলেন।

এবারে ক্ষমতা পেয়ে তিনি একটা নোবেল পুরস্কার ক্রয়ের জন্যে অনুরূপভাবে আমলা ও কূটনীতিকদের দেশে দেশে পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের তদ্বিরে কোন ফল হয়নি। অন্যদিকে গ্রামীণ ব্যাংক বাবদ আদর্শস্থানীয় ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের সাফল্য বিবেচনা করে নোবেল কমিটি ড. মুহম্মদ ইউনূসকে শান্তি পুরস্কার দিয়েছে। দেশে-বিদেশে ইউনূসের প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক অঙ্গরাজ্য এবং পশ্চিম গোলার্ধের আরো কয়েকটি দেশে গ্রামীণ ব্যাংকের আদলে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। কয়েকটি দেশ ইউনূসকে সম্মানিত করেছে। যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে প্রেসিডেন্টের পদক এবং কংগ্রেশনাল সুবর্ণ পদক দিয়ে সম্মানিত করেছে।

চরম ঈর্ষাতুর শেখ হাসিনার পক্ষে এতো কিছু হজম করা সম্ভব ছিল না। গ্রামীণ ব্যাংককে ধ্বংস এবং ড. ইউনূসকে হেনস্তা ও হয়রানি করার এমন কোন হেয় উপায় নেই যা শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকার করেননি। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন, তাঁর স্ত্রী ও বারাক ওবামার প্রথম মেয়াদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিন্টন ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংকের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা না নিতে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে বার বার অনুরোধ করেছেন। হিলারি ক্লিন্টন কয়েকবার হাসিনাকে টেলিফোন করেছেন, অনুরোধ জানাতে স্বয়ং ঢাকাতেও এসেছিলেন। মার্কিন সরকার, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং আরো বিভিন্ন দেশের সরকারও অনুরূপ অনুরোধ করেছে। কিন্তু ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা দুরারোগ্য টিউমারের মতো প্রধানমন্ত্রীর মস্তিষ্কে গেড়ে বসেছে। মনে হচ্ছে সে ব্যাধি থেকে তাঁর আর পরিত্রাণ নেই। এদিকে বাংলাদেশ সরকারের, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর আচরণে সারা বিশ্বে ছি-ছি পড়ে গেছে।

বাংলাদেশের বিদেশী মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস পোশাক নির্মাণ শিল্প। কিন্তু শেখ হাসিনার দ্বিতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হবার সময় থেকে এ শিল্পের ওপর যেন বিধাতার অভিশাপ নেমে এসেছে। কারখানায় শ্রমিকদের প্রাণের নিরাপত্তা বিধান এবং বেতন ও চাকরির শর্ত উন্নয়নের জন্যে বিদেশী ক্রেতারা এবং মার্কিন সরকার ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন কয়েক বছর ধরে চাপ দিয়ে আসছে। কিন্তু শেখ হাসিনার সরকার কিছুই করেনি সে ব্যাপারে। তাঁর দ্বিতীয় দফার শাসনকালে কয়েকশ' গার্মেন্ট কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, কয়েকশ' অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বিভিন্ন কারখানায়, শ' শ' শ্রমিক মারা গেছে। শ্রমিকদের প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধ ইত্যাদি নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শ্রমিকের প্রাণ রক্ষায় সরকার নিষ্ক্রিয় কেন?

কারখানা মালিকদের সঙ্গে সরকারের অতিমাত্রিক হৃদ্যতা সরকারি নিষ্ক্রিয়তার বড়ো কারণ। মালিকরা সরকারকে আর কি কি ভাবে সাহায্য করে

বলা যাবে না, কিন্তু কারখানা শ্রমিকদের দিয়ে সরকারি দলের সভা-সমাবেশে উপস্থিতি বড়ো করে দেখানো সকলের চোখের সামনেই হচ্ছে। রাণা প্লাজার ট্র্যাজেডিরও সেটাই ছিল প্রত্যক্ষ কারণ। সরকারের নারী সমাবেশে কারখানাগুলোর নারী শ্রমিকদের হাজির করানোর জন্যে মালিকদের ওপর চাপ এসেছিল। সেজন্যেই ছুটির দিন হলেও শ্রমিকদের কাজে আসতে বাধ্য করা হয়েছিল। তা না হলে সে হাজার দেড়েক শ্রমিক প্রাণে বেঁচে যেতে পারতো।

এতো বড়ো ট্র্যাজেডির পরেও বাংলাদেশ সরকারের সম্বিৎ ফিরে আসেনি। মাত্র গত রবি ও সোমবারও দাবি আদায়ের জন্যে প্রতিবাদকারী শ্রমিকদের ওপর পুলিশ হামলা করেছে। বাংলাদেশের পোশাক শিল্প সম্বন্ধে একটা প্যানোরামা অনুষ্ঠান প্রচার করেছে বিবিসি টেলিভিশন মাত্র গত সোমবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাতে। কারখানা মালিকদের দুর্নীতি এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তার প্রতি তাঁদের উপেক্ষার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে অনুষ্ঠানে। বহু পাঠক প্রায়ই আমাকে জানাচ্ছেন, অসন্তোষ, বিক্ষোভ, পুলিশী সন্ত্রাস এবং ট্র্যাজেডির ডামাডোলের মধ্যে বহু পোশাক কারখানার মালিকানা চলে যাচ্ছে ভারতীয়দের হাতে। ভারতীয়রা বিনা ভিসায় এসে বাংলাদেশে থাকছে এবং সেসব কারখানা চালাচ্ছে।

রানা প্লাজার ট্র্যাজেডির পর থেকে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প কারখানা গুলোতে শ্রমিকদের প্রাণের নিরাপত্তা, তাদের ইউনিয়ন করার অধিকার, বেঁচে থাকার মতো মাইনে দেওয়া ইত্যাদি নানা ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু উদ্যোগগুলো কারখানা মালিক কিম্বা বাংলাদেশ সরকার করছে না, করছে বিদেশী ক্রেতারা। সেসব খবর বিদেশী মিডিয়ায় দিনের পর দিন ফলাও করে প্রচার হচ্ছে। এটা যদি বাংলাদেশ সরকার তাদের গালে চপেটাঘাত মনে না করে তাহলে অপমান আর কাকে বলে বুঝে ওঠা কঠিন। এখন আবার শোনা যাচ্ছে বর্তমান সরকারের একজন ধিকৃত ও ঘৃণিত মন্ত্রীকে পোশাক শ্রমিকদের নেতা করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে বলেই মনে হয়।

বিশ্বের গালে হাসিনার চপেটাঘাত

একমাত্র ভারত ছাড়া পৃথিবীতে বোধ হয় এমন কোন দেশ নেই যারা সকলের গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচন পদ্ধতি নির্ণয়ের জন্যে সংলাপ করার তাগিদ দেয়নি শেখ হাসিনাকে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন তো বারম্বার সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘও এখন সে চেষ্টায় যোগ দিয়েছে। জাতিসংঘ মহাসচিবের রাজনৈতিক সহকারী ঢাকায় এসে চারদিন ছিলেন। তাঁর

চাপে সরকার বিএনপি ও বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সংলাপে বসতে রাজি হয়েছিল। মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের মহাসচিব সৈয়দ আশরাফ জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিবকে বলেছিলেন যে সংলাপের প্রস্তাব দিয়ে তাঁরা অবিলম্বে বিএনপি নেতৃত্বকে চিঠি লিখবেন। কিন্তু তিনি ঢাকা ছেড়ে যাবার পর থেকেই মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতারা সে প্রতিশ্রুতি গিলে খেয়েছেন।

বান কি মুন স্বয়ং টেলিফোন করেছেন দুই নেত্রীকে। তার কোন সুপ্রভাব সরকারে ও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে হয়েছে বলে মনে হয় না। সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্রের নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি চিঠি লিখেছেন শেখ হাসিনা ও বিএনপি নেত্রীকে। খালেদা জিয়া গত সপ্তাহে অনুকূল সাড়া দিয়ে সে চিঠির জবাব দিয়েছেন। শেখ হাসিনা জবাব দিয়েছেন বলে শুনিনি। এসব খবর বিশ্বের মিডিয়ায় দিনের পর প্রচারিত হচ্ছে। তার পরেও কেউ যদি বলে যে বর্তমান সরকারের আমলে বিদেশে বাংলাদেশ সরকারের কোন সম্মানের আসন আছে তাহলে তাকে বেহায়া না বলে উপায় থাকবে না।

শেখ হাসিনা আজকাল এত বেশি বক্তৃতা-বিবৃতি দিচ্ছেন যে খেই রাখা কঠিন। তবে একটা সাধারণ সুর আছে সেসব বক্তব্যের মধ্যে: 'মিয়ার গায়ে গন্ধ নেই' এবং 'যতো দোষ নন্দ ঘোষ'-তাঁর, তাঁর সরকার এবং আওয়ামী লীগের কোন দোষ নেই, সব দোষ বিএনপির। তবে বিচক্ষণ পর্যবেক্ষকের বুঝতে অসুবিধা হবে না যে নিজের এবং নিজের দলে যা যা দোষ তিনি লক্ষ্য করছেন সব কিছুই তিনি চাপিয়ে দিচ্ছেন খালেদা জিয়া, তাঁর প্রাক্তন তিন সরকার এবং বিএনপির ওপর।

যেমন, তিনি বিএনপিকে বলেছেন উড়ে এসে জুড়ে বসা দল। প্রধানমন্ত্রী কি নিজের এবং নিজের পরিবারের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ঘুরিয়ে? যেমন সাত-আট বছর বিদেশে থেকে উড়ে এসে তিনি আওয়ামী লীগের প্রধান হলেন? যেমন কদিন পরে পরেই গরীব দেশের ব্যয়ে শ'- দেড়শ' চেলা-চামুণ্ডা নিয়ে বিদেশে না গেলে তাঁর ভালো লাগে না? অথবা যেমন তাঁর পুত্র জয় আজীবন বিদেশে কাটালেন এবং এখন মাঝে মাঝে সপ্তাহ-খানেকের জন্যে আমেরিকা থেকে উড়ে এসে বাংলাদেশে বিপ্লব করতে এবং বাংলাদেশের নেতা হতে চাইছেন?

শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক কথাবার্তা কি আপনাদেরও সেই পুরনো গল্পটার কথা মনে করিয়ে দেয় না? সেই যে কুচক্রী মামলাবাজ বুড়োটা মরার আগে ছেলেদের বলে দিয়ে গিয়েছিল তাকে কবর না দিয়ে যেন গলায় দড়ি দিয়ে পাশের বাড়ির বাগানে একটা গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়। তাহলে লোকে মনে করবে পাশের বাড়ির লোকেরা তাকে মেরে গলায় দড়ি দিয়ে গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছে এবং পুলিশ সে বাড়ির লোকদের হয়রানি করবে।

তথ্যকে তিনি সুগম করছেন, না হত্যা?

লিখতে শুরু করেছিলাম তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুর প্রসঙ্গ দিয়ে। তাঁকে তথ্য-হন্তা বলা কি অন্যায় হবে? বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত যে দেশে এবং সমাজে যেসব অন্যায় হয় সেগুলো প্রতিকারের আশায় লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরা সাংবাদিকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। সাংবাদিকের কর্তব্য সমাপন এবং তথ্য সঞ্চালন সুগম করা তথ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব হওয়া উচিত। কুইক রেন্টাল বিদ্যুতের ব্যাপারে ২০ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছিল এবং সরকারের ভেতরের ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা তাতে জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ আছে। সাংবাদিক দম্পতি রুনি আর সাগর সে দুর্নীতি সম্বন্ধে তদন্ত করছিলেন। গভীর রাতে নিজেদের শোবার ঘরে এবং পাঁচ বছরের ছেলের চোখের সামনে তাঁরা খুন হলেন, তাঁর ল্যাপটপটা নিয়ে গেলো খুনিরা। দেড় বছর পেরিয়ে গেছে কিন্তু খুনের রহস্য উদঘাটিত হয়নি। তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু কিছু করেছেন সে সম্বন্ধে? অথবা বর্তমান সরকারের আমলে ১৮ জন সাংবাদিক হত্যা এবং বহু সাংবাদিকের নির্যাতন সম্বন্ধে?

বরং দেখা যাচ্ছে প্রধান নির্যাতক হচ্ছে সরকার। চারজন নাস্তিক ব্লগার দেশের ৯০ শতাংশ মানুষের ধর্ম বিশ্বাসের ওপর চরম আঘাত হেনেছিল। কোন প্রতিকার করেনি সরকার, বরং জামাই আদরে লালন করছিল তাদের। মাহমুদুর রহমান তাঁর সম্পাদিত আমার দেশ পত্রিকায় ইসলাম- দ্রোহিতার খবরটা প্রকাশ করেছিলেন। কোন বিচার ছাড়াই মাহমুদুর রহমান প্রায় ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করছেন, রিমান্ডের নামে তাঁর ওপর দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে। আমার দেশ পত্রিকার ছাপাখানায় তালা লাগানো হয়েছে, অন্য কোন মুদ্রণালয়ে এ পত্রিকা প্রকাশ সরকার অসম্ভব করে দিয়েছে।

ত্রিশ লাখ লোকের সমাগম হয়েছিল গত ৫ মে শাপলা চত্বরে। এটা যদি সংবাদ না হয় তাহলে সংবাদ আর কাকে বলবো? কিন্তু সরকারের আজ্ঞাবহ টেলিভিশন চ্যানেলগুলো সে সংবাদ প্রচার করেনি। প্রচার করেছিল মাত্র দিগন্ত টেলিভিশন এবং ইসলামী টেলিভিশন। সম্প্রচারের মাঝ পথেই সরকার এ দুটি চ্যানেল বন্ধ করে দিয়েছে।

সোনার বাংলাদেশ নামে একটা ব্লগ বাংলাদেশের জন্যে বিরল একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। তারা সকল মহলের অনুসারী কলামিস্টদের রচনাগুলো অবিকৃত ভাবে প্রচার করে যাচ্ছিলো। কিন্তু বর্তমান সরকারের তথ্যনীতি হচ্ছে সত্য প্রচারের সকল পথ বন্ধ করে দিয়ে শুধুমাত্র নিজেদের গোয়েবলসীয় মিথ্যাগুলো প্রচার করা। হাসানুল হক ইনুর মন্ত্রণালয় সোনার বাংলাদেশ ব্লগটা বন্ধ করে দিয়েছে। আরো কোন কোন ব্লগও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে

শুনেছি। তথ্য সঞ্চালনের পথ সুগম করা যদি তথ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব হয় তাহলে হাসানুল হক ইনুকে কেন তথ্য-হন্তা বলা যাবে না?

'কোথায় সিরাজ শিকদার'

হাসানুল হক ইনু জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের অন্যতম নেতা ছিলেন, মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ছিলেন, লন্ডনে বিবিসি বাংলা বিভাগে এসে সাক্ষাৎকারও দিয়ে গেছেন। সেজন্যে তাঁকে তখন শ্রদ্ধা করতাম। পরবর্তীকালে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ফিঁকে হতে হতে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যে রক্ষী বাহিনীর হাতে ৩০ থেকে ৪০ হাজার রাজনৈতিক কর্মী নিহত হয়েছেন। শুনেছি তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন জাসদ দলীয়। বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'লাল ঘোড়া দাবড়াইয়া দিব'। তার পরে পরেই জাসদ নেতা সিরাজ শিকদার মাথার পেছন দিকে একটি মাত্র গুলির আঘাতে মারা যান। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব তারপর আত্মপ্রসাদের সুরে বলেছিলেন, "কোথায় সিরাজ শিকদার?"

জাসদের অন্যতম নেতা হিসেবে হাসানুল হক ইনু সেসব হত্যার প্রতিবাদ করেছিলেন বলে শুনেছেন কেউ? অথবা সিরাজ শিকদারের হত্যার বিচার দাবি? অন্যদিকে কর্নেল তাহেরের কোর্ট মার্শাল (সামরিক আদালতে বিচার) হয়েছিল ৩৮ বছর আগে। সে বিচার সম্বন্ধে তদন্তে আগ্রহের কমতি ছিলনা ইনুর। এ সবের পুরস্কার হিসেবেই কি তিনি মন্ত্রী হয়েছেন? নাকি মন্ত্রী হবার আশায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ সোচ্চার হয়নি? হাসানুল হক ইনু বলেছেন, লন্ডনে তাঁর ওপর হামলা আসলে মিডিয়ার ওপরই হামলা। বাংলাদেশের মিডিয়াকে তিনি নিজের সঙ্গে সমার্থক বিবেচনা করছেন। শেখ মুজিব নিজেকে বাংলাদেশ ভাবতেন। শেখ হাসিনার কাজেকর্মে মনে হয় তিনিও সেটাই ভাবেন। দেখা যাচ্ছে হাসানুল হক ইনুকেও সে একই ব্যাধিতে পেয়ে বসেছে। 'যে যায় লংকা, সে হয় রাবন'।

(লন্ডন,২৪.০৯.১৩)

সরকারের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার এখনই সময়

ফলি মাছ ফুটুস কাটে এখানে, দম নেয় বিশ হাত দূরে। শেখ হাসিনা রামপাল তাপ-বিদ্যুৎ কারখানার ভিত্তি স্থাপন করলেন। কিন্তু তিনি রামপালে ছিলেন না, ছিলেন কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায়। বাংলাদেশের মানুষ সুন্দরবনের ধার ঘেঁষে কয়লা জ্বালানো বিদ্যুৎকেন্দ্র চায় না, আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদীরাও এর ঘোরতর বিপক্ষে। তাঁদের মতে কয়লা জ্বালানো বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদূষণে সুন্দরবনের অনন্য ম্যানগ্রোভ অরণ্য ধ্বংস হয়ে যাবে, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে।

শেখ হাসিনাকে ভিত্তি স্থাপনের রাণী বলা চলে। উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার ওয়াইল্ড ওয়েস্টে আইন ছিল না। স্থানীয় প্রশাসকরা নিয়ম করেছিলেন, আপনি যদি অন্য সকলের আগে কোন জমিতে গিয়ে একটা খুঁটি গেড়ে দেন তাহলে সে জমি আপনার হয়ে যাবে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সে রকমেরই মনে করেন, তিনি একটা ভিত্তি প্রস্তর গেঁড়ে দিলেই সে প্রকল্পটির অর্জন তাঁর হয়ে যাবে। বিগত পৌনে পাঁচ বছরে বহু ভিত্তি তিনি স্থাপন করেছেন। কিন্তু কয়টির কাজ সমাধা হয়েছে আর কয়টির কাজ শুরু হয়েছে জরিপ করতে গেলে আপনাকে হতাশ হতে হবে।

অথচ এই প্রধানমন্ত্রী আর এই সরকার ভিত্তি স্থাপনকে নিজেদের সাফল্য হিসেবে জাহির করতে চান। কারণ বোধ হয় এই যে তাঁরা পদ্মা সেতুটি গিলে খেয়েছেন, তার কিছুটা অপপ্রভাবও দূর করা না গেলে নির্বাচনে কী করে মুখ দেখাবেন্ তাঁরা। সেজন্যেই সেদিন যখন রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপন করলেন শেখ হাসিনা সরকারের অনুগত মিডিয়া ঢাকঢোল পিটিয়ে সেটাকে সে প্রকল্পের উদ্বোধন বলে প্রচার করেছিল। ভিত্তি স্থাপন আর প্রকল্পের উদ্বোধনের মধ্যে যে ব্যয়বহুল আর কষ্টসাধ্য নির্মাণ প্রক্রিয়া অবশিষ্ট থাকে সেটা বেমালুম চেপে গিয়ে তারা দেশের মানুষকে বোকা বানাতে চেয়েছে।

শোনা যাচ্ছে আগামী কয়দিনের মধ্যে শেখ হাসিনা আরো কয়টি অস্তিত্ব-বিহীন প্রকল্পের ভিত্তি স্থাপন করবেন যেগুলোর মূলধন সংস্থান, স্থান নির্ধারণ, এমনকি নীল নকশাই হয়তো তৈরি হয়নি। সন্দেহ নেই যে এই সরকারের

সাফল্যের খাতার শূন্য পাতাগুলো মিথ্যা সাফল্য দিয়ে অংশতও পূরণ করা তাদের উদ্দেশ্য।

রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তি প্রধানমন্ত্রী রামপালে গিয়ে স্থাপন করতে পারেননি। এ প্রকল্পের বিরুদ্ধে স্থানীয় এবং জাতীয় প্রতিরোধ খুবই প্রবল। প্রতিবাদ জানাতে ঢাকা থেকে বিশিষ্টজনদের একটা লং মার্চ পথে থেমে থেমে রামপাল পর্যন্ত গিয়েছিল। সর্বত্রই তাঁরা স্থানীয় লোকদের প্রতিরোধ দৃঢ়তর করার চেষ্টা করেছেন। আঠারো দলের জোটের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াও বলেছেন রামপালে কয়লা জ্বালানো বিদ্যুৎ কেন্দ্র কিছুতেই হতে দেওয়া হবে না। রামপালে গেলে শেখ হাসিনার প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়ার ভয় ছিল। হয়তো সে কারণেই তিনি কাজটা রিমোট কন্ট্রোলে সারার চেষ্টা করেছেন।

রিমোট কন্ট্রোলের নির্বাচন

রিমোট কন্ট্রোলে আরেকটা কাজও করেছেন শেখ হাসিনা। রামপালের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে ভিডিয়ো লিংকে কথা বলেছেন। তার মাত্র আগের সপ্তাহে জাতিসংঘে তিনি ড. মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, ফটো তুলিয়েছেন। নতুন এমন কি জরুরি ব্যাপার ঘটলো যে ভিডিয়ো লিংক করে চমক আর চটক দেখাতে হলো তাঁকে? বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কি ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বলতে চেয়েছিলেন: আপনারা যা যা চেয়েছেন আমি দিয়ে দিয়েছি, এবারে আপনারা অনুগ্রহ করে আমাকে গদিতে রাখার ব্যবস্থাটা করুন কোন মতে?

ভিত্তি স্থাপনের এই হিড়িক আর ত্রস্ততা এবং আরো কিছু ব্যাপার-স্যাপার থেকে মনে হচ্ছে শেখ হাসিনা আরো একটা চমক দেখাতে যাচ্ছেন। জামায়াত-শিবিরের কর্মীদের গ্রেফতার বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিএনপি এবং ১৮ দলের জোটের নেতা-কর্মীদের ওপর পুলিশের নজরদারীও বেড়ে গেছে। শোনা যাচ্ছে ঈদের পরে পরেই তাঁদেরও গ্রেফতার করে জেলে পোরা হবে। সরকারি কর্মচারীদের জন্যে হঠাৎ করে উদারভাবে ২০ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সেনা-সামন্তরা বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে হুশিয়ারি ও গালিগালাজ তুঙ্গে তুলেছেন। লক্ষণীয় যে শেখ হাসিনা তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভূর বিরুদ্ধে নতুন কোন অপবাদ আবিষ্কার করতে পারছেন না। এখন তিনি নিজের অপকর্মগুলো একে-দুয়ে খালেদা জিয়ার ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করছেন।

এসব কি আপনাদের আসন্ন কোন চমকের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে না? মনে করা যেতে পারে যে ২৫ অক্টোবর থেকে নতুন আন্দোলন করার সুযোগ

খালেদা জিয়াকে দিতে চাননা শেখ হাসিনা। খুব সম্ভবত সে তারিখের আগেই তাঁর একদলীয় নির্বাচনের (এ বি এম মূসার ভাষায় রিমোট কন্ট্রোলের নির্বাচন) ঘোষণা দিয়ে দেবেন হাসিনা। সে জন্যেই ধর-পাকড়ের হিড়িক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকার তাদের একদলীয় নির্বাচনে একদলীয় বিজয়ের পথের কাঁটাগুলো সরিয়ে ফেলতে চায়।

এটাই যদি সরকারের পরিকল্পনা হয় তাহলে গোটা সিনেরিয়োটা কেমন হতে পারে? স্বল্পতম সময়ের ব্যবধানে তারা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবে। সরকার জানে যে ভোট দিতে বেশি লোক আসবে না। সময়ের স্বল্পতার এবং নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে মতানৈক্যের কারণে ভারত ছাড়া আর কোন দেশ থেকে পর্যবেক্ষকও সম্ভবত আসবেন না। ডুপ্লিকেট ব্যালট বাক্সগুলো আগে থাকতেই ভরাট করে রাখা হবে। খালেদা জিয়া নির্বাচন প্রতিরোধ করার জন্যে কমিটি গঠনের ডাক দিয়েছেন। দলাদলি ইত্যাদি কারণে সরকারের শর্ট-নোটিশ নির্বাচনের আগে কমিটিগুলো গঠিত নাও হতে পারে। হলেও ২০০৮ সালের মতো আওয়ামী লীগ ক্যাডার দিয়ে ভারাক্রান্ত ডিজিএফআই এবং এন এসআই বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রস্তাবিত কমিটির সদস্য এবং সাধারণভাবেই ১৮ দলের জোটের নেতা-কর্মীদের ভয় দেখিয়ে আসবে, যাতে তাঁরা ভোট কেন্দ্রের ধারে-কাছেও না যান।

ষড়যন্ত্রের সম্ভাব্য সিনেরিয়ো

তা সত্ত্বেও সাহস করে যাঁরা ভোট কেন্দ্রে যাবেন কী দেখবেন তাঁরা? উত্তর পাড়ার তৃতীয় শক্তি যদি ভোট কেন্দ্র পাহারা দিতে সরকারের ডাকে সাড়া নাও দেয় তাহলেও দলীয়কৃত পুলিশ ও র‍্যাব, আওয়ামী লীগের ক্যাডার আর বিজিবি দিয়ে কেন্দ্রগুলো ঠেঁসে রাখবে সরকার। বাংলাদেশে বহু লোক বিশ্বাস করে বিডিআর বিদ্রোহের সময় এবং গত ৫ মে ভোর রাতে শাপলা চত্বরের অভিযানে ভোল-বদলানো বিএসএফও তৎপর ছিল। সে সবের পুনরাবৃত্তি যে সরকারের একতরফা ভোটের দিনেও হবে না কে জানে? এখন আবার বিএসএফ-বিজিবি যৌথ টহলের কথাবার্তা শুরু হয়েছে। এই যৌথ টহল কি ভোটের দিন নির্বাচন কেন্দ্রগুলোতেও প্রসারিত হবে?

তারপর প্রশ্ন ওঠে ফলাফল নিয়ে। বিএনপির ভেতরেও কিছু গদি ও অর্থলোভী আছেন খালোদা জিয়ার বয়কটের ডাক সত্ত্বেও যাঁরা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে হলেও নির্বাচন প্রার্থী হবেন। তাঁদের দু'একজন এবং বামের জোটের জনকয়েককে বিজয়ী ঘোষণা করে সরকার ফলাফলের ঘোষণা দেবে। ভারত ছাড়া বহু দেশের সরকারই শেখ হাসিনার একতরফা নির্বাচনের ফলাফলকে

বিশ্বাসযোগ্য মনে করবে না। কিন্তু ভারতের চাপ এবং অন্যান্য কূটনৈতিক স্বার্থ বিবেচনা করে আমতা-আমতা করে হলেও অবশেষে তারা সরকারের ঘোষিত ফলাফলকে গ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা দেবে। বিগত দু'তিন বছরে বিএনপি এবং ১৮ দলের জোটের নেতারা কূটনীতিকদের সাথে বহু বৈঠক করেছেন, বহু খানাপিনা করেছেন। কিন্তু তাতে নিরপেক্ষ নির্বাচন এগুনোর বদলে পিছিয়ে যাচ্ছে বলেই মনে হয়। খানাপিনা আর বৈঠকের কোন বাস্তব মূল্য থাকলে সেই কবে তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি স্বীকৃতি পেতো, খালেদা জিয়ার প্রধানমন্ত্রী হওয়া সুনিশ্চিত হয়ে যেতো।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস কূটনীতিকদের মতামতকে বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে বিএনপি এবং ১৮ দলের জোট গুরুতর ভুল করেছে। সরকার পতনের আন্দোলন যখন তুঙ্গে উঠেছে কূটনীতিকদের পরামর্শ শুনতে গিয়ে বিরোধী জোট তখন ক্ষ্যান্ত দিয়েছিল। আমার তখন ছোট বেলায় পড়া সিরাজ-উদ-দ্দৌল্লা নাটকের পলাশীর যুদ্ধের দৃশ্যের সে কথাগুলো মনে হয়েছে। মীর জাফরের লোকেরা সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে প্রচার করছিল, "শোন ওহে বন্ধুগণ, করো অস্ত্র সম্বরণ। নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ।" এ কলামে একাধিক বার আমি বিরোধী জোটকে সতর্ক করেও দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, আন্দোলনে একবার ভাঁটা পড়লে সে আন্দোলন নতুন করে চাঙ্গিয়ে তোলা কঠিন হবে। দু'হাজার আট সালের মাস্টারপ্ল্যানের নির্বাচনে গদি দেবার বিনিময়ে ভারত শেখ হাসিনার সরকারের কাছ থেকে অনেক কিছু আদায় করে নিয়েছে। শেখ হাসিনার দিল্লিতে স্বাক্ষরিত গোপন চুক্তিগুলোতে কী কী দিতে রাজি হয়ে এসেছিলেন আমরা জানিনা। সেসব চুক্তির বিবরণ কখনো প্রকাশ করা হয়নি। এমনকি সংসদ সদস্যদের কাছেও নয়। কিন্তু আমরা দেখেছি এশিয়ান হাইওয়ে, বিনা শুল্কে আমাদের সড়ক রেল ও নদী পথে করিডোর এবং আমাদের সমুদ্র বন্দর দুটোর অবাধ ব্যবহার দিল্লির সরকার আদায় করে নিয়েছে।

বাংলাদেশকে উলফাদের সঙ্গে ঠেলে দেবেন না

একাত্তরে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ভারত তাঁদের পাকিস্তানের হাতে তুলে দেয়নি। উত্তর পূর্ব ভারতের কিছু মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশের কারাগারে হলেও আশ্রয় পেয়েছিলেন। শেখ হাসিনার সরকার একে-দুয়ে তাঁদের ভারতের হাতে এবং খুব সম্ভবত নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে তুলে দিয়েছে।

সর্বশেষ আমাদের সুন্দরবন, আমাদের পরিবেশের সর্বনাশ করে শেখ হাসিনা রামপালে কয়লা-জ্বালানো বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের অধিকার ভারতের হাতে

তুলে দিলেন। কিন্তু এখানেই ভারতের চাওয়ার শেষ নেই। বাংলাদেশকে হয় পুরোপুরি ভারতের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া, নয়তো প্রাথমিকভাবে সিকিমের মতো করদ রাজ্যে পরিণত করা ভারতের লক্ষ্য বলে বহুদিন ধরেই পরিষ্কার হয়ে গেছে। শেখ হাসিনাকে আরেক মেয়াদে গদিতে রাখা গেলে সে উদ্দেশ্যও সফল হবে বলে দিল্লি আশা করতে পারে।

কিন্তু তার পরিণতি সম্বন্ধে ভারতের পূর্ণ উপলব্ধি আছে কি না পরিষ্কার নয়। বাংলাদেশের মানুষ এবং বিদেশের মিডিয়া বেশ কিছুদিন আগে থাকতেই বলে আসছে আওয়ামী লীগ পুরোপুরি গণ সমর্থনহীন হয়ে গেছে। ভারতীয় মিডিয়া তো পরিষ্কার বলে দিয়েছে, আওয়ামী লীগ সরকারের জনপ্রিয়তা তলানীতে ঠেকেছে। এমতাবস্থায় পচন ধরা বর্তমান সরকারকে ফরমালিন ইনজেকশন দিয়ে আরো এক মেয়াদে গদিতে রাখার অর্থ হবে ভারত বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং সুসম্পর্ক রাখার ইচ্ছা পুরোপুরি পরিত্যাগ করেছে। হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের এক পর্যায়ে রাষ্ট্রপতি হবার আগে প্রণব মুখার্জী নাকি ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ণ কম্যান্ডকে সতর্কাবস্থায় রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ভারতের বিশাল সামরিক শক্তির ভয় দেখানো অবশ্যই হাসিনার সমর্থকদের একটা বড়ো ভরসা।

একাত্তরেও পাকিস্তানীরা তাদের সমরশক্তির ভয় দেখিয়ে বাংলাদেশীদের গণতন্ত্রের আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার চেষ্টা করেছিল। তখন যেসব ছেলে পাকিস্তানীদের ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ি চলাচল অসম্ভব করে দিয়েছিল তারা এবং তাদের উত্তরসূরীরা এখনো বাংলাদেশেই আছে। আর নদীপথ ও সড়কগুলো অচল করে দেবার টেকনিকও হারিয়ে যায়নি। শেখ হাসিনাকে আবারো গদিতে বসিয়ে দিল্লির সরকার যদি বাংলাদেশের গণতন্ত্রের শিখাটি নিভিয়ে দিতে চায় তাহলে অবশ্যই এখানে দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে এবং উত্তরপূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্যের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে তারা হাত মেলাবে।

বিচ্ছিন্নতাবাদে জর্জরিত ভারত

উত্তরপূর্বের সাত বোন নামে পরিচিত রাজ্যগুলো সুবিচারের আশা পরিত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছে চার দশকেরও বেশি আগে। ভারত তার বিশাল সমরশক্তি দিয়েও সে যুদ্ধ বন্ধ করতে পারেনি। বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে সে করিডোর নিচ্ছে সাত বোনের বিরুদ্ধে দলন প্রক্রিয়া শক্তিশালী এবং চীনের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে অরুণাচলে হিমালয়ের ওপর ভারী অস্ত্রশস্ত্র পাঠানোর পথ সুগম করতে। শুধু উত্তরপূর্বেই নয়, দিল্লি সরকারের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ক্রমেই

জোরদার হচ্ছে। বিহার ভেঙ্গে ঝাড়খণ্ড হয়েছে। পাঞ্জাব সেই কবে দু'টুকরো হয়ে হারিয়ানার জন্ম দিয়েছে। ১৯৮৪ সালের সামরিক অভিযানের পরেও শিখদের পৃথক রাজ্যের দাবি মাঝে মাঝেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। অন্ধ্র প্রদেশ মাত্র সেদিন দু'ভাগ হলো, জন্ম হলো নতুন রাজ্য তেলেঙ্গানার। জলপাইগুড়ি আর দার্জিলিংকে পৃথক করে গোর্খাল্যান্ড করারও আন্দোলন হচ্ছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে এগুলোর প্রত্যেকটি দাবি বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং সেসব দাবিতে অনিবার্যভাবেই সন্ত্রাস ও হানাহানি হয়েছে। এই যেখানে অবস্থা সেখানে খণ্ডিত ভারতবর্ষকে আঠা দিয়ে জোড়া লাগানোর স্বপ্ন আহাম্মকেই দেখতে পারে। বাংলাদেশের তথাকথিত প্রগতিবাদী পুঁটি মাছের তড়পানি তার চাইতেও বড়ো মূর্খতা। সাত বোন দিল্লির শেকল কাটিয়ে বেরিয়ে যাবেই। সে প্রক্রিয়ায় যদি বাংলাদেশকেও ঠেলে দেওয়া হয় তাহলে যে বিভীষিকা সৃষ্টি হবে দিল্লির কর্তারা এখনো সেটা বুঝে উঠতে পারেননি। এবং তার সীমানা ছুঁয়ে সে রকম তোলপার আর উথাল-পাতাল দেখা দিলে বেইজিং নীরব হয়ে থাকবে বলে মনে করার কোন কারণ নেই। খালেদা জিয়া তাঁর সিলেটের ভাষণেও উল্লেখ করেছেন যে চীন বাংলাদেশের সঙ্গে সযোগিতা করতে চায়, বাংলাদেশের বন্ধু হতে চায়।

খালেদা জিয়া এখন কি করবেন?

খালেদা জিয়া এখন কি করবেন? ঈদের জন্যে দেরি না করেই একটা ঘোষণা তাঁকে প্রচার করতে হবে। যে মুহূর্তে সরকার শেখ হাসিনার অধীনে একদলীয় নির্বাচনের ঘোষণা দেবে সে মুহূর্ত থেকেই নতুন কোন নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা না করে সমর্থক ও কর্মীদের লাগাতার দেশ অচল করে দিতে হবে। সে মুহূর্ত থেকে সড়ক, রেল, বন্দর, অফিস-আদালত আর দোকানপাট সব কিছু বন্ধ করে দিতে হবে।

আওয়ামী লীগের নেতারা টিটকারি করেন, বলেন যে বিএনপিকে আন্দোলন করা শিখতে হবে আওয়ামী লীগের কাছ থেকে। তবে তাই হোক। শেখ হাসিনার লগি-লাঠি-বৈঠার আন্দোলনের ডাকে ২০০৬ সালে অক্টোবরে বাংলাদেশকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সরকারের নতুন চমকের জন্যে দেরি না করে এখন থেকেই খালেদা জিয়া সে ঘোষণা দিয়ে রাখতে পারেন। তা না হলে আমার ভয় হচ্ছে, ক্ষমতা হয়তো চিরতরে বিএনপির নাগালের বাইরে শেখ হাসিনার বাকশালী স্বৈরতন্ত্রের হাতে চলে যাবে।

(লন্ডন, ০৮.১০.১৩)

প্রধানমন্ত্রীর টেলিভাষণ বনাম দেশের করুণ বাস্তবতা

নয় বছর স্থায়ী সামরিক স্বৈরতন্ত্রের পর বাংলাদেশে প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচন হয় ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি। তার দুদিন আগে ২৫ ফেব্রুয়ারি রাতে শেখ হাসিনা টেলিভিশনে ৪৫ মিনিট ধরে স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের কুৎসা রটনা করেছেন। তাঁর ভাষণের অধিকাংশ জুড়ে ছিলো অশ্লীল ভাষায় তাঁদের গালিগালাজ। সে সন্ধ্যায় বাংলাদেশের একজন শীর্ষ আমলার বাড়িতে আমার নৈশভোজের নিমন্ত্রণ ছিলো। আরো প্রায় ১০ জন বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন সে নৈশভোজে। শেখ হাসিনার টেলি-বক্তৃতা শুনে সকলেই থ হয়ে গিয়েছিলেন। ধাতস্থ হবার পর প্রত্যেকেই অত্যন্ত অনুদার মন্তব্য করছিলেন শেখ হাসিনা সম্বন্ধে। একজন বললেন, এই দীর্ঘ সময় নষ্ট করে উন্মাদের প্রলাপোক্তি শুনলাম। আরেকজন বলেছিলেন, মহিলার বাপ-মা তাঁকে ভদ্র ভাষা শেখাতে ভুলে গিয়েছিলেন।

ভোজসভার পর আমার আরেকটি নিমন্ত্রণ ছিলো পররাষ্ট্র সচিবের বাড়িতে, তাঁদের বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষে। কূটনীতিক, রাজনীতিক, পত্রিকা সম্পাদক, অর্থাৎ ঢাকার সমাজের মাথা বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন। আমি পৌঁছেছিলাম একটু বেশি রাত করে। পৌঁছে শুনি গোটা মজলিসে আলোচনার বিষয়বস্তু শেখ হাসিনার ভাষণ। খুবই হতাশা দেখালেন কয়েকজন। ছি-ছি করলেন কেউ কেউ। ব্যারিস্টার এবং শেখ মুজিবের সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদকে একপাশে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, কাকে ভোট দেবেন তিনি। খুবই হতাশার সুরে তিনি বললেন, সারা জীবন আওয়ামী লীগের রাজনীতি করেছি। এখন অন্য কোন দলকে ভোট দেবার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু এই ভাষণের পর আওয়ামী লীগকে ভোট দেবার প্রবৃত্তি হবে না।

যাঁদের স্মৃতি এখনো ঝাঁপসা হয়ে যায়নি সে ভাষণ প্রসঙ্গে সকলেই এখনো ছি-ছি করেন। দেশের ও জাতির রায় যে শেখ হাসিনা জানতেন না সেটা ভাবতে পারি না। কিন্তু কোন শিক্ষা নিতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। সুযোগ পেলেই তিনি শহীদ জিয়াউর রহমানের পরিবার, বিশেষ করে বাংলাদেশের তিনবারের প্রধানমন্ত্রী (হাসিনা এযাবৎ প্রধানমন্ত্রীত্ব করেছেন দুবার) বেগম খালেদা জিয়া

সম্বন্ধে কটূক্তি করতে তিনি ছাড়েননি। এমন কি বর্তমান সংসদের অধিবেশনেও ১৯৯১ সালের কদর্য ভাষণের উক্তিগুলো পুনরাবৃত্তি করেছেন তিনি।

সরকারের মেয়াদ তামাদির মুখে এসে আরেকটি টেলিভাষণ দিয়েছেন শেখ হাসিনা। এটাকে বলা হয়েছে জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রসূতি স্থান বলে বর্ণিত বৃটেনে বাস করছি ৫৩ বছর ধরে। এদেশেও বিশেষ জাতীয় পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের রীতি আছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ, আপৎকালীন পরিস্থিতি ইত্যাদি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেন। কিছু দৃষ্টান্ত। ১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। সে উপলক্ষে তিনি জাতির উদ্দেশে একটি রেডিও ভাষণ দিয়েছিলেন। ২০০৩ সালের মার্চ মাসে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমণ করেছিলো। প্রধানমন্ত্রী টোনি ব্লেয়ার তার আগে আগে একটা 'প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ' দিয়েছিলেন।

কিন্তু বিশেষ শর্ত এই যে তেমন ভাষণে প্রধানমন্ত্রী দলীয় রাজনীতির প্রসঙ্গ তুলতে পারবেন না। তিনি যদি তেমন কোন প্রসঙ্গ তোলেন তাহলে বিবিসিসহ ব্রডকাস্টিং প্রতিষ্ঠানগুলো অনুরূপ সময়ে এবং সমান সমান সময় জুড়ে বিরোধী দলের নেতাকেও ভাষণদানের সুযোগ দিতে হয়। সেটা বিবিসির চার্টারে অন্তর্ভুক্ত আছে। কারো কারো মনে থাকার কথা। ১৯৫৬ সালের অক্টোবরে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার এন্টনি ইডেন সুয়েজ খাল আক্রমণ করেন। সে উপলক্ষে তিনি একটা বেতার ভাষণ দাবি করেন। বিবিসি তাঁর লিখিত ভাষণ গ্রহণযোগ্য মনে করেনি, কেননা বৃটেনের অধিকাংশ মানুষ সে আক্রমণের বিরোধী ছিলো। কিন্তু এন্টনি ইডেন তাঁর 'প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ' দানের অধিকার ছাড়তে রাজি ছিলেন না।

সে সময় বিবিসি যা করেছিলো সেটা ইতিহাস হয়ে আছে। বিবিসি কর্তৃপক্ষ বিরোধী লেবার পার্টি নেতা হিউ গেটসস্কেলকে এনে অন্য একটা স্টুডিয়োতে বসিয়ে রাখে। এন্টনি ইডেনের ভাষণের পরে পরেই হিউ গেটসস্কেল সুয়েজ আক্রমণের বিরোধিতা করে সমান দৈর্ঘ্যের একটি ভাষণ প্রচার করেন। বাহ্যত এবং স্পষ্টতই ব্রিটিশ জাতির বিপুল গরিষ্ঠ অংশ ইরাক আক্রমণের বিরোধী ছিলো। বেতার-টেলিভিশন সম্প্রচারকরা মিঃ ব্লেয়ারের 'প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ' প্রচার করলেও যুদ্ধের বিরোধীদের বক্তব্য সম্ভবত বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করেছিলেন।

এখন পরিষ্কার যে বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ মানুষ তত্ত্বাবধায়ক অথবা যে কোন নামেই হোক একটা নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন চায়। সরকার সমর্থক কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত সমীক্ষায়ও ৮১ শতাংশ মানুষের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শেখ হাসিনা তাঁর আলোচ্য বক্তব্যে জনমতের বিরুদ্ধে তাঁর

একগুঁয়েমির পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। বক্তৃতার বেশির ভাগ জুড়ে তিনি আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছেন। সুতরাং এটাকে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ বলা ভুল হবে। শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের নেত্রী হিসেবেই ১৮ অক্টোবর শুক্রবারের টেলিভাষণটি দিয়েছেন।

অর্থাৎ, গণতন্ত্রের আদর্শ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের জবাব দেবার অধিকার বিরোধী দলের নেতার আছে। যেসব চ্যানেল শেখ হাসিনার ভাষণটি প্রচার করেছে তাদের নৈতিক কর্তব্য হচ্ছে মোটামুটি দিনের একই সময়ে (এ ক্ষেত্রে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা) বেগম খলেদা জিয়াকে জবাব দানের সুযোগ দেওয়া। তারা নিজেরা সে দায়িত্ব পালন না করলে তথ্যমন্ত্রীর কর্তব্য হবে বিরোধী দলের নেতার বক্তব্য সম্প্রচার করতে চ্যানেলগুলোকে বাধ্য করা। সেটা যদি তিনি না করেন তাহলে হাসানুল হক ইনু যেকোন জাতীয় দায়িত্বপূর্ণ পদের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য সকল দলের নেতারা এবং দেশের চিন্তানায়করা বলেছেন নির্বাচন সম্বন্ধে শেখ হাসিনার বক্তব্য পরিষ্কার নয়। তিনি যা বলেছেন তার চাইতে অনেক বেশি অনুক্ত রয়ে গেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান কে হবেন খুলে বলেননি প্রধানমন্ত্রী। বর্তমান সংসদ বজায় রেখে নির্বাচন হবে কিনা সে বিতর্কিত প্রশ্নের ওপর কোন আলোকপাত হয়নি। নির্বাচন কবে হবে সেটাও বলেননি প্রধানমন্ত্রী। নির্দলীয় সরকারের বিরোধী দলকে সমান প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি তিনি দেননি। কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে ভাষণে শেখ হাসিনা সংবিধানের ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

আলোচ্য ভাষণে তিনি ভাষার কদর্যতা খুব বেশি দেখাননি, কিন্তু বিরোধী দলের বিরুদ্ধে অনেকগুলো অসত্য অপবাদ দিয়েছেন। তাঁর ভাষণে শেখ হাসিনা ওয়ান-ইলেভেন সরকারের জন্যে খালেদা জিয়ার ওপর দোষারোপ করেছেন। এবং সে সরকারের দৃষ্টান্ত দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতির অগ্রহণযোগ্যতা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। এর চাইতে বড়ো সত্যের অপলাপ আর হতে পারেনা। প্রথমত ওয়ান-ইলেভেন কোন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিলো না। সেটা ছিলো একটা বর্ণচোরা সামরিক সরকার। এবং সেটা ঘটিয়েছিলো আওয়ামী লীগ। শেখ হাসিনা নিজেই সে কথা স্বীকার করেছেন।

এক-এগারোর বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা

বিএনপির সরকার ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর তাদের মেয়াদ শেষে সংবিধান অনুযায়ী একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নেয়। মনে রাখতে হবে ১৯৯৫-৯৬ সালে শেখ হাসিনা জামায়াতে

ইসলামকে দলে টেনে তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতির দাবিতে দেশজোড়া আন্দোলন করেন। দেশকে অচল করে দেওয়া হয় এবং আন্দোলনকারীদের সহিংসতায় বেশ কয়েকজন মানুষ মারা যায়। হানাহানি বন্ধ করার লক্ষ্যে খালেদা জিয়ার সরকার সংবিধানের ১৩-তম সংশোধনী পাস করে তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতির বিধান করে। ২০০৬ সালে শেখ হাসিনা থুড়ি খেলেন। সংবিধান তখন আর তাঁর ভালো লাগলো না। সেই সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতির বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন, লগি-লাঠি-বৈঠার আন্দোলন শুরু করেন।

সে আন্দোলনের ভয়াবহতার কথা ভুলে গেলে বাংলাদেশের মানুষ ভুল করবে। লাঠি-পেটা করে প্রকাশ্য দিবালোকে এবং রাজধানীর কেন্দ্রে দুই ডজন মানুষ হত্যা করা হয়। বন্দর ও সড়ক অবরোধ করে অর্থনীতিকে অচল করে দেয়া হয়। রেলওয়ের স্লিপার তুলে তাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি বঙ্গভবন অবরোধ এবং বঙ্গভবনের বিদ্যুৎ, টেলিফোন ইত্যাদি কেটে দিয়ে রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমেদকে কয়েদীর মতো গৃহবন্দী করে রাখা হয়। সেসবকে তখন শেখ হাসিনার সন্ত্রাস মনে হয়নি। ওয়ান-ইলেভেনের সরকার আসে শেখ হাসিনার গোপন ষড়যন্ত্রের ফলে। ২০০৭ সালের ১৫ এপ্রিল বিদেশ ভ্রমণে যাবার আগে বিমানবন্দরে শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে সে সরকার তাঁরই আন্দোলনের ফসল এবং ক্ষমতা পেলে তিনি তাদের সব কাজ বৈধ করে দেবেন। শেখ হাসিনাকে চিকিৎসার নামে বিদেশ ভ্রমণের (যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, যুক্তরাজ্য ও ফিনল্যান্ড) অনুমতি দেওয়া হয়। অথচ বেগম খালেদা জিয়াকে প্রথমে সৌদি আরবে নির্বাসনে পাঠানোর চেষ্টা করে বর্ণচোরা সরকার। বিএনপি নেত্রী সাহসিকতার সঙ্গে সে অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। কিন্তু তাঁকে কয়েদ করে রাখা হয়। প্রথম ডিজিএফআইকে দিয়ে বিএনপিকে ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা হয়। তাতে ব্যর্থ হয়ে ওয়ান-ইলেভেন সরকার বিএনপিকে বাদ দিয়ে নির্বাচন করারও চেষ্টা করেছিলো। হাসিনা নিজে ওয়ান-ইলেভেন ডেকে আনলেন, অথচ এখন তিনি প্রকারান্তরে সেজন্যে বিএনপিকে দায়ী করার চেষ্টা করছেন, সে দৃষ্টান্ত দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতির ব্যর্থতা প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন। আরেকটা কথা। শেখ হাসিনা বিএনপিকে কতোটা ভয় করেন এই হচ্ছে তার মাত্র একটি প্রমাণ।

অন্যের কীর্তি চুরি করে এই দল

শেখ হাসিনা প্রায়ই বলে থাকেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে কিছু গঠনমূলক কাজ হয়। বিএনপি এলে হয় ভাঙচুর ও দুর্নীতি। মনে করা যেতো শেখ হাসিনা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। প্রকৃত পরিস্থিতি ভিন্ন

রকম। প্রধানমন্ত্রী মাত্র সাধারণ মানুষের হ্রস্ব রাজনৈতিক স্মৃতিকে 'এক্সপ্লয়েট' (অপসুযোগ) করছেন। খালেদা জিয়ার প্রথম সরকার মহান যমুনা সেতুটি তৈরি করেন। ১৯৯৬ সালে গদি পেয়েই শেখ হাসিনা সে সেতুর কপালে তাঁর বাপের নাম এঁকে দিলেন। বর্তমানেও তিনি শুধুই পাইকারী হারে 'ভিত্তি স্থাপন' করছেন। অথচ কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

এই সরকার পদ্মা সেতুটিও গিলে খেয়েছে। সরকারের দুর্নীতির কারণে বিশ্ব ব্যাংক পদ্মা সেতুর অর্থায়ন প্রত্যাহার করে। ব্যাংক দুর্নীতিবাজদের তালিকা সরকারের হাতে দিয়ে তাদের বিচার চেয়েছিলো। বলেছিলো তাহলে আবার তারা সেতু নির্মাণে অর্থায়ন করবে। কিন্তু শীর্ষ ব্যক্তিদের প্রক্সি হয়ে যাঁরা দুর্নীতি করেছেন সরকারের হুকুমের দাস দুর্নীতি দমন কমিশন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সাহস পায়নি। এই সরকার কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নামে ২০ হাজার কোটি টাকা চুরি করেছে। ডেসটিনি এবং হলমার্ক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে এই ব্যাংকগুলোকে ফতুর করে দিয়েছে। ২০০৯ সালে গদি পেয়ে প্রথমেই তারা শেয়ার বাজার থেকে ৩৫ লাখ পরিবারের লগ্নি লুট করেছে।

এ বি এম মূসা বাংলাদেশের প্রবীণতম সাংবাদিকদের একজন। কম বয়েসে আমরা একসঙ্গে বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করেছি। তারপর তিনি বিবিসির সংবাদদাতা নিযুক্ত হন। প্রায়ই টেলিফোনে কথাবার্তা হতো তাঁর সঙ্গে। গোটা কর্মজীবন তিনি আওয়ামী লীগের সমর্থক ছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে তিনি বিবিসির চাকরি ছেড়ে দেন। তিনি ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি ছিলেন। শেখ মুজিব তাঁকে বিটিভির মহাপরিচালক নিয়োগ করেন। মুজিব যতোবারই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে লন্ডনে এসেছেন ততোবারই এ বি এম মূসা তাঁর সফর-সঙ্গী ছিলেন। শুনেছি অন্যান্য সফরেও মূসা তাঁর সঙ্গে থাকতেন। সেই এ বি এম মূসাই সম্প্রতি এক টেলিভিশন টকশোতে বলেছেন, দেশবাসীর উচিত যখনই কোন আওয়ামী লীগ নেতাকে দেখবেন তখনই 'চোর, চোর' বলে ধ্বনি তোলা।

শেখ হাসিনার মুখে বিএনপির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ হাস্যাদ্রেক করে মাত্র। আসলে বিএনপির দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তিনি নিজের সরকার ও নিজের দলের দুর্নীতি থেকে দেশবাসীর মনোযোগ ভিন্নমুখী করার চেষ্টা করেন। বাংলা প্রবাদ অনুযায়ী 'চোরের মায়ের বড়ো গলা'।

তিনি দেশের মানুষকে জুজুর ভয় দেখাচ্ছেন

শেখ হাসিনা দেশের মানুষকে জুজুর ভয় দেখাতে চান বলেই মনে হয়। তিনি বলে থাকেন বিএনপি ক্ষমতায় এলে দেশে সন্ত্রাস হয় এবং হবে। বিগত

প্রায় পাঁচ বছরে বাংলাদেশে যা ঘটেছে সেটা যদি সন্ত্রাস না হয় তাহলে সন্ত্রাস কাকে বলবো? এমন দিন যায় না যখন দেশের কোথও না কোথাও দু'চারটি খুনের খবর পাওয়া যায় না। এগুলো প্রায় সবের জন্যেই দায়ী আওয়ামী লীগের ক্যাডার। ক্যাডাররা রাজনৈতিক হত্যা করেছে কয়েক হাজার। সরকার নিজেই সন্ত্রাসী ভূমিকা নিয়েছে। ক্রসফায়ার বা বন্দুকযুদ্ধের ভুয়া নামে প্রায় আড়াইশো রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। গুম-খুন হয়েছে প্রায় দেড়শো। গত বছরের এপ্রিল মাসে র‍্যাবের হাতে ছিনতাই হওয়া বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এবং সিলেট বিএনপির নেতা ইলিয়াস আলী এবং তাঁর ড্রাইভারকে সরকার এখনো হাজির করতে পারেনি।

বিএনপি কোন মিছিল ইত্যাদি ডাকলে তাতে সন্ত্রাস হয়। কিন্তু সে সন্ত্রাস কে করে? সর্বত্রই পুলিশ-র‍্যাবের সংরক্ষণে ছাত্রলীগ-যুবলীগের সশস্ত্র গুণ্ডারা সেসব শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলেই সন্ত্রাসের ঘটনাগুলো ঘটে। পুলিশ আর আওয়ামী ক্যাডারদের সংযত করা গেলে সভা-সমাবেশ ও মিছিলে সন্ত্রাস মোটেই হবে না। গত ৬ মে ভোরে শাপলা চত্বরে যা ঘটেছে সেসবের জন্যে কি বিএনপি দায়ী ছিলো? সে রাতে হেফাজতে ইসলামের লাখ লাখ কর্মী শাপলা চত্বরে ঘুমিয়ে ছিলো। রাস্তার আলো ও মাইক্রোফোন বন্ধ করে দিয়ে সম্পূর্ণ দলীয়কৃত র‍্যাব-পুলিশ-বিজিবি (এবং সম্ভবতঃ সীমান্তের ওপার থেকে আনা কিছু সশস্ত্র ব্যক্তি) ঘুমন্ত কর্মীদের ওপর পাইকারী গুলি চালায়। দাবি করা হয়েছে যে হাজার-দুই কর্মী সেই কালরাতে মারা গেছে। ঘটনা চাপা দেবার সব চেষ্টা করেছে সরকার। পরিচয়সহ ৬৫ জনের নামের তালিকা হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে দেবার জন্যে মানবাধিকার সংস্থা অধিকারের মহাসচিব আদিলুর রহমানকে গ্রেফতার করে বেশ কিছুদিন কয়েদ করে রেখেছিলো সরকার।

এসব খুন-খারাপি ও অপকর্মের জন্যে প্রধানমন্ত্রী পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁর ভাষণে। এই ব্যক্তিরা বাংলাদেশের লোক। দেশে তাঁদের আত্মীয়-বন্ধু ও পরিচিত অনেক আছেন। তাঁরা এই তিন বাহিনীর বাড়াবাড়ি সমর্থন করছেন বলে কি আপনাদের মনে হয়? দেশে সরকার পরিবর্তন হবেই। তখন এই তিন বাহিনীর সদস্যদের এবং তাঁদের পরিবার-পরিজনের কি পরিণতি হবে ভাবতেও আমি শিউরে উঠছি।

রাজনীতিতে সন্ত্রাস চালু করেছে আওয়ামী লীগ

বাংলাদেশে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের 'ফাদার-মাদার' হচ্ছে আওয়ামী লীগ। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যে (শেখ মুজিবের শাসনকাল) রক্ষীবাহিনীর খুনিরা অন্তত ৩০ হাজার রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে হত্যা করেছে। শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী হয়ে আওয়ামী লীগের সশস্ত্র ক্যাডার গঠন করেন। সে

সময় এক কলামে আমি তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলাম চোর-চোট্টা-দাগাবাজ আর ধর্ষণকারীরা ক্যাডারের ছাতার নিচে এসে দুষ্কর্ম চালাবে। কিছু দিনের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গেলো সেটাই শেখ হাসিনার উদ্দেশ্য ছিলো। চার 'গডফাদারের' নির্দেশে আওয়ামী লীগের ক্যাডাররা খুন-খারাপি ও ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতাদের 'একটির বদলে দশটি' লাশ ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। গডফাদারদের সমালোচনা করায় সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের তিনি তিরস্কার করেন। হাসিনার বর্তমান সরকারের আমলে কি ঘটেছে সেটা এখনো জাতির মনে তাজা আছে।

গৃহস্থালীর দা-কুড়াল নিয়ে কর্মীদের প্রস্তুত থাকতে বলেছেন সাদেক হোসেন খোকা। তাঁকে গ্রেফতারের জন্যে হন্যে হয়ে খুঁজছে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় তুলেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা। কিন্তু কর্মীদের এ ধরনের নির্দেশ দানের কথা সাদেক হোসেন খোকার কেন মনে হয়েছিলো? তিনি শুধু নজির অনুসরণ করেছেন। আওয়ামী লীগ নেতারা আশা করছেন দেশের সকল মানুষ ইতিহাস ভুলে গেছে। শেখ মুজিব ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বক্তৃতায় 'যা যা অস্ত্র আছে' তাই নিয়ে পাকিস্তানীদের প্রতিরোধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। শেখ হাসিনা ২০০৬ সালে লগি-লাঠি-বৈঠা নিয়ে ঢাকায় আসার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন একটি এনজিওর ভাড়া করা লোকেরাসহ লক্ষাধিক লাঠিয়াল তখন ঢাকায় এসেছিলো। সাদেক হোসেন খোকা হয়তো এঁদের দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই কথাগুলো বলেছিলেন। আওয়ামী লীগের একটা চারিত্রিক দোষ এই যে তারা দুই মানদণ্ডে পৃথিবীকে বিচার করে। তারা যা করে সেটা 'হালাল'। আর তাদের বিরোধীরা যদি সে একই কাজ করে তাহলে তাদের দেশদ্রোহী বলে অপবাদ দেওয়া হয়।

আজকাল আওয়ামী লীগ নেত্রী প্রায়ই দাবি করেন তাঁর দল গদি পেলে ইসলাম নিরাপদ থাকবে, আর বিএনপি ক্ষমতা পেলে ইসলাম বিপন্ন হবে। প্রধানমন্ত্রী কি একবারও ভেবে দেখছেন বিভিন্ন বানোয়াট অভিযোগে হাজার হাজার টুপি-দাড়ি পরিহিত মুসলমানকে গ্রেফতার কে করেছে? ফসল ভালো হওয়ায় মা-দুর্গাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন কে? শাপলা চত্বরের লাখ লাখ মুসলমানের ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিলো কে? প্রধানমন্ত্রী কি শোনেননি যে তাঁর পুত্র জয় বলেছেন মুসল্লিদের ওপর নজরদারী করার জন্যে মসজিদে আওয়ামী লীগ ক্যাডারদের পাঠানো হবে? জয় সম্প্রতি বলেছেন, মাদ্রাসাগুলোতে ভর্তি হ্রাস করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অনেকেই সন্দেহ করেন চট্টগ্রামে একটি মাদ্রাসায় বোমা বিস্ফোরণ সরকারের চরেরাই করেছে সজীব ওয়াজেদ জয়ের ঘোষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী। এসব দৃষ্টান্তকে ইসলামের সংরক্ষণ বলে বিশ্বাস করবেন কেউ?

গণতন্ত্র সম্বন্ধে হাসিনার সংজ্ঞা

শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে বলেছেন, "গণতন্ত্র তখনই শক্তিশালী হবে যখন তা সাংবিধানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে, জনগণের ভোটে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন।" এ প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে, ২০০৬ সালে লগি-লাঠি-বৈঠার আন্দোলনে যখন এতোগুলো মানুষ খুন করা হলো, দেশ অচল করে দেওয়া হলো, তখন কি দেশে কোন সংবিধান ছিলো না? একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির অত্যন্ত বিতর্কিত একটা রায়ের অর্ধেকের দোহাই দিয়ে বিরোধী দল বর্জিত সংসদে শেখ হাসিনা সংবিধানের ১৫ সংশোধনী পাস করে তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি বাতিল করেন। তারপর থেকে হঠাৎ তাঁর সংবিধান প্রীতি অতিরিক্ত রকম বেড়ে গেছে মনে হয়।

ক্ষমতায় আসার সময় থেকেই বিরোধী দলের সভা-সমাবেশ করার ওপর বহু অন্যায় বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। নানা ভুয়া অজুহাতে বিরোধী দলের নেতাদের গ্রেফতার করে রিম্যান্ডের নামে নির্যাতন করা হচ্ছে। বহু নেতা এখনো কারাবন্দি আছেন। শোনা যাচ্ছে বাইরে যাঁরা আছেন তাঁদেরও শিগগিরই বিভিন্ন অজুহাতে গ্রেফতার করা হবে। বিএনপির নেতাদের নয়া পল্টনে তাঁদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। কার্যালয়ের বাইরে পুলিশ দিয়ে প্রাচীর তৈরি করা হয়েছে।

মিডিয়াকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয়। এ সরকার দেশে বাক ও সাংবাদিকতার ঢল নেমেছে বলে টাইমস পত্রিকায় লাখ পাউন্ড ব্যয় করে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। অথচ মিডিয়ার ওপর এমন অত্যাচার-নির্যাতন আইয়ুব খানের সামরিক স্বৈরতন্ত্রে কিম্বা ব্রিটিশ আমলেও দেখা যায়নি। এ সরকারের আমলে অন্ততঃ ২৩ জন সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। আহত হয়েছেন আরো অনেকে। মেহেরুন রুনী ও তাঁর স্বামী সাগরের মর্মান্তিক হত্যার তদন্তে অগ্রগতি করতে পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে। দিগন্ত ও ইসলামী টেলিভিশন এখনো বন্ধ আছে। আমার দেশ পত্রিকার মুদ্রণের ওপর নিষেধাজ্ঞা এখনো প্রত্যাহার করা হয়নি। পত্রিকাটির সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে অন্যায় ভাবে প্রায় ছয় মাস জেলে পুরে রাখা হয়েছে। এসবকে শেখ হাসিনা গণতন্ত্র বলতে পারেন কিন্তু কোন সুস্থ বুদ্ধির মানুষ বলবে না।

(লন্ডন, ২২.১০.১৩)

হাসিনাকে নিয়ে ভারত-বাংলাদেশের স্বার্থ সাংঘর্ষিক

'কালা হুতার' গল্পটি আপনাদের কারো করো মনে থাকার কথা। আগেও দু'একবার লিখেছিলাম। মেয়েটি সন্ধ্যেবেলা কালো সূতা চেয়েছিলো। মা দিতে পারেনি। বাড়িতে ছিলো না। 'কালা হুতা দে' বলে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিলো মেয়েটি। সকাল বেলা ঘুম ভেঙ্গে সে আবার কান্না জুড়ে দিলো, কালা হুতা দে। সারা রাতের ঘুম সত্ত্বেও কালো সূতার জন্যে বিলাপ সে ভুলে যায়নি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হয়েছে সে অবস্থা। হরতাল প্রত্যাহার করুন– এই হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী, সরকার ও আওয়ামী লীগের সর্বশেষ শ্লোগান। হরতালের আঘাত এখন যে তাঁদের আঁতে গিয়ে আঘাত করছে এই হচ্ছে তার প্রমাণ। খালেদা জিয়া ২৫ অক্টোবরের বিশাল জনসভায় ঘোষণা দিলেন, সেদিন এবং পরের দিনের মধ্যে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন নিয়ে সংলাপে রাজি না হলে ১৮ দল ২৭ অক্টোবর থেকে তিন দিনের হরতাল শুরু করবে। প্রধানমন্ত্রী হাসিনা সেদিন টেলিফোন করলেন না। সেটা তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। পরদিন বিকেলে তাঁর দফতর থেকে জানানো হলো– দুপুরে প্রধানমন্ত্রী বিএনপি ও ১৮ দলের জোটের নেত্রী খালেদা জিয়াকে ফোন করেছিলেন কিন্তু তাঁকে পাওয়া যায়নি।

ব্রিটিশ আর ডেনিশ নৌবাহিনীর মধ্যে ঐতিহাসিক এক যুদ্ধ হয়েছিলো ১৮০১ সালে নরওয়ের অদূরে। ব্যাট্‌ল অব কোপেনহাগেন নামে বর্ণিত এ যুদ্ধে ব্রিটিশ আক্রমণের ভার ছিলো অ্যাডমিরাল নেলসনের ওপর, তবে প্রধান সেনাপতি ছিলেন অ্যাডমিরাল স্যার হাইড পার্কার। অ্যাডমিরাল পার্কার হিসেব-নিকেশ করে মনে করলেন তাঁর নৌবহর হেরে যাবে। তিনি অ্যাডমিরাল নেলসনকে পিছু হঠার সিগন্যাল দেন। কিন্তু পরিস্থিতি দৃষ্টে নেলসন স্থির করলেন অবিলম্বে আক্রমণ করাই বিজয়ের সুযোগ। তিনি ডান চোখে দূরবীণ দিয়ে সিগন্যাল দেখার ভান করলেন আর তার জাহাজগুলোকে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। তার জাহাজের নাবিকরা বুঝতেও পারলেন না যে নেলসন তাঁর প্রধান সেনাপতির নির্দেশ অমান্য করছেন, কেননা নেলসনের ডান চোখ ছিলো অন্ধ। সে যুদ্ধে ব্রিটিশ বহরের বিরাট জয় হয়েছিলো।

হাসিনাও সে রকমের একটা কাণ্ড করলেন ২৬ অক্টোবর। তিনি দাবি করলেন যে তিনি লাল ফোনে বিরোধী দলের নেতাকে ফোন করেছিলেন কিন্তু কেউ ফোন ধরেননি। কিন্তু ল্যান্ডলাইন অথবা মুঠোফোনে কথা বলার কথা নাকি তাঁর মনে হয়নি। অথচ অন্য অনেকেই বেগম জিয়ার সঙ্গে সংযোগ করতে পারেন। মাত্র কয়েক দিন আগে জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি-মুনও নিউইয়র্ক থেকে ফোন করে বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ করেছিলেন। রহস্য এই যে খালেদা জিয়ার লাল ফোন বছর খানেক ধরেই অচল। সেটা সচল করার জন্যে সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগে বার বার অনুরোধ করেও লাভ হয়নি। এখন প্রশ্ন উঠতে বাধ্য: লাল ফোন যে অচল ছিলো সে খবর শেখ হাসিনা জানতেন কিনা। দ্বিতীয়ত বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা কতোটা আন্তরিক ছিলো।

প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে বেগম জিয়ার আপিসে জানানো হয় যে ২৭ অক্টোবর সন্ধ্যা ছয়টায় শেখ হাসিনা বিরোধী দলের নেতাকে ফোন করবেন। খালেদা জিয়াকে বসিয়ে রেখে আধঘণ্টা পরে টেলিফোন করেন শেখ হাসিনা। অসৌজন্য দেখানোর একটা অভিপ্রায় এখানে অবশ্যই ছিলো। এখন জানা যাচ্ছে শেষপর্যন্ত সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় শেখ হাসিনা যখন ল্যান্ডলাইনে বেগম জিয়াকে ফোন করেন তখন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কয়েকজন মন্ত্রী ছাড়াও টেলিভিশন ক্যামেরা ছিলো।

টেলিফোন সংলাপ নিয়ে মিথ্যার বেসাতি

তাঁদের ৩৭ মিনিটের সংলাপের পুরো বিবরণ বাংলাদেশের মিডিয়ার একাংশে প্রকাশি হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী বার বার খালেদা জিয়াকে প্যাঁচে ফেলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে, উল্টো বেকায়দায় পড়েছেন তিনি। বাংলাদেশী মিডিয়ার সরকার নিয়ন্ত্রিত অংশ প্রকাশ করেছে একটা সম্পাদিত বিবরণ, যাতে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে হাসিনাই খালেদা জিয়াকে বেকায়দায় ফেলেছেন। ভারতীয় মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছে এই শেষোক্ত সম্পাদিত বিবরণটি। কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকার মন্তব্য প্রতিবেদন থেকেও সেটা পরিষ্কার হয়ে যায়। এবং অবশ্যই ভারতীয় মিডিয়া হাসিনা ও আওয়ামী লীগের অনুকূলে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিকূল মন্তব্য করেছে।

ভারতীয় মিডিয়া সম্বন্ধে আমার কৈশোরের একটা স্মৃতি। ১৯৪৬ সালের কথা। ভারতবর্ষ অবিভক্ত থাকবে, না বিভক্ত হয়ে একটা স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হবে, সে সম্বন্ধে গণভোট আসন্ন। হিন্দু মালিকানাধীন পত্রিকাগুলো প্রস্তাবিত পাকিস্তানের ইমেজ নষ্ট করার কোন চেষ্টারই ত্রুটি রাখেনি।

মুসলিমপন্থী পত্রিকাগুলোর খবর অনুযায়ী সারা ভারতবর্ষের মুসলমানই পাকিস্তান চায়, এমনকি যেসব এলাকার পাকিস্তানে যাবার সম্ভাবনা নেই তারাও। এই নিরেট সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যে কংগ্রেসী পত্রিকাগুলো আহার-নিদ্রা হারাম করে লেগে গিয়েছিলো। রাতারাতি তারা 'জাতীয়তাবাদী' মুসলিম দল ও গোষ্ঠী আবিষ্কার করছিলো, তাদের কাল্পনিক সভাসমিতির বহু উৎপাদিত সংবাদ প্রকাশ করছিলো।

এ রকম পরিস্থিতিতে একদিন কলকাতার যুগান্তর পত্রিকা খবর ছাপলো, অমুক স্থানে অমুক তারিখে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের এক বিশাল সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন মওলানা অলাদুজ-জ্বেনা (ধর্ষণজাত সন্তান)। সভায় বক্তৃতা করেন মওলানা জাহেল ও মওলানা মরদুদ, ইত্যাদি ইত্যাদি। পরদিন দৈনিক আজাদ কোন রকম মন্তব্য ছাড়াই শব্দার্থসহ খবরটি পুরোপুরি ছেপে দেয়। কলকাতার মুসলিম মহলে সেদিন হাসির হুল্লোড় পড়ে গিয়েছিলো। দৈনিক আজাদ কালোবাজারে বিক্রি হয়েছিলো বলেও শুনেছি। কোন মুসলমানের কাছে যুগান্তর নিশ্চয়ই কিছু ভারিক্কি মুসলিম নাম চেয়েছিলো। সে ব্যক্তি যুগান্তরকে ফাঁসিয়ে দিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে। হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় মিডিয়ার সে ট্যাডিশন এখনো সমানেই চলছে। খবর উৎপাদন ও তথ্য বিকৃতির বদঅভ্যেস কোন কোন ভারতীয় মিডিয়া কিছুতেই ছাড়তে পারছে না।

ভারতের একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান তাদের বদঅভ্যেস ছাড়তেও দেবে না। রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং (র') নামক প্রতিষ্ঠানটি সরকারিভাবে সাউথ ব্লকের (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) একটা শাখা হলেও আসলে ভারতের পররাষ্ট্র নীতির ঘাড়ে আঁটুলি পোকার মতো ভর করে আছে র'। র' যেদিকে নিয়ে যেতে চায় সেদিকে না গিয়ে সাউথ ব্লকের গত্যন্তর নেই। ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে নির্বাচিত কয়েকটি পত্রিকায় র'য়ের স্ট্রাটেজি অনুযায়ী 'খবর' ও 'তথ্য' উৎপাদনের জন্যে সেল আছে। সার্বক্ষণিক 'সাংবাদিকরা' র'য়ের নির্দেশ অনুযায়ী সেখানে খবর মন্তব্য ও প্রতিবেদন ইত্যাদি তৈরি করে থাকেন।

অবরুদ্ধ দুর্গে অবরুদ্ধ প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশে নির্বাচন আসন্ন। গোটা দেশ এখন শেখ হাসিনার সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যরা এখন পুলিশ পরিবেষ্টিত না হয়ে নিজেদের নির্বাচনী এলাকায় যেতে সাহস পান না। পুলিশও এখন সদলবলে ছাড়া বহু এলাকায় যেতে নিরাপদ বোধ করে না। লক্ষণীয় যে এই বাস্তবতার সঙ্গে বিএনপি, জামায়াত কিম্বা বিরোধী দলের কোন সম্পর্ক নেই। দেশের মানুষ এই সরকারকে চোর, গুমকারী আর খুনী ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না। এই সরকার আর শাসক দলের মুখ তারা আর দেখতে চায় না। ভাঙ্গা নৌকায় তারা আর চড়বে না।

রাজধানী ঢাকা যেন মধ্যযুগীয় কোন অবরুদ্ধ দুর্গ। দেশের অবশিষ্টাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন এই রাজধানী শহর। তার ভেতরে ও আশপাশের সড়কগুলো বন্ধ করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের (এবং কারো কারো মতে র'য়ের চরদের) দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে গৃহবন্দী জীবন যাপন করছেন। বিরোধী জোট হরতাল ডাকলে সরকারের এবং প্রধানমন্ত্রীর হৃদয়ের আতঙ্ক বেড়ে যায়। তারা র‍্যাব, পুলিশ আর বিজিবি এবং সেসঙ্গে আওয়ামী লীগের সশস্ত্র ক্যাডারদের ময়দানে ছেড়ে দেয়। এরা বোমাবাজি খুনোখুনি রক্তারক্তি ঘটায়, সংখ্যালঘু এলাকায় গিয়ে চাঁদাবাজি করে, চাঁদা না পেলে মন্দির ভাঙচুর করে ঘরবাড়িতে আগুন লাগায়। ভারতের আওয়ামী লীগ সমর্থক মিডিয়া ফলাও করে সেসব খবর ছাপে, যথাসম্ভব খালেদা জিয়া ও বিএনপি-জামায়াতের ওপর দোষারোপ করে। আওয়ামী লীগ ও তাঁদের ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকরা গাছেরটাও খাচ্ছে, তলারটাও কুড়াচ্ছে।

র'য়ের গৃহপোষ্য লেখক ও সাংবাদিকরা বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে ওভারটাইম খাটছেন এখন। নিত্যনতুন চাঞ্চল্যকর খবর উৎপাদিত হচ্ছে। স্বেচ্ছায় না হলেও অনিচ্ছায় ভারতীয় মিডিয়া সেসব তৈরি খবর ফলাও করে প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছে। বাংলাদেশের নির্বাচনে শেখ হাসিনার জয় ভারতের জন্যে কেন অত্যাবশ্যকীয় সে সম্বন্ধে বহু বিশ্লেষণ ও অভিমত ছাপা হচ্ছে। হাসিনাকে বিদায় করা কেন বাংলাদেশীদের জন্যে অত্যাবশ্যকীয় সেকথা ভারতের কেউ বলছে না। কি মুশকিল দেখুন তো! হাসিনাকে দিল্লির প্রভুদের প্রয়োজন। তাঁকে তাঁরা আবারো দিল্লি নিয়ে গেলেই পারেন। বাংলাদেশের মানুষ তাই বলে দিল্লির হুকুমে ভোট দেবে, সেটা কি ধরনের কথা হলো? ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল কুমার সিণ্ডে শেখ হাসিনাকে ভারতের আপনজন এবং পশ্চিমবঙ্গের মেয়ের মতো বলে বিবৃতি দিয়েছেন। সীমান্তের ওপারের ওরা এটুকুও বুঝতে পারছে না যে তারা যতোই শেখ হাসিনাকে আপনজন বলবেন, আত্মস্থ করে নেবেন, হাসিনা ততোই বাংলাদেশের মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে যাবেন। ভারতের স্বার্থকে মানুষ বাংলাদেশের স্বার্থের প্রতি সাংঘর্ষিক মনে করে।

অপপ্রচারেরও সীমা থাকা দরকার

উৎপাদিত খবর আর র'য়ের প্রচারণা এখন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তারা বাংলাদেশের মানুষকে বোঝাতে চায় বাংলাদেশে এখন পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের চরে ভরে গেছে। এ কথা বোধহয় কেউ হলফ করে বলতে পারে না– কোন্ দেশের চর বাংলাদেশে নেই। বস্তুত বর্তমান রাজনৈতিক সংকটে বাংলাদেশের অবস্থা হয়েছে মরা গোরুর ভাগাড়ের মতো। কাক-শকুনি শেয়াল-কুকুর সবাই উপস্থিত। কামড়া কামড়ির উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে

তাদের জন্যে। কিন্তু, সেই যে কথায় বলে, "চালুনি সূঁচকে বলে, তোর ল্যাজে ফুটো"। অনেকদিন ধরেই র'য়ের চরেরা বাংলাদেশে গিজ গিজ করছে। প্রাপ্ত একটা আনুমানিক হিসেবে অনুযায়ী বর্তমান বাংলাদেশে র'য়ের চর আছে ছয় লাখ তিন হাজার। শাহবাগে কিছুকাল ধরে যে হুজ্জত চললো, দিনের পর দিন পোলাও-কোর্মা-বিরিয়ানীর জিয়াফত হলো, সেটা কারা করেছিলো?

এক চোর আরেক চোরকে চোর বলে গালি দেয়! হাস্যকর নয়কি? র'য়ের বর্তমান প্রচারণার ধারা, তারেক রহমানের সঙ্গে নাকি আইএসআইয়ের চরদের যোগাযোগ আছে। আরে ব্যাটা, তাতে তোর কি? শেখ হাসিনা আর জয়ের আশেপাশে যদি সদাসর্বদা র'য়ের চরদের উপস্থিতি থাকে তাহলে তারেক রহমানকে নিয়ে তোদের চোখ টাটায় কেন? র'য়ের প্রণীত আরেকটি 'চাঞ্চল্যকর' খবর হচ্ছে, ২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহ নাকি ঘটিয়েছিলো আইএসআইয়ের চরেরা।

সাড়ে চার বছর ধরে দেশের এবং বিদেশের মানুষ বিশ্বাস করে আসছে বিডিআর বিদ্রোহ আসলে ঘটিয়েছিলো র'। অন্তত একথা ঠিক যে সে বিদ্রোহে পুরোপুরি লাভবান হয়েছে ভারত। ২০০১ সালে বিএসএফের লোকেরা রংপুরের পীরগঞ্জে বাংলাদেশের সীমানার অনেক ভেতরে ঢুকে পড়েছিলো। বিডিআরের সতর্কতায় তারা আর প্রাণ নিয়ে ফেরত যেতে পারেনি। এ রকম ঘটনা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে আরো ঘটেছিলো। ফেনসিডিল আর ইয়াবাসহ অবৈধ ভারতীয় পণ্য বিডিআরের আমলে বাংলাদেশে ঢুকতে পেরেছে অবাধে? বিডিআরের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ ভারত অবশ্যই খুঁজছিলো। তাছাড়া ১৯৭১ সালে ভারত তাজউদ্দিন আহমেদকে দিয়ে যে সাত দফা চুক্তিতে সই করিয়ে নিয়েছিলো তাতে স্পষ্ট করে বিডিআরকে ভেঙ্গে দিয়ে 'বিএসএফের তত্ত্বাবধানে' একটি বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) বাহিনী গঠনের কথা ছিলো। এ কথাও ছিলো যে স্বাধীন হলে বাংলাদেশের নিজস্ব কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকবে না। শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হয়ে সে চুক্তি বাতিল করেছিলেন। এমনকি ইন্দিরা গান্ধীও তাঁর মত পরিবর্তন করতে পারেননি।

পিলখানা বিদ্রোহে লাভ হয়েছে কার? পিলখানার বিদ্রোহে সেনাবাহিনীর ৫৭ জন সিনিয়র কর্মকর্তা নিহত হয়েছে। তাদের স্থলে আওয়ামীপন্থী অফিসারদের পদোন্নতি দিয়ে সেনাবাহিনীর কার্যকারিতা, হয়তো অস্তিত্বও বিপন্ন করে দেওয়া হয়েছে। এ বিদ্রোহের অজুহাতে বিডিআর ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। বিএসএফ এখন ইচ্ছামতো বাংলাদেশের ভেতর ঢোকে, লোকজন ধরে নিয়ে যায়। তাদের পাহারায় ভারতীয়রা বাংলাদেশের জমি দখল করে নেয়, বাংলাদেশীদের ফসল কেটে নিয়ে যায়। খেলার ছলে বিএসএফের জওয়ানরা বাংলাদেশের ফেলানীদের গুলি করে মারে। আর বিজিবি? তারা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে, হয়তোবা আঙ্গুল

চোষে। আইএসআই কি এতোই স্টুপিড যে তারা বিডিআর বিদ্রোহ ঘটিয়ে ভারতের অপরিসীম উপকার করবে? আসলে র'ও এখন হয়েছে আওয়ামী লীগেরই মতো। নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপানোর হাস্যকর চেষ্টা তাদেরও স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিডিআর বিদ্রোহের 'বিচার' সাঙ্গ হয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে ছয়শোর বেশি বিডিআর সদস্যকে। শুধু ফাঁসির দণ্ডই দেওয়া হয়েছে ১৫২ জনকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ন্যূরেমবার্গে জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পরে এমন পাইকারী প্রাণদণ্ড আর কোথাও দেওয়া হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এই বিচার, এই রায় নিয়ে বিশ্বজোড়া সমালোচনা হচ্ছে। সমালোচনা জাতিসংঘও করেছে। বস্তুত তথাকথিত আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে সরকারের বিরোধী কয়েকজন রাজনৈতিক নেতার বিচার ও দণ্ড এবং বিডিআর বিদ্রোহের তথাকথিত বিচার ও রায়ের পর বাংলাদেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশ্বব্যাপী কোথাও আর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবোধও অবশিষ্ট রইলো না।

বিচারাধীন অবস্থায় ৭০ জন বিডিআর সদস্য মারা গেছেন। বিশ্ব মিডিয়া সাফ সাফ বলে দিচ্ছে যে তাদের কয়েদখানায় হত্যা করা হয়েছে। অথচ এ বিদ্রোহ কি কারণে এবং কারা ঘটিয়েছিলো বাংলাদেশে এবং বিদেশে কেউ জানতে পারলো না। বিদ্রোহের আগে নানক, আজম, তাপস প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে কি কারণে মুঠোফোনে পিলখানার ভেতর থেকে কলগুঞ্জন হচ্ছিলো, হত্যাযজ্ঞের মাঝামাঝি সময়ে খুনীরা গণভবনে প্রধানমন্ত্রী হাসিনার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কি নিয়ে আলোচনা করছিলেন, সেনাবাহিনী যখন বিদ্রোহ দমন করতে পিলখানার দিকে আসছিলো তখন প্রধানমন্ত্রী কেন তাদের গতিরোধ করেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন ২৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় পিলখানা সফর করার পর কেন নতুন করে হত্যাকাণ্ড শুরু হয়, হত্যাযজ্ঞের আগে হঠাৎ করে কেন মাথায় রুমাল বাঁধা কিছু সংখ্যক অপরিচিত লোকের আবির্ভাব হলো এবং হত্যাকাণ্ডের পরে হঠাৎ তারা কি করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো– এসব প্রশ্ন প্রশ্ন হয়েই রইলো, জবাব পাওয়া গেলো না। সাড়ে চার বছর পরে র' এখন আইএসআইয়ের ওপর এ বিদ্রোহের জন্যে দোষারোপ করছে। পরিস্থিতি ঘোলাটে হলেও এতো ঘোলা নয় যে সীমান্তের ওপারের খেলায় বাংলাদেশের মানুষ বিভ্রান্ত হবে।

'সে ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়'

প্রকারান্তরে বাংলাদেশীদের ভারতের বিশাল সামরিক শক্তির ভয়ও দেখাতে শুরু করেছেন সীমান্তর ওপারের কোন কোন সাংবাদিক। টাইমস অব ইন্ডিয়া পত্রিকায় সুবীর ভৌমিকের একটা প্রতিবেদন ব্যাপক আলোচিত ও সমালোচিত

হচ্ছে। সুবীর ভৌমিক প্রকারান্তরে শেখ হাসিনাকে নির্বাচনে জয়ী করানোর জন্যে ভারতকে বাংলাদেশে সৈন্য পাঠানোর ওকালতি করেছেন। সুবীর লিখেছেন, ১৯৭১ সালে ভারত আমেরিকার হুমকিকে ভয় পায়নি, এখন কেন ভয় পাবে। সুবীর ভৌমিক যথেষ্ট গবেষণা না করেই এ প্রতিবেদন লিখেছেন। নইলে তাঁর মনে হতো যে একাত্তরে বাংলাদেশের মানুষ দুবাহু বাড়িয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আমন্ত্রণ করেছিলো, সব রকমের সহযোগিতা দিয়েছিলো তাদের। কিন্তু এখন সীমান্ত পেরিয়ে এলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবস্থা হবে একাত্তরের পাকিস্তানীদের মতো।

একটা কথা এখানে বলে দেওয়া অত্যাবশ্যকীয়। একথা সত্যি যে ভারতীয় সেনাবাহিনী বিশাল এবং সুসজ্জিত। কিন্তু প্রায় পাঁচ দশক ধরে উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতবোন নামে পরিচিত সাতটি রাজ্যের স্বাধীনতাকামীদের মুক্তিযুদ্ধ তারা অবদমিত করতে পারেনি। হাসিনাকে গদিতে রাখার জন্যে ভারতীয় বাহিনী যদি বাংলাদেশে ঢোকে তাহলে বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষ ওই সাতটি রাজ্যের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে হাত মেলাবে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আরো যেসব বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহ চলছে তারাও তাহলে উৎসাহ পাবে, নতুন উদ্যমে তারা তৎপর হয়ে উঠবে। অর্থাৎ বর্তমান আকারে ভারতের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ স্বাধীন করে প্রতিরক্ষা খাতে ভারত যে অপরিমেয় অর্থের ব্যয়হ্রাস করেছিলো তার চাইতেও বেশি অর্থ তাকে প্রতিরক্ষা বাবদ ব্যয় করতে হবে।

আসাম থেকে প্রকাশিত নব বার্তা এবং ভারতের আরো কোন কোন পত্রিকা খবর দিয়েছে যে বাংলাদেশের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করার জন্যে ভারত এক হাজার কোটি রুপী ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতীয় নেতারা মাঝে মাঝেই বলেন ভারত বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করতে চায়, বিশেষ কোন দলের সঙ্গে নয়। ঢাকায় বিজয়ার অনুষ্ঠানে ভারতের অস্থায়ী হাই কমিশনার সন্দীপ চক্রবর্তীও বলেছেন সেকথা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার সঙ্গে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংও বলেছেন সেকথা। কিন্তু ভারতের কথা এবং কাজ যে কতোটা সাংঘর্ষিক বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নির্বাচনকে প্রভাবিত করার জন্যে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের পরিকল্পনা তারই প্রমাণ দেয়। তাতে আরো প্রমাণ হয় যে শেখ হাসিনা গদি পেলে ভারত সব কিছুই পায়, বাংলাদেশ পায় শুধু মিথ্যা কথা আর মিথ্যা আশ্বাস। এবং অবশ্যই প্রমাণ হয় হাসিনা আবারো গদি পেলে ভারত আরো অনেক বেশি পাবার আশা রাখে। নইলে এক হাজার কোটি রুপী তারা লগ্নি করতে যাবে কেন?

(লন্ডন, ০৯.১১.১৩)

গোটা বিশ্বকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছে সরকার

বিএনপির পাঁচ নেতার গ্রেফতারের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে ব্রিটিশ হাইকমিশনার রবার্ট গিবসন বলেছেন, 'বাংলাদেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে গঠনমূলক সংলাপের পরিবর্তে আমাদের অব্যাহতভাবে সংঘাতমূলক কার্যকলাপ দেখতে হচ্ছে। এটি আমাদের হতাশ করেছে। কারণ বাংলাদেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ মনে করে, দুই দল সংলাপের মাধ্যমে সব দলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন করতে সক্ষম হবে।'

ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস এক বিবৃতিতে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র 'অবাধ, ন্যায্য এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের পথে অগ্রগতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।' বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, 'অবাধ, ন্যায্য ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের উপায় খুঁজে বের করার জন্যে বড়ো দলগুলোকে অবশ্যই গঠনমূলক সংলাপে বসতে হবে।'

ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত লি জুন এবং ক্যানাডার হাইকমিশনার হেদার ক্রুডেন হুবহু অনুরূপ বিবৃতি দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ অন্যান্য দেশ ও সংস্থা ইতোপূর্বেই সংলাপের মাধ্যমে সকল দলের গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পন্থা নিরূপণের পরামর্শ দিয়েছে বাংলাদেশকে।

ভারতীয় সংবাদ সংস্থা পিটিআইর খবর অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে বলেছেন, 'বাংলাদেশে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কী করণীয় তা দেশটির রাজনীতিকদেরই স্থির করা উচিত বলে ওয়াশিংটন মনে করে। তবে বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও সকলের অংশগ্রহণে গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। আর তার পথ সুগম করতে এবং দ্বন্দ্ব মেটাতে দুই প্রধান দলের সংলাপে অংশ নেওয়া উচিত।'

বলা হয় সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক স্মৃতি দুর্বল। কিন্তু এতো দুর্বল হবার কথা নয় যে ২০০৬-৭ সালের কথাও তারা ভুলে যাবে। খালেদা জিয়ার বিএনপি সরকারের শেষ বছরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে বিরাট ষড়যন্ত্র চলছিল। ভারতের হাইকমিশনার বীণা সিক্রি এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে

টম্যাস খুবই ঘন ঘন আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করছিলেন। প্রথম আলো পত্রিকার সম্পাদক মতিয়ুর রহমান এবং ডেইলি স্টার পত্রিকার সম্পাদক মাহফুজ আনাম সে ষড়যন্ত্রের দার্শনিক গুরুর ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। ভেতরে ভেতরে সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদও সম্পৃক্ত ছিলেন সে ষড়যন্ত্রে।

বিএনপি সরকার মেয়াদ শেষে ২৮ অক্টোবর (২০০৬) পদত্যাগ করে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শেখ হাসিনার লগি-লাঠি-বৈঠার লাগাতার আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। প্রকাশ্য দিবালোকে লাঠিপেটা করে বেশ কয়েকজন মানুষ খুন করা হয়। সড়ক রেল ও নদীপথে পরিবহন অবরোধ করে দেশের অর্থনীতি অচল করে দেওয়া হয়। এমনকি বঙ্গভবনে রাষ্টপতিকে সপরিবারে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। নাটমঞ্চের 'কিউর' মতো কিউ অনুযায়ী সেনাপ্রধান হাসিনার ১৯৯৫-৯৬ সালের আন্দোলনের ফসল তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বরখাস্ত করে মার্কিন নাগরিক ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে একটা বর্ণচোরা সামরিক সরকারকে বহাল করতে রাষ্ট্রপতিকে বাধ্য করা হয়। ২০০৭ সালের ১৫ এপ্রিল হাসিনা সে সরকারকে তাঁর (সর্বশেষ) আন্দোলনের ফসল বলে বর্ণনা করেন।

সে সরকারের কিছু কিছু লক্ষ্যের কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। তারা প্রথমেই ক্যান্টনমেন্টে খালেদা জিয়ার বাড়ি অবরোধ করে রাখে এবং তাকে সৌদি আরবে নির্বাসনে পাঠানোর চেষ্টা করে। পত্রিকা সম্পাদক দার্শনিক গুরুদ্বয়ের 'মাইনাস টু' (প্রকৃতপক্ষে মাইনাস ওয়ান) তত্ত্ব অনুযায়ী হাসিনাকে বিশ্ব ভ্রমণে যেতে দেওয়া হলেও খালেদা জিয়াকে কারাবন্দী করে রাখা হয়। ডিজিএফআই বিএনপি স্থায়ী কমিটির পাঁচজন সদস্যকে ছিনতাই করে গুলশানে সাইফুর রহমানের বাড়িতে নিয়ে যায় এবং মাঝ রাতের পরে নতুন নেতৃত্বে বিএনপি পুনর্গঠিত হয়েছে বলে মিডিয়ায় ঘোষণা দেওয়া হয়। এই সব কিছুতে ব্যর্থ হয়ে গোপালগঞ্জী প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সহযোগিতায় বিএনপিকে বাদ দিয়ে নির্বাচন করারও চেষ্টা হয়েছিল।

গাড়ি ভাংচুর, ককটেল নিক্ষেপ ইত্যাদি নানা সাজানো অভিযোগে মহাসচিব ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ বিএনপির কয়েকজন শীর্ষ নেতাকে আগেও গ্রেফতার করেছে এই সরকার। কিন্তু গত সপ্তাহে এ দলের স্ট্যান্ডিং কমিটির চারজন সদস্য এবং খালেদা জিয়ার একান্ত সচিব শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাসকে গ্রেফতার করা হয় বিএনপির প্রধান কার্যালয়, খালেদা জিয়ার অফিস এবং বাসভবন থেকে। অনেকেই সন্দেহ করছেন যে শেখ হাসিনা আবারো এক-এগারোর টেকনিক কপি করতে যাচ্ছেন।

সরকার একঘরে হয়ে পড়েছে কিন্তু হাসিনা ভুলে যাচ্ছেন যে এক-এগারোর প্রধান উপাদানটি বর্তমান সময়ে অনুপস্থিত। দিল্লি আর ওয়াশিংটন ২০০৬-০৭ সালে যেকোনো উপায়ে শেখ হাসিনাকে গদি দেবার ব্যাপারে একমত ছিল। এই দুই মহাশক্তির প্রভাবে অন্যান্য দেশ সমর্থন না দিলেও নীরব ছিল। সেটাকে 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' বিবেচনা করা ভারত আর যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কঠিন ছিল না। বিগত পাঁচ বছরে একদিকে পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রকে দফায় দফায় অপমান এবং সাহায্যদাতা দেশ ও সংস্থাগুলোর বিশ্বাস ভঙ্গ করা এবং অন্যদিকে স্বদেশে ব্যাপক রাজনৈতিক হত্যা ও মানবাধিকারের চূড়ান্ত অবমাননা প্রভৃতি কারণে আওয়ামী লীগ সরকার বিশ্বব্যাপী একঘরে হয়ে পড়েছে। মজার ব্যাপার এই, একঘরে হাসিনা সরকারকে অন্ধ সমর্থন দিতে গিয়ে ভারতও প্রকারান্তরে একঘরে হয়ে পড়েছে। প্রেসিডেন্ট ওবামার দরবারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের ধর্নাও এক নম্বর পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের মন গলাতে পারেনি। ওবামা ভারতকে বাংলাদেশে 'ফাঁকা মাঠে গোল করতে দিতে' রাজি হননি।

মনমোহন সিং প্রেসিডেন্ট ওবামাকে বলেছিলেন, 'আমরা বাংলাদেশে যে কোনো ধরনের বিদেশী হস্তক্ষেপের বিপক্ষে। আমরা চাই যেসব পক্ষের অংশগ্রহণে একটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই নির্ধারণ করুক।' কিন্তু একই সঙ্গে ভারতের মিডিয়া এবং পররাষ্ট্র নীতির বাহন র' যে কোন উপায়ে শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বহাল রাখার চেষ্টা গোপন করছে না। এদিকে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের অন্যতম কলম সন্ত্রাসী মুনতাসির মামুনের একটি সাম্প্রতিক কলামের শিরোনাম ছিলো: 'আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করবে কে? আমরা না বিদেশীরা?' অর্থাৎ ভারত বাংলাদেশকে পরদেশ এবং আওয়ামী লীগের আঁতাতকে অশুভ বলে বিবেচনা করে।

শত ফুটো কলসিতে পানি ঢালা হলে বহুমুখী ধারায় নানা দিকে ছিটকে বেরোয় সে পানি। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগ সরকারের কথাবার্তা সে রকম বিশৃঙ্খলা, পরস্পর বিরোধী এবং অর্থহীন। প্রধানমন্ত্রী হাসিনা প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছেন তিনি প্রধানমন্ত্রীত্ব চান না, চান দেশের মানুষের শান্তি। কিন্তু দেশের মানুষ তাঁকে প্রায় একবাক্যে বলে দিচ্ছে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ। ওদিকে হুমকিবাজ হানিফ আর তথ্যঘাতক মন্ত্রী ইনু আর বুনোমন্ত্রী মাহমুদ হাসান প্রমুখের বেয়াদপী ইতরামির সীমা ছুঁই ছুঁই করছে। সজীব ওয়াজেদ জয় তাঁর মাকে অনুকরণ করেই অশালীন ভাষায় কথা বলছেন। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এ দলটির মনোভাব এ রকম মনে হয়: তারা জানে বাংলাদেশের মানুষ আর ভোট দিয়ে তাদের নির্বাচিত

করবে না। তার কারণ একটিও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি পালনে সরকারের ব্যর্থতা, তাদের আকাশচুম্বী দুর্নীতি এবং ট্রানজিট, করিডোর আর অবাধে বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে বাংলাদেশের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব কার্যত ভারতের হাতে তুলে দেওয়া এবং দেশব্যাপী সহিংসতা ও রক্তারক্তির কারণ সৃষ্টি করা।

হাসিনা কি হুকুমের আসামী নন?

তবু তারা গদি আঁকড়ে থাকতে চায়। প্রধানমন্ত্রীর মার্কিন পুত্র জয়ের কথাবার্তায় পরিষ্কার হয়ে যায় যে আওয়ামী লীগ আরো ১৫ থেকে ২০ বছর ক্ষমতায় থাকতে চায়। সাদা চোখে তার দুটো কারণ দেখা যায়। প্রথমত বিগত পৌনে পাঁচ বছরের দুর্নীতিতে তাদের পেট ভরেনি। বাংলাদেশের কিছু সম্পদ এখনো অবশিষ্ট আছে। সেটাও তারা হাতিয়ে নিতে চায়। দ্বিতীয়ত তাদের ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকরা বাংলাদেশকে পুরোপুরি 'অ্যানেক্স' (ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত) করা না গেলেও নিদেন এই দেশটাকে তারা একটা করদ রাজ্যে পরিণত করতে চায়। তাদের সে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে শেখ হাসিনার গদিতে থাকা দরকার। ভারত জানে বাংলাদেশের অন্য কোনো রাজনৈতিক, এমনকি সাধারণ মানুষও হাসিনার মতো 'ঔদার্য' দেখিয়ে এই দেশটাকে ভারতের হাতে তুলে দিতে রাজি হবে না।

গদি লাভের সময় থেকেই বিচক্ষণ পর্যবেক্ষকরা বর্তমান সরকারের ফ্যাসিস্ট চরিত্র লক্ষ্য করেছেন। যতোই দিন যাচ্ছে তাদের মনোভাব ও আচরণ ক্রমেই বেশি আগ্রাসী ও মারমুখো হয়ে উঠছে। প্রধানমন্ত্রী পুত্র জয় এখনো মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী এমনকি সংসদ সদস্যও হননি। কিন্তু তাঁর সাম্প্রতিক কথাবার্তা-গুলোতে ফ্যাসিবাদীর সুর স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে এসেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগই জয়ী হবে বলে তাঁর কাছে 'ইনফরমেশন' আছে। সর্বশেষ তিনি বলেছেন যে গ্রেফতার হওয়া পাঁচজন শীর্ষ বিএনপি নেতা বোমাবাজি করার ইচ্ছা পোষণ করছিলেন বলে তাঁর কাছে প্রমাণ আছে। এই 'সর্বজ্ঞ' অর্বাচীনের কোনো কোনো উক্তি তাঁর মায়ের প্রায়শিক কথাবার্তার চাইতেও বেশি বিরক্তিকর হয়ে উঠছে।

ছাত্রলীগ যুবলীগ আর আওয়ামী লীগ ক্যাডারদের তাণ্ডব এখন আর কারোই অজানা থাকছে না। বিরোধী দল ও জোটের মিছিল ও সমাবেশে পুলিশের পাহারায় তাদের বন্দুকবাজির আলোকচিত্র মাঝে মাঝেই মিডিয়ায় দেখা যাচ্ছে। নিউ এজ্ পত্রিকার সম্পাদক নূরুল কবীর বলেছেন, সরকারের লোকেরাই বিআরটিসি বাসে আগুন লাগায় বলে তাঁর কাছে প্রমাণ আছে। পরিষ্কার হয়ে

গেছে যে বিরোধী দলের হরতালকে অপযশ দেবার লক্ষ্যে সরকার ও শাসক দলের হুকুমেই আওয়ামী লীগের ক্যাডাররা দুস্কৃতি ও অপকর্মগুলো করছে।

অনেকদিন আগে থেকেই বিরোধী দলের নেতাদের গ্রেফতারের অজুহাত হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীরা 'হুকুমের অপরাধী' কথাটা আবিষ্কার করেছেন। মনে হচ্ছে জয়ও সে যুক্তিতে দীক্ষা নিয়েছেন। একথা তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার বাংলাদেশে হাজার হাজার রাজনৈতিক হত্যা, গুম এবং পর্বত-প্রমাণ দুর্নীতি হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ, অন্তত পক্ষে সায় ছাড়া এসব সম্ভব হতো না। সরকারের (এবং জয়ের) যুক্তি অনুযায়ী সেসব অপরাধের জন্যে শেখ হাসিনা অন্তত হুকুমের আসামী। বিচার একচক্ষু না হলে শেখ হাসিনারও এখন জেলে থাকাই উচিত।

খালেদা জিয়া এখন কী করবেন?

প্রবন্ধের শুরুতে বিশ্ব সমাজের প্রতিনিধি কূটনীতিকদের কিছু উক্তি উদ্বৃত করেছি। তাঁরা বলেছেন সকলের গ্রহণযোগ্য এবং বিশ্ব সমাজের বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের পদ্ধতি নিরূপণের জন্যে বড়ো দল দুটোর মধ্যে সংলাপ অত্যাবশ্যকীয়। এবং বিশেষ করে পাঁচ নেতার গ্রেফতারের পরে পরেই তাঁদের প্রতিক্রিয়াগুলো থেকে পরিষ্কার যে গ্রেফতারগুলো তাঁরা সংলাপের পথের কাঁটা বিবেচনা করেন। তাছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে প্রায় সমস্বরে তাঁদের প্রতিক্রিয়া থেকে মনে হয় যে ঘটনাবলীর এই বিবর্তনে তাঁরা রীতিমতো উদ্বিগ্ন।

ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের প্রবক্তা সুজিত ঘোষ গত সোমবার একটি বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিতে প্রথমবারের মতো 'সংলাপ' কথাটার উল্লেখ আছে। কিন্তু পুরনো কথাবার্তার জঞ্জালে সে কথাটা হারিয়ে গেছে বলাই সঙ্গত হবে। অন্তত বিবৃতি থেকে এ ধারণা পাওয়া যায়নি শেখ হাসিনাকে সংঘাতের পথ ত্যাগ করে সংলাপের পথ ধরার পরামর্শ ভারত দেবে কিনা। সুতরাং এখুনি আশাবাদী হবার কারণ ঘটেনি।

ইতোমধ্যে বিএনপির এবং ১৮ দলের জোটের নেত্রী খালেদা জিয়াকে সহকর্মীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখাই বিএনপির পাঁচ নেতাকে গ্রেফতারের মুখ্য উদ্দেশ্য মনে হচ্ছে। নেতা-কর্মীদের বিএনপির প্রধান কার্যালয়ে ঢুকতে দিচ্ছে না পুলিশ। অন্য নেতাদের বাড়িতে পুলিশী তল্লাশী চলছে। তাঁদের ধরপাকড় করে, নিদেন গ্রেফতার আতঙ্ক দিয়ে তাঁদের আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য করে আন্দোলন ও হরতালে বাধা দেওয়াই সরকারের লক্ষ্য বলে মনে হয়। ওদিকে বেগম জিয়ার অফিসে ও ভাড়াকরা বাসা পুলিশ ও গোয়েন্দারা যেভাবে ঘিরে রেখেছে তাতে আবারো তাঁকে নির্বাসনে পাঠানোর কিম্বা কারাবন্দী করার

চেষ্টা হতে পারে। কিন্তু এ ধরনের চেষ্টা ২০০৭-০৮ সালে সফল হয়নি। বর্তমানেও হবে বলে আশা করা যাবে না। খালেদা জিয়ার উচিত হবে এখন থেকে নির্দেশ দিয়ে রাখা যে যদি তাঁকে গ্রেফতার করা হয় অথবা নির্দলীয় সরকারের অধীনে ছাড়া নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয় তাহলে স্থানীয় পর্যায়ের নেতারা অবিরাম হরতাল ও দেশ অবরোধ কর্মসূচি কার্যকর করবেন। দেশবাসীকে মনে রাখতে হবে যে একাত্তরে শেখ মুজিব আপসে ধরা দিয়ে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন আর আওয়ামী লীগের গোটা নেতৃত্ব পালিয়ে চলে গিয়েছিল ভারতে। কিন্তু আমাদের মুক্তিযুক্ত তাঁদের জন্যে থেমে থাকেনি। বর্তমানেও চলছে একটা মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশের গণতন্ত্র-পাগল মানুষকে প্রয়োজনবোধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগ্রাম করে ভারত-আওয়ামী লীগ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে হবে।

(লন্ডন, ১৩.১১.১৩)

ত্রুটি স্বীকার : গত শুক্রবার শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সম্বন্ধে প্রবন্ধে আর বেগম খালেজা জিয়ার একটি সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে অনবধানতাবশত ৭ নবেম্বরের স্থলে ৭ মার্চ লেখা হয়েছিল। কয়েকজন সহৃদয় পাঠক এই ত্রুটিটির দিকে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

দেশের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংকটের একটা সার্বিক চিত্র

ইংরেজি প্রবাদ হচ্ছে "গভ দ্যা ডগ এ ব্যাড নেম এবং হ্যাং ইট"- কুকুরকে একটা দুর্ণাম দাও, তাহলে তাকে ফাঁসি দেওয়া যাবে। শহীদ রাষ্ট্রপতি এবং স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষক জেনারেল জিয়াউর রহমানের পরিবারের বিরুদ্ধে বর্তমান প্রধামন্ত্রী শেখ হাসিনার গালিগালাজ ও আক্রোশ প্রসঙ্গে বরাবরই আমার এই প্রবাদটি মনে হয়েছে। বিভন্ন সময়ে বিভিন্ন কলামে এ বিষয়ে আলোচনাও করেছি।

শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের উদ্যোগে ভারতের রাজনৈতিক আশ্রয় থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসেন ১৯৮১ সালের ১৭ মে। এসেই তিনি রাষ্ট্রপতি জিয়ার কল্যাণে নতুন করে বৈধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের চেয়ারপার্সন হলেন। কোন নির্বাচন হলো না, যোগ্যতা-অযোগ্যতার বাছবিচার হলো না। আওয়ামী লীগের নেতারা ইংলন্ডের বংশানুক্রমিক রাণীর মতো অভিষেক করে হাসিনাকে আওয়ামী লীগের নেত্রী ঘোষণা করেন। শুধুমাত্র এ কারণে যে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা। পরবর্তী কালে ভেতরে ভেতরে আওয়ামী লীগের অনেক নেতা স্বীকার করেছেন অমন তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিয়ে আওয়ামী লীগ ভুল করেছে। ২০০৭ সালে বর্ণচোরা সামরিক সরকার যখন গণতন্ত্রের কচি বৃক্ষটির শেকড় উপড়ে ফেলার সর্বপ্রকার চেষ্টা করছিল আওয়ামী লীগ নেতাদের কেউ কেউ প্রকাশ্যে সে কথা বলার চেষ্টা করেছেন। তাতে তাঁদের মঙ্গল হয়নি। দুর্গ প্রাচীরের মতো হাসিনার সৃষ্ট ক্যাডারগুলো সমালোচকদের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমীর হোসেন আমু আর তোফায়েল আহমেদদের মন্ত্রী হতে যে পাঁচ বছর প্রতীক্ষায় থাকতে হয়েছে এই হচ্ছে তার কারণ।

বিগত প্রায় পাঁচ বছরে অনেকবার আমি লিখেছি যে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া এবং তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে হাসিনার অবিরাম কুৎসা রটনা এবং আদালতে রুজু করা মামলাগুলো সবই সাজানো। কারণগুলোকে দুই পর্যায়ে ফেলা যায়। জিয়াউর রহমান জীবিত এবং ক্ষমতাসীন থাকলে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার গদি পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। দিল্লি থেকে ঢাকায় নেমে সেজন্যেই তিনি 'খুনি' ইত্যাদি অপবাদ প্রচার করে জিয়ার ব্যক্তিত্বে ঘুণ ধরানোর

চেষ্টা শুরু করেন। সে চেষ্টা সফল হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। দেশী-বিদেশী সামরিক ষড়যন্ত্রে প্রেসিডেন্ট জিয়া খুন হওয়ায় হাসিনা আশার আলো দেখতে শুরু করেন। কিন্তু জিয়ার গৃহবধূ বিধবা স্ত্রী খালেদা যে এমন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে দাঁড়াবেন শেখ হাসিনা ঘৃণাক্ষরেও সেটা ভাবতে পারেননি।

খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে হাসিনা কুৎসা রটনা শুরু করেন সে কারণে। বর্তমান মেয়াদে গদি পাবার পর খালেদা ও তাঁর সন্তানদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলাগুলো সাজানোর কারণ সম্বন্ধে খুব বেশি লোকের সন্দেহ ছিল না। বিরোধীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে তার আড়ালে নিজেরা পর্বত-প্রমাণ দুর্নীতি করার পরিকল্পনা সম্ভবত আগেই তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সেই ধূম্রজালের আড়ালে যে শেয়ার বাজার লুণ্ঠন, কুইক রেন্টাল বিদ্যুতের নামে ২০ হাজার কোটি টাকা চুরি, ডেসটিনি ও হলমার্ক কেলেঙ্কারিতে আরো বহু হাজার টাকা লুট করা এবং শেষত গোটা পদ্মা সেতুটাই গিলে খাওয়া ঢাকা পড়বে না সরকার ও প্রধানমন্ত্রী খুব সম্ভবত সেটা ভাবতে পারেননি।

বিচার বিভাগ নিয়ে আশার ক্ষীণ আলো

বাংলাদেশের বিচার বিভাগ প্রায় সম্পূর্ণরূপে দলীয়কৃত। উচ্চতর আদালতের বহু বিচারক আওয়ামী লীগের নিম্নতর স্তরের নেতা কিংবা স্থানীয় কর্মী ছিলেন। বাংলাদেশে এবং বিদেশে প্রায় সকলেই আশঙ্কা করছিলেন খালেদা জিয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র এবং বিএনপির নির্বাসিত সিনিয়র ভাইস- প্রেসিডেন্ট তারেক রহমানের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করে তাঁর অন্তহীন রাজনৈতিক সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার সুযোগ সরকার কিছুতেই ছাড়বে না। কারো কারো মতে সহজেই তারেককে দোষী সাব্যস্ত করার আশায় সরকার বিচারের জন্যে প্রথমেই মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগটি বেছে নিয়েছিল। বস্তুত সকল আলামতই ছিল সে রকম। সরকার প্রভাবিত মিডিয়াগুলো এমন নিশ্চয়তার সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করছিল যে তারেক রহমান গত রোববারের (১৭ নবেম্বর) রায়ে দশ বছরের কারাদণ্ড পাবেন, তাতে মনে হতে পারতো যে রায়টি এসব মিডিয়ার সাংবাদিকরাই লিখে দিয়েছিলেন।

সরকারও নিশ্চয়ই সে রকমই আশা করেছিল। তারা জানতো যে সাজানো মানি লন্ডারিং মামলায় তারেককে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেওয়া হলে দেশজোড়া আগুন জ্বলবে। সেজন্যেই তারা তাদের সশস্ত্র ক্যাডার, পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি দিয়ে দেশ ছেয়ে ফেলেছিল। কিন্তু রোববারের রায়ে তারেক রহমান নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন এবং খালাস পেয়েছেন। এতে কিছু আশার আলো যেন দেখতে পাচ্ছি। আওয়ামীকৃত বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় তিন নম্বর বিশেষ দায়রা আদালতের বিচারপতি মোতাহার হোসেনের মতো সাহসী ও ন্যায়পরায়ণ বিচারক এখনো দু'একজন অবশিষ্ট আছেন বলে মনে হচ্ছে। এটা

প্রকৃতই আশার কথা। তারেক রহমানের জন্মদিনের তিনদিন আগে উপহারটি তিনি একটু আগামই পেলেন। তাঁকে অভিনন্দন।

সরকার যে শুধু তারেক রহমান ও জিয়া পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে ভুয়া ও মিথ্যা মামলা রুজু করেছে তা নয়। ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার মতলবে বিএনপির শীর্ষ পর্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত হাজার হাজার নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট মামলা চালু করেছে। মাত্র সেদিন পত্রিকায় পড়ছিলাম। একটি স্থানীয় মিছিলের ব্যাপারে পুলিশ বহু লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগের তালিকা তৈরি করেছে। তালিকার গোড়ার দিকেই আছে কবি মতিউর রহমান মল্লিকের নাম, যিনি তিন বছর আগেই পরলোকে চলে গেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপাত দৃষ্টিতে এমনই অবাস্তব সেসব অভিযোগ যে এই সরকারের হিংস্র চরিত্রের কথা জানা না থাকলে এসব অভিযোগ নিয়ে বিস্তর হাসাহাসি করা যেতো। সর্বশেষ গ্রেফতার করে অভিযোগ সাজানো হয়েছে মওদুদ আহ্‌মেদ, রফিকুল ইসলাম মিয়া, এম কে আনোয়ার, শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস এবং আব্দুল আউয়াল মিন্টুর বিরুদ্ধে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পুলিশের ওপর হামলা, গুণ্ডামি এবং বিস্ফোরণ ঘটানোর।

সরকারের হতাশা এবং বেপরোয়া আচরণ

কয়েক মাস আগে বিএনপির মহাসচিব মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ কয়েকজন শীর্ষ নেতাকে গ্রেফতার করে বেশ কিছুকাল কয়েদ করে রাখা হয়েছিল এবং মাঝে মাঝে রিমাণ্ডে নিয়ে তাঁদের ওপর নানা প্রকার মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তাঁরা নাকি সচিবালয়ের ভেতরে ককটেল বোমা ছুঁড়েছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কাছে এয়ারপোর্ট রোডে একখানি গাড়ি ভাচুর করেছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই অভিযুক্ত ব্যক্তিরা শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী এবং সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশের মানুষ কয়েক দশক ধরে তাঁদের চেনে ও শ্রদ্ধা করে এসেছে। সরকারের অভিযোগ অনুযায়ী দুষ্কর্মগুলো তাঁরা করতে পারেন বলে শুধু উন্মাদেই বিশ্বাস করতে পারে। শেষতক কোন কোন মন্ত্রী 'হুকুমের আসামী' কথাটা আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে কয়েক হাজার রাজনৈতিক কর্মীর জেল-জুলুম-হত্যা ও নির্যাতন, বিচার-বহির্ভূত হত্যা, গুম খুন ইত্যাদি হয়েছে। শেখ হাসিনার হুকুম ছাড়া সেসব কিছুতেই সম্ভব হতো না। বাংলাদেশে ভবিষ্যতে কিছু ভি-ভিআইপির হুকুমের আসামী হিসেবে বিচার করার নজীর সৃষ্টি হলো।

প্রকৃত পরিস্থিতি এই যে খালেদা জিয়ার গণতন্ত্র আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন এতোই দুর্বার যে শেখ হাসিনার অধীনে একটা সাজানো-পাতানো নির্বাচনে ২০০৮ সালের মতো অন্যায়ভাবে গদি দখল করতে পারবে বলে সরকার আশা করে না। সরকারের পরিকল্পনা ছিল নেতাদের গ্রেফতার করে কারাবন্দী করে রাখা হলে খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে

এবং তাঁর আন্দোলন দুর্বল ও হতোদ্যম হবে। সরকারের এতোসব চেষ্টা এ যাবৎ ব্যর্থ হয়েছে বলেই মনে হয়। যে কোন কারণেই হোক দু'চারজন নেতার ইতস্তত ভাব সত্ত্বেও দেশের মানুষ খালেদা জিয়ার সঙ্গেই আছে এবং গোটা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় শেখ হাসিনা পুলিশ-র‍্যাব ও বিজিবি পরিবৃত্ত হয়ে গণভবনে অবরুদ্ধ জীবন যাপন করছেন।

সরকারের আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল ভুয়া অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে নেতাদের (তারেক রহমানসহ) হয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বাধা দেওয়া হবে, নয়তো আদালতে দণ্ডিত অপবাদ দিয়ে জনসাধারণের অপ্রিয় করে তোলা যাবে। কিন্তু সরকারের এই দুটির কোন উদ্দেশ্যই সফল হবার সামান্যতম লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে তারেক রহমানের অব্যাহতি সাধারণ মানুষের এ বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করবে যে সরকার পুলিশী ত্রাস, হত্যা ও নির্যাতনের পাশাপাশি জেল-জুলুম ও মিথ্যা মামলা দিয়ে গদি আঁকড়ে থাকতে চায়।

'ঠাকুর ঘরে কে রে?'-'আমি কলা খাই না'

সে সবেও কোন লাভ হচ্ছে না। শেখ হাসিনা এখন ভারতের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছেন বলেই মনে হয়। তাঁর ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকরাও আদাজল খেয়ে তাঁকে গদিতে বহাল রাখতে উঠেপড়ে লেগে গেছেন। সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সঙ্গে আলোচনায় ভারতের প্রধামন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছিলেন, তাঁরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার হস্তক্ষেপ করতে চান না। তবে তাঁরা শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন দেখতে চান। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের বিজয়ার অনুষ্ঠানে ভারতের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার সন্দীপ চক্রবর্তীও বলেছিলেন যে নির্বাচন বাংলাদেশের নিজস্ব ব্যাপারে -তবে....। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল কুমার শিন্দে সম্প্রতি শেখ হাসিনাকে ভারতীয় বাংলার (পশ্চিমবঙ্গের) মেয়ের মতো বলে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। গত রোববার তিনি আবার বলেছেন, "ভারত কখনো কোন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও করবে না, কেননা আমরা সব সময়ই বাংলাদেশের ভালো চাই।"

ঠাকুর ঘরের ভেতর থেকে যারা বলে, 'আমি কলা খাই না' তাদের সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করা স্বাভাবিক। ভারতীয় নেতাদের উক্তিগুলো তেমনি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করেনি এবং করছে না। কারো মনে যদি সামান্যতম সন্দেহও থেকে থাকে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার পঙ্কজ শরণ সে সন্দেহও এখন ভঞ্জন করে দিলেন। মি. শরণ গত শনিবার বলেছেন, বাংলাদেশের 'শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিয়ে' ভারত অন্যান্য দেশের সঙ্গে আলোচনা করছে। এই উক্তি করার সময় পঙ্কজ শরণ সম্ভবত ভাষা ব্যবহারে কূটনৈতিক সতর্কতার কথা ভুলে গিয়েছিলেন, কেননা তাতে আরো স্বীকৃতি পাওয়া গেলো

যে ভারত বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ করছে। বাংলাদেশের নির্বাচনে অন্যায় হস্তক্ষেপ ভারতীয় নেতারা 'অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ' বলে স্বীকার করতে রাজি না হলেও সেটাই হচ্ছে বাস্তব। বস্তুত শুধু বাংলাদেশই নয়। শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান এবং মালদ্বীপ প্রায়ই অভিযোগ করে থাকে যে ভারত তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন্যায় হস্তক্ষেপ করে। মাত্র সেদিন মালদ্বীপে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়ে গেলো। সে দেশের মানুষ এবার ভারতপন্থী বলে পরিচিত সাবেক রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ নাশিদকে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।

'দূর হঠো দুনিয়াওয়ালে, বাংলাদেশ হামারা হায়'

বাংলাদেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বাংলাদেশের নিজস্ব ব্যাপার। বস্তুত ভারত হস্তক্ষেপ করছে বলেই বাংলাদেশে বর্তমান অশান্তি ও অস্থিতিশীলতাগুলো ঘটছে। খুব সম্ভবত ভারত ফায়দা লুট করার আশায় সুপরিকল্পিতভাবে বর্তমান অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশের মানুষের হৃদয় একটা হিন্দি গানের অনুকরণে বলতে আঁকূপাঁকু করছে: "দূর হঠো ভাই দুনিয়াওয়ালে, বাংলাদেশ হামারা হায়" ভারতীয় নেতারা এখন প্রকাশ্যেই স্বীকার করেন, বর্তমান সময়ে ভারত সম্বন্ধে বাংলাদেশের মানুষের ধারণা সবচাইতে খারাপ। ভারত কি গায়ের জোরে সে ধারণা ভালো করতে চায়? বর্তমান সময়ে ভারত যা করছে তার পরে আর কোন বাংলাদেশী ভারতের শাসকদের বন্ধু ভাবতে পারবে না।

গত কয়দিনে অনেক কিছু ঘটে গেছে বাংলাদেশে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনার বাসভবনে গিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর হাসিনার তনয় জয়ের শূন্য ভান্ডের বোল-চাল হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টও নীরব মনে হচ্ছে। অতলান্তিকের ওপার থেকে ইন্টারনেটে গুজব আসছে জয় এবং তাঁর কোন কোন আত্মীয়ের বিরুদ্ধে শত শত মিলিয়ন ডলারের মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ নিয়ে তদন্ত করেছে মার্কিন কর্তৃপক্ষ। এই দুটো ব্যাপারের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কি না কে জানে?

এদিকে মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিশা দেশাই বিসওয়াল বাংলাদেশ সফর করে গেছেন। প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলের নেতা, দু পক্ষের কিছু শীর্ষ প্রতিনিধি এবং কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সফর শেষের সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলে গেছেন নির্বাচনের ফলাফল বাংলাদেশের মানুষের গ্রহণযোগ্য হলে তবেই ওয়াশিংটন সে নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করবে। তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি তিনি বলতে চেয়েছেন সেটা এই যে শেখ হাসিনা যে নির্বাচন কালীন সরকার গঠন করেছেন তাতে সমাধানের পরিবর্তে সংকট আরো জটিল হয়েছে। নিশা দেশাই বিসওয়াল বলেছেন, সর্বশেষ ঘটনাবলীর কারণে প্রধান দুই দলের মধ্যে সংলাপ আরো বেশি জরুরি হয়ে উঠেছে।

কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন ও বিশ্ব বেঈমান

হাসিনা ও তাঁর সরকার নতুন কয়েকজন মন্ত্রীর শপথ অনুষ্ঠানকে বলেছেন সর্বদলীয় সরকার গঠন। কানা ছেলের পদ্মলোচন নাম রাখা আর কাকে বলে! আগে ছিল তাঁর ১৪ দলীয় মহাজোট সরকার। এখন হয়েছে তিন দলীয় সঙ্কুচিত এবং সংক্ষেপিত জোটের পুনর্গঠিত মন্ত্রীসভা। পদত্যাগকারীরা এখন আর বৈধ মন্ত্রী নন। তাছাড়া বিশেষজ্ঞদের অনেকেই বলেছেন, হাসিনার সংবিধানেও কোন সর্বদলীয় মন্ত্রীসভার বিধান নেই। এই সঙ্কুচিত জোটের মন্ত্রীসভায় এরশাদের জাতীয় পার্টির যোগদানে আমি মোটেই বিস্মিত হইনি। এরশাদ ১৯৮২ সালে তাঁর সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান তখন বাংলাদেশের রাজনীতিকদের মধ্যে একমাত্র শেখ হাসিনাই তাঁকে সমর্থন দিয়েছিলেন।

সামরিক স্বৈরতন্ত্রকে বৈধতা দেবার আশায় এরশাদ ১৯৮৬ সালের মে মাসে যে সংসদ নির্বাচন ডাকেন আওয়ামী লীগসহ সকল দল সে নির্বাচন বর্জনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু সকলের বিশ্বাস ভঙ্গ করে হাসিনা সে নির্বাচনে অংশ নেন। পরে সংসদ বয়কট করার ঘোষণা দিলেও এরশাদের সঙ্গে তিন ঘণ্টা ড্রাইভের পর আওয়ামী লীগ নেত্রী নিজের ঘোষণা গিলে খেয়ে সংসদে গিয়েছিলেন।

হাসিনার এখন দুঃসময়। দেশের মানুষ তার অধীনে নির্বাচন চায় না। একমাত্র ভারত ছাড়া আর কোন দেশ তার অধীনে বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন হবে বলে মনে করে না। তিনি এখন তিন দলের কয়েকজন মন্ত্রী নিয়ে 'সর্বদলীয় মন্ত্রীসভা' গঠন করেছেন। এ মুহূর্তে অতীতের ঋণ পরিশোধ করেছেন মাত্র সাবেক জেনারেল এরশাদ। অবশ্যি কেউ কেউ বলছেন তাঁর বিরুদ্ধে চাপা দেওয়া দুর্নীতির মামলাগুলো আবার চাঙ্গা করার ভয় দেখিয়েছিলেন শেখ হাসিনা। সেটা সত্যি হতেও পারে। আদালতকে রাজনীতির লগি-লাঠি কিংবা বৈঠা হিসেবে ব্যবহারে শেখ হাসিনা সিদ্ধহস্ত।

হুসেন মুহম্মদ এরশাদের ডিগবাজির রাজনীতি বাংলাদেশের মানুষের জন্যে নতুন নয়। গত কিছুদিন ধরে তিনি বলে আসছিলেন তাঁর দল হাসিনার মহাজোটে থাকলে দেশের মানুষ থু থু দেবে। জোর গলায় এরশাদ বলছিলেন যে সকল দল অংশ না নিলে জাতীয় পার্টি নির্বাচনে যাবে না। ১৪ দলের জোট ত্যাগের ঘোষণা দিয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জাতীয় পার্টির সদস্যদের তিনি তিন দলীয় জোটের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবার জন্যে বঙ্গভবনে পাঠান। এখন তিনি বুলি ঘুরিয়ে দিয়েছেন। এখন বলছেন যে নির্বাচনে অংশ না নিলে লোকে গায়ে থুথু দেবে। আশির দশকে বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় শিল্পী কামরুল হাসান এরশাদের কার্টুন ছবি এঁকেছিলেন এবং সে ছবির পরিচিতি দিয়েছিলেন 'বিশ্ব বেহায়া'। বেঁচে থাকলে কামরুল হাসান হয়তো আরো একটি কার্টুন আঁকতেন এবং তার ক্যাপশন দিতেন 'বিশ্ব বেঈমান'।

শান্তিপূর্ণ সমাধানের শেষ চেষ্টা করছেন খালেদা

নতুন মন্ত্রীসভাকে অন্তর্বর্তীকালীন কিংবা সর্বদলীয়- যে নামেই বর্ণনা করা হোক তাতে পরিস্থিতির ইতর-বিশেষ হচ্ছে না, সমাধানও নিকটবর্তী হচ্ছে না। প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে বর্তমান সরকারে মাত্র একজন ব্যক্তি আছেন যাঁর প্রভাব সর্বব্যাপী। প্রধানমন্ত্রী হয়েই শেখ হাসিনা র‍্যাব-পুলিশ আর আদালতের দলীয়করণ করেছেন। প্রশাসনকে মুঠোর মধ্যে রাখার জন্যে তিনি পাইকারী হারে তাঁর ভোট ব্যাংক হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে মোক্ষম পদগুলোতে কর্মকর্তা নিয়োগ করেছেন। সে লক্ষ্যে প্রায় সাতশো দক্ষ ও অভিজ্ঞ মুসলিম কর্মকর্তাকে অত্যন্ত বিতর্কিতভাবে ওএসডি করে রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রশাসনে হিন্দু কর্মকর্তার সংখ্যা খুবই দৃষ্টিকটুভাবে অনানুপাতিক।

কিছুকাল আগে একটা হিসেবে দেখেছিলাম ৬৮ জেলার মধ্যে ৪২ টিতেই ডেপুটি কমিশনার (প্রধান প্রশাসক) হিন্দু। আরো কিছু হিসেবে এ রকম: সচিবালয়ে ৩ জন সচিব, ৩৪ জন অতিরিক্ত সচিব, ১৩১ জন যুগ্ম সচিব এবং ১২৫ জন উপসচিব এখন হিন্দু। ৫৩ জন সিনিয়র সহকারী সচিব, ৯৬ জন সহকারী সচিব এবং ৪ জন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারও অমুসলিম। বাংলাদেশে নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে থাকেন এসব কর্মকর্তা। নির্বাচনে প্রকৃত ভোট গণনা করা হবে, না আগে থাকতেই ভরাট করা বিকল্প ব্যালট বাক্সগুলো গণনার জন্যে হাজির করা হবে, অথবা অন্য কোন ভাবে কারচুপি হবে কিনা সবই নির্ভর করছে এসব কর্মকর্তার ওপর। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন থাকলে নির্বাচনের দায়িত্বে নিযুক্ত এসব কর্মকর্তা তাঁর নির্দেশ পেলে কারচুপি করবেন না বলে বিশ্বাস করা কঠিন। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিরোধী ১৮ দলের জোট এবং বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ মানুষ সেজন্যেই শেখ হাসিনার অধীনে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব বলে মনে করে না।

খালেদা জিয়া গত মঙ্গলবার তাঁর দল ও জোটের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রতিনিধিকে নিয়ে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। জানা গেছে তাঁরা রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদকে বলে এসেছেন যে শেখ হাসিনার অধীনে কোন মন্ত্রীসভায় যোগদান কিংবা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ বিরোধী দলগুলোর পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁরা দেশের সংকটের গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং তাঁর সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করে হস্তক্ষেপের অনুরোধও জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতিকে। রাষ্ট্রপতি যদি এই ক্রান্তি লগ্নে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গীর ঊর্ধ্বে উঠে এবং সদিচ্ছা নিয়ে হস্তক্ষেপ করেন তাহলে শান্তিপূর্ণ সমাধান অসম্ভব নয়। অন্যথায় বিএনপি এবং ১৮ দলের জোট চূড়ান্ত এবং চরম আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে। সেটা আওয়ামী লীগের জন্যেও ভালো হবে না, দেশের জন্যে তো নয়ই।

(লন্ডন, ১৯.১১. ১৩)

প্রয়োজন গণবিপ্লবের-সুবিবেচক হরতালে কাজ হবে না

শান্তিপূর্ণভাবে এবং মীমাংসার ভিত্তিতে দেশের সংকট সমাধানের আর কোন পথ অবশিষ্ট রইলো না। রাষ্ট্রপতিও রাজনীতিকে সড়কে ঠেলে দিয়েছেন। বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া ১৮ দলের জোটের একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে মঙ্গলবার (১৯ নবেম্বর) সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদের কাছে আপিল করতে গিয়েছিলেন। রাষ্ট্রের তিনি অভিভাবক। তিনি সংসদ ভেঙে দেওয়া এবং তফসিল ঘোষণা বিলম্বিত করতে পারতেন, সাহসী হলে তিনি নিজেই নির্বাচনকালীন সরকারের প্রধান হয়ে একটি নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সুনিশ্চিত করতে পারতেন।

কিন্তু উল্টো তিনি শেখ হাসিনাকেই নির্বাচনী সরকারের প্রধানের দায়িত্ব পালন করতে বলেছেন, যদিও তিনি ভালোভাবেই জানেন বাংলাদেশের মানুষ তাঁর অধীনে নির্বাচন চায় না। সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনবোধে সংবিধানের ছোটখাটো সংশোধনও আর সম্ভব নয়। আব্দুল হামিদ জেলা পর্যায়ের উকিল ছিলেন। ডেপুটি স্পিকার কিম্বা স্পিকার হিসেবে তিনি দলীয় স্বার্থের ওপরে উঠতে পারেননি। জঙ্গী আওয়ামী লীগ দলীয় বিতর্কিত একজন বিচারপতির কাছে পরাজয় স্বীকার করলেন। রাষ্ট্রপতি হয়েও তিনি জেলা আওয়ামী লীগের কর্মী এবং স্থানীয় উকিলই রয়ে গেলেন। ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের অব্যাহতি দিলেন। সব চেয়ে বড়ো কথা, দেশ যখন কোন দিকে যাচ্ছে কেউ জানে না সেই মহাসংকটেও তিনি সমাধানের উদ্যোগ নিতে এবং জাতিকে আশ্বাস দিতে এগিয়ে এলেন না। ক্ষুদ্র দলীয় আনুগত্যের ওপর উঠতে পারেননি রাষ্ট্রপতি। পরম দুঃখ ও আফসোসের কথা। উচ্চ দায়িত্ব অনেক সময় সাধারণ মানুষকেও মহানুভবতা দেয়। তবে সকল সাধারণ মানুষ তো আর এক নয়!

তবু বিএনপি এবং ১৮ দলের জোট বঙ্গভবনে ব্যর্থ মিশনে গিয়ে অত্যন্ত ভালো কাজ করেছে। শেষ মুহূর্তেও তাঁরা শান্তিতে ও সমঝোতার ভিত্তিতে সংকটের অবসান করতে চেয়েছিলেন। দেশের মানুষ তার অকাট্য প্রমাণ পেলো। এর পর যা ঘটবে সে দায়িত্ব আর খালেদা জিয়া কিম্বা ১৮ দলের নয়। সে দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে শেখ হাসিনা এবং তাঁর ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকদের।

একটা সন্দেহ আমার মনে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। ক্ষমতা কি এখন সত্যি সত্যি শেখ হাসিনার হাতে? হাবে-ভাবে পঙ্কজ শরণকে এখন দিল্লির ভাইসরয় বলেই

মনে হয়। কলকাঠি তিনি নাড়ছেন। হাসিনার পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়কে তিনি বৈঠকে ডাকছেন, বিশ্ব বেহায়া, বিশ্ব বেঈমান এরশাদের সঙ্গে একের পর এক বৈঠক করছে, বৈঠক করছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লু মজীনার সঙ্গেও। এবং হয়তো দিল্লির নির্দেশনামাগুলো পৌঁছে দিচ্ছেন শেখ হাসিনাকে।

তিন বছর আগে সংসদে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাস হবার সময় থেকেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল হাসিনা গদি ছাড়তে রাজি নন, আর তাঁর ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকরাও তাঁকে গদি ছাড়তে দেবেন না। একটা আপাত বিরোধিতা আছে এখানে। ভারতে আমার মিডিয়া বন্ধুদের কেউ কেউ আমাকে বলেছেন শেখ হাসিনাকে দিল্লির নেতারা সবচাইতে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি মনে করেন না। বস্তুত এক-এগারোর পরে আওয়ামী লীগে নেতৃত্ব পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিল ভারত। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী ঢাকায় এসে তোফায়েল আহমেদ, আমীর হোসেন আমু ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের সঙ্গে দীর্ঘ গোপন বৈঠক করেছেন। সে খবর হাসিনাও জানতে পেরেছিলেন। তোফায়েল আর আমু সে জন্যেই ২০০৯ সালের মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়েছিলেন। এখন যে তাঁদের আবার নির্বাচনী মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে তার পেছনেও দিল্লির নির্দেশ আছে বলে সন্দেহ করা হয়। হাসিনার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে দিল্লির চোখে তারা সম্ভাব্য রিজার্ভ টিম হয়ে রইলেন।

বিএনপিকে বাদ দিয়ে নির্বাচন

কোন সন্দেহ আর অবশিষ্ট রইলো না যে হাসিনা বিএনপিকে বাদ দিয়েই নির্বাচন করতে চান। ২৬ অক্টোবরের আগেও চূড়ান্তভাবে সে সিদ্ধান্ত তিনি নেননি। বিএনপি তখন ৭২ ঘণ্টার হরতাল ডাকায় তিনি শঙ্কিতও হয়েছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে তিনি বুঝে গেছেন বিএনপির ৭২ কিম্বা ৮৪ ঘণ্টার মেয়াদী হরতাল তিনি হ্যান্ডেল করতে (সামলাতে) পারবেন। প্রচুর সময়ের নোটিশ দিয়ে এবং ঢাকঢোল পিটিয়ে সীমিত মেয়াদের হরতালকে হাসিনা এখন মান-অভিমানের হরতালের মতোই অর্থহীন বিবেচনা করছেন। বিএনপিকে তোয়াজ ও সাধাসাধি করার প্রয়োজন তিনি আর দেখছেন না। বিএনপি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা হাসিনার আগেও ছিল। বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ জিয়াউর রহমান ও তাঁর পরিবারকে চিরতরে বিদায় করা না গেলে তাঁর বাকশালী মসনদ কখনোই নিরাপদ হবে না। প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রথম মেয়াদে সংসদে তাঁর গরিষ্ঠতা যথেষ্ট ছিল না। দ্বিতীয়ত দিল্লির কাছ থেকেও তখন তিনি ক্লিয়ারেন্স পাননি।

বিএনপি নেতৃত্বের সকলে সার্বিক পরিস্থির মূল্যায়ন বোঝেন কিনা আমার সন্দেহ আছে। ভোট পড়ুক কিম্বা নাই পড়ুক কোন মতে যদি একটা নির্বাচন

হাসিনা করে ফেলতে পারেন ভারত অবিলম্বে সে সরকারকে স্বীকৃতি দেবে। ওয়াশিংটন ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও চীন স্বীকৃতি দিতে গড়িমসি করবে। নিউইয়র্ক টাইমসের সম্পাদকীয় থেকে হতে পারে তেমন অবস্থায় ওয়াশিংটন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে 'স্যাঙ্কশান' (শাস্তিমূলক নিষেধাজ্ঞা, অবরোধ, ইত্যাদি) আরোপ করার কথাও চিন্তা করছে। বিএনপি এতোকাল কূটনীতিকদের ওপর আস্থার ডিমের ঝুড়িটা ছেড়ে দিয়ে মারাত্মক ভুল করেছে। আমেরিকা একটা বিশ্ব শক্তি। কিন্তু তারও হাজার রকমের এবং মাঝে মাঝে পরস্পর বিরোধী স্বার্থ ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর সর্বত্র। সোভিয়েট ইউনিয়নের ঘনিষ্ঠতম মিত্র হিসেবে যে ভারত এককালে ওয়াশিংটনের শত্রু ছিল ওয়াশিংটন এখন তার সঙ্গেই বন্ধুত্ব করেছে, প্রেসিডেন্ট ওবামা মাত্র সম্প্রতি বলেছেন সে বন্ধুত্ব তিনি নষ্ট করতে চান না।

ভারত ছাড়া আর কাউকে চেনেন না হাসিনা

ভারতের খুঁটির ওপর শেখ হাসিনার এমনই ভরসা যে ড. ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যাপারে সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন, বর্তমান প্রেসিডেন্ট ওবামা, তাঁর প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিন্টন, অর্থাৎ কোন মার্কিন নেতার অনুরোধ-উপরোধকে পাত্তা দেননি। হিলারি নিজে এসেছিলেন ঢাকায়। তাতেও কাজ হয়নি। সহকারী মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লেক ঢাকায় এসেছিলেন কিন্তু হাসিনা তাঁকে দর্শন দান করেননি, রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনা চার-পাঁচ মাস ধরে চেষ্টা করে হাসিনার সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। প্রথমে জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব তারাঙ্কোর ঢাকায় এসেছিলেন এবং পরে স্বয়ং মহাসচিব বান কি-মুন টেলিফোনে নির্বাচন সম্বন্ধে সংলাপের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সারা দুনিয়ার কূটনীতিকরা, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট, বৃটিশ ও মার্কিন সংসদ এবং বাংলাদেশের জ্ঞানী-গুণী ও মানী ব্যক্তিদের প্রায় সকলেই সে উপদেশ প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছেন। তিনি শুনেছেন কারো কথা? তাঁর একমাত্র ঈশ্বর দিল্লি। দিল্লি ছাড়া আর কারো উপদেশ শেখ হাসিনা শুনবেন না।

আওয়ামী লীগের প্রতি রাষ্ট্রপতি হামিদের চূড়ান্ত আনুগত্যের পর রাজনীতি কিম্বা সংবিধান সংক্রান্ত সকল বিষয়েরই সমাধান এখন রাজপথেই হতে হবে। সরকার তাদের রাজনৈতিক বিরোধীদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকিয়ে দিয়েছে। এখন তারা শুধু সর্বশক্তি নিয়ে সামনেই এগুতে পারে। বিশ্বের মানুষ আগেই জেনে গেছে। বাংলাদেশে এতোকাল যাঁরা বুঝতে অস্বীকার করে এসেছেন এখন তাঁদেরও বুঝতে এবং বিশ্বাস করতে হবে যে এই মর্মান্তিক অবস্থার জন্যে দায়ী শেখ হাসিনা এবং পেছন থেকে পুতুলের মতো তাঁকে সামনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে ভারত।

ভারত প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলাদেশটাকে 'অ্যানেক্স' (আত্মস্থ করা, গ্রাস করা) করে নিতে চায়। হাসিনার দ্বিতীয় মেয়াদে তারা এশীয় হাইওয়ে, সড়ক রেল ও নদীপথে ট্রানজিট, চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর, সর্বোপরি বাংলাদেশের পানি হাতিয়ে নিয়েছে। এবং সবই বিনামূল্যে। তাদের পরিকল্পনা হচ্ছে হাসিনার তৃতীয় মেয়াদে বাংলাদেশকে তারা পুরোপুরি ভারতের সাথে যুক্ত করে নেবে। সেজন্যেই হাসিনাকে যেকোন ভাবে গদিতে রাখতে দিল্লি মরিয়া হয়ে উঠেছে।

বিএনপির দুর্বোধ্য স্ট্র্যাটেজি

দু'হাজার এগারো সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাস হবার পর থেকে বিএনপির স্ট্র্যাটেজি বোঝার অনেক চেষ্টা করেছি, বুঝে উঠতে পারিনি। স্ট্রাটেজি সম্বন্ধে দলের ভেতরেও বহু মত আছে বলে মনে হয়। তাছাড়া প্রায়ই আমার মনে হয়েছে এ দলের ভেতরে র' ও আওয়ামী লীগের চর আছে, 'যখন যেমন তখন তেমন' সুবিধাবাদীরা আছেন। হয়তো সাবোটিয়ারও (অন্তর্ঘাতী) আছেন কিছু। শত ব্যর্থতা এবং হতাশা সত্ত্বেও তাঁরা বুঝে উঠতে পারেন না যে সুবিধা মতো ধীরে সুস্থে জিরিয়ে জিরিয়ে আন্দোলনে জনমত সৃষ্টি করা যায় কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠিত এবং বিদেশী মদদপুষ্ট সরকারকে উৎখাত করা যায় না। শেখ হাসিনা জনমতকে পাত্তা দিয়েছেন বলে শুনেছেন কেউ? নোয়াখালীর আঞ্চলিক কথায় 'জামাইয়ের জন্যেও পরাণ পোড়ে, মুরগীর জন্যেও পরাণ পোড়ে'। জামাই এসেছে, মুরগি জবাই করে খাওয়াতে হবে, কিন্তু মুরগিটাও যে খুব আদরের! বিএনপির আন্দোলন হচ্ছে সে ভাবে।

অনেকগুলো আন্দোলন করেছে, হরতাল করেছে বিএনপি। জনসাধারণের অসুবিধার কথা ভেবে আবার সে হরতাল তুলে নিয়েছে। মাঝখান থেকে নিজেদের কর্মীরা আওয়ামী লীগের খুনিদের, পুলিশের, র‍্যাবের আর বিজিবির হাতে মার খেয়েছে, প্রাণ দিয়েছে। স্বভাবতঃই সে আন্দোলনে কাজ হয়নি, আবার হরতাল ডাকতে হচ্ছে। বার বার হরতাল করে দেশের মানুষের এবং নিজেদের ভোগান্তি না বাড়িয়ে একবারেই আন্দোলন করে সরকার হঠিয়ে দেওয়া অনেক সহজ হতো। অনেক কম ত্যাগ স্বীকার করতে হতো তাতে। হাসিনা গর্ব করেন বিএনপিকে আন্দোলন তাঁর কাছ থেকে শিখতে হবে।

সেটা অবশ্যই সত্যি কথা। হাসিনা কখনো কিস্তিতে কিস্তিতে, পথের ধারে বসে পান-তামাক খেয়ে আন্দোলন করেছেন? একটানা হরতাল, পরিবহন অবরোধ আর মানুষ হত্যা করে তিনি কি তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি আদায় করে নেননি? তাঁর লগি-লাঠি-বৈঠার আন্দোলন ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর শুরু হয়ে এক-এগারো (২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি) পর্যন্ত চলেনি? খালেদা জিয়া একথা বুঝতে পারেন না যে গণআন্দোলন সংগঠিত হলেই অবিলম্বে শেষ আঘাত হানতে হয়। নইলে আন্দোলন জুড়িয়ে যায়, নতুন করে চাপিয়ে তুলতে অনেক বেশি সময় লাগে।

আবারো সেই পুরাতন খেলা

বঙ্গভবনের অপমানকর অভিজ্ঞতার পর আবারো বিএনপি এবং ১৮ দলের জোট সেই পুরাতন খেলা খেলছে বলে মনে হয়। সরকার ও আওয়ামী লীগকে প্রস্তুতির জন্যে পাঁচদিন সময় দিয়ে বিএনপি চারদিনের হরতাল দেবে বলে শোনা যাচ্ছে। সংসদ ভেঙে দেবার মুহূর্ত থেকে তাদের উচিৎ ছিল অবিরাম হরতাল আর সড়ক রেল ও নদীপথ অবরোধ করে দেশ অচল করে দেওয়া। এই ঘোষণা দিয়ে দেওয়া যে শেখ হাসিনার পদত্যাগ এবং নির্দলীয় সরকার গঠন পর্যন্ত এই হরতাল, এই অবরোধ চলতেই থাকবে। ভালো-মানুষী আন্দোলন অনেক দেখেছে দেশের মানুষ তাঁদের কাছ থেকে। তেমন আন্দোলনে তারা আর আগ্রহী নয়।

বিএনপিতে কেউ কেউ হয়তো ভয় করছেন যে পথের আন্দোলনে হাসিনাকে হঠানোর চেষ্টা দুর্বল হয়ে উঠলে ভারত হয়তো বাংলাদেশে সৈন্য পাঠাতে পারে। সে আশঙ্কা কিছুকাল আগে পর্যন্ত হয়তো বাস্তব ছিল। কিন্তু পরিস্থিতির এখন গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। সাম্প্রতিকালে বিশ্ব জনমত এবং কূটনৈতিক বিশ্বের সমর্থন ঘুরে গেছে বিএনপির দিকে। এ অবস্থায় বাংলাদেশে সৈন্য পাঠানো ভারতের বন্ধু ওয়াশিংটনও সমর্থন করবে না। সে অবস্থায় বাংলাদেশকে সমর্থন দিতে গণচীনও এগিয়ে আসবে। বিশেষ করে এ কারণে যে হিমালয়ের গায়ে অরুণাচলে বিস্তীর্ণ বিবদমান এলাকা নিয়ে ভারত-চীন উত্তেজনা বেড়ে গেছে। যে কোন সময় সেখানে ১৯৬২ সালের মতো প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে। ভারতও সেটাই মনে করে। মাত্র দুদিন আগে খবর বেরিয়েছে যে ভারত জরুরিভাবে সে অঞ্চলে আরো ৮০ হাজার সৈন্য পাঠাচ্ছে।

আওয়ামী লীগ যদি ভোটার-বিহীন হলেও কোন নির্বাচনে জয়ী হতে পারে, শেখ হাসিনা যদি আবার প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসতে পারেন তাহলে কী হতে পারে বাংলাদেশে? বেগম খালেদা জিয়ার সন্তানেরা বাংলাদেশে ফিরতে পারবেন না। খালেদাকে নির্বাসনে যেতে হবে, নয়তো খুন করা হবে। বিএনপির বহু নেতা-কর্মী হালুয়া-রুটির লোভে চুপিসারে গিয়ে আওয়ামী লীগে কিম্বা অন্য কোন দলে যোগ দেবে। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বিএনপি দলটি অবলুপ্ত হবে। সবচাইতে বড়ো লোকসান, স্বাধীন বাংলাদেশ বলে কিছু অবশিষ্ট থাকবে না, তিন লাখ মুক্তিযোদ্ধার আত্মদান বিফলে যাবে। তার আগে বাংলাদেশের যা কিছু সম্পদ অবশিষ্ট আছে হাসিনার তাঁবেদাররা লুটেপুটে নিয়ে যাবে।

(লন্ডন, ২২.১১.১৩)

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য বুঝতে হবে উল্টো করে

খবর। আতঙ্কে পুলিশ। অতি-উৎসাহী পুলিশ সদস্যারাও এখন চরম আতঙ্কের মধ্যে আছেন। জেলার পুলিশ সদস্যদেরও মানোবল আগের মতো চাঙ্গা নেই। খবর। ত্রিশজন জেলা প্রশাসক (ডিসি) বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা চেয়ে ক্যাবিনেট সেক্রেটারীকে চিঠি লিখেছেন। কিছুদিন আগের খবর। বড়ো আকারের দলেবলে ছাড়া পুলিশ মফস্বলে যেতে সাহস পায় না।

খবরগুলো মঙ্গল কিম্বা অন্য কোন গ্রহের নয়। আজকের বাংলাদেশের। নাগরিকদের জান-মালের নিরাপত্তার দায়িত্ব যাঁদের ওপর তাঁরা কেমন অসহায় বোধ করছেন ওপরের খবর তিনটি থেকে তার সম্যক চিত্র পাওয়া গেলো। কেন এমন হলো? সরকার তো নিজেদের ভোট ব্যাংকের সদস্যদের দিয়ে প্রশাসন দলীয়ভাবে ঢেলে সাজিয়েছিল, বেছে বেছে দলীয় সমর্থকদের দিয়ে পুলিশ বাহিনীর কলেবর কয়েকগুণ বৃদ্ধি করেছিল। তা সত্ত্বেও এমন অবস্থা কেন হলো? কারণটা প্রশ্নের মধ্যেই পাওয়া যাবে। একটু খতিয়ে দেখলেই দেখা যাবে ভূতগুলো সরষের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল।

সরকার সম্পূর্ণ দলীয়কৃত প্রশাসন ও পুলিশ বহিনী গড়ে তুলেছিল এ আশায় যে যখন তাদের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে এই প্রশাসন আর এই পুলিশরাই অবৈধ উপায়ে হলেও গদি আঁকড়ে থাকতে সরকারকে সাহায্য করবে। সেটা তারা করে আসছে এবং অতি-উৎসাহী ভাবেই করে এসেছে। এতো উৎসাহের সঙ্গে করেছে যে দেশের মানুষের সেটা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে অনেক দিন আগে থাকতেই। প্রশাসন, পুলিশ আর দলীয়কৃত র‍্যাবকে বাংলাদেশের মানুষ এখন শত্রুপক্ষ মনে করে। অনেক গুলি আর মার খেয়ে তারা এখন রুখে দাঁড়িয়েছে, প্রতিরোধ করছে। এই সরকার মানুষের সমর্থনে আর দেশবাসীর ভোটের জোরে নয়, র‍্যাব-পুলিশ আর নিজেদের সশস্ত্র ক্যাডারের জোরে গদি দখল করে থাকতে পারবে ভেবেছিল। হাতিয়ারগুলোই এখন ভয়ে মুখ লুকোচ্ছে। সরকার এখন কি করবে?

এখন প্রায়ই বিজিবিকে (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) তলব করছে সরকার। আপনাদের মনে থাকার কথা প্রায় পাঁচ বছর আগে এখনো রহস্যে ঘেরা বিডিআর বিদ্রোহের পরে সে বাহিনীকে ভেঙ্গে দিয়ে সরকার ১৯৭১ সালে

তাজউদ্দিন আহমদের সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের সাত দফা চুক্তির একটা দফা পালন করেছে। সে দফা এই ছিল যে স্বাধীন হলে বাংলাদেশ বিডিআর বাহিনীকে ভেঙ্গে দিয়ে ভারতের 'বিএসএফের (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স)' তত্ত্বাবধানে একটা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বাহিনী গঠন করবে। কারণগুলোও আপনাদের জানা থাকার কথা। বিডিআর আমাদের সীমান্তে বিএসএফ কিম্বা ভারতীয় নাগরিকদের অনুপ্রবেশ বরদাশত করেনি, সীমান্তে বাংলাদেশীদের ওপর জুলুম-অত্যাচারও সহ্য করেনি। তারা সর্বশক্তি দিয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ ছিল। দিল্লির সরকার কখনই বিডিআরের ওপর প্রসন্ন ছিলনা। এখন দিল্লির হুকুমে হাসিনার সরকার ৪২ বছর আগের সাত দফা চুক্তিটি পালন করছে, যদিও প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে চুক্তিটি প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের সেনাবাহিনীকে সরিয়ে নিতে ভারতকে বাধ্য করেছিল।

বর্তমান সরকার তাদের প্রশাসন পুলিশ আর র‍্যাব বাহিনীর মতো বিজিবি বাহিনীতেও বেছে বেছে আওয়ামী পন্থীদেরই নিয়োগ করেছিল। সরকার পুরাকাহিনীর সাদ্দাদের মতো আশা করেছিল মন-মতো লোকদের দিয়ে নিরাপত্তা বাহিনীগুলো গঠন করা হলে তাদের গদি নিরাপদ হবে। একটা কথা তারা ভুলে গিয়েছিল। এই লোকগুলো আওয়ামী লীগপন্থী হলেও তারা বাংলাদেশেরই লোক এবং তাদের মা-বাবা আত্মীয়-স্বজন বাংলাদেশের গ্রামে-গ্রাঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। দেশের মানুষ তাদের পরিচয় জানে এবং দেশের মানুষ এখন অত্যাচারী পুলিশ র‍্যাব এবং বিজিবির ওপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ। নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর সদস্যদের ক্রমবর্ধমান শঙ্কার এটাও একটা কারণ।

সেনারা নানা কারণে হুঁশিয়ার হচ্ছে ঃ

সরকার এখন সেনাবাহিনীকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার (অর্থাৎ তাদের গদি বাঁচানোর) কাজে নামানোর চেষ্টা করছে। নিদেন তারা সেনাবাহিনীর পাহারায় ভোটার-বিহীন নির্বাচন করে বাকশালী স্বৈরতন্ত্র কায়েম করার আশায় আছে। জেনারেলদের মতিগতির কথা বলতে পারবো না, কিন্তু এ বাহিনীর জওয়ানরাও র‍্যাব-পুলিশ আর বিজিবির সদস্যদের মতোই গ্রাম-গঞ্জের সাধারণ মানুষের সন্তান। উপরোক্ত তিনটি বাহিনীর সদস্যদের মতো তারাও মফঃস্বলের পরিবার-পরিজনদের নিরাপত্তার কথা ভেবে শঙ্কিত। আরো একটা ভয়ের কারণ আছে তাদের। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় সেনাবাহিনীতে লোকে যোগ দিয়েছে বিশেষ করে এ আশায় যে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্য হিসেবে তারা বিদেশে যাবে, ইউএস-ডলার রোজগার করবে এবং নিজেদের ভাগ্য ফেরাবে। জাতিসংঘের দিক থেকে এখন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে বর্তমান সরকার যদি

একগুঁয়েমীর বাড়াবাড়ি করে তাহলে বিদেশে শান্তি মিশনগুলোতে নিয়োগ থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বাদ পড়তে পারে।

এদিকে বাংলাদেশের মানুষ মারা যাচ্ছে, ঘরবাড়ি যানবাহন পুড়ছে, অর্থনীতির বারোটা বেজে গেছে, সতেরোটা বাজি-বাজি করছে। সরকারের হাতে রাষ্ট্রীয় প্রচারযন্ত্র এবং দলের অনুগত মিডিয়া আছে, আছেন গলাবাজ প্রধানমন্ত্রী ও অন্য নেতারা। তাঁরা বোকা মনে করে সমর্থক ও বিদেশীদের চোখে ধূলো দেবার চেষ্টা করছেন, এই বলে যে বিএনপি এবং ১৮ দলের জোট গণতন্ত্রের নামে হত্যাতন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে।

আপনারাও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, এ সরকার, বিশেষ করে এই প্রধানমন্ত্রী যেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেন। অর্থাৎ তাঁরা যা বলেন তার বিপরীতটাই সত্যি বলে ধরে নিতে হবে। যেমন, তাঁরা যখন বিএনপির দুর্নীতির জিগির তোলেন তখন বুঝতে হবে যে তাঁরা পদ্মা সেতু দুর্নীতি, হলমার্ক দুর্নীতি, কুইক রেন্টাল দুর্নীতি, শেয়ার বাজার লুণ্ঠন কিম্বা সরকারের শীর্ষ ব্যক্তিদের আত্মীয়দের বিরুদ্ধে আমেরিকায় ৮৬২ মিলিয়ন ডলার মানি লন্ডারিংয়ের তদন্ত ইত্যাদি দুঃসংবাদ ধামা চাপা দেবার চেষ্টা করছেন। বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম ও খুন, ক্যাডারদের হত্যালীলা ইত্যাদির প্রসঙ্গ মিডিয়ায় জোরালো হয়ে উঠলে প্রধানমন্ত্রী ও সরকার জিয়া পরিবারকে খুনি বলে গলাগাল শুরু করে দেন।

শেখ হাসিনা জিগির ধরেছেন বিএনপি ক্ষমতার জন্যে উন্মাদ হয়ে গেছে। প্রকৃত পরিস্থিতি হচ্ছে গদি আঁকড়ে থাকার জন্যে এই সরকারের উন্মাদ চেষ্টার নিন্দা এখন দেশে তো বটেই সারা বিশ্বেই ধ্বনিত হচ্ছে। তাদের এই গদি-লিপ্সা এ যাবৎ কয়েকশো মানুষের মৃত্যুর কারণ ঘটিয়েছে। একটি মানুষের অপমৃত্যুও গোটা মানব সমাজের অপমৃত্যুর মতোই নিন্দনীয়। একাত্তরে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছেন 'একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি' গান করে। দেশের মানুষ এখন যুদ্ধ করছে গণতন্ত্রকে বাঁচাবে বলে। বর্তমান অশুভ চক্র ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রের হত্যা শুরু হয়েছে। তারা জানে তাদের ভোটব্যাংক ছাড়া আর কেউ তাদের ভোট দেবে না।

ভোট ব্যাংকেও এখন অবক্ষয় শুরু হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে শোনা যাচ্ছে ছাত্র লীগ ও যুব লীগের মাস্তানরা হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করে নিচ্ছে, হিন্দু নারী ধর্ষণ করছে। এ খবর আমি ২০০৯ সালেই শুনেছি সরকারের একজন সংখ্যালঘু মন্ত্রী শত শত একর অর্পিত হিন্দু সম্পত্তি দখল করে নিয়েছেন। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে চট্টগ্রামের রামুসহ বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে ছাত্র লীগ ও যুব লীগ চাঁদাবাজি করছে। চাঁদা না পেলে তাদের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে ও পুড়িয়ে ফেলছে, হিন্দু মন্দিরের দেবমূর্তি ভাঙচুর করছে। রামুসহ কোন কোন স্থানে

সরকার গোড়ায় বিএনপি ও জামায়াতের ওপর দোষারোপ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রমাণ পাওয়া গেছে শাসক দলের লেজুড়দের বিরুদ্ধে। কথায় বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

সহিংসতা ঘটাচ্ছে সরকার, তারাই মানুষ মারছে

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে বিএনপির নেতৃত্বে ১৮ দলের জোট আন্দোলন শুরু করেছে। এখন দেখা যাচ্ছে সে আন্দোলন একটা গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। সরকার ঢাক পেটাচ্ছে এই বলে যে আন্দোলনে মানুষ মারা যাচ্ছে, যানবাহন ভাঙচুর হচ্ছে। একটু খতিয়ে দেখলেই আসল সত্যটা বেরিয়ে আসবে। গত শনিবার বিএনপিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশ করতে দেয়নি সরকার। কিন্তু তার আগে যে সমাবেশ করেছে বিএনপি তাতে কোন বিশৃঙ্খলা কিম্বা সহিংসতা ঘটেনি। বিরোধী পক্ষ কোন কর্মসূচি দিলেই সরকার পুলিশ ও র‍্যাবের সংরক্ষণে আওয়ামী ক্যাডারদের পাঠাচ্ছে বিরোধীদের প্রতিবাদ ভণ্ডুল করার ব্যর্থ আশায়।

আগ্নেয়াস্ত্রসহ নানা রকম অস্ত্র হাতে আওয়ামী লীগের ক্যাডারদের ছবি সরকারের সমর্থক মিডিয়াতেও প্রকাশিত হচ্ছে। মিডিয়ায় প্রায়ই দেখা যাচ্ছে বিরোধী দলের কর্মসূচিতে বিরোধী দলীয় কর্মীদের মতো আওয়ামী লীগের কর্মীরাও মারা যাচ্ছে। তারা যে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বাধা দিতে গিয়েছিল এসব হচ্ছে তার প্রমাণ। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করা নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার। সরকার সে অধিকার অস্ত্রবলে দলন করছে। অর্থাৎ সহিংসতার উস্কানি দিয়ে সেসব কর্মসূচিতে নৈরাজ্যের সৃষ্টি করাচ্ছে সরকার। জনতার প্রতিবাদ এখন খরস্রোতা নদীর মতো। সে স্রোতকে বাধা দিতে গেলে বিপর্যয় ঘটবেই।

গত ২৫ নবেম্বর দেশের ৯০ শতাংশ মানুষকে বাদ দিয়েই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। সেটা যে গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বালানোর নামান্তর ছিল তাতে কারো কোন সন্দেহ ছিলনা। প্রতিবাদে বিএনপি ও ১৮ দলের জোট দেশজোড়া অবরোধ কর্মসূচি দিয়েছেন এবং দিচ্ছে। এক ডজনেরও বেশি মানুষ তাতে মারা গেছে। তাতে আমরা শোকাহত, মর্মাহত। শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকার তার স্বরে নিন্দা করছে। হয় প্রধানমন্ত্রীর স্মৃতি শক্তি লোপ পেয়েছে, নয়তো তিনি সত্য-বিরোধী কথাবার্তা বলেন।

১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে আওয়ামী লীগ-জামায়াতের লাগাতার হরতালেও মোটমুটি এ রকম সংখ্যার মানুষ খুন হয়েছে। সড়ক সেতু রেল ও নৌযান চলাচল তখনো এবং ২০০৬ সালে হাসিনার লগি-লাঠি-বৈঠার লাগাতার হরতালেও বন্ধ করা হয়েছিল। সে দুই আন্দোলনেও বহু

স্থানে রেল লাইন উপড়ানো এবং ফিশপ্লেটে আগুন লাগানো হয়েছিল। শেখ হাসিনা কি তখন সেসবের প্রতিবাদ করেছিলেন? সেসব কথা কি তাঁর মনে আছে? বিএনপির বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর গালাগাল সাধারণ মানুষের চোখে সরকারের নিজের গালেই থু থু ফেলার মতো মনে হয়।

শাহবাগে বাসে কে আগুন লাগিয়েছিল ?

শাহবাগে একটি বাসে আগুন লাগানোর দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। শুনেছি চারজন মানুষ মারা গেছে তাতে এবং আরো ১৩-১৪ জন হাসপাতালে আছে। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী হাসপাতালের বার্ণ ইউনিটে প্রধানমন্ত্রী অন্য মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ ভিআইপিদের ভিড়ে আহতদের চিকিৎসায় রীতিমতো বিঘ্ন ঘটছে। ভিআইপিদের এসব হাসপাতাল 'ভিজিট' যে লোক দেখানো এবং প্রচারণার কৌশল তাতে কোন সন্দেহ নেই। গোড়া থেকেই এ সরকার গোয়েবলসীয় প্রচার কৌশলের জোরে গদিতে টিকে থাকার চেষ্টা করে আসছে। বিএনপি এবং জামায়াতের নেতারা বারবার এবং জোর গলায় এ ঘটনার দায়িত্ব অস্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে সরকারের এজেন্টরাই বাসটিতে আগুন লাগিয়েছিল।

সে কথা বিশ্বাস করার প্রাসঙ্গিক কারণ আছে। বাসে আগুন লাগিয়ে যাত্রীদের পুড়িয়ে মারার নজীর আওয়ামী লীগ আগে থেকেই সৃষ্টি করে রেখেছে। ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতির দাবিতে আন্দোলনের সময় এই শাহবাগেই আওয়ামী লীগের কর্মীরা একটি বাসে আগুন লাগিয়ে নয়জন যাত্রীকে পুড়িয়ে মেরেছিল। শাহবাগ আওয়ামী লীগের পেশী শক্তির আধিপত্যের জন্যে কুখ্যাত। কয়েকশো আওয়ামী পন্থী দুর্বৃত্ত ও ইসলাম বিরোধী দুই মাস ধরে এই শাহবাগে হেন মঞ্চ তেন মঞ্চ নামে গেড়ে থেকেছিল। আলোচ্য বাসের ব্যাপারেও আওয়ামী লীগের লোকেদের কথা প্রথমেই মনে আসে। তাছাড়া মাত্র কয়েকদিন আগে দৈনিক নিউ এজ পত্রিকার সম্মানিত সম্পাদক নূরুল কবীর দাবি করেছেন, সরকারের লোকেরাই বিআরটিসি বাসে আগুন লাগাচ্ছে বলে তাঁর কাছে প্রমাণ আছে।

তা সত্ত্বেও শেখ হাসিনা প্রচার চালাচ্ছেন এই বলে যে খালেদা জিয়া গণহত্যা শুরু করেছেন। শেখ হাসিনার স্মৃতি লোপ পেয়ে থাকলে তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে আড়াইশো বিচার-বহির্ভূত হত্যা, দুশো গুম-খুন, ইলিয়াস আলীকে ছিনতাই এবং ২৬ মে অতি ভোরে শাপলা চত্বরে লাখ লাখ ঘুমন্ত মানুষের ওপর পাইকারী গুলিবর্ষণের হুকুম খালেদা জিয়া দেননি, দিয়েছিলেন শেখ হাসিনা। এসব ক্ষেত্রে হুকুমের আসামী কে বাংলাদেশের মানুষকে বলে দিতে হবে না। সত্যি কথা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী হজম করতে পারেন না। শাপলা চত্বরের গণহত্যায় নিহত ৬১ জনের নাম-পরিচয় প্রকাশ করেছিল

মানবাধিকার সংস্থা অধিকার। বিশ্বজোড়ো সম্মানিত অধিকার সংস্থার দুজন প্রধান কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করে প্রধানমন্ত্রী গায়ের ঝাল মিটিয়েছেন।

বৃহত্তর বিপদ সৃষ্টি করছে সরকারই

বিরোধী দলের গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকার লংঘন করে শেখ হাসিনা তাদের সভা-সমাবেশ-মিছিল করার অধিকার অপহরণ করেছেন। সারা দেশের মানুষের দাবি অগ্রাহ্য করে তিনি তাঁর পুরাতন মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী একদলীয় নির্বাচন করতে উদ্যত হয়েছেন। বিরোধী দল ও জোটের প্রতিবাদ নিস্তব্ধ করার আশায় তিনি পাইকারীভাবে বিএনপির নেতাদের গ্রেফতার করেছেন এবং করছেন। পাইকারীভাবেই তাঁদের সকলের বিরুদ্ধে 'গাড়ি ভাঙচুর করার এবং ককটেল বোমা নিক্ষেপের' অভিযোগ আনা হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং পাগল ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস করবে না যে এসব সম্মানিত এবং দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নেতারা এসব দুষ্কর্ম করতে পারে। কোন কোন আওয়ামী লীগ নেতার, বিশেষ করে যোগাযোগমন্ত্রী ওবায়েদুল কাদেরের উক্তি থেকেও প্রমাণ হয় যে সরকারের অভিযোগগুলো পুরোপুরি মিথ্যা এবং রাজনৈতিক মতলবে আবিষ্কার করা হয়েছে। ওবায়েদুল কাদের বলেছেন বিএনপি নির্বাচনে রাজি হলে বন্দী নেতাদের সকলকে মুক্তি দেওয়া হবে।

সরকারের এই অপকর্মের দূরমেয়াদী কুফল উপলব্ধি করার মতো দূরদৃষ্টি বোধ হয় বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নেই। সারা দেশের মানুষ এখন সরকারের অন্যায়-অবিচার-দুর্নীতি এবং বাকশালী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছে। নেতাদের গ্রেফতার কি তাদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে এতটুকু তারতম্য ঘটিয়েছে? ২৫ নবেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিব উদ্দিন আহমেদের বেতার ভাষণের প্রতিক্রিয়ায় অবরোধ কর্মসূচির ঘোষণা বিএনপির নেতারা দিয়েছিলেন রাত নয়টার দিকে। কিন্তু দেশের সকল অঞ্চলের সাধারণ মানুষ তার এক ঘণ্টা আগেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অবরোধ কর্মসূচি শুরু করে। অর্থাৎ আন্দোলন, কর্মসূচি ও অবরোধ এখন তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের হাতে চলে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতাদের জেলে পুরে রেখে সরকারের কোন লাভের আশা নেই। কিন্তু যদি পরিস্থিতি অনুকূল হয়, হরতাল অবরোধ ও কর্মসূচি গুটিয়ে আনার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে সে আহ্বান দেবে কে? সরকারের নির্দেশে তারা থেমে যাবে না। বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে তারা।

শেখ হাসিনার অবাস্তব ও অন্যায় উচ্চাভিলাষের কারণে বাংলাদেশ কোথায় নেমে এসেছে সকলেই জানে। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর দুর্দম একগুঁয়েমীতে ইন্ধন যোগাচ্ছে প্রতিবেশী দেশ ভারত। তারা মুখে বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা বলে। কাজে কিন্তু তারা একজন স্বৈরতন্ত্রী ও গণবিদ্বেষী ব্যক্তিকে

এ দেশের মানুষের ঘাড়ের ওপর স্থায়ীভাবে বসিয়ে রাখতে চায়? কেন? কারণটা কারোই অজানা নয়। হাসিনার সঙ্গে গোপন চুক্তি করে ভারত বাংলাদেশের রেল, সড়ক, নদীপথ ও সমুদ্র বন্দরগুলো অবাধ ব্যবহারের অনুমতি আদায় করে নিয়েছে, যদিও ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত সীমান্ত সহজীকরণ চুক্তি তারা অনুমোদন করেনি, আজো তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তিতে সই করেনি। কিন্তু ভারতের চূড়ান্ত লক্ষ্য বাংলাদেশকে পুরোপুরি ভারতের অঙ্গীভূত করে নেওয়া। অভিন্ন মুদ্রার প্রস্তাব দিয়ে বর্তমান সরকার ভারতকে ইঙ্গিত দিচ্ছে যে তারা দিল্লির হুকুম তামিল করতে সদা-প্রস্তুত। দ্বিতীয় মেয়াদে শেখ হাসিনাকে গদিতে বসিয়ে বাংলাদেশকে গ্রাস করে নেবার কাজটাও ভারত সেরে নিতে চায়, কেননা হাসিনা ছাড়া আর কোন বাংলাদেশী এদেশটাকে ও দেশের হাতে তুলে দিতে রাজি হবেন না।

পঙ্কজ শরণের ভূমিকা এবং সুজাতার সফর

ভারতের হাইকমিশনার পঙ্কজ শরণের ভূমিকা নিয়ে বাংলাদেশে ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাঁর হস্তক্ষেপ অনেকেই আপত্তিকর মনে করছেন। কেউ কেউ তাঁকে বৃটিশ আমলের ভাইসরয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। গোপনে হাসিনা-পুত্র জয়, হাসিনা-ভগ্নি রেহানা, হাসিনার ভারতীয় উপদেষ্টা গওহর রিজভী প্রমুখের সঙ্গে তাঁর বৈঠককে অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখছেন। মনে হচ্ছে এখন "একা রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর" অবস্থা হচ্ছে। পঙ্কজ শরণের 'বস' পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিংয়ের ঢাকা আসার কথা আগামীকাল বুধবার। তাঁর সফরের উদ্দেশ্য আমাদের জানার কথা নয়, কিন্তু তাঁর এবং তাঁর পিতার অতীত কীর্তি-কলাপ কিছুটা শঙ্কার কারণ ঘটায় বৈকি! তাঁর পিতা টি.ভি. রাজেশ্বর ভারতের অভ্যন্তরীণ ইন্টেলিজেন্স বিভাগের প্রধান ছিলেন। সিকিমকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার ষড়যন্ত্রে তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। মি. রাজেশ্বরের কন্যা সুজাতা সিং র'য়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে জানা আছে। ভারত যখন পারমাণবিক বোমা তৈরির জন্য ইউরেনিয়াম সংগ্রহের জন্যে অনিচ্ছুক অস্ট্রেলিয়াকে সাধ্য-সাধনা করছিল তখন সুজাতাকে হাইকমিশনার করে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো হয়। বলা হয় যে সেদেশে প্রবাসী ভারতীয়দের উস্কানি দিয়ে তিনি একটা দাঙ্গা বাধান এবং সেদেশের সরকারকে বর্ণবাদের দায়ে অভিযুক্ত করেন। এভাবে চাপ সৃষ্টি করে তিনি ভারতকে ইউরেনিয়াম বিক্রির চুক্তি করতে সে দেশের লেবার দলীয় সরকারকে বাধ্য করেন।

(লন্ডন, ০৩.১২.১৩)

পঙ্কজ-সুজাতা বাংলাদেশীদের মুখ বিস্বাদ করে দিয়েছেন

একজন মানুষের মৃত্যুতে বিশ্বব্যাপী শোকের এমন বহিঃপ্রকাশ আগে মাত্র একবারই দেখেছিলাম– ১৬ বছর আগে প্রিন্সেস ডায়নার মৃত্যুতে। সকল জনমত অনুযায়ী সবচাইতে জনপ্রিয় বৃটিশ রাজনীতিক ছিলেন স্যার উইনস্টন চার্চিল। ১৯৬৫ সালে তার শবযাত্রার ধারা বিবরণী প্রচারের সুযোগ আমার হয়েছিল। কিন্তু তখনো সাধারণ মানুষ কিম্বা মিডিয়ার মধ্যে এমন ব্যাপক শোক, এমন আবেগ আর এমন উচ্ছ্বাস দেখিনি, যেমন দেখেছি নেলসন ম্যান্ডেলার মহাপ্রয়াণে।

দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকান (ওলন্দাজ বংশোদ্ভূত) শাসকরা সংখ্যাগুরু কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর শাসন ও শোষণ চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে অ্যাপার্থাইড (বর্ণভেদে) পদ্ধতি চালু করেছিল। তারা 'পাস ল' জারি করে পাসবুক ছাড়া কৃষ্ণাঙ্গদের শ্বেতাঙ্গ বসতি এলাকায় যাওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। তরুণ আইনজীবী নেলসন ম্যান্ডেলা এবং আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (এএনসি) দল প্রথমে আইনের সাহায্যে এবং পরে গান্ধীর মতো শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে সংখ্যাগুরুর অধিকার আদায় করে নেওয়ার চেষ্টা করেন। ব্যর্থ হয়ে তাদের সহিংস গেরিলা যুদ্ধ শুরু করতে হয়। ম্যান্ডেলা ও তার সহকর্মীরা গ্রেফতার হন। দীর্ঘ ২৭ বছরের কারাবাসের বিপুল গরিষ্ঠ অংশ ম্যান্ডেলা রোবেন দ্বীপে বন্দী ছিলেন। দিনের অধিকাংশ সময় তাকে পাথর ভেঙ্গে কুচি তৈরি করতে হয়েছে।

ম্যান্ডেলার অসহনীয় নির্যাতন ভোগ এবং আফ্রিকানদের অমানুষিক অবিচার বিশ্ব মানবতার অন্তর স্পর্শ করেছিল। ম্যান্ডেলার মুক্তির এবং অ্যাপার্থাইড পদ্ধতির অবসানের দাবিতে বহু দেশে আন্দোলন শুরু হয়। এসব দাবির সপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক অবরোধ আরোপের দাবি ওঠে সর্বত্র। কিন্তু সাবেক সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার এবং প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে দাবি মেনে নেয়নি। তারা অ্যাপার্থাইড সরকারকে সমরাস্ত্রসহ যাবতীয় উপকরণ সরবরাহ করে যায়। সেসব অস্ত্র দিয়ে নির্বিচারে কৃষ্ণাঙ্গদের হত্যা করে চলে শ্বেতাঙ্গ পুলিশ। লন্ডনে-নিউইয়র্কে ছাত্র-জনতা দিনের পর দিন অবরোধের দাবিতে প্রায়ই সহিংস আন্দোলন করে। একাধিক বৃটিশ লেবার দলীয় সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী পিটার হেইন এবং পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত বিপ্লবী লেখক তারিক আলী সে আন্দোলনেই খ্যাতি লাভ করেছিলেন। টোরি দলীয়

প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার ঘৃণাভরে তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় এএনসিকে সন্ত্রাসী দল বলে ঘোষণা করেন। বর্তমান টোরি প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন সে সময় একটি বৃটিশ কম্পানির হয়ে বাণিজ্যিক অর্ডারের তদবির করতে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার পরবর্তীতে তাঁর সরকারি বাসভবন ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে ম্যান্ডেলাকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। ম্যান্ডেলার প্রয়ানে ডেভিড ক্যামেরন তাঁকে সর্বোজ্জ্বল একটি আলোকবর্তিকা নিভে যাবার সঙ্গে তুলনা করেছেন। বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ম্যান্ডেলাকে তার অনুপ্রেরণার উৎস বলে বর্ণনা করেছেন। ওবামা বলেছেন, ম্যান্ডেলার কথা মনে হলেই ব্যক্তি হিসেবে তাঁর আরো ভালো হতে ইচ্ছে করে। ১০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার জোহানেসবার্গের বিশ্বকাপ ফুটবল স্টেডিয়ামে ম্যান্ডেলার স্মৃতি অনুষ্ঠানে ৯০ হাজারেরও বেশি লোক যোগ দেবে বলে আশা করা গিয়েছিল। মুষল বৃষ্টি সত্ত্বেও ৫০ হাজারের বেশি লোক এসেছিল। সেখানে বাঘে-ছাগলে যেন এক ঘাটে পানি খেয়েছে। প্রেসিডেন্ট ওবামা আর আমেরিকার চির শত্রু কিউবার প্রেসিডেন্ট রাউল ক্যাস্ট্রো মুখোমুখি হয়েছেন, কথা বলেছেন এবং একই মঞ্চ থেকে ম্যান্ডেলার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তিনজন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন, জর্জ ডব্লু বুশ আর জিমি কার্টার যোগ দিয়েছিলেন অনুষ্ঠানে, যেমন যোগ দিয়েছেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন এবং তিনজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন, টোনি ব্লেয়ার এবং জন মেজর।

ম্যান্ডেলার প্রতি বিশ্ব মানবের শ্রদ্ধার্ঘ্য

প্রায় একশত দেশের রাষ্ট্রপতি কিম্বা সরকারপ্রধান উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে। প্রেসিডেন্ট ওবামা এবং প্রেসিডেন্ট ক্যাস্ট্রো ছাড়াও চীনের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ব্রাজিল ও ভারতের রাষ্ট্রপতিরা ভাষণ দিয়েছেন সে অনুষ্ঠানে। রোববার ১৫ ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব ট্র্যানস্কি প্রদেশে ম্যান্ডেলার পিতৃ গ্রামে ম্যান্ডেলাকে সমাহিত করা হবে। ম্যান্ডেলার কারা জীবনের প্রায় ২০ বছর তাকে পাহারা দিয়েছেন উগ্র অ্যাপার্থাইড পন্থী শ্বেতাঙ্গ পুলিশ অফিসার গ্রেগরি। তিনি তার বইতে লিখেছেন, কারামুক্তি মুহূর্তে ম্যান্ডেলা করমর্দনের জন্যে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন 'তোমাকে আমি ভুলবো না'। গ্রেগরি লিখেছেন তিনি কান্না চেপে রাখতে পারেননি। রাষ্ট্রপতি হিসেবে ম্যান্ডেলার অভিষেকে গ্রেগরি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

কারাভোগের শেষের বছরগুলোতে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ প্রেসিডেন্ট ছিলেন এফ ডব্লু ডি ক্লের্ক। শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে গিয়ে ডি ক্লের্ক বলেছেন, কারামুক্ত হয়ে ম্যান্ডেলা তার অফিসে এলেন। তাকে দেখেই ডি ক্লের্কের মনে হয়েছিল যে লোকটিকে তাঁর ভালো লাগবে। ম্যান্ডেলা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, আমরা

এক দেশে আছি, আমাদের এক সঙ্গে (মিলেমিশে) কাজ করতে হবে। ডি ক্লের্ক নাকি তখনই ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন। কিন্তু ম্যান্ডেলার চার বছর পরের নির্বাচন পর্যন্ত তাকে স্বপদে বহাল থাকতে অনুরোধ করেন। ১৯৯৪ সালের নির্বাচনে ম্যান্ডেলা প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হতে চাননি। দলের ও দেশের পীড়াপীড়িতে এক মেয়াদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করলেও দ্বিতীয় মেয়াদে তিনি কিছুতেই প্রেসিডেন্ট হতে রাজি হননি। মঙ্গলবারের স্মৃতি অনুষ্ঠানে ডি ক্লের্কও উপস্থিত ছিলেন। এই হচ্ছে একটা মানুষের একটা পরিমাপ। তাকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত (এফ ডব্লু ডি ক্লের্কের সঙ্গে যৌথভাবে) করে নোবেল কমিটি অবশ্যই নিজেদের ধন্য মনে করেছিল। তার পরিবর্তে অন্য কাউকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বলে যারা বাচ্চা মেয়ের মতো কান্নাকাটি করে সব কিছু ভেঙেচুরে তছনছ করে দেন তাঁরা কি নিজেদের ম্যান্ডেলার নখের তুল্য বলেও মনে করেন? নেলসন ম্যান্ডেলা বাংলাদেশেও গিয়েছিলেন। শেখ হাসিনা তখন প্রথম মেয়াদের প্রধানমন্ত্রী। সে সময় এক কলামে আমি হাসিনাকে ম্যান্ডেলার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছিলাম। কিন্তু শেখ হাসিনা কি কখনো নিজের কথা ছাড়া আর কারো কথা শোনেন? ম্যান্ডেলার মাহাত্ম্যের একটু হাওয়াও কি তাঁর গায়ে লেগেছে? ম্যান্ডেলা মহামানব ছিলেন এ কারণে যে প্রতিশোধ আর প্রতিহিংসা নয়, ক্ষমা ও সমঝোতাকে তিনি জীবনের আদর্শ করে তুলেছিলেন। ক্ষমতা ও সমঝোতা শব্দ দুটো যে অভিধানে আছে বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জানেন বলে মনে হয় না। ম্যান্ডেলার স্মৃতিতে বাংলাদেশ সরকার তিন দিনের শোক পালনের ঘোষণা দিয়েছে। সামান্যতম আন্তরিকতাও কি আছে তার মধ্যে?

হাসিনার রাজনীতি এবং সুজাতার উস্কানি

বাংলাদেশের মানুষ এখন নিজেদের বর্তমান দেখে এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে শোকাপ্লুত। শেখ হাসিনা নিরপেক্ষ নির্বাচনে রাজি নন, অতএব সংলাপের পথেও তিনি যাবেন না। হাসিনা জানেন এবং গোটা বিশ্ব জানে নির্বাচন সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হলে আওয়ামী লীগের শোচনীয় পরাজয় অনিবার্য। হাসিনা গোঁ ধরে বসে আছেন মধ্যযুগীয় কোনো অত্যাচারী রাজা-বাদশার মতোঃ লোকে সমর্থন করুক কি নাই করুক সিংহাসনের মালিক আমি, আমি আমার সিংহাসনে বসে থাকবো। ভারত ছাড়া আর কেউ তাকে সমর্থন করছে না। অতএব ভারতকে তিনি যে কোনো মূল্য দিতে রাজি আছেন। ভারত অবশ্যই সে মূল্য আদায় করে নিচ্ছে এবং নেবে। তারা বাংলাদেশের সড়ক, নৌ, রেলপথ এবং সমুদ্র বন্দরগুলো বিনামূল্যে হাসিনার কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে। এখন তারা দেশটাকেই গ্রাস করে নিতে চায় । হাসিনা ছাড়া সে 'উপহার' আর কেউ

ভারতকে দেবে না। সুতরাং যে কোনো মূল্যে গণ-ধিকৃত হাসিনাকে গদিতে রাখতে উঠেপড়ে লেগেছে ভারত সরকার।

মনে হচ্ছে সে প্রক্রিয়া অনুসারে ভারত সব দিক দিয়ে বাংলাদেশকে একটা ব্যর্থ এবং অস্থিতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়। ভারতের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং ঢাকায় একদিনের সফর করে গেছেন। ষড়যন্ত্রের বীজ তার অস্থিমজ্জায়। তার পিতা ষড়যন্ত্র করে সিকিমকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। সুজাতা নিজে অস্ট্রেলিয়া সরকারকে ব্ল্যাকমেইল করে পারমাণবিক বোমা তৈরির জন্যে অস্ট্রেলিয়ার ইউরেনিয়াম আদায় করে নিয়েছিলেন। চাণক্যের উপযুক্ত শিষ্যা তিনি। অবশ্যই তিনি এসেছিলেন বাংলাদেশের সংকটময় পরিস্থিতিতে আরো উস্কানি দিয়ে যেতে। সুজাতা বলে গেছেন যেসব দল অংশ নিতে রাজি আছে তাঁদের নিয়ে নির্বাচন করলেই সে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে। একই কদমে তিনি বলেছেন, "সেটা বাংলাদেশের মানুষই স্থির করবে"। সুজাতা আরো বলেছেন গণতন্ত্র একেক দেশে একেক রকম হয়। বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু জানে গণতন্ত্র মানেই হলো গণতন্ত্র। তারা জানে স্ট্যালিনের একদলীয় নির্বাচনকে গোটা বিশ্ব গণতন্ত্র বলে গ্রহণ করতে রাজি হয়নি এবং সেজন্যেই অর্ধশতাব্দী জুড়ে বিশ্বব্যাপী স্নায়ুযুদ্ধ হয়েছিল। অবশ্যি সুজাতার দেশ ভারত সে অর্ধশতাব্দী ধরে স্বৈরতন্ত্রী স্ট্যালিন ও তার উত্তরসূরী সোভিয়েট ইউনিয়নের লেজুড় ছিল। বাংলাদেশের মানুষের আরো মনে আছে আইয়ুব খানের কাউন্সিল মুসলিম লীগের নির্বাচন কিম্বা 'বুনিয়াদী গণতন্ত্রকে' গণতন্ত্র বলে মানতে তারা রাজি হয়নি। আজো তারা গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচন চায়, সুজাতা সিংয়ের মতলবী গণতন্ত্র নয়।

বিজেপি ও জামায়াতে ইসলামী

সুজাতা সিং তার 'গণতন্ত্রের' সপক্ষে বলে গেছেন শেখ হাসিনা গদিতে না থাকলে বাংলাদেশ 'ইসলামী সন্ত্রাসী' হয়ে যাবে। ভারত সরকার এমনই হাসিনা-অন্ধ হয়ে গেছে যে প্রকৃত পরিস্থিতিটা তাদের চোখে পড়ে না। বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ মানুষ ধর্ম-ভীরু মুসলমান। তারা নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, দাড়ি রাখে আর টুপি পরে মসজিদে যায়। এবং এদেশে ধর্মীয় রাজনীতি আছে। বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী আছে, যেমন ভারতে আছে বিজেপি, শিবসেনা প্রমুখ হাজারো উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল। তাদের কেউ কেউ ২০ কোটি মুসলমানকে ভারতের নাগরিক বলে স্বীকার করতে রাজি নয়। ১৯৯২ সালে অযোধ্যার বাবরী মসজিদ ভাঙ্গায় বড়ো ভূমিকা ছিল বিজেপির, সে দলের শীর্ষ নেতারা নিজের হাতে মসজিদ ভেঙেছেন। ২০০২ সালে গুজরাতের বিজেপি দলীয় মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উৎসাহ ও সাহায্যে মুসলিম বিরোধী দাঙ্গায় দুই হাজার মুসলমান মারা যায়।

মোদী তার তদন্ত কিম্বা বিচার করেননি-যেমন শেখ হাসিনার সরকার বিডিআর বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ ধামাচাপা দিয়ে রাখছে। শেষে ভারতের সুপ্রিম কোর্টই এই দাঙ্গা আর মোদীর ভূমিকা নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজো অবধি নরেন্দ্র মোদীকে ভিসা দিতে অস্বীকার করছে। আগামী বছরের নির্বাচনে বিজেপি জয়ী হলে নরেন্দ্র মোদী হবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। এই দেশ ভারতের মুখে বাংলাদেশে ধর্মীয় রাজনীতির নিন্দা পরিহাসের মতোই শোনায়। প্রকৃত পরিস্থিতি হচ্ছে শেখ হাসিনা তার বিদেশী প্রভুদের মনোরঞ্জনের জন্যে মুসলিম নির্যাতন করে দেখাতে চাইছেন যে তিনি সন্ত্রাস দমন করেছেন। ওদিকে যতোই তিনি নির্যাতন-নিপীড়ন চালাচ্ছেন বাংলাদেশী মুসলমানের ধর্মীয় অনুরাগ ততোই বেড়ে চলেছে। হাসিনা গদিতে আসার আগে তো হেফাজতে ইসলাম বলে কোনো আন্দোলন বাংলাদেশে ছিলনা!

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে, বিশেষ করে আসন্ন নির্বাচন নিয়ে ভারতের হাইকমিশনার পঙ্কজ শরণের অবাঞ্ছিত এবং অশোভন হস্তক্ষেপের সমালোচনা অনেকে করেছেন। অন্যেরা অবিশ্বাস আর ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে আছেন। তার ওপরও 'রঙ্গের ওপর রসান চড়ালেন' সুজাতা সিং। সাধারণ মানুষ নিয়ে তাদের কিম্বা শেখ হাসিনার কাজ-করবার নয়। নইলে পঙ্কজ শরণ এবং সুজাতা সিং টের পেতেন ভারতের আধিপত্যবাদ এবং সাম্প্রতিক অন্যায় হস্তক্ষেপের ফলে বাংলাদেশের মানুষের মুখ বিস্বাদ হয়ে আর মন বিষিয়ে গেছে। দু বছর আগে, ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছিলেন জামায়াতে ইসলামী ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষের মন বিষিয়ে দিচ্ছে। সেটা কতোটা সত্যি জানি না কিন্তু ইদানীং অন্যদের গোপন এবং পঙ্গজ শরণ ও সুজাতা সিংয়ের প্রকাশ্য ভূমিকায় বাংলাদেশের মানুষের মন বিষিয়ে দেবার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হয়ে গেছে। সে কাজে আর জামায়াতে ইসলামীকে কিছু করতে হবে না।

অশুভ জন্মলগ্ন

আওয়ামী লীগের জন্মলগ্ন থেকে একটা অশুভ প্রেতাত্মা তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সে তারিখটা-২৩শে জুন ১৯৪৮ ছিল পলাশী যুদ্ধের বার্ষিকী। ১৭৫৭ সালের ওই একই তারিখে পলাশীর আম্রকাননেই মীর জাফর ও তার সহষড়যন্ত্রকারীরা বাংলার স্বাধীনতা ইংরেজের হাতে তুলে দিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের এবং তার উত্তরসূরী বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে তাদের জীবনের মূলব্রত বলে স্বীকার করে নিয়েছে। জনতার বলে বলীয়ান হয়ে নয়, ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন হতে চেয়েছিলেন। এ দেশের জনতার আন্দোলনেই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন। সে ষড়যন্ত্রে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ভারত কি তার ওপর আধিপত্য করতো না?

একাত্তরে আবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার আশায় তিনি পাকিস্তানীদের সঙ্গে আপস করে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেলেন। আর এদিকে বাংলাদেশের জনতা তার অনুপস্থিতিতে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিল। অবশ্যি মুজিবের সপক্ষে বলতেই হবে, একাত্তরে তাজউদ্দীন আহমেদের সঙ্গে ভারতের সাত দফা চুক্তি মেনে নিতে তিনি অস্বীকার করেছিলেন এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী তুলে নিতে ইন্দিরা গান্ধীকে বাধ্য করেছিলেন। আওয়ামী লীগের বর্তমান নেত্রী এদেশের মানুষকে বিশ্বাস করেন না। এতোকাল তিনি জনতার স্বার্থ ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলে এসেছেন। গদির লোভে তিনি অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছেন এ দেশের মানুষের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ভারতের হাতে তুলে দিতে উদ্যত হয়েছেন বলেই দেশের মানুষ বিশ্বাস করে।

আওয়ামী লীগের চরিত্রের আরেকটা ত্রুটি, তারা ফাঁকা মাঠে রাজনীতি করতে ভালোবাসে। শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হয়ে রক্ষীবাহিনীকে দিয়ে ৪০ হাজার সমালোচক ও বিরোধীকে হত্যা করেছিলেন। তিনশো সদস্যের সংসদের চার-পাঁচজন সদস্য তার সমালোচক ছিলেন। সেটা তার সহ্য হয়নি। একদলীয় সংসদ গঠনের লক্ষ্যে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনের কথা ভুলে গিয়ে তিনি মধ্য মেয়াদে বিভাজক নির্বাচন করেছিলেন। পত্রপত্রিকায় তার অশাসন-কুশাসনের সমালোচনা হচ্ছিলো। তিনি সকল বেসরকারি পত্রপত্রিকা বন্ধ করে দিলেন। দেশজুড়ে তার সমালোচনা হচ্ছিলো। তিনি রাজনীতি নিষিদ্ধ করে একদলীয় বাকশালী আজীবন রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার গোড়া থেকেই বিরোধী দলের সভা-সমাবেশে বাধা দিয়েছে, রাজনৈতিক বিরোধী ও সমালোচকদের বিচার-বহির্ভূত হত্যা আর গুম-খুন করছে, হাজার হাজার লোককে কয়েদ করে রেখেছে। বিরোধী দলের সমর্থক পত্রপত্রিকা ও টেলিভিশন চ্যানেলগুলো বন্ধ করে দিয়ে, ১৯ জন সাংবাদিক খুন করে এবং মাহমুদুর রহমানসহ সমালোচকদের মিথ্যা মামলায় বন্দী করে বিরোধী দলের বাকরোধ করেছে। ওদিকে তাদের গৃহপালিত মিডিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বিরোধী দল এবং তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে চলেছে। বিএনপি এবং অন্য বিরোধী দলগুলোর শীর্ষ নেতাদের প্রায় সকলকেই মিথ্যা মামলায় জেলে পুরে রাখা হয়েছে। এভাবে তারা নির্বাচন করতে চায়, এটাকে তারা রাজনীতি বলে। আপনাদের কি নিচের কবিতাটির কথা মনে হয় না?

"বাবুরাম সাপুড়ে/কোথা যাস বাপুরে/আয় বাবা দেখে যা/দুটো সাপ রেখে যা/ যে সাপের দাঁত নেই চোখ নেই/করে নাকে ফোঁস-ফাঁস/মারে নাকো টুঁস-টাঁস/সেই সাপ জ্যান্ত/ গোটা দুই আনতো/তেড়ে মেরে ডাণ্ডা/করে দিই ঠাণ্ডা।"

(লন্ডন, ১০.১২.১৩)

নূহ্ নবীর কিস্তি এবং জাতিসংঘ সনদের সপ্তম অধ্যায়

শেখ হাসিনা যে কখন কি বলেন নিজেও নিশ্চয়ই তার তাৎপর্য ভেবে দেখেন না। দুর্গাপূজার মণ্ডপে গিয়ে তাঁর ভোটব্যাংককে তোষণের উদ্দেশ্যে তিনি দেশে ফসল ভালো হবার জন্যে তাঁর মা-দুর্গাকে ধন্যবাদ দেন, বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের তিনি সন্ত্রাসীরূপে চিত্রিত করেন, আল্লাহ-রাসূল (দঃ) আর ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাকারী শাহবাগী ব্লগারদের তিনি পোষণ ও তোষণ করেন, আর অন্যদিকে এ সবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে যোগদানকারীদের ওপর রাতের আঁধারে বুলেট বৃষ্টি করে বাংলাদেশী জালিওয়ানওয়ালা বাগ গণহত্যা সৃষ্টি করেন।

প্রগলভতা আর দম্ভের নতুন মাত্রা দেখিয়েছেন শেখ হাসিনা ২৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার। ফরিদপুরের ভাঙ্গায় এক নির্বাচনী সভায় তিনি আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীককে নূহ নবীর কিস্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন– আওয়ামী লীগের নৌকা হচ্ছে সেই কিস্তি যা দিয়ে নূহ নবী মানবজাতিকে উদ্ধার করেছিলেন। আওয়ামী লীগের নেতাদের উচিত হাসিনার দাম্ভিকতার লাগাম টেনে ধরা। তা না হলে হয়তো শিগগিরই তিনি নিজেকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালার সঙ্গে তুলনা করে বসবেন (আস্তাগ ফিরুল্লাহ)।

তা ছাড়া শেখ হাসিনার ইতিহাস জ্ঞানের মধ্যে বরাবরের মতোই বঙ্গোপসাগরের সমান বিশাল ফাঁক রয়ে গেছে। নূহ নবী শুধু মানবজাতিকে নয়, সার্বিক প্রাণীজগৎকে রক্ষার জন্যেই নৌকা ভাসিয়েছিলেন এবং প্রতি প্রজাতির এক জোড়া করে প্রাণীকে তিনি সে নৌকায় তুলেছিলেন। তবে এখানে হয়তো হাসিনার উক্তিতে কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তিনি তাঁর নৌকা প্রতীক দিয়ে এমন এক বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে চান যেখানে শুধুমাত্র অত্যাচরী আওয়ামী লীগই (চোর-চোট্টা-দাগাবাজসহ) টিকে থাকতে পারবে।

বাংলাদেশের ষোলো আনা মানুষ কেন হাসিনা, তাঁর সরকার ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়েছে কখনো ভেবে দেখেছেন তিনি? এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে তিনি সন্ত্রাসী বলে অপবাদ দেন, অপমান করেন, ভোটের অধিকার থেকে তিনি তাদের বঞ্চিত করেন। হাসিনা মনে করেন তিনি যা ভাবেন সেটাই সঠিক এবং অন্যেরা সকলে স্টুপিড। সারা বিশ্বের সুপরামর্শ এবং

হীতোপদেশকে তিনি লাথি মেরে সরিয়ে দেন। তিনি গায়ের জোরে অন্যদের ধ্বংস করে দিতে উঠেপড়ে লেগেছেন। ইতিহাসের মতো তাঁর ভূগোল জ্ঞানও ভুলে ভর্তি। পৃথিবীতে তিনি দিল্লির সরকার ছাড়া আর কোন দেশ ও প্রতিষ্ঠানকে দেখতে পান না।

হাসিনার প্রগলভ দাবিগুলোর মধ্যে সর্বশেষ কবে সত্যতা দেখেছিলেন? ভাঙ্গার আলোচ্য নির্বাচনী সভাতেই তিনি পদ্মা সেতু তৈরি না হওয়ার জন্যে বিএনপিকে দায়ী করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, এই সেতু সংক্রান্ত দুর্নীতিতে জড়িতদের কেউ তাঁর আত্মীয় নন। ক্যানাডার আদালতে এ সংক্রান্ত যে মামলাটি বর্তমানে মুলতবি আছে তার অভিযোগপত্র বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ দেখতে পায়নি। তারা যাতে দেখতে ও জানতে না পায় সে জন্যে সকল প্রকারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সে অভিযোগপত্রে কাদের নাম আছে সেটা একদিন জানাজানি হবেই। সে মামলার ব্যাপারে তদন্তে প্রধানমন্ত্রীর অতি নিকট আত্মীয়দের কারো কারো সম্পদের উৎস সম্বন্ধে কেন অনুসন্ধান করা হচ্ছে সে প্রশ্নও উঠতে বাধ্য।

ঘটনাগুলো সুদূর অতীতের নয়, অতি সাম্প্রতিক। এ ক্ষেত্রে দেশের মানুষকে প্রতারিত করা যাবে না। পদ্মা সেতুর অর্থায়ন সর্বশেষ যে কারণে বিশ্ব ব্যাংক করেনি সেটা কারোই ভুলে যাবার কথা নয়। বিশ্ব ব্যাংক দুর্নীতিতে সর্বাধিক জড়িত ব্যক্তিদের নামের একটা তালিকা বাংলাদেশ সরকারকে পাঠিয়েছিলো এবং সংশ্লিষ্টদের বিচার ও শাস্তি দাবি করেছিলো। বহু ধানাই-পানাইয়ের পরও সরকার এবং তাদের আজ্ঞাবহ দুর্নীতি দমন কমিশন সাবেক যোগযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনের বিচার, এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করতেও অস্বীকার করেছে।

ওরা দুর্নীতির দল

তখন বহু মহল থেকেই এ সমালোচনা উঠেছিলো যে আবুল হোসেন হয়তো সরকারের এবং শাসক দলের শীর্ষ ব্যক্তিদের কারো কারো হয়ে প্রক্সিতে দুর্নীতি করেছিলেন; সেই শীর্ষ ব্যক্তিদের পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবার ভয়েই আবুল হোসেনকে সযত্নে তদন্ত ও বিচার থেকে রক্ষা করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সেতু থেকে বঞ্চিত হয়েছে। লজ্জার মাথা খেয়ে এখন হাসিনা আবারো মানুষের ভোট প্রার্থনা করছেন এবং বলছেন যে আবার তিনি ক্ষমতায় এলে পদ্মার ওপর সেতু তৈরি হবে। কিন্তু দেশের মানুষ ভাবছে অন্য কথা। বিগত নির্বাচনের আগেও বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। তার কোনটি তিনি পালন করতে পেরেছেন? সাধারণ মানুষ বরং মনে করে হাসিনা আর ক্ষমতা না পেলেই দ্রুত একটা সুষ্ঠু ও দুর্নীতিমুক্ত সেতু নির্মাণ সম্ভব হবে এবং দেশের সার্বিক মঙ্গল হবে।

বাংলাদেশের অন্ধ-বধির মানুষও জানেন আওয়ামী লীগ দুর্নীতির দল। বিগত নির্বাচনের আগে হাসিনা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়ী হলে মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের সম্পদের বিবরণ নিয়মিত প্রকাশ করা হবে। কোথায় গেল শেখ হাসিনার সে প্রতিশ্রুতি? প্রতিশ্রুতির যারা বরখেলাপ করে বাংলাদেশের মানুষ তাদের বলে বেঈমান। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে গদি লাভের কিছুদিনের মধ্যেই হাসিনা সে প্রতিশ্রুতি গিলে খেলেন। কোন মন্ত্রী কিম্বা সংসদ সদস্যেরই সম্পদের বিবরণ কখনো প্রকাশ করা হয়নি।

নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী প্রার্থীরা সম্পদের বিবরণ হলফনামায় ঘোষণা করতে বাধ্য। যে কয়জন সে বিবরণ দিয়েছিল তাতে দেখা যাচ্ছে বিগত পাঁচ বছরে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের বিত্ত-সম্পদের পরিমাণ বহু গুণ, এমনকি কারো কারো ক্ষেত্রে শত শত গুণও বেড়ে গেছে। সেসব কেলেঙ্কারী চাপা দেবার মতলবে সরকারের হুকুমের দাস নির্বাচন কমিশন এখন তাদের ওয়েবসাইট থেকেও সেসব বিবরণ গুম করে ফেলেছে। প্রকৃত পরিস্থিতি এই যে আওয়ামী লীগ দেশের যাবতীয় বিত্ত-সম্পদ তাদের দলের নেতা-কর্মীদের হাতে পূঞ্জীভূত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্পদের অর্থ শক্তি। এই ভাবে শক্তি কেন্দ্রীভূত করে শেখ হাসিনা চিরস্থায়ীভাবে ক্ষমতা নিজের হাতে রাখার পরিকল্পনা করেছেন।

বাইবেলের কাহিনী এবং আওয়ামীদের স্বরূপ বিগত কয়েক মাসে বাংলাদেশে যা ঘটছে সেটাকে একটা চাপা গৃহযুদ্ধ বলতেই হয়। সরকার রাজনৈতিক বিরোধীদের নির্মূল করে শোষণের রাজত্ব কায়েম করতে চায়। বাইবেলে আছে ভবিষ্যৎ বক্তারা বলেছিলেন জুডিয়াতে (বর্তমান ইসরাইল) এমন এক শিশুর জন্ম হবে যে হবে রাজার রাজা। রাজ্য হারানোর ভয়ে দুর্নীতিবাজ ও অত্যাচারী রাজা হ্যারোড সকল নবজাত পুরুষ সন্তানকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর সৈন্যদের। দৈবাৎ যোসেফ ও মেরী ঈসা নবীকে (যিশু খৃস্ট) নিয়ে মিসরের পথে পাড়ি দিয়েছিলেন। পাইকারী শিশু হত্যা হ্যারোডের মসনদ রক্ষা করতে পারেনি।

আওয়ামী লীগ হ্যারোডের মতোই রাজনীতি করতে ভালোবাসে। কোন প্রকার বিরোধিতা কিম্বা সমালোচনার মুখে তারা রাজনীতি করতে পারে না। শেখ মুজিব যখন প্রথম বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তাঁর তখনকার জনপ্রিয়তা আধুনিক ইতিহাসে একমাত্র নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু সে জনপ্রিয়তা নিয়েও তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। 'লাল ঘোড়া দাবড়াইয়া' দেবার হুমকি দিয়েছিলেন তিনি, পেছন থেকে গুলি করে সিরাজ শিকদারকে হত্যা করা হয়েছিলো, রক্ষীবাহিনী ৮০,০০০ বিরোধী ও সমালোচককে হত্যা করেছিলো, সংসদে ৯৫ শতাংশেরও বেশি গরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও একদলীয় সংসদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি মধ্যমেয়াদে নির্বাচন করেছিলেন।

শেখ হাসিনাও বরাবরই খালেদা জিয়া ও বিএনপিকে রাজনীতির মানচিত্র থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছেন, তিনি এবং তাঁর মাস্তান মন্ত্রীরা এখন আবার খালেদা জিয়াকে পাকিস্তানে, আফগানিস্তানে কিম্বা পাবনায় পাঠিয়ে দিতে চান। তাঁদের খালেদা ও বিএনপি ভীতি প্রকারান্তরে তাঁদের গণতন্ত্র ভীতিরই পরিচয় দেয়।

শেখ হাসিনার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ নেতারা বিএনপি দল এবং সারা দেশেরই নেত্রী খালেদা জিয়াকে বিলুপ্ত করার প্রকাশ্য হুমকি দিয়ে চলেছেন। বিগত এক বছরে বাংলাদেশে প্রায় ছয়শো রাজনৈতিক হত্যা হয়েছে, আহত হয়েছেন ২২,০০০। এসবের প্রায় সবগুলোর জন্যেই দায়ী আওয়ামী লীগের ক্যাডাররা। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী বিরোধী দলীয় কর্মীদের হত্যার জন্যে আওয়ামী লীগ ক্যাডারদের আরো ৫০,০০০ আগ্নেয়াস্ত্র দেওয়া হয়েছে। বিরোধী দলকে সভা-সমাবেশ ও মিছিল করার গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। মিথ্যুক সরকার উদ্ভট ও অবিশ্বাস্য অভিযোগে বিরোধী পক্ষের নেতাদের বিরুদ্ধে মামলার পাহাড় গড়ে তুলেছে।

ফ্যাসিবাদ এভাবেই গড়ে ওঠে

বিএনপির যে নেতা যখনই মুখ খোলেন তখনই তাঁকে বাংলামোটরে কনস্টেবল হত্যা কিম্বা গাড়ি ভাঙচুরের জন্যে অভিযুক্ত করা হয়। শীর্ষ নেতাদের প্রায় সকলকে এবং দেশজোড়া হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ৮৮ বছর বয়স্ক ড. আর এ গনির বিরুদ্ধেও পুলিশ কনস্টেবল হত্যার হাস্যকর অভিযোগ এনেছে এই সরকার। গত ২৯ ডিসেম্বর বিএনপির মার্চ ফর ডেমোক্র্যাসি কর্মসূচির দিন এবং তার আগের দু'দিনে গ্রেফতার করা হয়েছে এক হাজারেরও বেশি। বাংলাদেশের কারাগার ও বন্দী শিবিরগুলো এখন হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলোর মতোই টইটম্বুর ভরাট হয়ে গেছে।

ইউরোপের ইতিহাসে অনুরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিলো বিগত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে। অ্যাডলফ হিটলার বিশ্ব জয়ের স্বপ্নে প্রথমেই সকল সম্ভাব্য উপায়ে সকল সমালোচনা ও রাজনৈতিক বিরোধিতাকে হত্যা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্লান্তি ও বিভীষিকা ইউরোপীয় রাজনীতিকরা তখনো ভুলতে পারেননি। গোড়ায় তাঁরা হিটলারের ফ্যাসিস্ট অত্যাচার ও নির্যাতনকে উপেক্ষা ও ক্ষমার, এমনকি প্রশ্রয়ের চোখেই দেখেছেন। তাঁদের টনক নড়েছিলো অতি বিলম্বে— হিটলার যখন চেকোশ্লোভাকিয়া এবং পোল্যান্ড আক্রমণ করেন। কিন্তু তখন খুবই বিলম্ব হয়ে গিয়েছিলো। একজন অতি-উচ্চাভিলাসী ব্যক্তির বাড়াবাড়ি এবং অবাধ্যতার কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং সে যুদ্ধে কয়েক কোটি মানুষ মারা গিয়েছিলো, গোটা মানব সভ্যতাই ধ্বংস হতে বসেছিলো।

ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধের লক্ষ্যেই যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবী ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলে। জাতিসংঘের প্রথম এবং প্রধান কাজ ছিলো বিশ্বব্যাপী শান্তি এবং মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার লক্ষ্যে একটা সনদ তৈরি করা। বাংলাদেশের বর্তমান (বৈধ কি অবৈধ সুনিশ্চিত নয়) প্রধানমন্ত্রী বিগত পাঁচ বছরে যে পথে চলেছেন সেটা বিশ্ব সমাজের প্রতি চূড়ান্ত অবাধ্যতা স্বরূপ। প্রকৃত গণতন্ত্র চর্চা করে দেশে শান্তি এবং উন্নতি-প্রগতির পথ প্রশস্ত করার পরামর্শ বিশ্ব সমাজ তাঁকে দিয়ে এসেছে। কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কমনওয়েলথ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান, ক্যানাডা, এমনকি জাতিসংঘের প্রতিও তিনি চরম অবমাননা দেখিয়ে চলেছেন। উপরোক্ত সবগুলো দেশ এবং সংস্থা পরামর্শ দিয়েছে সংলাপের মাধ্যমে সকলের গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে। কিন্তু হাসিনা সেসব পরামর্শ গ্রাহ্য করেননি, কেননা তিনি জানেন পাঁচ বছর ধরে তিনি যে জাতি ও গণবিরোধী পথে চলেছেন তাতে সাধারণ মানুষের ভোটে তাঁর আবার ক্ষমতা পাবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

আমাদের ধর্মীয় সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করা হয়, আল্লাহ যাকে ধ্বংস করতে চান তাকে আগে উন্মাদ করে দেন। সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর আচরণ এবং কথাবার্তা থেকে অবশ্যই মনে হবে তাঁরা সবাই জ্ঞান-বুদ্ধির কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। শেখ হাসিনার উন্মাদ আচরণ বন্ধ করা না গেলে বাংলাদেশে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে সেটা গোটা দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য। দেশে এবং বিদেশে সকলেই এখন একমত যে হাসিনার ফ্যাসিস্ট শাসন প্রলম্বিত হলে বাংলাদেশের মানুষ পরিত্রাণের জন্যে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হবে– যেমন করে তারা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলো পাকিস্তানী অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে।

জাতিসংঘের উদ্বেগ যে কারণে

এদেশের মানুষ এখন আর নিরীহ নয়। একাত্তরে তারা গেরিলা যুদ্ধ এবং নাশকতা শিখেছে। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস তখনই তাদের হয়েছিলো। তখন তারা ৯৩ হাজার পাকিস্তানী সৈন্যের একটা অত্যাধুনিক সুসজ্জিত বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিলো। অনুরূপ পরিস্থিতি যদি আবার দেখা যায় এই মানুষগুলো চুপচাপ ঘরে বসে থাকবে না। এবং সে প্রতিরোধ উপচে সীমান্তের বাইরেও চলে যাবে। প্রতিবেশী পরাশক্তি ভারতেরও সেটা গভীর চিন্তার কারণ হওয়া উচিত। উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার জন্যে চার দশকেরও বেশিদিন ধরে গেরিলা যুদ্ধ চালাচ্ছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে (পশ্চিমবঙ্গসহ) ত্রিশটিরও বেশি সন্ত্রাসী দল ও গোষ্ঠী বিচ্ছিন্ন

হয়ে যাবার জন্যে সংগ্রাম করছে। বাংলাদেশে একটা গৃহযুদ্ধের বিস্ফোরণ ঘটলে তার প্রভাব ভারতেও পড়তে বাধ্য।

খুব সম্ভবত এসব সম্ভাবনা জাতিসংঘ সদর দফতরেও উদ্বেগ সৃষ্টি করছে। সংলাপের মাধ্যমে বিরোধী দলের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার উপদেশ দিয়ে জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন কয়েক দফায় শেখ হসিনাকে টেলিফোন করেছেন। রাজনীতি বিষয়ে তাঁর বিশেষ সহকারী অস্কার ফার্নান্দেজ তারানকো একাধিকবার বাংলাদেশ সফর করেছেন। সরকার সংলাপ করবে বলে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলেও তাঁর বাংলাদেশ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। সংলাপ হয়নি। সমস্যা এখন সঙ্কটে পরিণত হয়েছে।

মি. তারানকো মহাসচিবের কাছে সর্বশেষ যে প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন জানা গেছে তাতে চারটি সুপারিশ রয়েছে। সুপারিশগুলো হচ্ছে (১) অবিলম্বে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের মুক্তিদান, তাদের অফিস খুলে দেওয়াসহ স্বাভাবিক রাজনৈতিক কার্যক্রম চালু রাখা। এবং সভা-সমাবেশে কোন রকম বাধা না দেওয়া, (২) নির্বাচন কালীন সময়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর ছুটিতে যাওয়া, (৩) প্রথম দুটি প্রস্তাব মেনে নেওয়া না হলে জাতিসংঘের একটি বিশেষ কমিটির তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠান, এবং (৪) উপরোক্ত কোনো পন্থায় সমাধান না হলে জাতিসংঘ সনদের (উপরে বর্ণিত) সপ্তম অধ্যায় অনুযায়ী সামরিক পদক্ষেপ এবং প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ।

আগেই বলেছি অবাধ্য ও দুর্বৃত্ত দেশগুলোকে সামালে রাখা ও শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যেই জাতিসংঘের সনদটি প্রণীত এবং গৃহীত হয়েছিলো। অবাধ্য সদস্য দেশের শাসনের জন্যে, প্রয়োজনবোধে সামরিক শক্তি ব্যবহার ছাড়াও অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিধান আছে সনদে। যেমন সপ্তম অধ্যায়ের ৪১ ধারায় অপরাধী দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক, রেল, বিমান, ডাক ও তার যোগযোগ সম্পূর্ণ কিম্বা আংশিক ভাবে বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে দেওয়া যাবে। বাংলাদেশের বর্তমান সরকার তার অবাধ্য আচরণের দ্বারা ভারত ছাড়া সকল গুরুত্বপূর্ণ দেশেরই বিরক্তি উৎপাদন করেছে। এমনকি ভারতের সবচাইতে পুরাতন মিত্র রাশিয়াও সরকারের নির্বাচন সংক্রান্ত নীতি ও কার্যকলাপ সমর্থন করছে না। মস্কো গত সপ্তাহে জানিয়ে দিয়েছে যে হাসিনা সরকারের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে সে কোন পর্যবেক্ষক পাঠাবে না।

জাতিসংঘের যে কোন সদস্য দেশ এ সরকারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবার জন্যে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে অনুরোধ করতে পারে। মনে হচ্ছে সে অনুরোধ ইতোমধ্যেই করা হয়েছে। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী বাংলাদেশ পরিস্থিতি বিবেচনার জন্যে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ জানুয়ারির শুরুতেই বৈঠকে বসবে।

হরতাল-অবরোধে হাসিনার মেকি অরুচি?

সরকারের গোঁয়ার্তুমি এবং প্রতারণাপূর্ণ পন্থায় গদি দখলে রাখার চেষ্টার প্রতিবাদে বিএনপি এবং ১৮ দলের জোট বহু প্রকার আন্দোলন করছে। ফ্যাসিস্ট পন্থায় তাদের সভা-সমাবেশ করার গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বাধ্য হয়ে তাদের হরতালের পথ ধরতে হয়েছিলো। মনে হচ্ছে প্রতিবাদ, হরতাল ইত্যাদিতে হঠাৎ করে শেখ হাসিনার অরুচি ধরে গেছে। ১৯৯১ সালে নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে তিনি ১৭৩ দিন হরতাল করেছিলেন, তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতিতে নির্বাচনের দাবিতে লাগাতার হরতাল ও অবরোধ করে তিনি দেশ অচল করে দিয়েছিলেন, অনেকগুলো নরহত্যা ঘটিয়েছিলেন। বিগত পাঁচ বছরে বিএনপি ও ১৮ দলের জোট হরতাল করেছে আজ অবধি ৬৫ দিন, অবরোধ হয়েছে ২৩ দিন। এখন কিন্তু 'আইন-শৃঙ্খলার' দরদ তাঁর উথলে উঠেছে।

শান্তিপূর্ণ পন্থায় বিরোধী পক্ষকে নিজেদের প্রতিবাদ দেশবাসীকে জানান দেওয়া এবং সমর্থন সংগ্রহের চেষ্টার সুযোগ দান ছিলো যে কোন সভ্য সরকারের কর্তব্য। কিন্তু বর্তমান সরকারকে প্রকাশ্যে অসভ্য বলা হয় না সৌজন্যের খাতিরে। তারা পুলিশ, র‍্যাব এবং আওয়ামী লীগের সশস্ত্র ক্যাডার ও ভাড়াটে গুণ্ডাদের দিয়ে বিরোধীদের হরতাল-মিছিলে বাধা দিয়েছে। বিশৃঙ্খলা, অশান্তি, সম্পত্তির ক্ষতি, এমনকি কিছু মূল্যবান প্রাণহানিও ঘটেছে আওয়ামী লীগ সরকারের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের ফলে। সেসব ঘটনা নিয়ে মিথ্যা প্রচার চালিয়ে সরকার বিরোধী দলগুলোকে দুর্নাম ও অপবাদ দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে।

গত সোমবার ২৯ ডিসেম্বর এবং পরের দুদিনে যা ঘটেছে তাতে ঢাকা নগরী রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিলো। ঢাকার বাইরে সরকারের নিয়ন্ত্রণ অনেকদিন আগেই হাতছাড়া হয়ে গেছে। বিরোধী দলের অবরোধের বিরুদ্ধে সরকারের মন্ত্রীরা বহু চেঁচামেচি করেছেন। কিন্তু ২৯ তারিখের দু'দিন আগে থেকে সরকার যেন দুর্ভেদ্য প্রাচীর তৈরি করে তার আড়ালে আত্মগোপন করেছিলো। সদর ঘাটের লঞ্চঘাট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো। দেশের সকল অঞ্চল থেকে প্রতিদিন যে শত শত লঞ্চ ঢাকায় আসে তাদের যাত্রা শুরু করতে দেওয়া হয়নি। দূর পাল্লার কোন বাস ঢাকা অভিমুখে ছাড়তে দেওয়া হয়নি। ট্রেনগুলো ঢাকা থেকে দূরের কোন স্টেশনে থামিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি প্রাইভেট গাড়িতে কিম্বা পায়ে হেঁটেও কাউকে ঢাকার দিকে এগুতে দেওয়া হয়নি। শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশের মানুষকে কেমন ভয় করে এই হচ্ছে তার কিছু নমুনা।

সনাতনী ঐতিহ্য

গুণ্ডাগার্দি আওয়ামী লীগের সনাতনী ঐতিহ্য। হাসিনার "৯৬ সালের সরকারের আমলে খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ী

রায় দিতে বিচারপতিদের ওপর চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে গজারী কাঠের লাঠিধারীদের মিছিল নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট প্রদক্ষিণ করেছিলেন। মনে হচ্ছে একমাত্র লাঠি নির্মাণ শিল্পই ইদানীং বাংলাদেশে ফুলটাইম কাজ করছিলো। একই মাপের এবং একই চেহারার লাঠি উচিয়ে হাজার হাজার মানুষের মিছিলের আলোকচিত্র বিশ্ব মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আর জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভেতরে ঢুকে আওয়ামী লীগের ভাড়াটে গুণ্ডারা আইনজীবী ও সাংবাদিকদের লাঠিপেটা করেছে, তিনবারের প্রধানমন্ত্রী এবং বর্তমানে প্রধান বিরোধী বিএনপি দলের ও ১৮ দলের জোটের নেতা বেগম খালেদা জিয়াকে দিনের পর দিন বালুভর্তি ট্রাক আর পুলিশের দেওয়াল দিয়ে গৃহবন্দী করে রেখেছে, এসব দৃশ্যের পর বাংলাদেশের বর্তমান শাসকদের সভ্য বলে বিশ্বাস করতে বিশ্বাবাসীর অসুবিধা হবে।

আওয়ামী লীগের মহাসচিব সৈয়দ আশরাফ সব সময় স্থিরমতি থাকেন না। তাঁর রক্তচক্ষু ও বেসামাল হুঙ্কার যে তরল এবং কৃত্রিম সামগ্রীর প্রভাবে ঘটে বাংলাদেশের মানুষ অনেকদিন আগে থেকেই জানে। ইদানীং মনে হচ্ছে আরো কোন কোন মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ নেতাও একই তরল ও রাসায়নিক পথের যাত্রী হয়েছেন। এঁদের হুঙ্কার আর তর্জন-গর্জনে খালেদা জিয়া কিম্বা অন্য কোন বিএনপি নেতা ভয় পাবেন বলে আমার মনে হয় না। বরং বাংলাদেশের মানুষ তাঁদের পূর্ব পুরুষদের সম্বন্ধেই বিরূপ ধারণা পোষণ করবে। মানুষ গণতন্ত্র চায়। যে কোন ভাবেই হোক শেষ পর্যন্ত তারা গণতন্ত্র আদায় করেই ছাড়বে। তারা স্বাধীনতা চেয়েছে এবং এখনো চায়। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার এবং দেশকে পরের হাতে তুলে দেওয়া তারা প্রাণ দিয়ে হলেও প্রতিরোধ করবে।

ইংরেজী নতুন বছরের শুভ কামনা আপনাদের সকলের জন্যে। বিভীষিকার কালরাত্রি অতিক্রম করে এ বছর আপনাদের জন্যে সুখী ও নিরাপদ হোক। এ বছরে বাংলাদেশ অত্যাচারী ও গণবিরোধীদের বিতাড়িত করে গণতন্ত্র, উন্নতি ও প্রগতির পথে সম্মুখযাত্রা শুরু করুক।

ত্রুটি স্বীকার :

গত সপ্তাহের কলামে অসাবধানতাবশত কমনওয়েলথের সদস্য দেশের সংখ্যা ২৭টি বলে লেখা হয়েছিলো। সেজন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত। এ সংস্থার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৩।

(লন্ডন, পয়লা জানুয়ারি, ২০১৪)

গণতন্ত্রের আন্দোলন এখন কোন পথে যাবে

একাত্তরে আমাদের অসম সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা বীর বিক্রমে মূলত গেরিলা যুদ্ধ করেছে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে। ধরা পড়ে গেলে সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ হয়ে যেতো তারা। যেমন নিরুদ্দেশ হয়েছিল আমার পরম স্নেহভাজন শহীদ রুমি। মুখ খোলার সাহস ছিলো না দেশের সাধারণ মানুষের। পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করলে মৃত্যু অবধারিত ছিল। এমন কি দেশের কোথায় কি হচ্ছে তাদের জানতে দেওয়া হয়নি। লোকে বিবিসির সংবাদ বিশ্বাস করে। বহু চেষ্টায় বিবিসি থেকে আমরা নানাভাবে কিছু কিছু সংবাদ সংগ্রহ করে প্রচার করেছি। তাতে সাংঘাতিক ক্রুদ্ধ হয়েছিল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সরকার।

পাকিস্তান সরকার বৃটিশ সরকারের কাছে অনেকগুলো কড়া প্রতিবাদ করেছে। প্রতিবাদ করেছে বিবিসির কাছেও। নাম ধরে আমার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করেছে ইয়াহিয়া সরকার। ওদিকে পূর্ব পাকিস্তানে বিবিসি নিষিদ্ধ করা হয়। বিবিসিতে খবর পাঠালে, বিবিসির সঙ্গে কোন প্রকার যোগাযোগ করলে, এমনকি বিবিসির খবর শুনলেও কঠোর শাস্তি হবে বলে ঘোষণা করা হয়। ঢাকায় আমাদের সংবাদদাতা নিজামুদ্দিন আহমেদ মাঝে মাঝে গোপনে এবং সাংকেতিক ভাষায় কিছু খবর পাঠাতেন। ডিসেম্বর মাসে বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রথম চোটেই নিজামুদ্দিনকে ওরা ধরে নিয়ে যায়। আর কখনো তাঁর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

সহজেই বোধগম্য যে রাজনৈতিক ধরনের কোন প্রকার কথাবর্তা বলার সাহস কারোই ছিল না। সকল বড়ো যুদ্ধেরই অন্তত অর্ধেকাংশ হয় রাজনৈতিক। একাত্তরে রাজনৈতিক যুদ্ধটা করেছিলেন প্রবাসীরা, যুক্তরাজ্যে। বাংলাদেশের বাইরে তখন শুধু এদেশেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশী ছিলেন। এই রাজনৈতিক যুদ্ধের কিছু কিছু দিক তুলে ধরা বর্তমান পরিস্থিতিতে খুবই প্রাসঙ্গিক হবে।

পঁচিশ মার্চের পাশবিক বর্বরতার খবর লন্ডনে এসে পৌঁছায় পরের দিন বিকেলে। বিবিসির বাংলা অনুষ্ঠানে কয়েকজন পূর্ব পাকিস্তানী উচ্চশিক্ষার্থী খণ্ডকালীন কাজ করতেন। তাঁরা এবং আমি ক্যান্টিনে বসে স্থির করলাম একটা জাতির ওপর এমন অমানুষিক সামরিক হামলার পটভূমি বিশ্ববাসীকে জানতে

দিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের সমর্থনের আবেদন করবো। সে সন্ধ্যার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি ফ্যাক্টশিটগুলো লিখতাম। উপরোক্ত উচ্চশিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নামে সেগুলো স্টেনসিলে মুদ্রণ করে মিডিয়া, পার্লামেন্ট সদস্য, হাইকোর্টের বিচারপতি এবং বিদেশী দূতাবাসগুলোতে বিলি করতেন। সংশ্লিষ্ট উচ্চশিক্ষার্থীদের কয়েকজন ছিলেন রাজিউল হাসান, ওয়ালি আশরাফ, বুলবুল মাহমুদ, এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী, অধ্যাপিকা সুরাইয়া খানম প্রমুখ।

কী ধরনের কাজ আমরা করেছি একটা দৃষ্টান্ত প্রাসঙ্গিক হবে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন অধ্যাপক আগে পাকিস্তান সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁরা যৌথভাবে একটা দলিলে দেখিয়েছিলেন যে যথোচিত ব্যবস্থা নেওয়া হলে অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রস্তাবিত বাংলাদেশ স্বনির্ভরশীল হতে পারে। ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার কূটনৈতিক সম্পাদক জন রিডলি একদিন সকালে টেলিফোন করে জানালেন যে পাকিস্তান পররাষ্ট্র দফতরের প্রবক্তা আব্দুল কাইয়ুমের স্বাক্ষরিত একটি দলিল তাঁরা পেয়েছেন যাতে বলা হয়েছে যে স্বাধীন হলে বাংলাদেশ কখনো নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। আমি তাঁকে পরামর্শ দিলাম যে দলিলটা ছেপে দেওয়াই তাঁদের উচিৎ হবে। তার পরেই আমি আমেরিকার মিশিগান রাজ্যে আমার ছোট ভাইয়ের বন্ধু ডা. শামসুল হককে টেলিফোন করে বলি যে হার্ভার্ড দলিলটা আমাদের অবিলম্বে চাই। ডা. হক পরদিন সকালেই সে দলিল নিয়ে লন্ডনে এসে হাজির হলেন এবং সেদিন সন্ধ্যার আগেই ৩২ পৃষ্ঠার সে দলিলের পাঁচ হাজার কপি আমরা সাইক্লোস্টাইল করে মিডিয়াসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মহলে প্রচার করতে পেরেছিলাম। হার্ভার্ড দলিলটি পরবর্তীকালে আরো কয়েকটি সূত্র থেকে প্রকাশ করা হয়েছিল। আব্দুল কাইয়ুমের স্বাক্ষরিত পাকিস্তান সরকারের দলিলটি এরপর আর কেউ বিশ্বাস করেনি।

বিবিসির চাকরির শর্ত অনুযায়ী এই রাজনৈতিক ভূমিকা আমার জন্যে নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে সেজন্যে আমাকে অন্তত দুইবার পদোন্নতি দেওয়া হয়নি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের খবরাদি সংগ্রহ এবং প্রচার করা, (প্রতিদিন, কোন কোন দিন দুবার) মিডিয়াকে ব্রিফ করা, ফ্যাক্টশিট লেখা ইত্যাদির ওপর সভা-সমিতিতে যোগ দেওয়া আর আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। প্রায় তিন সপ্তাহ অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী আমাদের আন্দোলনের ফ্রন্ট লিডার হতে রাজি হলেন, তবে এ শর্তে যে মিডিয়া-সম্পর্কের দায়িত্ব আমাকেই বহন করে যেতে হবে।

সত্তরের নবেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ উপকূল অঞ্চলের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় পাঁচ লাখ লোক মারা গিয়েছিল। ত্রাণ সাহায্যের জন্যে চাঁদা তুলতে যুক্তরাজ্যের বহু শহর নগরে পূর্ব পাকিস্তানীরা বাংলাদেশ সমিতি গঠন করেছিলেন। পঁচিশে মার্চের পরে এই সমিতিগুলো আবার সক্রিয় হয়ে উঠলো।

তারা বিচ্ছিন্নভাবে নিজ নিজ শহরে মিছিল সভা ইত্যাদি করে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে জনমত সংগ্রহের কাজ শুরু করে দেয়। আবু সাইদ চৌধুরী এসব সমিতির মধ্যে লিয়াজোঁ স্থাপন করেন। লন্ডন বার্মিংহ্যাম প্রতি বড়ো শহরে তারা কয়েকটি বড়ো সমাবেশ ও মিছিল করেছে। এদিকে চৌধুরী সাহেব একাধিক টেলিভিশন সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, পার্লামেন্ট সদস্য হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার প্রমুখ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি ও কার্যকারণ বিশ্লেষণ করেছেন। আমার প্রেস ব্রিফিংয়েও দু'তিনবার এসেছিলেন তিনি।

হতাশ হবার কারণ ঘটেনি

এসবের ফলে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে উঠেছিল। স্বাধীনতার পরে অনেকেই আমাকে বলেছিলেন বিশ্বব্যাপী প্রবল জনমত গড়ে ওঠায় আমাদের স্বাধীনতা লাভ অন্তত দু'বছর এগিয়ে এসেছিল। একই সঙ্গে আমরা ভারতে নির্বাসিত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের জন্যে কূটনৈতিক স্বীকৃতি সংগ্রহেরও প্রবল প্রচেষ্টা করেছি। এখানে সাফল্য ছিল সীমিত। বৃটেনসহ প্রায় সকল দেশ আমাদের বলেছে মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতার একটা কনসেপ্ট (ধারণা) মাত্র। কনসেপ্টকে সমর্থন দেওয়া যায় কিন্তু স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। যে দেশের মাটিতে কর্তৃত্ব যে শক্তি বা সংগঠনের হাতে, স্বাভাবিক কূটনৈতিক রীতি অনুযায়ী স্বীকৃতি তাদেরই দিতে হবে।

একের পর এক দেশের সরকার প্রধান বিগত কিছুদিনে শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন, তাঁর প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার দিচ্ছেন। অথচ এই সরকারগুলো আওয়ামী লীগের একদলীয় 'সেমসাইড' নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠাতে অস্বীকার করেছে, আজো অবধি বলে যাচ্ছে যে নির্বাচন বিশ্বাসযোগ্য কিম্বা গ্রহণযোগ্য হয়নি এবং মে-জুনের মধ্যেই সকলের অংশগ্রহণে আরেকটি স্বচ্ছ নির্বাচনের দাবি জানিয়ে আসছে। ইউরোপীয় পার্লামেন্ট এবং যুক্তরাজ্য পার্লামেন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে যথাসত্বর সকলের গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করার তাগিদ দিয়েছে। এই আপাত বিরোধিতার কারণটা একটু আগেই বুঝিয়ে বলা হলো। সুতরাং বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামীদের হতাশ হবার বিশেষ কারণ ঘটেনি।

এদিকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি বর্তমানে প্রায় ১৯৭১ সালের মতোই। কেউ কোথাও সরকারের নাৎসি-সুলভ কাজকর্মের সমালোচনা করলেই সরকারের দলীয়কৃত পুলিশ, র‍্যাব কিম্বা সশস্ত্র ক্যাডার তাঁদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাঁরা শহীদ রুমি এবং নিজামুদ্দিন আহমেদের মতোই নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছেন। প্রায়ই সকাল বেলা তাঁদের কারো কারো লাশ এখানে সেখানে পড়ে থাকতে দেখা যায়। বিএনপি এবং জামায়াত সহ ১৮ দলীয় নেতাদের অধিকাংশ এখন জেলে

এবং রিম্যান্ডে দলিত-মথিত হচ্ছেন। দু'চারজন যাঁরা বাইরে আছেন তাঁরা প্রাণভয়ে কোনমতে আত্মগোপন করে আছেন।

এমন মিডিয়া ভীতির কারণ কি?

দেশের মানুষ গণতন্ত্র চায়, তারা এই অত্যাচারী বাকশালী স্বৈরতন্ত্র থেকে নাজাত চায়, নিষ্কৃতি চায়। মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনা নতুন নির্বাচন দাবি করে যাচ্ছেন। সে কারণে জেনারেল সফিউল্লাহ্ দাবি করছেন তাঁকে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে। জেনারেল সফিউল্লাহকে চিনতে পেরেছেন আপনারা? ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তিনি ছিলেন বাংলাদেশের সেনাপ্রধান। তিনি তাঁর বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি। সে কালরাত্রিতে প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান টেলিফোন করে তাঁর কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। সফিউল্লাহ্ অপারগতা প্রকাশ করে তাঁকে পেছনের দরোজা দিয়ে পালিয়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এখন একটা পেশিশক্তি-নির্ভর সরকার গদি দখল করে আছে বলে সফিউল্লাহরা বীরদর্পে গলাবাজি করছেন।

একাত্তরের মতোই দেশের ভেতরের খবরও আর বাংলাদেশের মানুষকে জানতে দেওয়া হচ্ছে না। সরকারের জনতা-ভীতি এমনই সাংঘাতিক। টকশো নিয়ে শেখ হাসিনা নাখোশ হয়েছিলেন। অতএব চ্যানেল ওয়ান টেলিভিশন বন্ধ করে দেওয়া হলো। শাহবাগ মোড়ের মাস্তানদের কয়েকজন আল্লাহ্-রাসূল (দ) আর ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে ব্লগ প্রচার করছিল। সে খবর ফাঁস করে দেবার কারণে মাহমুদুর রহমানকে তাঁর অপিস থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। আজো অবধি তিনি বিনা বিচারে কারাবন্দী আছেন এবং মাঝে মাঝে তাঁকে রিম্যান্ডে নিয়ে নির্যাতন করা হচ্ছে। তথাকথিত আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারপতির স্কাইপ কেলেঙ্কারীর খবর ফাঁস করে দেবার কারণে আমার দেশ পত্রিকার ছাপাখানায় তালা লাগিয়ে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। লক্ষণীয় যে আমার দেশে প্রকাশিত খবরগুলো মিথ্যা ছিল বলে সরকারও দাবি করতে পারেনি। সেসব খবর প্রকাশ হওয়ায় সরকার বিব্রত হয়েছিল, বেকায়দায় পড়েছিল। আমার দেশের প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয় সে কারণে।

মে মাসের ৫ তারিখে হেফাজতে ইসলাম শাপলা চত্বরে সমাবেশ ডেকেছিল। বহু লক্ষ লোক সমবেত হয়েছিল সেখানে। সরকারের পোষ্য মিডিয়াগুলো চোখের মাথা খেয়ে বসেছিল। এই জনসমুদ্রকে তারা খবর বলে বিবেচনা করেনি। ইসলামী টেলিভিশন আর দিগন্ত টেলিভিশন সে সমাবেশকে সংবাদ বলে বিবেচনা করেছিল, সমাবেশের চিত্র প্রদর্শন করছিল তারা। সম্প্রচারের মাঝপথেই এ দুটি টেলিভিশন বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখন আবার ইনকিলাব পত্রিকার ছাপাখানায় তালা লাগানো হয়েছে। বার্তা সম্পাদকসহ

তিনজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। সকলেই জানে, যে খবর প্রকাশের দায়ে এ পত্রিকাটিকেও হত্যা করা হলো সে খবরও মিথ্যা ছিল না। আমি উনিশশো ত্রিশের দশকের জার্মানী কিম্বা একাত্তরের বাংলাদেশের কথা বলছি না। আমি বলছি একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের হাসিনা-শাসিত বাংলাদেশের কথা।

ভারতীয় কূটনৈতিক অপপ্রচার

কি করবে এখন বিএনপি? গোড়ায় কূটনৈতিক সমর্থনের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা দেখিয়ে এবং জিরিয়ে জিরিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে বিএনপি ভুল করেছিল। এখন বিদেশীদের ওপর সে নির্ভরশীলতা পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে আন্দোলনে ভাটা দিলে কূটনীতিকদের গরজও কমে যাবে। অর্থাৎ একদিকে কূটনীতিকদের সুযোগ দিতে হবে। একই সঙ্গে আন্দোলনও চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সরকারের নাৎসিসুলভ বুলডোজার নীতির কারণে আন্দোলনের কৌশলে পরিবর্তন আনতে হবে।

বিদেশী সরকার প্রধানরা শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁরা ইঙ্গিতে-ইশারায় জানিয়ে দিচ্ছেন বর্তমান গোঁয়ার্তুমির পথ আঁকড়ে থাকলে বিদেশী ঋণ ও সাহায্য হ্রাস পেতে থাকবে। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলে দিচ্ছে বাংলাদেশের পোশাক ও অন্যান্য পণ্য রফতানীতে জিএসপি বিশেষ সুবিধা তারা হয়তো আর দেবে না হাসিনার সরকারকে। ওদিকে বিদেশে শ্রমিক রফতানী বিগত তিনচার বছরে অর্ধেক হয়ে গেছে। রেমিটেন্স অনেক পড়ে গেছে, আরো পড়ে যেতে বাধ্য। এসব বিদেশী কূটনীতিক চাপ অব্যাহত থাকলে শেখ হাসিনাকে অবশ্যই নতি স্বীকার করতে হবে। সরকার ও দেশ চালানোর মতো (এবং প্রধানমন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রীদের বিশ্বজোড়া বিলাস ভ্রমণের জন্যে) যথেষ্ট অর্থ সাহায্য তাঁর ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকরা তাঁকে দেবে না।

কিন্তু শেখ হাসিনার অনির্বাচিত স্বৈরাচারী সরকারের ওপর থেকে কূটনৈতিক চাপ হ্রাস করতে ভারতীয় কূটনীতিকরা বিশ্বজোড়া তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা বিদেশীদের বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে জামায়াতে ইসলাম প্রকৃতই একটা সন্ত্রাসী দল, তাদের সহায়তায় বিএনপি শেখ হাসিনার গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষ জানে বিএনপির আন্দোলনে হামলা করে সহিংস ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে সরকারের দলীয়কৃত পুলিশ এবং আওয়ামী লীগের সশস্ত্র ক্যাডাররা। এবং আওয়ামী লীগের গুণ্ডা-পাণ্ডারাই সুপরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা করে বিএনপি-জামায়াতের ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে।

কিন্তু ভারতীয় কূটনীতিকরা বিদেশীদের বোঝাচ্ছেন সম্পূর্ণ উল্টোটা। তাঁরা বিদেশী সরকারগুলোকে বোঝাতে চাইছেন যে বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাস বন্ধ

করতে হলে শেখ হাসিনার কঠোর শাসনকে গদিতে রাখতেই হবে। ভারতের এসব তৎপরতার কিছু ইতোমধ্যেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সে ভরসাতেই সরকারের মন্ত্রীরা আস্ফালন শুরু করে দিয়েছেন। তাঁরা এখন বলছেন যে পুরো পাঁচ বছরই তাঁরা গদিতে থাকবেন। এবং উপজেলা নির্বাচন ইত্যাদি দিয়ে সরকার তাদের ক্ষমতা সংহত করার সর্বাত্মক চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে।

আন্দোলনের পরিবর্তিত লক্ষ্য

এই বিদেশী কূটনৈতিক চাপ অব্যাহত রাখা এবং ভারতীয় কূটনৈতিকদের অপপ্রচার ভণ্ডুল করে দেওয়া বিএনপির আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দিক হওয়া উচিৎ। দেশের মানুষ গণতন্ত্র চায়। বিএনপির আন্দোলনের ভ্রান্ত কৌশলের কারণে কিছুকাল তাদের সমর্থন ফিকে হয়ে এসেছিল। কিন্তু ৫ জানুয়ারির নির্বাচন সফলভাবে বয়কট করে তারা প্রমাণ দিয়েছে যে তাদের অন্তর এবং সমর্থন এখনো খালেদা জিয়ার পক্ষে আছে। বিএনপির যেসব নেতাকে সরকার জেলে পুরে রেখেছে তাঁদের সত্বর মুক্তি দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় না। গ্রেফতারের এবং বিচার-বহির্ভূত হত্যার ভয়ে যাঁরা গা ঢাকা দিয়ে আছেন তাঁদের এখন সাহস সঞ্চয় করে বেরিয়ে আসতে হবে। সরকার যদি তাঁদের গ্রেফতার করে সেটাও আন্দোলনকে বেগবান করে তুলবে। আগেই বলেছি জনগণ আন্দোলনের সঙ্গে আছে। তারা শুধু নিশ্চিত হতে চায় নেতারা তাদের সঙ্গে আছেন, তাঁরা কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করছেন না, ত্যাগ স্বীকার করতে পিছপা হচ্ছেন না।

খালেদা জিয়ার ওপর জনতার বিশ্বাস অটুট আছে। একটানা ১৫ দিন গৃহবন্দী দশায় থেকেও যেভাবে তিনি আন্দোলনকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, যেভাবে সেমসাইড নির্বাচন বর্জন করতে তাদের উদ্দীপনা দিয়েছেন, তাতে তাঁর প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা বেড়ে গেছে। কিন্তু দেশে এবং বিদেশে এতোবড়ো একটা আন্দোলন পরিচালনা করা একক ভাবে খালেদা জিয়ার পক্ষে কঠিন হবে। বিএনপির যে নেতারা বিশ্বাসঘাতক নন তাঁদের অবশ্যই এবং অবিলম্বে শত ঝুঁকি সত্ত্বেও আন্দোলনে নেমে আসতে হবে।

খালেদা জিয়া অজস্রবার বলেছেন তিনি শান্তিপূর্ণ আন্দোল চান। কিন্তু শান্তি রক্ষা সম্পূর্ণরূপে তাঁর কিম্বা তাঁর দলের এখতিয়ারে নেই। দলীয়কৃত পুলিশ এবং আওয়ামী লীগের সশস্ত্র ক্যাডাররা আন্দোলনে বাধা দিচ্ছে, একে-সাতচল্লিশ রাইফেল ও রিভলবার নিয়ে মানুষ খুন করছে। ১৯৭২-৭৩ সালে রক্ষীবাহিনী ৪০,০০০ বিরোধী নেতা-কর্মীকে হত্যা করেছিল। এ পরিস্থিতি এখন আবার দেখা দিয়েছে। দেশের সর্বত্র নিহত বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের লাশ পড়ে থাকছে। আসাদুজ্জামান নূরের নির্বাচনী মিছিলে হামলা হয়েছিল, সে রকম হামলা বাংলাদেশের সর্বত্র হয়ে থাকে। এসব হামলার নজীর সৃষ্টি করেছিল আওয়ামী লীগ ১৯৭৩ সাল থেকে।

কিন্তু নূরের মিছিলে হামলার দায়ে অভিযুক্ত বিএনপির দুজন স্থানীয় নেতার লাশ পর পর দুদিনে গত সোমবার পর্যন্ত পাওয়া গেছে। গোয়েবেলসীয় সরকারের প্রচারযন্ত্রগুলো তার স্বর এসব অপরাধের দায় চাপাচ্ছে আন্দোলনের এবং বিএনপির ওপর। সম্প্রতি তো দফায় দফায় প্রমাণ পাওয়া গেছে সরকারের লোকেরা হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালাচ্ছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারাও বলছেন সে কথা। কিন্তু সরকারের পোষ্য এবং ভারতীয় মিডিয়া বিএনপি এবং জামায়াতের ওপর দোষারোপ করছে। বিএনপিকে এখন এসব মিথ্যা অপপ্রচারের মোকাবেলা করতে হবে, আন্দোলনের চাইতেও অসহযোগের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। দেশবাসীকে বোঝাতে হবে এই সরকারের কোন হুকুম মানা চলবে না, এই সরকারকে কোন কর বিল ইত্যাদি পরিশোধ করা হবে না। গোয়েবেলস হক ইনুরা তখন কি করে দেখা যাক।

তারেকের ভূমিকার প্রয়োজন এখন তীব্র

একই সঙ্গে লন্ডন নিউইয়র্ক মাদ্রিদ প্রভৃতি রাজধানীগুলো থেকে বিএনপির কর্মী ও সমর্থকদের ভারতীয় অপপ্রচার প্রতিরোধের চেষ্টা চালাতে হবে। সুগঠিত ভাবে আন্দোলন করে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সরকারকে প্রকৃত পরিস্থিতি জানান দিতে হবে। সামাজিক মিডিয়ার কল্যাণে দেশের সত্যিকারের খবর চাপা দিয়ে রাখা সরকারের পক্ষে আর সম্ভব নয়। আমরা একাত্তরে যে সমস্যার মোকাবেলা করেছি সে সমস্যা এখন আর নেই। বাংলাদেশ থেকে সঠিক খবর ও তথ্যাদি সংগ্রহ করে সকল দেশের সরকার ও মিডিয়ার হাতে পৌঁছে দিতে হবে।

সৌভাগ্যবশত এখন আর আবু সাইদ চৌধুরী সমতুল্য নেতা ও সংগঠন পাবার জন্যে আমাদের তিন সপ্তাহ ধরে তদ্বির করতে হবে না। বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান কয়েক বছর যাবৎ লন্ডনে আছেন। শুনেছি অনেক কর্মীর আনাগোনাও আছে তার কাছে। আইটিতে (তথ্য প্রযুক্তি) দক্ষ এবং মিডিয়া-বান্ধব উৎসাহী কর্মীদের সাহায্যে তিনি সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করে বিভিন্ন দেশের মিডিয়া ও সরকারের পররাষ্ট্র দফতরে নিয়মিত পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারেন। বিদেশে এখন তারেকের প্রতিষ্ঠা আছে। তিনি মিডিয়ায় সাক্ষাৎকার দিয়ে, সম্পাদকদের সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠক করে, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশের প্রকৃত পরিস্থিতি এবং সমস্যা-সংকটের কথা তাঁদের বুঝিয়ে বলতে পারেন। হাসিনার সরকার এবং তাদের ভারতীয় মুরব্বিদের সমবেত আন্দোলন প্রতিহত করার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার ওপর ছেড়ে দেওয়া হৃদয়হীন কাজ হবে।

(লন্ডন, ২১.০১.১৪)

জীবন সায়াহ্নের কিছু অভিলাষ কিছু ভাবনা

ছেলেবেলায় প্রথমে বেতারের সঙ্গে এবং কিছু পরে সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলাম। এসব সুবাদে বেশ কিছু সংখ্যক কবি-সাহিত্যিক ও সাংবাদিককে কাছে থেকে জানার সুযোগ হয়েছিলো। কবি ফররুখ আহ্‌মেদ ছিলেন তাঁদের একজন। তিনি লিখেছিলেন, "কবিকে যদি হতে হয় কবিরাজ/মহাজন বাক্যবলে বাঁশী হয় বাঁশ/তখন সম্ভব নয় কবিতার কাজ।"

বাংলাদেশে বহু সাহিত্যিক-সাংবাদিকের মনের অবস্থা বর্তমান সময়ে এ রকম হতে বাধ্য। সাংবাদিকতার ওপর ব্রিটিশ আমল থেকে চাপ দেখেছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সেন্সরশিপ দেখেছি। পাকিস্তানে আইয়ুবী সামরিক স্বৈরতন্ত্রের শাস্তির ভয়ে সাংবাদিকরা 'সেলফ-সেন্সরশীপ' অনুসরণের পথ ধরতে বাধ্য হয়েছিলেন। তখনই উপলব্ধি করেছিলাম সেলফ-সেন্সরশিপ প্রকৃত সেন্সরশিপের চাইতে বহুগুণে পীড়াদায়ক। কিন্তু বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে সাংবাদিকদের এবং সাংবাদিকতার যেমন সংকট চলছে তেমনটা আগে আর দেখিনি।

কাতার-ভিত্তিক জনপ্রিয় বিশ্ব টেলিভিশন আল-জাজিরা মাত্র সপ্তাহখানেক আগে বলেছে, বাংলাদেশের সাংবাদিকরা ভীত, সন্ত্রস্ত; সাংবাদিকতা এদেশে বিপজ্জনক পেশা। একই রকম বর্ণনা দিয়েছে সাংবাদিক স্বাধীনতার বিশ্ব পৃষ্ঠপোষক 'রিপোর্টার্স সঁস ফ্রঁটিয়ার'। দেশ-বিদেশের কয়েকটা মানবাধিকার সংস্থাও বাংলাদেশে সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদ করেছে। তাতে লাভ হয়েছে কিছু? হয়নি। কার কথা কে শোনে?

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকেই ভীতি প্রদর্শন শুরু হয়েছে। সাংবাদিকদের ধাওয়া করা, তাঁদের গাড়িতে ইট-পাটকেল ছোঁড়া এবং ধরতে পারলে মারধর এবং পেটানো শাসক দল আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংস্থাগুলোর লোকেদের আমোদ-প্রমোদের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাঁদের পরিবেশিত কোন খবর সংশ্লিষ্ট কারো মনঃপূত না হলে তো কথাই ছিলো না। তারপর এলো সাংবাদিক দম্পতি মেহেরুন রুনি ও তাঁর স্বামীর মর্মান্তিক পরিণতি। এ দু'জন অনুসন্ধানী সাংবাদিক কুইক রেন্টাল বিদ্যুতের নামে রাষ্ট্রের হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি এবং সম্ভবত গোপনে ভিন্ দেশে প্রাকৃতিক

গ্যাস চালান দেওয়া সম্বন্ধে তদন্ত করছিলেন বলে জানা আছে। গভীর রাতে নিজেদের শোবার ঘরে শিশুপুত্রের সামনে অমানুষিক নৃশংসভাবে তাঁদের হত্যা করা হয়। তাঁদের ল্যাপটপ কম্পিউটারের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। এ কম্পিউটারেই তাঁদের তদন্তের তথ্যাদি ছিলো।

সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন জোর গলায় ঘোষণা করেছিলেন দুদিনের মধ্যেই ঘাতকদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে। একই রকম প্রতিশ্রুতি আরো কয়েকবার শোনা গেছে তাঁর এবং তাঁর উত্তরসূরীর মুখে। কিন্তু বাস্তবে তার কিছুই দেখা যায়নি। যাবার কথাও নয়। অনেকেই মনে করেন যারা খুন করেছে বা করিয়েছে তারা সরকারের নিজের লোক। তাছাড়া এখন যাঁরা গদিতে আছেন তাঁদের কোন প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হয়েছে বলে শুনেছেন কখনো?

বিস্তারিত লিখতে হলে পুরো দিন লেগে যাবে। সার কথা হচ্ছে খুব সম্ভবতঃ ২৩ জন সাংবাদিক হত্যার খবর পড়েছি বিগত পাঁচ বছরে। শত শত সাংবাদিক দলীয়কৃত র‍্যাব-পুলিশের এবং শাসক দলের সশস্ত্র ক্যাডারদের হাতে নির্যাতিত ও নিগৃহিত হয়েছেন, আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। সত্য কথা বলতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছেন এবং নিয়মিত নির্যাতিত হচ্ছেন মাহমুদুর রহমান। সত্য কথা বর্তমান শাসকদের সহ্য হয় না। সত্য প্রচার করতে গিয়ে মাহমুদুর রহমানের পত্রিকা আমার দেশ, চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত ও ইসলামী টেলিভিশন এবং সর্বশেষ ইনকিলাব পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কলম ধরতে কিম্বা কম্পিউটারের কীবোর্ডে হাত রাখতে বাংলাদেশের সাংবাদিকরা এখন ভয় পান। সকলে যেন ঘাড়ের ওপর দিয়ে পেছনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন কখন কোন মন্দভাগ্য পেছন থেকে আসছে।

সাংবাদিকতার সেকাল ও একাল

বিবেক বিক্রি করে দিতে যাঁরা রাজি হয়েছেন, যাঁরা সরকারের মিথ্যা প্রোপাগান্ডাকে খবর বলে প্রচার করতে রাজি হয়েছেন এবং অজস্র সহস্র অন্যায়কে করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করতে রাজি আছেন তাঁরা ভালো তো আছেনই, রীতিমতো ফুলে-ফেঁপে উঠেছেন। কিন্তু এঁরা দেশের বাস্তব পরিস্থিতি এবং দেশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক বিবর্জিত। উদ্ভিদ বড়ো হয়, ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ হয় মাটি থেকে রস পায় বলেই। কাগজের ফুল মাটির রস পায়না, ফল দেয় না, নিছকই ঠুন্‌কো সে। তার কখনো নবায়ন হবে না, ধ্বংস তার অনিবার্য। যারা বিবেককে পতিতাবৃত্তির মতো ব্যবহৃত হতে দেয় তাদের নিয়ে নষ্ট করার সময় আমার নেই।

সরকারিভাবে ৮০ বছরের জন্মদিন পালন করেছি গত সপ্তাহান্তে। সঠিক এ তারিখ মতোই যে আমার জন্ম হয়েছে হলফ করে বলতে পারবো না। আমার

প্রয়াত বন্ধু কবি আবু হেনা মোস্তাফা কামালের গানের কথায়, "কবে আমি চোখ মেলেছি স্বপ্নভরা গ্রামে, ছড়িয়ে আবীর মেঘে মেঘে সন্ধ্যা যেথা নামে।" জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে ইত্যাদির নিবন্ধন তখন বাধ্যতামূলক কিম্বা সহজপ্রাপ্য ছিলো না। পাশের গ্রামের পাঠশালার পণ্ডিত মশাই ভর্তির খাতায় যে তারিখটা লিখে রেখেছিলেন সেটা আজো অবধি বয়ে বয়ে বেড়াচ্ছি। তবে সঠিক জানি জীবিকার জন্যে সাংবাদিকতা করছি ৬৪ বছর ধরে। এর প্রায় পুরো সময়টা ধরে বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডটা এবং এখানের জনগোষ্ঠির কল্যাণ প্রচেষ্টা করে এসেছি। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে আমিও প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করেছি। ত্যাগ স্বীকার করেছেন আমার সহধর্মিণী। অনিবার্যভাবেই বর্তমানে প্রয়াত আমাদের পুত্র-কন্যাও ত্যাগ স্বীকার করেছে। কিন্তু যে স্বাধীনতার জন্যে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম সেটাকে দেখতে পাচ্ছি কই?

গত সপ্তাহে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন দেখেছিলাম। তাতে বলা হয়েছে গত মাসে (জানুয়ারি) বাংলাদেশে ৫৬৮টি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন খুন হয়েছেন ১৮ জন। এ মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহত হয়েছেন ২৯ জন, র‌্যাব-পুলিশের হাতে বিচার বহির্ভূতভাবে খুন হয়েছেন ৩৯ জন, আর একাত্তরের রাজাকার-আলবদরদের টেকনিকে গুম-খুন হয়েছেন ৬৫ জন, আট নারীর ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে এ মাসে। মুক্তিযুদ্ধে আমাদের শিল্পীরা গান গেয়েছেন 'একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি'। মুক্তিযোদ্ধারা এবং দেশের মানুষ অনুপ্রাণিত, উদ্দীপিত হয়েছেন। তাঁরা কি জানতেন যুদ্ধ করে তাঁরা যে দেশটাকে স্বাধীন করলেন সেখানে মানুষের প্রাণের দাম কানাকড়িও হবে না?

জানবেন কি করে? এখন যাঁরা মুক্তিযোদ্ধা বলে সনদ নিচ্ছেন, চাকরি কিম্বা মাসে পাঁচ হাজার টাকার ভাতা পাচ্ছেন এবং ছড়ি ঘোরাচ্ছেন তাঁদের অনেকেরই তখন জন্মই হয়নি। আসলে স্বাধীনতাটা হাতবদল হয়ে গেছে। পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর বর্বরতা আসছে জেনে শেখ মুজিব আপসে ধরা দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর আশা ছিলো আওয়ামী লীগের 'হটহেডদের' পিটিয়ে দিয়ে ইয়াহিয়া খান তাঁকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করবেন। হটহেড এবং আওয়ামী লীগের নেতারা রাতের আঁধারে সীমান্ত পেরিয়ে কলকাতায় চলে গেলেন। কলকাতার হোটেলগুলোতে তাঁদের অবস্থান, এমনকি যাবতীয় আমোদ-প্রমোদের ব্যয়ও বহন করেছে ভারত সরকার। তাঁরাই এখন অপবাদ দেন– বিএনপি মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিলো, তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী নয়। অথচ আমরা জানি সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। জিয়াউর রহমান ছিলেন স্বাধীনতার ঘোষক, তিনি পালিয়ে বিদেশে চলে যাননি, তাঁর নেতৃত্বের জেড ফোর্স অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করেছিলো। আমরা আরো জানি বিএনপির প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো মুক্তিযুদ্ধের সাত বছর পরে।

রক্ষক যেখানে ভক্ষক

পুলিশ-র‍্যাব প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার, নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তার অতন্দ্র প্রহরী বিবেচনা করা হয়। কিন্তু সেটা নীতির ও আদর্শের কথা, বাস্তবের কথা নয়। আজকের বাংলাদেশে র‍্যাব-পুলিশকে কেউ জানমালের হেফাজতকারী বলবেন? বরং উল্টোটাই সত্যি। পুলিশ দেখলে, এমনকি পুলিশের কথা শুনলেও নাগরিকরা আতঙ্কিত বোধ করেন। মিথ্যা মামলায় কেউ ফেঁসে গেলে তো কথাই নেই। এখন আবার পুলিশ বলতে গেলে নিয়মিত গ্রেফতার বাণিজ্য করছে। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, আপনাকে গ্রেফতার করা হবে– এ জাতীয় মিথ্যা হুমকি দিয়ে পুলিশ মোটা অঙ্কের ঘুষ দাবি করবে। সে ঘুষ যদি আপনি না দেন তাহলে অযথা আপনাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন ছাড়া পেতে ঘুষের অঙ্ক অনেক বেড়ে যাবে। ঘুষ দিতে বিলম্ব হলে সম্ভবত আপনার লাশ পাওয়া যাবে খোলা মাঠে কিম্বা বনে-বাঁদাড়ে।

বিগত পাঁচ বছরে পুলিশের সখ্যা অন্তত দুই কিম্বা তিনগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এদের অনেকেই দেশের একটা বিশেষ জেলার লোক। অথবা তারা আওয়ামী লীগের কর্মী বাহিনী কিম্বা ক্যাডারের সদস্য ছিলো। পাঁচ বছর ধরে তারা সরকারের হুকুমে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রুজু করেছে, তাঁদের গ্রেফতার করে এবং রিম্যান্ডে নিয়ে নির্যাতন করছে। এমনকি গুম-খুনও করছে। সরকার তাদের দিয়ে ঘোরতর অন্যায় করাচ্ছে। সরকারের শত অন্যায় এবং দুর্নীতির প্রত্যক্ষ এবং নীরব সাক্ষী তারা। যখন বিবেকই বিক্রি করে দিয়েছে তখন দুর্নীতি করে কিছু সম্পদ গড়ে তুলতে ক্ষতি কি? এই হচ্ছে বহু পুলিশের মনের কথা। এসব কারণেই বর্তমান বাংলাদেশে চোর, ডাকাত, ধর্ষণকারী কিম্বা খুনির বিচার হয় না, বিচারে চড়ানো হয় বেছে বেছে সরকারের বিরোধী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের। এ বাহিনীগুলোকে 'নিরাপত্তারক্ষী' বলতে আমার জিহ্বায় আটকায়।

বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে

কেউ দাঙ্গাবাজি করছে, দিবালোকে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে বিরোধীদের খুঁজে বেড়াচ্ছে, গুলি করছে– এমন ঘটনা ঘটলে পুলিশ তাদের পাকড়াও করবে, শাস্তি দেবে, এটাই হচ্ছে মানুষের প্রত্যাশা। বাংলাদেশে কিন্তু উল্টো কাণ্ড। পুলিশ তাদের প্রশ্রয় দেয়, রক্ষা করে, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষের ওপর হামলা করে। ছাত্রলীগ যুবলীগকে সরকার বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের মাথা ফাটানোর কিম্বা তাঁদের হত্যা করার কাজে ব্যবহার করছে। সরকারের পক্ষের লোকেরাও এখন বলছে– এই সংগঠন দুটো সরকারের সামালের বাইরে চলে গেছে। শেখ হাসিনার সরকার বোতল থেকে যে দানব ছেড়ে দিয়েছিলো সে দানব এখন বোতলে ঢুকে যেতে অস্বীকার করছে, গোটা দেশটাকেই সে গিলে খাবার উদ্যোগ করছে।

প্রতিকার কে করবে? সরকার ও প্রশাসনের ওপর ভরসা বাংলাদেশের মানুষ অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছে। শেষ ভরসা বিচার বিভাগ এবং আদালতের ওপর থাকার কথা। বাংলাদেশের বিচার বিভাগকে দেশে এবং বিদেশে এখন আর কেউ ন্যায়পরায়ণ কিম্বা নিরপেক্ষ মনে করে না। আওয়ামী লীগের কর্মী ও সমর্থকরা এখন বিচারক ও বিচারপতি। তাঁরা সরকারের ইচ্ছা পূরণের লক্ষ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। এমনকি কাকে জামিন দেওয়া হবে কি হবে না, কাকে কি দণ্ড দেওয়া হবে, এসব মামুলি রায়েও তাঁরা সব সময় নির্ভর করেন সরকারের ইচ্ছার ওপর। দেশের বর্তমান সংকটের উৎপত্তি একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির একটি বিতর্কিত রায়ের কারণে। সে রায়ে উক্ত বিচারপতি সরকারের অভিপ্রায় অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতিকে অবৈধ ঘোষণা করেছিলেন। সে বিচারপতি পরে সরকারের কাছ থেকে ১০ লাখ টাকা দক্ষিণা পেয়েছেন। অন্যদিকে একটা সাজানো দুর্নীতির মামলায় যে বিচারক তারেক রহমানকে নির্দোষ বলে রায় দিয়েছেন তাঁকে প্রাণের ভয়ে সপরিবারে বিদেশে পালিয়ে যেতে হয়েছে। তাঁর গাড়ির ড্রাইভার, এমনকি চাকর-বাকরদেরও গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ভবিষ্যতের জন্যে প্রতিকূল প্রভাব

আমাদের প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ করেছিলো মূলত ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে। দেশের মানুষ শান্তিতে বাস করবে, পুত্র-কন্যা এবং নাতি-নাতনিদের ভবিষ্যৎ আমাদের চাইতে ভালো হবে, তারা বড়ো হবার সুযোগ পাবে, ইত্যাদি ছিলো আমাদের প্রধান অনুপ্রেরণা। আজকের বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে সেকথা কি কারো মনে হবে? ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করবে না, মাস্তানী করে পরীক্ষা পাসের শর্টকাট তারা শিখে গেছে। তাছাড়া লেখাপড়া করেই বা কি হবে? পরীক্ষার ফী, পকেট খরচ এসব দিতে মা-বাবা হিমশিম খেয়ে যেতেন এককালে। এখন ছাত্রছাত্রীদের অনেকেরই অঢেল টাকা পয়সা। রাজনৈতিক দলের ও নেতাদের হয়ে মাস্তানী করার জন্যে তারা ভাড়া খাটে। টেন্ডার বাণিজ্য করে বিস্তর অর্থ তারা কামাই করে। নারী ধর্ষণ তাদের জন্যে অপরাধ বলে বিবেচিত হয় না রাষ্ট্রের পুলিশ ও বিচারকদের কাছে। এই যেখানে উপভোগ্য জীবনের চাবিকাঠি সেখানে খাটাখাটুনি করে আর রাত জেগে স্বাস্থ্য নষ্ট করে পড়াশুনা করতে কে যাবে?

আমাদের কালে বিনয়ী হওয়া, শালীন ও মার্জিত ভাষায় কথা বলা বাধ্যতামূলক ছিলো। একচুল নড়চড় হলে চড়-চাপড় অনিবার্য ছিলো। আমাদের শৈশবে মা ঘরে ঢুকলে বাবা উঠে দাঁড়াতেন, সন্তানদের সভ্যতা শেখাতে, তাদের জন্যে আদর্শ সৃষ্টি করতে। আজকাল আর শিক্ষা এবং আদর্শ বাবা-মায়ের ওপরই নির্ভর করছে না। বহু বাড়ীতেই এখন টেলিভিশন আছে। ইচ্ছা থাকলেও টেলিভিশন দেখা থেকে সন্তানদের নিবৃত্ত করা যাবে না। তারা শোনে দেশের

যাঁরা মন্ত্রী ও নেতা-নেত্রী তাঁরা অনর্গল অশ্লীল ভাষায় বিরোধীদের বিরুদ্ধে খিস্তি-খেউড় করছে। মন্ত্রীরা হয়তো মনে করেন কটু-কাটব্য করে তাঁরা প্রমাণ দিচ্ছেন যে বাংলাদেশে এখন বাক-স্বাধীনতা আছে। ইন্টারনেট প্রযুক্তিও অনেকের সহজ প্রাপ্য। সেখানে ছেলেমেয়েরা পর্নোগ্রাফী দেখছে, আল্লাহ্-রাসূল (দঃ) আর ইসলামের বিরুদ্ধে খিস্তি-খেউড় শুনছে। ভবিষ্যতে এরা বড়ো হবে, রাজনীতি করা এবং দেশ শাসন করার দায়িত্ব এদের ওপরই বর্তাবে। সেই অনাগত দিনের বাংলাদেশে বেঁচে থাকতে আপনার মন চাইবে?

সমাধানের যাঁরা অগ্রনায়ক

সমাধান কোথায়? সাহিত্যিক-সাংবাদিকরা সমাধানের প্রধান অগ্রনায়ক হতে পারতেন। সমবেতভাবে তাঁরা লিখে যেতে পারতেন বর্তমান পরিস্থিতি ও প্রবণতার ভয়াবহতার কথা। বিকল্প পথের আকর্ষণীয় দিকগুলো তাঁরা তুলে ধরতে পারতেন। বিবেককে যাঁরা বেচে দিয়েছেন তাঁদের কাছ থেকে সেটা আশা করা অরণ্যে রোদনের শামিল হবে। এখনো যাঁরা বিবেক আঁকড়ে আছেন ভয়ভীতিতে তাঁদের কলম অবশ হয়ে গেছে। নিজেদের পিঠ এবং প্রাণ বাঁচানো তাঁদের একটা বড়ো চিন্তা।

কর্মজীবনের ৩৪টি বছর কাটিয়েছি বিবিসিতে। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির সেবা করার অপূর্ব সুযোগ ছিলো। অবসর নিয়েছি ২০ বছর হলো। সেসব সুযোগ আর নেই। তবু মিডিয়ার কল্যাণে যোগযোগ রাখার চেষ্টা করি। বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ এখনো জনপ্রিয় জেনে আনন্দ হয়। কিন্তু যখন দেখি জীবনের কবিকে মঞ্চের ওপর স্থাপন করে তাঁর পূজা করা হচ্ছে তখন হৃদয়টা সত্যি বিষণ্ন হয়। ভাবছি রবিঠাকুরের কবিতাও এখনো পড়া হয় কিনা, তার মর্মার্থ কেউ অনুধাবনের চেষ্টা করে কিনা। বহু বহু বছর আগে কলকাতার স্কুলে পড়া তাঁর একটি কবিতা আজো প্রায়ই মনে পড়ে। সে কবিতায় কবি তাঁর স্বদেশের কাঙ্ক্ষিত স্বরূপ কল্পনা করে বিধাতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। কেউ কেউ পড়বেন আশা করে কবিতাটি হুবহু নিচে উদ্ধৃত করছি:

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির, /জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর/আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বরী/বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,/যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে/উচ্ছুসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে/ দেশে দেশে দিশি দিশি কর্মধারা ধায়/অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,/যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি/বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি-/ পৌরুষেরে করে নি শতধা, নিত্য যেথা/তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,/নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিত,/ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।"

(লন্ডন, ০৪.০২.২০১৪)

যে হাত খেতে দেয় সে হাত কামড়াতে নেই

আওয়ামী লীগের মন্ত্রীদের নিয়ে শত দুঃখেও মাঝে মাঝে হাসতে ইচ্ছে করে। তারা মনে করেন বাকি বিশ্বের মাথা তাদের কাছে বন্ধক আছে। তারা কারো কথা শুনবেন না, কিন্তু তাদের কথা মেনে চলতে অন্যেরা বাধ্য থাকবে। তার একচুল এদিক ওদিক হলে মন্ত্রীদের মুখ দিয়ে যেসব 'অমৃত বাণী' অঝোরে ঝরতে থাকে হাসিটার উদ্রেক হয় সেখান থেকেই। আওয়ামী লীগের ক্ষুদে হিটলাররা এতোদিন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে হুঙ্কার বর্ষণ করছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে, বিশেষ করে ৫ জানুয়ারির ফাঁকা মাঠের নির্বাচনের পর রাষ্ট্রীয় ঘাতকদের লেলিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। গত রোববার (১৬ ফেব্রুয়ারি) অনির্বাচিত সংসদে শেখ ফজলুল করিম সেলিম ঢালাওভাবে কূটনীতিকদের বিরুদ্ধে যেসব হুঙ্কার ছেড়েছেন সেগুলো অবিকল গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকের শেষাংশে হিটলারের উন্মাদ হুঙ্কারের মতো শুনিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এরপর কি রাজনৈতিক বৈরীদের মতো কূটনৈতিক সমালোচকদের বিরুদ্ধেও রাষ্ট্রীয় ঘাতকদের লেলিয়ে দেয়া হবে?

সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে, তৈরি পোশাকসহ বাংলাদেশী পণ্য বিনা শুল্কে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রফতানির সুযোগ বরাবরের মতো হাতছাড়া হতে যাচ্ছে। মন্ত্রীরা আবার উল্টো-পাল্টা কথাবার্তা বলতে শুরু করেছেন। বর্তমান অত্যন্ত বিতর্কিত এবং সম্ভবত অবৈধ সরকারের মন্ত্রীদের মধ্যে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ সম্ভবত সবচাইতে অভিজ্ঞ। শেখ হাসিনার ১৯৯৬-২০০১ সরকারেও তিনি বাণিজ্যমন্ত্রী ছিলেন। তিনি বলেছেন, ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ধর্তব্যে আনলে বাংলাদেশ সম্ভবত জিএসপি সুযোগ পাবে না। খাদ্যমন্ত্রী আমির হোসেন আমু পরোক্ষে হলেও এজন্য বিএনপিকে দায়ী করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, বিএনপি মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে শুধু দেশেই নয় বিদেশী বন্ধুদের মাঝেও বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন নিজেকে সর্বজ্ঞানী মনে করেন। তার ধারণায় অন্য সকলকে 'লেকচার' দেয়ার একটা বিধিবদ্ধ অধিকার তার আছে।

মি. মেনন জিএসপি সুবিধা প্রসঙ্গে গোড়াতেই এক হাত নিয়েছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনাকে। মেনন বলেছেন, "বাংলাদেশে নিযুক্ত সে দেশের

রাষ্ট্রদূত যিনি রয়েছেন, তিনি তো এ দেশের সবচেয়ে বড়ো রাজনীতিবিদ।" এর পরেই যে কথাগুলো মেনন বলেছেন তাতে তার বিদ্যার বহর এবং লেকচার দেয়ার অধিকার প্রশ্নবিদ্ধ হয়। তিনি বলেছেন, "জিএসপি বাতিলে বাণিজ্যিক যুক্তির চেয়ে রাজনৈতিক যুক্তি অনেক বেশি। এরপরও আমরা তাদের দেয়া অনেক শর্ত পূরণ করেছি। কিন্তু তাদের সেই শর্তের সঙ্গে যখন বাংলাদেশের নির্বাচন ও ড. ইউনূসের ইস্যু আসে, তখন সেটা আর বাণিজ্যিক শর্ত থাকেনা।" আরো বেশি হাস্যকর কথা বলেছেন রাশেদ খান মেনন। তিনি বলেছেন, "আমেরিকার শর্ত মেনেই যদি চলতে হয় তাহলে আমাদের স্বাধীনতা কেন?"

মন্ত্রীত্রয়ের যুক্তির প্রথম ও প্রধান দুর্বলতা এখানে যে শুল্কমুক্ত পণ্য রফতানি (জিএসপি) একটা সুবিধা মাত্র– অধিকার নয়। সুবিধা অর্জন করতে হয় অন্য পক্ষের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে, তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে কিংবা তার মাথায় মুগুর মেরে সুবিধা আদায় করা যাবে না। ড. মুহম্মদ ইউনূস নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, কিন্তু প্রচুর তদ্বির করেও শেখ হাসিনা সে পুরস্কারের জন্য যোগ্য বিবেচিত হননি। নিজের গাত্রদাহ মেটাতে গিয়ে হাসিনা ইউনূসের ওপর প্রতিহিংসার কামান দেগে চলেছেন, যে গ্রামীণ ব্যাংকের কারণে ইউনূস নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং যে মডেল এখন অনেক দেশেই চালু করা হয়েছে সে ব্যাংকটিকেও ধ্বংস করার সকল আয়োজন তিনি প্রায় সমাপ্ত করে এনেছেন।

মার্কিন সরকার গোড়া থেকেই এই প্রতিহিংসার পথ থেকে শেখ হাসিনাকে নিবৃত্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন ব্যক্তিগতভাবে হাসিনাকে অনুরোধ করেছেন। সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিন্টন (যিনি খুব সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন বলে মনে করা হয়) দফায় দফায় টেলিফোন করেছেন শেখ হাসিনাকে, সশরীরে ঢাকা পর্যন্ত উড়ে এসেছিলেন শেখ হাসিনার জিঘাংসা প্রশমিত করার আশায়। কিন্তু শেখ হাসিনা কারো কথা শোনেননি। খুব সম্ভবত তিনিও রাশেদ খান মেননের মতো স্বাধীনতা সমন্ধে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা পোষণ করেন। বর্তমান শাসকদের নিয়ে একটা সমস্যা এই যে, স্বাধীনতার সংজ্ঞা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমন্ধে সামান্যতম ধারণাও তাদের নেই। স্বাধীনতার অর্থ গোঁয়ার্তুমি কিংবা বন্ধুদেরও পরামর্শ শুনতে অস্বীকার করা নয়। গোঁয়ার্তুমি আর বেয়াদবি যদি স্বাধীনতার সংজ্ঞা হয় তাহলে অনেকেই সে স্বাধীনতা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে চাইবেন।

আধুনিক বিশ্বে বাণিজ্যকে রাজনীতি থেকে পৃথক করে দেখার চেষ্টা অবশ্যই হাস্যকর। আলোচ্য মন্ত্রীত্রয়ের জীবদ্দশাতেই যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গোটা পশ্চিমী বিশ্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অর্ধ শতক ধরে বাণিজ্যিক অবরোধ চালিয়ে এসেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন নির্যাতক কমিউনিস্ট পদ্ধতি পরিত্যাগ করে গণতন্ত্রকে আলিঙ্গন করার পরই শুধু সে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

পারমাণবিক গবেষণার বিষয়ে ইরান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি কর্তৃপক্ষের দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করায় সে দেশের বিরুদ্ধে পশ্চিমা দেশগুলো অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। তাতে ইরানের অর্থনীতি গভীর সংকটে পড়েছিলো। সাম্প্রতিককালে ইরান প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, সে পারমাণবিক বোমা তৈরি করবে না এবং পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রগুলো সে আন্তর্জাতিক তদন্তের জন্যে খুলে দিয়েছে। তারপরে তার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ সামান্য পরিমাণে শিথিল করা হয়েছে। অবশিষ্ট বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক বিধিনিষেধ প্রত্যাহার সমন্ধে গত মঙ্গলবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) ছয়টি বিশ্ব শক্তির সঙ্গে ইরানের আলোচনা শুরু হয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নও জিএসপি বাতিল করতে চায়

জিএসপি সুবিধা বাতিলের হুমকি যে শুধু যুক্তরাষ্ট্রই দিচ্ছে তা নয়। বাংলাদেশে তৈরি পোশাকের অন্য বৃহত্তম বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়নও হুমকি দিয়েছে যে বর্তমান বাংলাদেশ সরকার যদি মানবাধিকার ও গণতন্ত্রকে সমুন্নত করার পথ না ধরে, যদি বিচার বহির্ভূত হত্যা বন্ধ না হয়, যদি খুবই দ্রুত সংলাপের ভিত্তিতে নিরপেক্ষ নির্বাচনের পন্থা উদ্ভাবন করে গ্রহণযোগ্য একটা সংসদ নির্বাচন না হয় আহলে তারাও অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে বাংলাদেশী রফতানির ওপর জিএসপি সুবিধা প্রত্যাহার করবে। ইউরোপীয় পার্লামেন্ট আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাস করে তাদের চিন্তা-ভাবনার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে। এসবের ফলাফল কি হতে পারে সে আলামত ইতোমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। বিগত কয়েকদিনে মিডিয়াতেই দেখেছি তৈরি পোশাক রফতানির যেসব অর্ডার বাংলাদেশের পাবার কথা ছিলো সেসব অর্ডার চলে যাচ্ছে ভারতে, ভিয়েতনামে এবং কম্বোডিয়ায়। মিডিয়ায় আরো দেখেছি ভারতে পোশাক তৈরির কারখানা নির্মাণের হিড়িক পড়ে গেছে। অন্তত ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ধরেই নিয়েছেন বাংলাদেশে বর্তমানে যারা গদিতে আছেন তারা গোঁয়ার্তুমি ছেড়ে সুস্থ বুদ্ধির পথে ফিরে আসবেন না। সুতরাং জিএসপি সুবিধা বাংলাদেশের হাতছাড়া হয়েই যাবে।

বিগত পাঁচ বছর ধরে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প ধ্বংস করার সুপরিকল্পিত কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের ছেলেরা জীবিকার খোঁজে পৃথিবীর ৬৮টি দেশে এখন ছড়িয়ে পড়েছে। অজস্র ঝুঁকি মাথায় নিয়ে তারা বিদেশে যাচ্ছে, কেননা দেশে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। মাত্র গত সপ্তায় মিডিয়ায় দেখেছি গত ছয় বছরে ১৪ হাজার প্রবাসী বাংলাদেশী শ্রমিক লাশ হয়ে ফিরেছে বিদেশ থেকে। অবৈধ ভাবে বিদেশের পথে এবং আরো নানা ভাবে অঘোরে তারা প্রাণ হারাচ্ছে। অথচ বাংলাদেশের কলকারখানায় এবং বাণিজ্যিক কম্পানিগুলোতে কি দেখছি আমরা?

হাজারে হাজারে ভারতীয় নাগরিক বৈধ এবং অবৈধভাবে এসব প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে। বিশেষ করে পোশাক শিল্পে বিগত পাঁচ বছরে এদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। এবং এই সময়ে বাংলাদেশের পোশাক কারখানাগুলোতে দুর্ঘটনার সংখ্যা কলেরা মহামারীর মতো বেড়ে চলেছে। এই পাঁচ বছরের দুর্ঘটনায় কয়েক হাজার বাংলাদেশী শ্রমিক মারা গেছে। বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় এসব ভারতীয় শুধু যে বাংলাদেশীদের চাকরিগুলো দখল করে নিচ্ছে তা নয়, ভেতরে ভেতরে সাবোটাজও চালাচ্ছে তারা। তারা জানে ও বিশ্বাস করে তৈরি পোশাকের বিশ্ব বাজার বাংলাদেশের হাতছাড়া হয়ে গেলে সে বাজার যাবে ভারতের হাতে।

খাদ্যমন্ত্রী আমির হোসেন আমু গত সপ্তাহে বাংলাদেশের মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কতোজন ভারতীয় মারা গেছেন। নিশ্চয়ই তিনি চান যে বাংলাদশের মানুষ চিরতরে ভারতের কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকুক, করজোড়ে হাঁটু গেড়ে বসে বলুক, "মহাশয়, পদাঘাতে দিয়েছো খৃস্টের সম্মান"। মুক্তিযুদ্ধে ভারত আমাদের সাহায্য দিয়েছে, সে কথা আমরা অস্বীকার করিনি। কৃতজ্ঞতা জানাতেও আমরা কার্পণ্য করিনি। বাংলাদেশের চাইতেও বেশি উপকৃত হয়েছেন আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব। আমির হোসেন আমু এবং তোফায়েল আহমেদসহ আওয়ামী লীগের গোটা নেতৃত্ব বাংলাদেশের অসহায় মানুষকে নেতৃত্বহীন করে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর তোপের মুখে ফেলে রেখে ভারতে চলে গিয়েছিলেন।

পুরো নয় মাস কলকাতার হোটেলগুলোতে তাদের পুষেছে ভারত সরকার। শুনেছি কোন কোন নেতার অতিথি কলগার্লদের বিলও পরিশোধ করেছে ভারত সরকার। বিশেষ করে তোফায়েল আহমেদ এবং আমু প্রমুখ কয়েকজনকে ভারত সরকার বাংলাদেশের নেতৃত্বের জন্যে প্রস্তুত করছিলো, ভারতীয় মিলিটারী একাডেমিতে তাদের প্রশিক্ষণের জন্যে পাঠিয়েছিলো। শেখ মুজিবুর রহমান জীবিত অবস্থায় পাকিস্তান থেকে ফিরে আসবেন বলে ভারত নিশ্চিত ছিলো না। সুতরাং ভারতের প্রতি আমু ও তোফায়েলদের কৃতজ্ঞতা অন্যদের চাইতে বেশি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

ভারত কি নিয়েছে আর কি দিয়েছে

কিন্তু কিছু ত্যাগ স্বীকারের পরিবর্তে বাংলাদেশের স্বাধীনতা থেকে ভারত কি পেয়েছে আমুরা হিসাব করে দেখেছেন কখনো? ৯৩ হাজার পাকিস্তানী সৈন্যের ফেলে যাওয়া সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং বাংলাদেশের বাজার থেকে আমদানিকৃত বিলাস সামগ্রী ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতেই ভারতে চলে গিয়েছিলো। কলকাতার সাংবাদিকরা তখন রসিকতা করে বলতেন ভারতীয় সেনাবাহিনী সর্বাধিক অস্ত্র সাহায্য পায় পাকিস্তান থেকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে বলে পূর্ব

সীমান্তের প্রতিরক্ষা বাবদ প্রতি বছর ভারতের ব্যয় সাশ্রয় হচ্ছে বহু বিলিয়ন ডলার করে। বিগত ৪৩ বছর ধরে ভারত বাংলাদেশকে ব্যবহার করছে 'ক্যাপটিভ' বাণিজ্যের বাজার হিসেবে। দুদেশের বাণিজ্যের ভারসাম্যের ব্যবধান দিনকে দিন দুস্তর হচ্ছে। সর্বোপরি বিগত পাঁচ বছরে আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশের সড়ক, রেল, নদীপথ এবং সমুদ্র বন্দর দুটো বিনা ব্যয়ে ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে দিয়েছে ভারতকে। অর্থাৎ কার্যত এই পাঁচ বছরে আমাদের সার্বভৌমত্বকেও ভারতের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে ভারত নানা অসিলায় দুদেশের মধ্যেকার আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলো কার্যকর করছে না। আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করে তারা অভিন্ন নদীগুলোর উজানে বাঁধ তৈরি করছে, বাংলাদেশকে শুকিয়ে মারার সকল আয়োজন পাকা করে ফেলেছে।

এর পরে যদি আমু, তোফায়েল এবং মেননরা বলতে চান যে একাত্তরের ভূমিকার জন্যে কৃতজ্ঞতা হিসেবে বাংলাদেশের রফতানি বাণিজ্যের বাজারও তারা ভারতের হাতে তুলে দিতে চান এবং সে উদ্দেশ্যেই দেশের পোশাক শিল্পকে সাবোটাজের হাতে তুলে দিয়ে এবং স্বদেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করে ইউরোপ-আমেরিকার বাজার হাতছাড়া করে আমাদের পোশাক শিল্পের বাজার নষ্ট করছেন, তাহলে সেজন্যে তাদের জবাবদিহি করতে হবে বাংলাদেশের জনতার কাছে।

একচক্ষু পররাষ্ট্র নীতির মতো একচক্ষু কৃতজ্ঞতাও কি দেখাচ্ছেন না তারা? হেনরি কিসিঞ্জার ১৯৭১ সালে বলেছিলেন স্বাধীন হলে বাংলাদেশ হবে একটা 'বাস্কেট কেস' (মুমূর্ষু যুদ্ধাহত)। [অনেকেই ভুল উদ্ধৃতি দেন। কিসিঞ্জার কখনো বটমলেস বাস্কেট বলেননি]। বর্তমান মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনা মাত্র সেদিন বলেছেন কিসিঞ্জার ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কিন্তু কিসিঞ্জারকে ভুল প্রমাণিত করে বাংলাদেশ যে ৪৩ বছর পরেও শুকিয়ে মরেনি তার জন্যে উদার মার্কিন অর্থ ও প্রকৌশলী সাহায্য, বাণিজ্যের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা এবং কয়েক লক্ষ অবৈধ বাংলাদেশী অভিবাসীর প্রতি অনুকূল আচরণ অনেকখানি দায়ী। বাংলাদেশের এই সীমিত সমৃদ্ধি ভারতের বদান্যতায় হয়নি মোটেও। আসলে ভারত যতোখানি দিয়েছে আমাদের নিয়েছে তার তুলনায় বহুগুণ বেশি। সংশ্লিষ্ট তিন মন্ত্রী এবং সার্বিকভাবে বর্তমান সরকার সেসব অস্বীকার করে মারাত্মক ভুল করছেন।

কৃতজ্ঞ হতেও ভুলে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

তার চাইতেও বেশি মারাত্মক ভুল হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের কথা ভুলে যাওয়া। একাত্তরে আওয়ামী লীগের আপাদ-মস্তক নেতৃত্ব যখন রণাঙ্গনে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিলো তখনও বাংলাদেশের আপামর ছাত্র-জনতা কিসের লক্ষ্যে অত্যাধুনিক পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো? শহীদ প্রেসিডেন্ট

জিয়াউর রহমান বলেছিলেন, গণতন্ত্র নেশার মতো বাংলাদেশের মানুষের শিরায় শিরায়। এই গণতন্ত্রের জন্যেই তারা একাত্তরে প্রায় খালি হাতে হানাদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলো।গণতন্ত্রকে হত্যা করে বর্তমান সরকারও পঁচাত্তরের বাকশালী সরকারের মতো জনতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। পঁচাত্তরে পরিণতি ভালো হয়নি। এবারে হবে কি?

শেখ হাসিনার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ওয়াশিংটনের মুখে চপেটাঘাত করার সময় তিনি ভুলে যান যে মার্কিন সরকারের কাছে তার কৃতজ্ঞ থাকার অনেক ব্যক্তিগত কারণও আছে। ২০১০ সালে শেখ হাসিনার সঙ্গে দীর্ঘ টেলিফোন আলাপে সন্তুষ্ট হতে না পেরে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিন্টন সে টেলিফোন কথোপকথনের পূর্ণ বিবরণ মিডিয়ায় ফাঁস করে দিয়েছিলেন। সে বিবরণে পরিষ্কার শেখ হাসিনাকে মনে করিয়ে দেয়া হয়েছিলো যে ২০০৮ সালে দিল্লি আর ওয়াশিংটন সম্মিলিত চেষ্টা করে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী এবং শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো। হাসিনা এখন এক পৃষ্ঠপোষককে পরিত্যাগ করে ও চটিয়ে সম্পূর্ণরূপে অন্য পৃষ্ঠপোষককে আঁকড়ে ধরেছেন। সেটা ওয়াশিংটনের জন্যে সুখকর অনুভূতি নয়।

রফতানিতে জিএসপি সুবিধা হারানো ছাড়া আরো একটা গুরুতর হুমকি দেয়া হয়েছে মার্কিন সিনেট পররাষ্ট্র কমিটির দ্বিতীয় এবং সর্বসাম্প্রতিক শুনানিতে। বলা হয়েছে নতুন করে বিশ্বাসযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা না হলে এর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে শুধু এমন প্রকল্পেই অর্থ সাহায্য দেবে যেসব প্রকল্পে সংসদ সদস্যদের ভূমিকার সুযোগ থাকবে না। বিগত সংসদে আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্যদের কারো কারো সম্পদ শতগুণ এবং হাজারগুণ বেড়েছিলো। সে লালসায় পড়ে ৫ জানুয়ারির ভোটারবিহীন নির্বাচনেও কেউ কেউ লাখের এবং কোটির অঙ্কে টাকা ব্যয় করেছেন। মার্কিন সিনেটের উপরোক্ত ঘোষণা অবশ্যই তাদের জন্যে দুশ্চিন্তার কারণ হবে।

বিদেশী মুদ্রা অর্জনের ওপর এ দুটি হুমকি আসছে এমন সময় যখন রেমিট্যান্সের আয় দ্রুত পড়ে যাচ্ছে। সরকারের ভ্রান্ত পররাষ্ট্র নীতির কারণে উপসাগরীয় দেশগুলোসহ বহুদেশ বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে কিংবা হ্রাস করছে। অর্থাৎ রেমিট্যান্স আরো কমে যাবে।

সরকারের অন্তরে আতঙ্ক

মনে হচ্ছে সরকারেও কোথাও না কোথাও দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক মেরামতের চেষ্টায় পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হকের নেতৃত্বে একটা প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়েছে ওয়াশিংটনে। কিন্তু গাছের গোড়া কেটে আগায় পানি ঢাললে কোন লাভ হবে? বাংলাদেশ নিয়ে ওয়াশিংটনের উদ্বেগের কারণ মৌল। মনে রাখতে হবে যুক্তরাষ্ট্র কোন দেশকে অর্থসাহায্য, রাজনৈতিক

সমর্থন এবং বাণিজ্যিক সুবিধা দেয় সে দেশে এবং সে অঞ্চলে মানবাধিকার ও গণতন্ত্র মজবুত করার আশায়। বিগত পাঁচ বছরে বাংলাদেশে ঘটেছে সম্পূর্ণ উল্টো ব্যাপার-স্যাপার। এই পাঁচ বছরে মানবাধিকার বলতে তেমন কিছু অবশিষ্ট নেই বাংলাদেশে। রাজনৈতিক মতদ্বৈধের কারণে বিচার বহির্ভূতভাবে ছয়শতাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে এ সময়ে। মিথ্যা সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে, ক্রসফায়ার ও বন্দুক যুদ্ধের মিথ্যা অজুহাতে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের হত্যা করা হচ্ছে। গুম ও খুনের ঘটনা এখন নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। জানুয়ারি মাসেই রাজনৈতিক হত্যার ঘটনা ঘটেছে ছয় শতাধিক।

গণতন্ত্রের নাম-নিশানা মুছে ফেলার সকল ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশে। ভারত-মার্কিন ষড়যন্ত্রে গদি পাবার সময় থেকেই সরকারের রাজনৈতিক বিরোধীদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের সব রকমের ব্যবস্থা হয়েছে। বিরোধীদের সভা-সমাবেশ এবং মিছিল করে রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বিএনপি দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একাধিকবার পুলিশ হামলা করেছে, কার্যালয়টি বহুবার বন্ধ কিংবা পুলিশবেষ্টিত করা হয়েছে। হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতাকর্মী সাজানো মামলায় কারারুদ্ধ আছেন। সরকার মুখে অস্বীকার করলেও কারোই বুঝতে বাকি নেই যে সংবাদের স্বাধীনতা সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে।

মেহেরুন রুনি ও তার স্বামী সাগরসহ ২৩ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন এই পাঁচ বছরে। আহত এবং নির্যাতীত হয়েছেন আরো কয়েকশো। মাহমুদুর রহমান আজো বিনা বিচারে বন্দী আছেন। আমার দেশ পত্রিকার ছাপাখানা এখনো তালাবন্ধ। দিগন্ত ও ইসলামী টেলিভিশন এখনো নীরব। ৫ মে রাতে শাপলা চত্বরের সত্য বিবরণ প্রকাশের দায়ে মানবাধিকার সংস্থা অধিকারের নেতাদের গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে সাজানো মামলা রুজু করা হয়েছে। এই পাঁচ বছর ধরে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

সরকার সবচাইতে মারাত্মক আঘাত হেনেছে গণতন্ত্রের ওপর। কোন কোন মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ নেতা গোড়া থেকেই বলে এসেছেন যে একটা বাকশালী ধাঁচের (একদলীয়) সরকার প্রতিষ্ঠাই তাদের কাম্য। সরকারের কাজকর্মেও অহরহ দেখা গেছে যে তারা যে কোন মূল্যে গদি দখল করে থাকতে চায়। যেভাবে তারা দশম সংসদ নির্বাচনে এগুচ্ছিলো তাতে নির্বাচন ন্যায্য এবং নিরপেক্ষ হবে বলে কেউ আশা করতে পারেনি। দেশে বিদেশে এ বিশ্বাসই বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিলো যে একটা লোক-দেখানো নির্বাচনের অভিনয় করে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকাই সরকারের লক্ষ্য। সে কারণে কোন দেশই সে নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠাতে রাজি হয়নি। একমাত্র ভারত ছাড়া পৃথিবীর অন্য সকল দেশই সংলাপের মাধ্যমে স্বীকৃত একটা পদ্ধতিতে সকলের গ্রহণযোগ্য একটা

নির্বাচন করার পরামর্শ দিয়েছিলো সরকারকে। কিন্তু সকলেই লক্ষ্য করেছেন একমাত্র দিল্লি ছাড়া অন্য কারো পরামর্শ এ সরকারের গ্রহণযোগ্য নয়।

সাজানো ভিডিওতে কেউ বিভ্রান্ত হবে না

যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অন্য সকল সাহায্য দাতা দেশ ও সংস্থা যে শেখ হাসিনার সরকারের ওপর অসন্তুষ্ট এসব হচ্ছে তার কারণ। সাধারণ বুদ্ধির একটা প্রবাদ বহু দেশে আছে। ইংরেজিতে 'ডোন্ট বাইট দ্য হ্যান্ড দ্যাট ফিডস ইউ' – যে হাত ভাত দেয় সে হাত কামড়াতে নেই। বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জেও বলে: যে গাই দুধ দেয় তার লাথিও সই। এগুলো সহ বহু হিত কথাতেই যে তাদের বিশ্বাস নেই বর্তমান সরকারের শীর্ষ ব্যক্তিরা বার বার তার প্রমাণ দিয়েছেন।

পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হকের নেতৃত্বে যে প্রতিনিধি দলটি ওয়াশিংটনে গেছে তাকে কতোখানি ক্ষমতা দেয়া হয়েছে জানি না। কিন্তু একথা মোটামুটি বলা যায় যে উপরোক্ত পুরাতন দাবিগুলো গ্রহণ করা না হলে মার্কিন সরকার জিএসপি কিংবা প্রকল্প সাহায্যের ব্যাপারে তাদের মনোভাব শিথিল করবে বলে মনে হয় না। হয়তো সেটা বুঝে গিয়েই সরকার এখন হিটলারী ছলনার আশ্রয় নিয়েছে। আল কায়েদা প্রধান আয়মান আল জাওয়াহিরির নামে যে ভিডিওটি গত কয়দিনে প্রচার করা হচ্ছে সেটাকে এ আলোকেই বিচার করতে হবে। নাইন-ইলেভেনের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আল কায়েদা ভীতি তুঙ্গে উঠেছিলো। তার অপসুযোগ নিয়ে মার্কিন জনমতকে প্রভাবিত করা অবশ্যই এই ওয়েবসাইটের আনাড়ী প্রচেষ্টা। সরকারের গোয়েবলসরা আদাজল খেয়ে এ নিয়ে অপবাদ ছড়াচ্ছেন। কেউ হেফাজতে ইসলাম, কেউ জামায়াত আর কেউ বিএনপিকে সেজন্যে দায়ী করার চেষ্টা করেছেন। সরকারের মিঃ গোয়েবলস হাছান মাহমুদ তো সরাসরি খালেদা জিয়াকেই সেজন্যে দায়ী করেছেন।

তারা সকলেই সরকারের অপপ্রচারকে খণ্ডন করেছেন। তারপর থেকে আল কায়েদা নেতা স্বয়ং বলেছেন যে এই ভিডিওর সঙ্গে তার সংস্থার কোন সম্পর্ক নেই। অবশ্যি সাধারণ মানুষও সরকারের অপপ্রচারে কান দেয়নি। তারা সন্দেহ করছে র'কে। তাছাড়া ইন্টারনেট প্রচারের আবাসিক বিশেষজ্ঞ তো গণভবনেই আছেন। শহীদুল হক মিশনের সায়াহ্নের এসব অপপ্রচারে ওয়াশিংটনের মনোভাব প্রভাবিত হবে কিনা সে প্রশ্ন অনেকের মনেই উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। আলোচ্য ভিডিও সম্বন্ধে স্টেট ডিপার্টমেন্টের (মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর) প্রতিক্রিয়া থেকে তো মনে হয় সরকারের আশাবাদী হবার কারণ নেই।

(লন্ডন, ১৮.০২.১৪)

ক্ষমতার শেষ শেকড়টিও কেটে গেছে উপজেলা নির্বাচনে

শেখ হাসিনার সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বে সকল বিরোধী দল অংশ নিতে রাজি হয়নি যেসব আশঙ্কায় তার সবগুলোই বাস্তবে দেখা গেছে প্রথম দফার উপজেলা নির্বাচনে। ভোটকেন্দ্র দখল, জাল ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বীদের এজেন্টদের বিতাড়ন, অস্ত্রবাজি এবং সাধারণভাবেই সরকারি তাণ্ডব ছিলো বুধবারের (১৯ ফেব্রুয়ারি) নির্বাচনের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য দিক। দেশবাসীর আরো প্রত্যয় ঘটলো যে অসাধু উপায়ে নির্বাচনে জয় আওয়ামী লীগের সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক কৌশল। উল্লেখ্য যে ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের ভারত-মার্কিন মাস্টারপ্ল্যানের নির্বাচনেও এসব কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিলো। আওয়ামী লীগ বুঝেই নিয়েছে তাদের স্বৈরতন্ত্রী এবং সন্ত্রাসী রাজনীতি বাংলাদেশের গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের গ্রহণযোগ্য নয়। সুষ্ঠু নির্বাচন হলে পরাজয় নিশ্চিত জেনেই তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে সাজানো নির্বাচন করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। গত ৫ জানুয়ারির ভোটারবিহীন নির্বাচনও তারা করেছে একই কারণে। অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে তারা আদৌ কোন আসন পেতো কিনা সন্দেহ আছে।

মোট চারশো ষাটটিরও বেশি উপজেলার নির্বাচন হচ্ছে পাঁচ দফায়। স্থানীয় নির্বাচনগুলো হবার কথা অরাজনৈতিক ও নির্দলীয়ভাবে। কিন্তু বাংলাদেশে এখন আর কোন কিছুই অরাজনৈতিক কিংবা নির্দলীয়ভাবে করা সম্ভব নয়। মেরুকরণ এমনই চরমে পৌঁছেছে। বিদেশীরা হয়তো এসব নির্বাচন থেকে জাতীয় রাজনীতির প্রবণতার পরিমাপ করতে চাইবে না। সেটা অনেকটা হবে ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখার কিংবা অ্যাডমিরাল নেলসনের অন্ধ চোখে দূরবীণ ধরে শত্রু বহরের মূল্যায়ন করার সামিল। ভোট ও ভোটারবিহীন সংসদ নির্বাচনকে এই বিদেশীরা বিশ্বাসযোগ্য কিংবা গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেনি। তা সত্ত্বেও মূলত ভারতের চাপে কোন কোন দেশ ক্রমশ শেখ হাসিনার সরকারের সঙ্গে লেনদেন করতে রাজি হচ্ছে। তাদের দিক থেকে স্থিতিশীলতার দোহাই দেবার চেষ্টা লক্ষণীয়।

তারা সম্ভবত ভুলে যাচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দীর্ঘতম স্থায়ী শাসক ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের যোসেফ স্ট্যালিন। তার ৩১ বছরের শাসনের অধিকাংশ

সময় গণতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে মস্কোর ভয়ানক এক স্নায়ুযুদ্ধ চলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নেই কতো লাখ মানুষ যে এ সময়ে মারা গেছে তার হিসেব করাও সম্ভব নয়। পাকিস্তানে বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান স্থিতিশীলতার দোহাই দিয়েই গদি আঁকড়ে থাকতে চেয়েছেন। আরো আধুনিককালে রবার্ট মুগাবে গত ৩৭ বছর ধরে জিম্বাবুয়ের রাষ্ট্রপতির গদি দখল করে আছেন। এ সময়ে জিম্বাবুয়েতে যেসব অমানুষিক অত্যাচার-নির্যাতন হয়েছে তার কিছু কিছু ছবি টেলিভিশনে দেখেছি, বিবিসি থেকে প্রচারও করেছি সে সংক্রান্ত খবর। পশ্চিমা বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই তিনি অগ্রহণযোগ্য। স্থিতিশীলতার দোহাই দিয়ে যারা শেখ হাসিনার গণবিরোধী সরকারের সঙ্গে লেনদেন করতে রাজি হবে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই দ্বিমুখী নীতি এবং কাটা জিহ্বা দিয়ে কথা বলার অভিযোগ উঠবে।

জানুয়ারির সে নির্বাচনে দেশের মোট দুই শতাংশ ভোটারও ভোট দেননি। ১৫৩ নির্বাচনী এলাকার চার কোটি ৯০ লাখ মানুষকে আদৌ ভোটদানের সুযোগ দেয়া হয়নি। অন্য ১৪৭ এলাকায় বহু কেন্দ্রে একটি ভোটও পড়েনি। সরকার বিদেশীদের ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছে এই বলে যে বিরোধী দলগুলোর নির্বাচন বর্জন এবং বাধাদান না ঘটলে তারা বিশ্বাসযোগ্য সংখ্যক ভোট পেতো। ঠিক সে কারণেই উপজেলা নির্বাচনগুলোর ফলাফল বিবেচনা করা সকলেরি কর্তব্য হবে। প্রথম দফায় ৯৭টি উপজেলায় নির্বাচনে প্রধান বিরোধী বিএনপি দল ৪৪টিতে এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ৩৪টিতে জয়লাভ করেছে।

জামায়াতের এতো সাফল্য যে কারণে

বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে ১৩টি উপজেলায় জামায়াতের এবং মাত্র একটি উপজেলায় বর্তমান সংসদের গৃহপালিত বিরোধী দল জাতীয় পার্টির জয়লাভ। সকল মিডিয়া এবং পর্যবেক্ষক একমত যে সরকারের দিক থেকে তাণ্ডবগুলো না ঘটলে বিএনপির জয় আরো চাঞ্চল্যকর হতো। এমনকি নির্বাচন কমিশন থেকেও স্বীকার করা হয়েছে যে ভোট জোচ্চুরি ও অন্যান্য অনিয়মের বহু অভিযোগ তাদের কাছে এসেছে। এসব সরকারি তাণ্ডব না হলে আওয়ামী লীগ আদৌ কোন উপজেলায় জয়ী হতো কিনা সন্দেহ। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গত বছর সিটি কর্পোরেশনগুলোর নির্বাচনেও শাসক দল আওয়ামী লীগ তাদের সকল 'তাণ্ডব' দেখিয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি কর্পোরেশনেই মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপির সমর্থিত প্রার্থী।

মাত্র একটি উপজেলায় সরকারি প্রভাবের জোরে জাতীয় পার্টির জয় আবারো প্রমাণ করে যে এই সুযোগ সন্ধানী দলটি গত মাসের সংসদ নির্বাচন

নিয়ে যেসব কেলেঙ্কারী করেছে তাতে তাদের সীমিত সমর্থকরাও ঘৃণায় নাক সিঁটকে নিয়েছে। এমনকি জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান লেজে হোমো এরশাদ নিজেই বলেছেন যে 'জাতীয় পার্টির ভবিষ্যৎ এখন অন্ধকার'। অবশ্যি এরশাদ প্রায়ই আমাকে ব্রিটিশ আবহাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেন। শীত-গ্রীষ্ম-বসন্ত-শরৎ চারটি ঋতুই একদিনে দেখা সম্ভব বৃটেনে। এরশাদের মুখে সকাল দুপুর বিকেল আর সন্ধ্যেয় পরস্পরবিরোধী কথাবার্তা প্রায়ই শোনা যায়। দল হিসেবে জাপার অস্তিত্ব এখন সত্যি সত্যি বিপন্ন মনে করতেই হবে। আর জামায়াত যে ১৩টি উপজেলায় জয়ী হয়েছে তার থেকে ধরে নিতেই হবে যে দেশের মানুষ সরকারের মিথ্যার মুখোশ খুলে ফেলতে এখন বদ্ধপরিকর।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং ২০১১ সালের আগস্ট মাসে বলেছিলেন জামায়াত বাংলাদেশের মানুষকে ভারতের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন করে তুলছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর (নাইন-ইলেভেন) নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে আল কায়েদার সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে আমেরিকার সাধারণ মানুষ ইসলামী সন্ত্রাস সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। শেখ হাসিনা ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে গদি লাভের সময় থেকেই মার্কিন জনমতের এই প্রবণতার অপসুযোগ নেবার লক্ষ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন বাস্তব-অবাস্তব সংস্থার নাম দেখিয়ে টুপি-দাড়িধারী মানুষকে গ্রেফতার এবং নির্যাতন করে সরকার মার্কিনীদের মন পাবার চেষ্টা শুরু করে। মনমোহন সিংয়ের উক্তিটির পর ভারতকে খুশি করার মতলবে জামায়াতের বিরুদ্ধে যেন সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আওয়ামী লীগ সরকার। টুপি-দাড়ি পরিধান এবং মসজিদে নামাজ পড়তে যাওয়া যেন মঙ্গলগ্রহ কিংবা অন্য কোন তারকালোক থেকে হঠাৎ করে বাংলাদেশে এসে পড়েছে। সরকারের ভাবখানা সে রকম। সনাতনী কাল থেকেই এ দেশের মানুষ যে ধর্মপ্রাণ বর্তমান শাসকরা যেন ইতিহাস বইতেও সেসব কথা পড়েননি।

দেশবাসীর সহানুভূতি যাবে নির্যাতিতের দিকে

সরকারের আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশন জামায়াতের নিবন্ধন বাতিল করেছে। ভারতের দালাল এবং ইসলাম-বিরোধী চক্রের দাবিতে সন্ত্রাসী দল অপবাদ দিয়ে জামায়াতকে নিষিদ্ধ করার পাঁয়তারা করছে সরকার। তাদের উস্কানি দিচ্ছে শাহবাগ কুখ্যাত ধর্মদ্রোহী ভারতের দালাল কতিপয় জীব। টুপি-দাড়ি পরিহিতদের লাশ এখন প্রায়ই এখানে সেখানে পড়ে পাওয়া যায়। সরকারের গণতন্ত্র বিরোধী ত্রাস এখন মসজিদেও ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। সজীব ওয়াজেদ জয়ের স্বীকৃতি অনুসারেও 'ইসলামী সন্ত্রাসী' খুঁজে বের করার জন্যে আওয়ামী

লীগের ফেউ পাঠানো হচ্ছে মসজিদে। অনেক মুসলমান এখন নামাজ আদায় করতে মসজিদে যেতে ভয় পাচ্ছেন। কিন্তু প্রথম দফার উপজেলা নির্বাচনে জামায়াতকে ব্যাপক সমর্থন দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ যেন শেখ হাসিনার সরকারকে বৃদ্ধাঙ্গুলিই দেখালো। প্রমাণ হয়ে গেল অন্যায়ভাবে এ সরকার যাদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন চালাবে জনসাধারণের সহানুভূতি ঘুরে যাবে তাদের দিকে।

সরকারের মন্ত্রীদের, বিশেষ করে মন্ত্রীসভার প্রধানের মুখে খিস্তি-খেউড় যে আবার শালীনতার সকল মাপকাঠির বাইরে চলে যাচ্ছে তাতে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাদের পায়ের তলার মাটি সরে গেছে, ক্ষমতার শেষ শেকড়টিও ছিন্ন হয়ে গেছে মাত্র ৯৭টি উপজেলার নির্বাচনী ফলাফলে। দেশি-বিদেশী সকলে এখন বুঝে গেছে সর্ববিধ সরকারি তাণ্ডব এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ব্যবহার করেও তারা গণতন্ত্রকামীদের দমিয়ে রাখতে পারছে না। যে স্থিতিশীলতার দাবি তারা করছে সেটা কতো ভঙ্গুর প্রমাণ হয়ে গেছে। কোন সন্দেহ নেই যে বাকি চার দফার উপজেলা নির্বাচনে তারা আরো মরিয়া হয়ে উঠবে। কিছু লক্ষণ ইতোমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। ৫ জানুয়ারির ভোটারবিহীন নির্বাচনের পর ১৯ দলের জোটের নেতা-কর্মীদের হত্যা বেড়ে গিয়েছিলো। প্রথম দফার উপজেলা নির্বাচনে বিপর্যয়ের পর সরকার ও শাসক দলের হিংস্রতা আরো বেড়ে গেছে মনে হয়। কিন্তু তাতে করে আরো সুস্পষ্ট প্রমাণ হয়ে যাবে যে বাংলাদেশের এবং বাংলাদেশের মানুষের ঘাড়ের ওপর চেপে বসে থাকার কোন অধিকার এই সরকার আর এই দলের অবশিষ্ট রইলো না।

কী শিক্ষা নেবে ১৯ দলের জোট?

কী করবে এখন ১৯ দলের জোট এবং সে জোটের প্রধান শরিক বিএনপি? এতোদিন আন্দোলন করেও একটা অমোঘ সত্য তারা উপলব্ধি করতে পারেনি। বিদেশীরা, বিশেষ করে বিদেশী কূটনীতিকরা যখন তাদের সমালোচনা করে এবং যখন তাদের সমর্থন করে সেটা কখনোই নিছক ন্যায়ান্যায় এবং নিয়ম-নীতির কারণে নয়। ২০০৬ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টার পত্রিকার এবং সেনাপ্রধান মইন-উ-আহমেদের সমর্থন সংগ্রহ করে ভারতের হাইকমিশনার বীনা সিক্রির সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টম্যাস আওয়ামী লীগকে গদিতে বসানোর জন্যে যখন বহু ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন তখন তার সঙ্গে ন্যায়-নীতির কিংবা গণতান্ত্রিক আদর্শের কোন সম্পর্ক ছিলো না। যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে গণতান্ত্রিক বিশ্বের নেতা বলে দাবি করে এবং সাধারণত গণতন্ত্রের পক্ষে থাকতে চায়। সে কথা মেনে নিতেই হবে। কিন্তু তার বিশ্ব স্বার্থ সময় সময় গণতন্ত্রের চাইতেও বেশি শক্তিশালী হয়ে দেখা দেয়।

একবিংশ শতকের প্রথম দশকে দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন স্বার্থ ছিলো উদীয়মান পরাশক্তি চীনের প্রভাব সীমিত রাখার লক্ষ্যে ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা, যে ভারত স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শত্রু সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্র ছিলো। ভারত বরাবরের মতো বাংলাদেশে এমন একটা সরকার চেয়েছিলো যে সরকার তার সামরিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে। কিন্তু নতুন শতকের দ্বিতীয় দশকে এসে মার্কিন স্বার্থের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটেছে। ওয়াশিংটন বঙ্গোপসাগরে তার নৌশক্তি বৃদ্ধি করতে চায়। সে লক্ষ্য ভারতের স্বার্থের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সুতরাং ওয়াশিংটন গণতন্ত্রের বিবেচনাকে তুলে ধরে বিএনপি ও বিরোধী জোটের প্রতি আনুকূল্য দেখিয়ে এসেছে।

কিন্তু বিরোধী জোটের সঙ্গে এতো বেশি ঘনিষ্ঠ হতে সে চায়নি যাতে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক মেরামত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ভারত বিশাল দেশ। তার সমরাস্ত্রের বাজার বিশাল। বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্ত ও ভোক্তা শ্রেণীর চাহিদা অপূরণীয় বলে ভুল হতে পারে। অন্যান্য বহু দেশের মতো আমেরিকার ব্যবসায়ীদেরও প্রলুব্ধ দৃষ্টি ভারতের দিকে নিবদ্ধ। এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যাপারে এশিয়ার দ্বিতীয় পরাশক্তি ভারতের সমর্থন ওয়াশিংটনের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্যেই বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের ব্যাপারে মার্কিন নীতি ও মনোভাবে কিছু আপাত বিরোধীতা লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনা যখন গণতন্ত্রের প্রতি প্রধানমন্ত্রী হাসিনার ঘৃণা এবং বিরোধী দলগুলোর বিরুদ্ধে সরকারের নির্যাতন-নিপীড়ন লক্ষ্য করেন তখন সেটাকে আন্তরিক বলতেই হবে। কিন্তু তিনি যখন সহিংসতার সমালোচনা করে বিরোধীদের আন্দোলন সংযত করার পরামর্শ দেন তখন কূটনীতিক হিসেবে নিজ দেশের স্বার্থের প্রতি তার মনোযোগ প্রধান হয়ে ওঠে।

ইউক্রেনের বিপ্লবের সাফল্য যে কারণে

ইউক্রেনে বিগত তিন মাসে যে অগ্নিস্রাবী এবং রক্তঝরা বিপ্লব ঘটেছে তাতেও বিদেশী কূটনীতির এই উভয় সঙ্কট পরিষ্কার হয়ে যায়। ইউক্রেন সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি অঙ্গরাজ্য ছিলো। সোভিয়েতের পতনের পর ১৯৯১ সালে সে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন হয়ে যায়। কিন্তু রাশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট ভ্লাডিমির পুতিন যতো বেশি সম্ভব সাবেক অঙ্গরাজ্যকে আবার রাশিয়ার প্রভাবাধীনে আনতে চান। মুসলিম প্রধান চেচনিয়া ও দাগেস্তানকে তিনি অস্ত্রবলে দখল করে রেখেছেন। সাবেক অঙ্গরাজ্য জর্জিয়াকে আবারো কুক্ষিগত করার জন্যে ২০০৮ সালে পুতিন সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। সে যুদ্ধ দক্ষিণ ওসেটিয়া যুদ্ধ

নামে খ্যাত। ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের লঘিষ্ঠ মানুষ রুশ ভাষাভাষী। প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইউনোকোভিচ এবং তার সরকারের সদস্যরা রুশ প্রভাবিত ছিলেন। রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন সে সুযোগ নিয়ে ইউক্রেনকে আবার রাশিয়ার আধিপত্য বলয়ে ফিরিয়ে আনতে চান।

সম্প্রতিকালে ইউক্রেনের অধিবাসীরা তাদের স্বাধীনতাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইউনোকোভিচ সংশ্লিষ্ট চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেন। বিপ্লবের সূচনা সেখান থেকে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো যুক্তরাষ্ট্রও জনসাধারণকে সমর্থন দেয় কিন্তু বাংলাদেশের মতো সেখানেও ওয়াশিংটন আন্দোলনকারীদের সংযত থাকতে পরামর্শ দেয়। বৃহৎ শক্তির রাজনীতি এখানেও সঞ্চালক শক্তি ছিলো। সিরিয়ার জটিল গৃহযুদ্ধের অবসান এবং ইরানকে পারমাণবিক বোমা তৈরি থেকে নিবৃত্ত রাখা মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের দুটি বড়ো সমস্যা। সিরিয়া ও ইরানের ওপর রাশিয়ার প্রভাবই সর্বাধিক। সে কারণে ওয়াশিংটন প্রেসিডেন্ট পুতিনকে চটাতে চায়নি। আন্দোলনকারীদের সে জন্যেই সংযমের পরামর্শ দিয়ে আসছিলেন মার্কিন নেতারা।

জনতা পিছল পথে যায়নি

কিন্তু কিয়েভের ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্কোয়ারের (ওরা বলে ময়দান) জনতা বৃহৎ শক্তির খেলার মারপ্যাঁচে ভরসা করতে পারেনি। তারা অবিরাম এবং আপসবিহীন আন্দোলন চালিয়ে গেছে। প্রচুর রক্তও তারা দিয়েছে। ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২২ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই সরকারের দাঙ্গা পুলিশ এবং সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে ৮৮ জন ইউক্রেনীয় প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু বিনিময়ে তারা বিজয় অর্জন করেছে। প্রথমে প্রেসিডেন্ট ইউনোকোভিচের সমর্থক ১৫ জন পার্লামেন্ট সদস্য পদত্যাগ করেন। জনতা অনেকগুলো সরকারি ভবন দখল করে নেয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য জার্মানি, ফ্রান্স আর পোল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যস্থতায় এবং রাশিয়ার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে আন্দোলনের কয়েকজন নেতা প্রেসিডেন্ট ইউনোকোভিচের সঙ্গে চুক্তি করেন যে একটা সর্বদলীয় সরকার গঠন এবং চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা হবে।

ইউক্রেনের জনতা সে সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজি হয়নি। তারা নিশ্চয়ই ভয় করছিলো যে ইউনোকোভিচকে অমন দীর্ঘ সময় দেয়া হলে কি ষড়যন্ত্র করে তিনি পরিস্থিতির মোড় কোন দিকে ঘুরিয়ে নেবেন কে জানে? আন্দোলনের তীব্রতার মুখে হঠাৎ করে কিয়েভের রাজপথ থেকে পুলিশ ও সৈন্য উধাও হয়ে যায়। পার্লামেন্টের স্পিকার পদত্যাগ করেন। স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীরা,

কয়েকজন মেয়র ও গভর্নর পালিয়ে রাশিয়ায় চলে যান। প্রেসিডেন্ট ইউনোকোভিচও রাশিয়ায় যাবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বর্ডার গার্ড বাহিনী তার ব্যক্তিগত জেট বিমানকে উড়তে দেয়নি। তিনি এখন পলাতক আছেন। পাইকারী হত্যার দায়ে বিচারের দায়ে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হয়েছে এবং নতুন অস্থায়ী সরকার দেশব্যাপী তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। কিন্তু জনতা ময়দান ছেড়ে যেতে রাজি হচ্ছে না। বন্দী মুক্তি, হত্যাযজ্ঞের বিচার এবং সম্ভবত মে মাসে নির্বাচনসহ দাবিগুলো পূরণ হওয়া পর্যন্ত তারা প্রতিবাদ বিক্ষোভ চালিয়ে যেতেই চায়।

এদিকে দেশটির অবস্থা এখন গভীর উদ্বেগের বিষয়। প্রশাসন ভেঙে পড়েছে। রাশিয়া ঋণ দানের প্রস্তাব প্রত্যাহার করেছে। ইউক্রেন দেউলিয়া হবার উপক্রম। তিন মাসের আন্দোলনে কয়েকশো মানুষ মারা গেছে। আহত হয়েছে কয়েক হাজার। এ সবের জন্যে দায়ী বৃহৎ শক্তিগুলোর ইতস্তত ভাব, আপাত বিরোধী নীতি এবং তাদের বিশ্ব স্বার্থের সংঘাত।

ইউক্রেন বনাম বাংলাদেশ

বাংলাদেশে বিগত পাঁচ বছরেরও বেশি সময়ে ক্ষমতাসীনরা রাজনৈতিক বিরোধীতাকে পঙ্গু করে দেবার আশায় শত শত নেতাকর্মীকে হত্যা করেছে। খুনের আসামিকে মুক্তি দিয়ে রাজনৈতিক বন্দীদের জন্যে কারাগারে স্থান করেছে সরকার। তা সত্ত্বেও জেলখানাগুলো এখন টইটম্বুর, তিল ধারণের স্থান নেই সেখানে। সাম্প্রতিক কয়েক মাসে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও বিচারবহির্ভূত হত্যা চরমে উঠেছে। ইউক্রেন থেকে বহুগুণ বেশি মানুষ প্রাণ দিয়েছে বাংলাদেশের বর্তমান গণতন্ত্রের আন্দোলনে। বিশ্ব স্বার্থের বিবেচনায় বিদেশীরা গড়িমসি করেছে, গণতন্ত্রের পরিবর্তে আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী শক্তিকে তোষণ করেছে।

তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতিতে নির্বাচনের দ্বারা গণতন্ত্র সংহত করার আন্দোলন খালেদা জিয়া যখন শুরু করেন বাংলাদেশের মানুষ তাতে নজিরবিহীন সাড়া দিয়েছে। আন্দোলনের সে বেগ অব্যাহত থাকলে স্বৈরতান্ত্রিক শক্তি অনেক আগেই পরাভূত হতো। হয়নি অনেকগুলো কারণে। কূটনীতিকরা সংযম আচরণ আর ধীরে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। বিএনপিতে কোন কোন মহল সত্যি সত্যি আশা করেছিলেন যে শেখ হাসিনার সরকার বিদেশী পরামর্শের কাছে নতি স্বীকার করবেন। অন্যেরা সে যুক্তিতে ধুয়া ধরেছেন শুধুই আন্দোলনকে সাবোটাজ করার উদ্দেশ্যে। সংযম আচরণ আর ধীরে চলার পরামর্শের পেছনেও বহুমুখী স্বার্থ কাজ করেছে। আমার কোন সন্দেহ নেই বিরোধী আন্দোলনে, বিশেষ করে বিএনপির ভেতরেও শত্রুপক্ষের বর্ণচোরা এজেন্টরা সক্রিয় ছিলো।

তাছাড়া বিএনপির নেতৃত্বে এমন সব মহল আছেন যারা শুধু পদ ও গদির লোভেই রাজনীতি করছেন, বিনিময়ে ত্যাগ স্বীকারের কথা যারা ভাবতে পারেন না।

রয়ে সয়ে, জিরিয়ে জিরিয়ে আন্দোলনে বাংলাদেশের মানুষ ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে পড়েছে। গণতন্ত্র তারা অবশ্যই চায়। তারা সংগ্রাম করতে রাজি আছে কিন্তু সে সংগ্রামে তারা নেতাদেরও দেখতে চায়। আন্দোলন, বিপ্লব কিভাবে করতে হয় দেখিয়ে দিয়েছে ইউক্রেনের জনতা। যুদ্ধের ময়দানে নেমে তারা বিরতি দেয়নি, লক্ষ্য অর্জিত হওয়া পর্যন্ত তারা রণাঙ্গনে অবস্থান নিয়েছে। আধিপত্যবাদী রুশ দালালরা এখন গদি হারিয়েছেন, প্রাণভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু সংগ্রামী জনতা এখনো কিয়েভের ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্কোয়ার ছাড়তে রাজি নয়। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং অন্যান্য লক্ষ্য অর্জিত হওয়া পর্যন্ত সেখানেই তারা থাকবে। বাংলাদেশে যারা গণতন্ত্রের দাবিত আন্দোলন করছেন ইউক্রেনের মানুষের কাছ থেকে তাদের অনেক শিক্ষা নেবার আছে। সৌভাগ্যবশত খালেদা জিয়া দলীয় সংগঠন চাঙ্গা করার দিকে জরুরি মনোযোগ দিয়েছেন মনে হচ্ছে। তাকেও মনে রাখতে হবে লক্ষ্য অর্জিত হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন এতোটুকু শিথিল হতে দিলে তার পরিণতি মারাত্মক হয়। বাংলাদেশে যে ইউক্রেনের বহুগুণ বেশি মানুষ প্রাণ দিয়েছে কিন্তু তাতেও সাফল্য আসেনি এই হচ্ছে তার কারণ।

(লন্ডন, ২৫.০২.১৪)

দেশ চলেছে নাৎসিবাদের পথে

বৃটেনে এখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। এ যুদ্ধের নানা দিক নিয়ে রেডিওতে এবং টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে বহু আলোচনা হচ্ছে, বহু প্রামাণ্য চিত্র দেখানো হচ্ছে। সাধারণভাবেই মিডিয়ায় বহুবিধ আলোচনা চলছে। এসব থেকে জানতে পেরেছি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানরা বেলজিয়াম, হল্যান্ড নরওয়ে ও ডেনমার্ক আক্রমণের পর ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছিলো যে তারা এসব দেশে এসেছে 'আগ্রাসী ব্রিটিশদের' আক্রমণ থেকে তাদের রক্ষা করতে। অবশ্যি এসব দেশে এবং অন্যান্য দেশেও কেউ জার্মান প্রচারণায় বিশ্বাস করেনি, সেসব প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়নি।

আরো পরে নাৎসিবাদের উদ্ভবের সময় থেকে ক্ষমতা লাভের জন্যে মিথ্যা প্রচারণা ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ তাদের বড়ো রাজনৈতিক কৌশল ছিলো। আপনাদের অনেকেই নিশ্চয়ই জানেন, হিটলারের নাৎসিরা রাতের আঁধারে বুন্ডেস্ট্যাগ (পার্লামেন্ট) ভবন পুড়িয়ে দেয় এবং সে অপকর্ম কমিউনিস্টরা করেছে বলে ব্যাপক প্রচারণা শুরু করে। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি তখন নতুন নাৎসি পার্টির চাইতেও শক্তিশালী ছিলো। সুতরাং জনসাধারণকে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা অত্যাবশ্যকীয় ছিলো। জার্মানরা আরো প্রচারণা চালায় ট্রেড ইউনিয়নপন্থীদের, ইহুদিদের, উন্মাদ আর সমকামীদেরও বিরুদ্ধে। তাদের সকলকে বিভিন্ন বন্দীশিবিরে আটক রাখা হয়। এসব শিবিরে ৬০ লাখ ইহুদি এবং লাখো লাখো অন্যেরা মারা গিয়েছিলো।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাৎসিদের অবিরাম মিথ্যা প্রচারণা এবং হিটলারের প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলসের কথা নিশ্চয়ই অনেকেই জানেন। গোয়েবলস বলতেন, বার বার করে বলা হলে ঘোর মিথ্যাকেও মানুষ সত্য বলে বিশ্বাস করে। বাংলা প্রবাদে বলে, চোরের সাতদিন আর গৃহস্থের একদিন। নাৎসিদের মিথ্যার বেসাতি এবং তাদের নজিরবিহীন সমরশক্তি অবশেষে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়েছিলো। অধিকৃত কোন দেশ গোয়েবলসের মিথ্যা প্রচারে বিশ্বাস করেনি। সব দেশেই গোপন প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে ওঠে। শেষে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করে তারা জার্মানীকে বিধ্বস্ত ও পরাজিত করেছিলো। দর্পচূর্ণ হিটলার সস্ত্রীক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মান জাতি নতুন পথ ধরেছে। সংঘাতের পরিবর্তে তারা সমঝোতা ও সংলাপের পথে চলেছে। তার সুফল এখন সকলেই দেখছেন। হিটলার গোটা ইউরোপের প্রভু হতে চেয়েছিলেন যুদ্ধ করে। বর্তমানের জার্মানী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান দেশ, জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মের্কেল ইউরোপের সবচাইতে প্রভাবশালী রাজনীতিক। ইউরোপের দেশগুলোর নেতারা রীতিমতো তার অনুগ্রহ চান। মাত্র গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবার তিনি একদিনের সফরে লন্ডন এসেছিলেন। রাষ্ট্রপ্রধান না হলেও ব্রিটিশরা তাকে রাষ্ট্রপ্রধানের সমান লাল গালিচা সংবর্ধনা দিয়েছে। মিসেস মের্কেল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং বিকেলে চা খেয়েছেন বাকিংহ্যাম প্রাসাদে রাণীর সঙ্গে। মনে পড়ে ১৯৯২ সালে বার্লিনের এক সেমিনারে অ্যাঙ্গেলা মের্কেল বসেছিলেন আমার পাশে। তখন তিনি স্থানীয় রাজনীতিক এবং সমাজকর্মী। নিজের অধ্যবসায়, ঐকান্তিকতা এবং সততার দ্বারা তিনি জার্মান জাতির বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।

সে মুখোশ খুলে যাবেই

বলছিলাম যে মিথ্যা অপপ্রচারে সাময়িক সুবিধা হতে পারে কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে মিথ্যার মুখোশ খুলে যাবেই। অসাধু উপায়ে যে যতো ওপরে উঠবে তার পতন হবে ততোই সাংঘাতিক। প্রকৃত সম্মানের সঙ্গে ক্ষমতা পাবার শ্রেয়তর উপায় হচ্ছে শান্তিপূর্ণ রাজনীতি, আলোচনা ও সংলাপ। অ্যাঙ্গেলা মের্কেল বিশ্ববাসীকে সেটা দেখিয়ে দিয়েছেন।

বাংলাদেশে এখন চলছে নাৎসিদের অনুকরণে মিথ্যা অপপ্রচারের জোয়ার। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রায় সকলমন্ত্রী অর্বাচীনের মতো প্রতিপক্ষ বিএনপি এবং এ দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে অবিরাম মিথ্যা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। দুর্ভাগ্যবশত তাদের অনেকে এমন ভাষা ব্যবহার করছেন যা ভদ্র সমাজে ব্যবহারের উপযোগী নয়। খুব সম্ভবত যেসব পরিবারে তাদের জন্ম হয়েছিলো সেসব পরিবারে ভব্যতা কিংবা সংস্কৃতির নামগন্ধও ছিলো না। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচ টি ইমামও গোয়েবলসের অনুকরণে বলেছেন, একই মিথ্যা বার বার বললে সেটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে যায়। মিঃ ইমাম উচ্চশিক্ষিত। গোয়েবলসের মিথ্যা প্রচারণার পরিণতি কি হয়েছে তিনি নিশ্চয়ই জানেন। বর্তমান অবৈধ ও অনির্বাচিত সরকারের মন্ত্রী হাছান মাহমুদ সকাল-সন্ধ্যা নিত্য নতুন মিথ্যা অভিযোগ করে যাচ্ছেন প্রতিপক্ষের, বিশেষ করে বিএনপি নেত্রী এবং তিন বারের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে। এসব থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে নাৎসি পন্থায় ক্ষমতা দখল করার ও আঁকড়ে থাকার কৌশল বেছে নিয়েছে আওয়ামী লীগ।

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে

ভোটবিহীন নির্বাচনে বিজয়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথায় ও কাজে নাৎসিদের বুন্ডেস্ট্যাগ পুড়িয়ে দেয়ার কথা মনে পড়ে। বর্তমানে দেশে অপকর্মগুলো করছে আওয়ামী লীগ। কিন্তু কর্কশ কণ্ঠে সেসব সহিংস দুষ্কৃতির দায় বিএনপির ওপর চাপিয়ে চলেছেন শেখ হাসিনা। তার শাসনকালে কয়েক হাজার বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। দলীয়কৃত পুলিশ ও র‍্যাবের এবং আওয়ামী লীগের ক্যাডারদের হাতে বিগত দুবছরে ছয়শোরও বেশি রাজনৈতিক কর্মী খুন হয়েছেন। গুম-খুন হয়েছেন দু'শোরও বেশি। বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ইলিয়াস আলী আজো নিখোঁজ। তাকে এবং তার ড্রাইভারকে র‍্যাব ঢাকার বনানীতে গাড়ি থেকে টেনে বের করে নিয়ে গিয়েছিলো। বাংলাদেশে এখন সরকার ও দুষ্কৃতকারী এবং সন্ত্রাসীরা সমার্থক হয়ে গেছে। ফ্যাসিবাদের এই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য।

হিটলারের নাৎসিরা ভিন্ন মতের পত্রপত্রিকা বন্ধ করে দিয়েছে, বহু লেখক সাংবাদিককে বন্দী শিবিরে বছরের পর বছর আটক রেখেছে, ভিন্ন মতের লেখকদের হাজার হাজার বই স্তূপাকার করে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশে বিনা বিচারে সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে জেলে পুরে রাখা, ইসলামী টেলিভিশন ও দিগন্ত টেলিভিশন বন্ধ করে দেয়া, আমার দেশ পত্রিকার ছাপাখানায় তালা লাগানো এবং ২৪জন সাংবাদিককে হত্যা নাৎসিদের কাছ থেকে ধার করা টেকনিক।

আওয়ামী লীগের কর্মীরা ভয় দেখিয়ে ভোট পাবার আশায় এবং ভোট না পেলে প্রতিশোধ হিসেবে সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি ও দোকানপাট পুড়িয়ে দিচ্ছে, তাদের মন্দির ও দেবমূর্তি ভেঙে ফেলছে। যুবলীগ ছাত্রলীগের সদস্যদের 'চাঁদা' না দেবার কারণেও বহু হিন্দু নির্যাতিত হয়েছেন। গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) দ্বিতীয় দফা উপজেলা নির্বাচনের দিন পটিয়া উপজেলায় দুটি হিন্দু বাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। সে দুটি বাড়ির লোকেরা বলেছেন, আওয়ামী লীগ প্রার্থী নাসির আহমেদ নির্বাচনে পরাজিত হবার পর তার লোকেরাই তাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়েছে।

নাৎসি স্টাইলে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করার চেষ্টাও করে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ সরকার। পুলিশকে দেখা মাত্র গুলি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করছে পুলিশ-র‍্যাব। পরদিন কিংবা দু'একদিন পরে তাদের অনেকের হাতবাঁধা লাশ পাওয়া যাচ্ছে এখানে সেখানে। আসাদুজ্জামান নূরের মিছিলে হামলার জন্যে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছিলো একের পর এক তাদের লাশ পাওয়া যাচ্ছে এখানে সেখানে। চলতি বছরের প্রথম ৪৬দিনে এ রকম ৪৬টি লাশ পাওয়া গেছে। পুলিশ হেফাজতের বন্দী

রাজনৈতিক কর্মীরা কোথায় বন্দুক পায়, কিভাবে পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধ করে মারা যায়, কোন সুস্থবুদ্ধির মানুষ বুঝতে পারে না। গুম-খুন এবং বিচারবহির্ভূত হত্যা ৫ জানুয়ারির ক্যুর পরে অনেক বেড়ে গেছে। গত বছরের ৫ মে রাতে শাপলা চত্বরে যে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়া হয়েছে স্বয়ং হিটলারও বোধকরি তাতে আতঙ্কিত হতেন।

বিএনপি যখন সরকারে ছিলো শেখ হাসিনার নৈমিত্তিক একটা প্রচারণার কথা আপনাদের অনেকেরই মনে থাকার কথা। হাসিনা জোর গলায় প্রচার করছিলেন যে খালেদা জিয়া 'ইলেকশান ইঞ্জিনিয়ারিং' দিয়েই ভোটে জিতেছেন এবং সরকার গঠন করেছেন। বিশেষজ্ঞরা আওয়ামী লীগ নেত্রীর কাজকর্মেই বরং ইলেকশান ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রাধান্য দেখছেন। বেশি দূরে যাবার প্রয়োজন নেই। পাঁচ জানুয়ারির নির্বাচনকে ক্যু বলা সঙ্গত এ কারণে যে দেশের মানুষের সম্মতি নিয়ে নয়, তাদের বিরোধিতা ও প্রতিবাদের মুখেই হাসিনা ও আওয়ামী লীগ গদি দখল করে নিয়েছে।

নির্বাচনে দুর্বৃত্তপনা

সংসদের অধিকাংশ আসনে কোন নির্বাচনই হয়নি, ৫০ শতাংশের বেশি চার কোটি ৯০ লাখ ভোটদাতাকে তাদের ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট যে ১৪৭ আসনের জন্যে নির্বাচন হয়েছে তাতে বিভিন্ন মহলের মতে দুই থেকে পাঁচ শতাংশ মাত্র ভোট পড়েছে। তার পরেও সরকার গোটা কূটনৈতিক সম্পদ ব্যবহার করে বিদেশে প্রচার চালাচ্ছে এই বলে যে তারা ৪০ শতাংশের কাছাকাছি ভোট পেয়েছে। এই অপপ্রচারে তাদের সাহায্য করছে তাদের ভারতীয় পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবকরা।

বিএনপির নেতৃত্বে ১৯ দলের জোট সংসদ নির্বাচন বয়কট করেছিলো। সরকার তড়িঘড়ি উপজেলা নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছিলো এ আশায় যে বিরোধী জোট এ নির্বাচনও বয়কট করবে এবং তারা তাদের বিদেশী প্রভুদের দেখাতে পারবে যে তারা প্রকৃতই দেশের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু বিএনপি ও জামায়াতের নির্বাচন করার ঘোষণায় খুবই বেকায়দায় পড়েছে সরকার। তারপর থেকে বিভিন্ন পত্রিকায় দেখেছি উপজেলা নির্বাচনে জয়ী হবার জন্যে আওয়ামী লীগ নানা রকমের প্রস্তুতি নিচ্ছে, নিত্য নতুন কৌশল উদ্ভাবন করছে।

সেসব প্রস্তুতি ও কৌশল যে কি ছিলো এখন আর কারো বুঝতে বাকি নেই। এমন কোন নির্বাচনী দুর্নীতি নেই যা আওয়ামী লীগ প্রথম ও দ্বিতীয় দফার উপজেলা নির্বাচনে করেনি। তাদের ক্যাডাররা ভোট কেন্দ্র দখল করে ভুয়া ভোট দিয়ে ব্যালট বাক্স ভরাট করেছে, বিরোধীদের নির্বাচনী এজেন্টদের তারা ভয় দেখিয়ে এবং পেশীশক্তির জোরে ভোট কেন্দ্র থেকে বিতাড়িত করেছে।

প্রিজাইডিং অফিসারকে এবং পুলিশকেও কোথাও কোথাও ভুয়া ভোট দিয়ে ব্যালট বাক্স ভরাট কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা বহু স্থানে ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা দিয়েছে। ঠাকুরগাঁও জেলার ডেপুটি কমিশনার মুখেশ চন্দ্র বিশ্বাস স্বীকার করেছেন যে বালিয়াডাঙ্গি উপজেলার হরিণমারীতে আওয়ামী লীগের কর্মীরা ভোটারদের বাধা দিলে ১৯ দলের জোটের কর্মীরা প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসে। পুলিশ তাদের বাধা দিলে যে সংঘর্ষ হয় ৪ বিজিবি সদস্যসহ ৯জন তাতে আহত হয়েছেন। কোম্পানিগঞ্জ ও ক্ষেতলালে দুজন প্রিজাইডিং অফিসার আওয়ামী লীগ কর্মীদের অত্যাচারে হার্ট ফেল করে মারা যান।

প্রথম দুই উপজেলা নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়

এতোসব করেও আওয়ামী লীগ ভরাডুবি এড়াতে পারেনি। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে বিএনপি ৫২টি উপজেলায় জয়ী হয়েছে আর আওয়ামী লীগ জয়ী হয়েছে ৪৬টিতে। প্রথম দফা উপজেলা নির্বাচনেও হেরে গেছে আওয়ামী লীগ। বিএনপি ও জামায়াত সমর্থক প্রার্থীরা আওয়ামী লীগের প্রায় দ্বিগুণ ভাইসচেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। বিএনপি যেখানে ৪৪টি উপজেলা জয় করেছে সে ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ৩৪টি উপজেলায় জয়ী হয়। যে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে উভয় নির্বাচনে সেসব না হলে আওয়ামী লীগ এক ডজন উপজেলায়ও জয়ী হতো কিনা সন্দেহ আছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হবে যে গত বছর যে পাঁচটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হয়েছিলো তাতে আওয়ামী লীগ সবগুলোতেই পরাজিত হয়েছিলো। এমনকি আওয়ামী লীগের দুর্গ নামে পরিচিত গাজীপুরেও ক্ষমতাসীন দল পরাজিত হয়েছিলো। বাকি উপজেলাগুলোতে জয়ী হবার আশায় আওয়ামী লীগের লোকজনকে প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ করা হচ্ছে, আওয়ামী লীগের ক্যাডারদের আরো হিংস্র হবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

কথা হচ্ছে এতোসব দুর্নীতি করেও আওয়ামী লীগ অবশিষ্ট তিনটি উপজেলা নির্বাচনে জয়ী হতে পারবে কিনা। ব্যালট বাক্স ছিনতাই, গুণ্ডামী ইত্যাদি দুর্নীতিগুলো কিছু কম হলেই বেধড়ক মার খাবে আওয়ামী লীগ বাকি উপজেলা নির্বাচনগুলোতেও। বিশ্বের কোথাও কেউ এখন আর বিশ্বাস করে না যে আওয়ামী লীগের পেছনে জন সমর্থন আছে। ভারতীয় কূটনীতিকদের ব্যাপক প্রচেষ্টা আর বৃহৎ শক্তির স্বার্থের মারপ্যাঁচে শেখ হাসিনার সরকার ৫ জানুয়ারির ভোটারবিহীন নির্বাচনের পরেও এ যাবৎ কোন মতে টিকে আছে। কিন্তু তাদের ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে নির্যাতন-নিপীড়ন এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তীব্রতর করে তুলে বাকশালী কায়দায় স্থায়ীভাবে গদি দখল করে থাকাই শেখ হাসিনার পরিকল্পনা। সম্প্রতি তিনি বলতে শুরু করেছেন ২০৫০ সাল নাগাদ তিনি বাংলাদেশকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করবেন।

বাংলাদেশের মানুষ এখন খাবি খাচ্ছে। তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ভোটাধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। জান-মালের নিরাপত্তা বলে কিছু অবশিষ্ট নেই এই দেশে। 'বন্দুক যুদ্ধ' আর 'ক্রসফায়ারের' রহস্য এখন সকলের জানা হয়ে গেছে। কিন্তু দলীয়কৃত পুলিশ, র‍্যাব আর আদালতের কল্যাণে ন্যায় বিচারের অধিকারও হারিয়ে ফেলেছে বাংলাদেশের মানুষ। সরকারি দলের গুণ্ডারা মানুষের সহায়-সম্পত্তি, এমনকি নারীর সম্ভ্রমও ছিনিয়ে নিচ্ছে। দেশের সম্পদের একটা বিরাট অংশ লুট হয়ে গেছে। মালয়েশিয়ায়, দুবাইতে আর লন্ডনে সে সম্পদ দিয়ে সম্পত্তি কেনা হয়ে গেছে। একদিকে আকাশচুম্বী দ্রব্যমূল্য, তার ওপর গ্যাস বিদ্যুৎ ইত্যাদির ধারাবাহিক বৃদ্ধি মধ্যবিত্তের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো আরো এক দফায় বিদ্যুতের দাম প্রায় সাত শতাংশ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। দুর্নীতি কিংবা চুরি যারা করছেন না তারা এখন অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে খাবি খাচ্ছেন। শেখ হাসিনার স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্টার আগেই বাংলাদেশের মানুষকে বেহেশতে যেতে হবে।

দেশের সর্বনাশ, বিদেশীদের জন্যে দাক্ষিণ্য

দেশে শিক্ষিত-অশিক্ষিত কারো কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। বাংলাদেশের শিক্ষিত ছেলেরাও উপসাগরীয় দেশগুলোতে, মধ্যপ্রাচ্যে এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কোন কোন দেশে কুলি-মজুরের কাজের জন্যে ছুটছে মরিয়া হয়ে এবং ধারকর্জ করে। পথে এবং বিদেশে তারা লুণ্ঠিত ও নির্যাতিত হচ্ছে। মাত্র গত বছরে তাদের ১২,০০০ লাশ এসেছে বাংলাদেশে। অথচ বাংলাদেশে ভারতীয়দের চাকরির অভাব হয় না। তৈরি পোষাকের এবং অন্যান্য শিল্পে এখন চাকরি করছে কম সে কম পাঁচ লাখ ভারতীয়। গত বছর তারা বাংলাদেশ থেকে ভারতে রেমিটেন্স পাঠিয়েছে ৩৭১ কোটি ৬০ লাখ ডলার। এবং সন্দেহ করা হচ্ছে ভারতের লাভের জন্যে বাংলাদেশের শিল্পগুলো ধ্বংস করার লক্ষ্যে তাদের অনেকে সাবোটাজ চালাচ্ছে নিজ নিজ কর্মস্থলে।

হাসিনা কেন ভারতকে তোয়াজ করছে কারোই বুঝতে বাকি নেই। দিল্লির অনুগ্রহে ২০০৮ সালে তিনি ক্ষমতা পয়েছিলেন এবং আজো গদিতে আছেন দিল্লির অনুগ্রহে। জনসমর্থন-বিহীন হাসিনা স্বৈরশাসন চালাচ্ছেন বাংলাদেশে। কিন্তু সে ধরনের অবস্থা তার ভারতীয় অভিভাবকরাও নিজেদের দেশে বরদাশত করবেন না। গোপন চুক্তি করে, জনসাধারণের অজান্তে তিনি ভারতকে বিনা ফি-তে সড়ক, রেল ও নদীপথে ট্রানজিট দিয়েছেন, বিনা মাশুলে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরও অবাধ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। বিনিময়ে কি পেলো বাংলাদেশের মানুষ? তাদের চাকরি-বাকরি নিয়ে যাচ্ছে ভারতীয়রা। বাংলাদেশের কল-কারখানা বিনাশ করে ভারতের উৎপাদনকে একচেটিয়া করে নিচ্ছে। তাদের যে পণ্য অন্যত্র বিক্রি হয় না সেগুলো বাংলাদেশে ডাম্প করা হচ্ছে। বাণিজ্যের

ভারসাম্য বহু হাজার কোটি ডলার ভারতের অনুকূলে এবং সে ব্যবধান বেড়েই চলেছে।

অন্যদিকে বাংলাদেশের প্রাপ্যটাও দিতে ভারত অস্বীকার করছে। ১৯৭৪ সালে হাসিনার পিতা সীমান্ত সহজীকরণ চুক্তি করেছিলেন ভারতের সঙ্গে। কালবিলম্ব না করে তিনি সংবিধান সংশোধন করেছেন, বেরুবাড়ি ছিটমহলটা ভারতের হাতে তুলে দিয়েছেন। কিন্তু সে চুক্তি ভারত আজো অবধি পালন করেনি, তিন বিঘা ছিটমহলটি বাংলাদেশ আজো পায়নি। আজো অবধি তিস্তার পানি বন্টন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি ভারত।

মনমোহনের দুঃখ

মনমোহন বলেছেন তিনি আসছে নির্বাচনের পরে প্রধানমন্ত্রী থাকতে চান না। সে নির্বাচন হবে খুব সম্ভবত মে মাসে। ভারতীয় বিশেষজ্ঞ পর্যবেক্ষকরা প্রায় একবাক্যে বলছেন সে নির্বাচনে কংগ্রেস হেরে যাবে। সে ক্ষেত্রে মনমোহনের প্রধানমন্ত্রী থাকার প্রশ্নও উঠতো না। মনমোহন সিং মিয়ানমারে শেখ হাসিনার সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎ করেছেন, উপরোক্ত চুক্তিদুটি বাস্তবায়ন না করার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু মনমোহনের দুঃখ প্রকাশে বাংলাদেশের মানুষের পেট ভরবে না, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে তাদের মন বিষিয়ে উঠবে মাত্র। ভারত আন্তর্জাতিক চুক্তি পালন করে না। অথচ শেখ হাসিনা বাংলাদেশের অবকাঠামো এবং সার্বভৌমত্ব ভারতের হাতে তুলে দিয়েছেন। সুন্দরবন ধ্বংস করার বিপদ অগ্রাহ্য করে ভারতকে বাংলাদেশের মাটিতে পরিবেশ বিনাশী কয়লা জ্বালানো বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করতে দিয়েছেন।

অত্যাচারী শেখ হাসিনা এবং তার অত্যাচারী বর্বর সরকারকে অবিলম্বে টেনে নামানো না হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিলীন হয়ে যাবে, জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। বিএনপি তাদের কিছু ভ্রান্ত নীতি ও ভুল কৌশলের কারণে দীর্ঘ আন্দোলনেও এই সরকারকে গদিচ্যুত করতে পারেনি। খালেদা জিয়া রাজবাড়ির বিশাল জনসভায় বলেছেন উপজেলা নির্বাচনগুলো শেষ হয়ে গেলে তিনি আবার তার ১৯ দল নিয়ে নতুন ও সংশোধিত কৌশলে আন্দোলন শুরু করবেন। সেটা আশার কথা। কিন্তু বিএনপি মহল থেকে শোনা যাচ্ছে সে শুরু হবে মে মাসে। এটা দেশের মানুষ বুঝে উঠতে পারছে না। উপজেলা নির্বাচন শেষ হবে মার্চ মাসের মধ্যেই। তাহলে মে মাসের জন্যে অপেক্ষা কেন? খালেদা জিয়ার জানা থাকার কথা একমাস বেশি সময় পেলে সরকার তাদের স্বৈরতন্ত্রী ভিত্তি পাকা করার বাড়তি এক মাস সময় পাবে।

(লন্ডন, ০৪.০৩.১৪)

নাৎসিরা যেভাবে জার্মান জাতিকে শেকলবন্দী করেছিলো

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দুর্ধর্ষ জার্মান ইউবোট (সাবমেরিন) বহরের একজন ডাকসাইটে ক্যাপ্টেন ছিলেন মার্টিন নায়েমোলার। জার্মান মিডিয়া জাতির ও সামরিক বাহিনীর মনোবলকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে তাকে নিয়ে বহু কাহিনী প্রচার করেছে । সে যুদ্ধের পর তিনি নৌবাহিনী ছেড়ে যাজক বৃত্তি গ্রহণ করেন। গোড়ায় তিনি হিটলারের রাজনীতিকে সমর্থন করতেন। হিটলারের দলের পোশাকী নাম 'ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি' অনেককেই আকৃষ্ট করেছিলো। কিন্তু নায়েমোলারের মোহভঙ্গ হতে বেশি দেরি হয়নি। ক্রমেই তিনি নাৎসিদের স্বৈরাচারী এবং হিংস্র স্বরূপ দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছিলেন। নায়েমোলার ১৯৩৩ সালের গোড়ায় নাৎসিদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। পরের বছর তিনি পুলিশি নির্যাতন থেকে যাজকদের রক্ষার জন্যে একটা 'সিনোড' (যাজক সমিতি) গঠন করেন। এ সমিতি হিটলারের বিরুদ্ধে জার্মান জাতির প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়।

নায়েমোলার ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত নাৎসিদের নীতি ও কার্যক্রমের তীব্র ও ব্যাপক সমালোচনা করেন বহু যাজক সভায় এবং প্রবন্ধে। ১৯৩৮ সালে নাৎসি পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে' (বন্দী শিবির) পাঠায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত (১৯৪৫) তিনি সে শিবিরে বন্দী ছিলেন। হিটলারের পরাজয় এবং মিত্র বাহিনীর বিজয়ের পর মুক্ত হয়ে তিনি ঘোষণা করেন যে হিটলার ও তার নাৎসিদের বর্বরতার জন্যে জার্মান জাতি সম্মিলিতভাবে দোষী, সে দায়িত্ব থেকে কেউ মুক্ত নন। ১৯৪৫ সালে লেখা তার কিছু পংক্তি আজো বিশ্বব্যাপী আলোচিত এবং উদ্ধৃত হয়। পংক্তিগুলো ছিলো নিম্নরূপঃ

"প্রথমে ওরা কমিউনিস্টদের ধরতে এলো,/ আমি প্রতিবাদ করিনি,/ কেননা আমি কমিউনিস্ট ছিলাম না।/ তার পর তারা এলো ট্রেড ইউনিয়নিস্টদের পাকড়াও করতে,/ আমি কিছু বলিনি,/ কেননা আমি ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য ছিলাম না।/ এর পর তারা এলো ইহুদিদের গ্রেফতার করতে,/ আমি কিছু বলিনি,/ কারণ আমি ইহুদি ছিলাম না,/ তারপর তারা ধরতে এলো ক্যাথলিকদের,/ আমি প্রতিবাদ করিনি,/ কেননা আমি ছিলাম প্রোটেস্ট্যান্ট।/সব

শেষে তারা এলো আমাকে ধরতে,/ কিন্তু ততোদিনে আমার হয়ে প্রতিবাদ করতে কেউ অবশিষ্ট ছিলো না।"

হয়তো লক্ষ্য করেছেন নাৎসিরা এক সঙ্গে সকল বিরোধী শক্তির ওপর হামলা করেনি। এক সঙ্গে সকলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া মারাত্মক হতো তাদের জন্যে। তখনকার জার্মানীতে অনেকেই কমিউনিজমকে ভীতির চোখে দেখতো। সুতরাং কমিউনিস্টদের পাইকারী ধরপাকড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠেনি। জার্মান অর্থনীতির ওপর ইহুদিদের অনানুপাতিক প্রভাব বহু জার্মানের ক্রোধের কারণ ছিলো। নাৎসিরা প্রচার শুরু করে যে ইহুদিরাই কমিউনিজম ছড়াচ্ছে। তারপর ইহুদিদের গ্রেফতার করে বন্দী শিবিরে নিয়ে যাওয়াতে সাধারণ জার্মান বরং খুশিই হয়েছিলো। শিল্পপতিরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে তাদের শোষণের পথের কাঁটা বিবেচনা করতো। প্রভাবশালী শিল্পপতিরা ট্রেড ইউনিয়নিস্টদের গ্রেফতারে অখুশি হয়নি।

রোমান ক্যাথলিক ধর্মমত জার্মান গীর্জার মূল ধারা প্রোটেস্ট্যান্টদের চক্ষুশূল ছিলো। কাজেই বিনা প্রতিবাদে ক্যাথলিকদের ধরে নেওয়া হয়। শেষে দেখা গেল হিটলার ও নাৎসিদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দূরের কথা, ভিন্ন মত প্রকাশের সাহসও কারো ছিলো না। হিটলার গোটা জার্মান জাতিকে ক্রীতদাসের মতো নীরব কর্মীতে পরিণত করেছিলেন। নাৎসি বাহিনীর কোন না কোন শাখায় যোগ না দিয়ে জার্মান যুবকদের উপায়ান্তর ছিলো না। রাষ্ট্রের নির্বাচিত সুদর্শন ও সুস্বাস্থ্য 'আর্য' পুরুষের সঙ্গে সঙ্গম করে নিখাঁদ 'প্রভুর জাতি' আর্য সন্তানের জন্ম দেয়া নারীদের নৈতিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। হিটলারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র ইতঃস্তত ভাবও নাৎসিরা গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

আমি সাংবাদিকতা করছি ৬৪ বছর ধরে। সংবাদ ও তথ্যের বিশ্ব রাজধানী লন্ডনে আছি ৫৪ বছর। ৩৪ বছর বিবিসিতে কর্মরত অবস্থায় আমার মূল কাজকারবার ছিলো বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে। রাজনৈতিক আনুগত্য বলে আমার কিছু ছিলো না। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য ছিলো। বড়ো ভাইয়ের বন্ধু হিসেবে তাকে আমি আজীবন মুজিব ভাই ডেকেছি, বড়ো ভাইয়ের মতোই ভালোবেসেছি। বাংলাদেশে এখন আওয়ামী লীগ সরকারের দয়ায় ভণ্ড ও প্রতারক মুক্তিযোদ্ধা পথের কাঁকরের মতোই সর্বব্যাপী। তাদের কথা আমি বলছি না। আমি বলছি তাদের কথা যারা জীবন পণ করে মুক্তি যুদ্ধ করেছিলেন, দেশটাকে স্বাধীন করেছিলেন। সৌভাগ্যবশত তাদের কেউ কেউ এখনো বেঁচে আছেন। একাত্তরে তাদের মতো আমারো ভূমিকা ছিলো এবং সে ভূমিকার জন্যে প্রধানমন্ত্রী হয়ে মুজিব ভাই প্রকাশ্যে আমাকে পুরস্কৃত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

পাকিস্তান থেকে মুক্তি পাবার পর যে জনপ্রিয়তা জাতি তাকে দিয়েছিলো একমাত্র কারামুক্ত নেলসন ম্যান্ডেলা ছাড়া আধুনিক ইতিহাসে তার আর কোন তুলনা খুঁজে পাই না। গত বছরের শেষ প্রান্তে এসে ম্যান্ডেলা শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন। তার প্রয়াণে সারা বিশ্ব শোকে মুহ্যমান হয়েছে, অশ্রুপাত করেছেন অজস্র সহস্র মানুষ। অন্যদিকে শেখ মুজিবের মৃত্যু? আমি এবং আমার স্ত্রী ছাড়া এমন আর কাউকে জানি না যিনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট অশ্রুপাত করেছেন। এই বেদনাদায়ক বিসাদৃশ্যের কারণ সৃষ্টি করেছেন মুজিব ভাই নিজে।

শেখ মুজিবঃ অঙ্গীকার আর বাস্তবতা

গণতন্ত্রের কথা বলে বাংলাদেশের মানুষের সমর্থন তিনি অর্জন করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হলে গণতন্ত্র আসবে, এ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তারা তার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও ৯৩ হাজার সৈন্যের একটা অত্যাধুনিক ও সুসজ্জিত বাহিনীর বিরুদ্ধে বলতে গেলে খালি হাতে লড়াই করতে গিয়েছিলো। কিন্তু মুজিব তাদের হতাশ করেছেন। ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি আমাকে বলেছিলেন গণতন্ত্রকে অবাধে বৃদ্ধি পেতে না দিলে সে গণতন্ত্র বিকশিত হতে পারে না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হয়ে কতিপয় দুষ্ট লোকের পরামর্শে তিনি একদলীয় সরকার গঠনের লক্ষ্যে ভিন্নমত দলনের সকল প্রচেষ্টা শুরু করে দেন।

তার রক্ষী বাহিনী ১৯৭২-'৭৩ সালে ৪০ হাজার সমালোচক ও ভিন্নমত পোষণকারীকে হত্যা করেছিলো। রক্ষী বাহিনীর অধিপতি বর্তমান বিতর্কিত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীপদে আসীন আছেন এবং ঘন ঘন রাজনৈতিক বিরোধীদের 'নির্মূল' করার হুমকি দিচ্ছেন। মুজিব কথায় কথায় সমাজতন্ত্রের জপ করতেন। বাংলাদেশের সংবিধানেও সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রাদর্শের অন্যতম খুঁটি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ বিশেষ একটা শ্রেণীর কুক্ষিগত করার এমন সুযোগ পাকিস্তানী আমলেও ছিলো না।

প্রধানমন্ত্রী হবার পরেও অন্তত এক ডজন উপলক্ষে একান্তে মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ আমার হয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ কিংবা আব্দুর রাজ্জাক (প্রয়াত) প্রায় অনিবার্যভাবেই এসব সাক্ষাতের সময় উপস্থিত থাকতেন। অনেক সুপরামর্শ আমি তাকে দিয়েছি। হয়তো ওই দুই নেতার পরামর্শেই তিনি আমার প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করেননি। প্রকাশ্যে আমি প্রথম তার সমালোচনা করি ১৯৭৪ সালে লন্ডন বিমান বন্দরে। বাংলাদেশে জরুরি ক্ষমতা আইন এবং পত্রপত্রিকা নিষিদ্ধ করা নিয়ে ফ্লিট স্ট্রিটের প্রায় দুই ডজন সাংবাদিকের উপস্থিতিতে আমাদের উষ্ণ বাদানুবাদ হয়।

আমার প্রায়ই মনে হয় যে চক্রটি ১৯৭২-৭৫ সালে ভুল পরামর্শ দিয়ে এবং কুপথে পরিচালিত করে শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বনাশ অনিবার্য করে

তুলেছিলো সে চক্রটি মুজিবের সঙ্গে কবরে যায়নি। [খুবই দুঃখের কথা]। মুজিব ভারত-বান্ধব ছিলেন। ভারতের সহযোগিতায় স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা বিবেচনা করতে আগরতলা গিয়েছিলেন তিনি। একটা গণ-অভ্যুত্থান না হলে পাকিস্তানীরা নিশ্চয়ই দেশদ্রোহিতার অভিযোগে তাকে ফাঁসিতে লটকাতো।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি ইন্দিরা গান্ধীর হাতে ভাত খেতে রাজি হননি। তাজউদ্দীন একাত্তর সালে দিল্লির সঙ্গে যে সাত দফা চুক্তি করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিগত অনুরোধ সত্ত্বেও মুজিব সে চুক্তি মানতে রাজি হননি। তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশ থেকে সরে যেতে বাধ্য করেছিলেন, দিল্লির দাবি অনুযায়ী বিডিআর বাহিনীকে ভেঙ্গে দিতে এবং বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র নীতির দায়িত্ব ভারতের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করেছিলেন। মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনা যে পিতার নীতির বিরোধীতা করে চলেছেন তার কারণ খুব সম্ভবত পিতার মতো তার নীতি এবং কার্যও নিয়ন্ত্রণ করছেন এমন ব্যক্তিরা যারা তার পিতারও সর্বনাশ করেছিলেন।

মনে রাখতে হবে মুক্তিযুদ্ধের সময় দিল্লির নীতি-নির্ধারকরা ধরে নিয়েছিলেন পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা কিছুতেই শেখ মুজিবকে জীবিত স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসতে দেবে না । সে জন্যে তারা বাংলাদেশের জন্যে নেতৃত্ব তৈরির উদ্যোগ নিলেন। ভারতে তাদের আশ্রিত কয়েকজন অপেক্ষাকৃত তরুণ আওয়ামী লীগ নেতাকে নিয়ে মুজিব বাহিনী গঠন করেন এবং সামরিক প্রশিক্ষণের জন্যে তাদের ইন্ডিয়ান মিলিটারী একাডেমিতে পাঠান। অবশ্যই ধরে নিতে হবে তারা বরাবর দিল্লির প্রতি অনুগত থাকবেন বলে তাদের কাছ থেকে মুচলেকা আদায় করে নেওয়া হয়েছিলো। অদৃষ্টের পরিহাস, তাদের প্রশিক্ষণের মাঝ পথেই জীবিত মুজিব স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এলেন। একটা কম জানা ঐতিহাসিক ঘটনার কথা এখানে আগ্রহজনক হতে পারে। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি মুজিব যখন পাকিস্তান থেকে লন্ডনে আসেন তখন তাকে বাংলাদেশে নিয়ে যাবার জন্যে ইন্দিরা গান্ধী একখানি ভারতীয় এয়ারলাইনার পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমি এবং আমরা কয়েকজন ভারতীয় বিমানে দেশে না যাবার পরামর্শ তাকে দিয়েছিলাম এবং মুজিব আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন।

অধিকার আর মর্যাদা হানি রোবোট তৈরি করে

আলোচনা শুরু করেছিলাম জার্মানীর প্রসঙ্গ দিয়ে। হিটলারের নাৎসিরা যেসব কৌশলে জার্মান জাতির মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে তাদের 'অটোমেটনের' (রোবটের মতো স্বয়ংক্রিয়) মতো যুদ্ধ যন্ত্রে পরিণত করেছিলো সেদিকে আলোকপাত করাই ছিলো উদ্দেশ্য। মানুষের মানবাধিকার

যদি হরণ করা হয়, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার যদি পদদলিত করা হয়, আর তাদের আত্মমর্যাদা যদি কেড়ে নেওয়া হয় তাহলে পশুর সঙ্গে সে মানুষের বিশেষ কোন তফাৎ থাকে না। মেষপাল কিংবা রাখাল যেমন তাদের পশুগুলোকে যদৃচ্ছা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় গণতন্ত্র মানবাধিকার ও আত্মমর্যাদা হারানো মানুষকেও তেমনি দুরভিসন্ধি ব্যক্তি আত্মস্বার্থে ব্যবহার করতে পারে। হিটলার ও মুসোলিনী ঠিক তাই করেছিলেন। তার পরিণতি যে বিশ্বজোড়া সকলের জন্যেই অশুভ হতে বাধ্য সেটা বিবেচনা করার ধৈর্য্য কিংবা সময় তাদের ছিলো না।

বিচারবুদ্ধির সীমা কিংবা দৈন্য থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু দীর্ঘ কর্মজীবনে বিশ্ব পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ থেকে ত্রিশের দশকের জার্মানী আর বর্তমান বাংলাদেশের মধ্যে হুবহু মিল আমি দেখতে পারছি, আর দেখে আতঙ্কিত হচ্ছি। হিটলারের অপকৌশল অনুকরণ করে বাংলাদেশের মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্রীতদাসে পরিণত করার সঙ্কল্প নিয়েই কি ২০০৯ সালে একটা সরকার যাত্রা শুরু করেছিলো? তা না হলে আজ আমরা যেখানে পৌঁছেছি তার ব্যখ্যা কোথায় খুঁজে পাবো?

ছিয়ানব্বইয়ে তো জামায়াত যুদ্ধাপরাধী ছিলো না!

নিউইয়র্ক আর ওয়াশিংটনে ২০০১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর আল কায়েদাদের সন্ত্রাসের পর পশ্চিমে, বিশেষ করে আমেরিকায় ইসলামী সন্ত্রাস সম্বন্ধে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বলতে গেলে তারা রজ্জুতে সর্পভ্রমের মতো এবং পঞ্চাশের দশকে 'খাটের নিচের লুকোনো' কমিউনিস্টদের মতো সর্বত্র ইসলামী সন্ত্রাস আবিষ্কার করতে থাকে। এদিকে ভারতের শাসকচক্র ধরে নিয়েছিলো বাংলাদেশের মানুষ যে অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য অংশ এবং বাণিজ্যে ভারসাম্য স্থাপনের দাবি করে, সীমান্তে বিএসএফের উৎপাত বন্ধ করতে বলে, সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয়দের জমি দখল এবং ফসল লুণ্ঠনের অবসান চায়, এগুলো 'জামায়াতের অপরাধ'। তারা বাংলাদেশের মানুষকে ভারতের প্রতি বৈরী করে তুলছে বলেই এমনটা হয়। শেখ হাসিনার দ্বিতীয় দফার সরকারে নিশ্চয়ই এমন অতি-চালাক কেউ ছিলো যারা ধরে নিয়েছিলো যে পাইকারীভাবে ধর্মভীরু মুসলমান ও জামায়াতের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা নেয়া হলে এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে, ওয়াশিংটন আর নয়াদিল্লির অনুগ্রহ পাওয়া যাবে একই সঙ্গে।

জামায়াতের সঙ্গে আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ইতিহাস যারা জানেন তারা হঠাৎ করে জামায়াতকে সন্ত্রাসবাদী বলে ফতোয়া দেবার আর কোন কারণ খুঁজে পাবেন না। সামরিক স্বৈরশাসক লে. জে. এরশাদ ১৯৮৬ সালে লোক দেখানো সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দিলে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতসহ ছয়

দলের জোট সে নির্বাচন বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু রাতারাতি জামায়াতকে দলে ভিড়িয়ে শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন যে তারা এরশাদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ১৯৯৫-৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে শেখ হাসিনা আন্দোলন করেছিলেন জামায়াতকে সঙ্গে নিয়ে। মনে পড়ে মওলানা মতিয়ুর রহমান নিজামী ও অন্যান্য জামায়াত নেতার পাশে বসে শেখ হাসিনার আন্দোলনের কলা-কৌশল নিয়ে আলোচনার আলোকচিত্র মিডিয়ায় দেখেছিলাম। ১৯৯৬ সালের জুন মাসের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক গরিষ্ঠতা পায়নি। জামায়াতের সাংসদদের সমর্থন নিয়ে শেখ হাসিনা সরকার গঠন করেছিলেন। শেখ হাসিনার তখন মনে হয়নি যে একাত্তরে জামায়াতের কোন কোন নেতা যুদ্ধাপরাধী ছিলেন কিংবা জামায়াত একটি জঙ্গি দল। বাংলা প্রবাদে বলে 'কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরালে পাজী'।

ধর্মীয় চরমপন্থী আমি নই এবং কখনো ছিলাম না। আমার ধারণায় বাংলাদেশের ৯৮-৯৯ শতাংশ মুসলমানই ধর্মীয় উগ্রপন্থী নন। সুতরাং 'ধর্মীয় চরমপন্থী' আখ্যায়িত করে এবং হেজবুত-তাহরির কিংবা জেএমবি অপবাদ দিয়ে হাজারে হাজারে টুপি-দাড়ি পরিহিত এবং মসজিদে নামাজ পড়া মানুষকে পাইকারী ধরপাকড় করা হলে 'আলট্রা সেকুলারিস্টদের' আপত্তি হবার কথা নয়। কিন্তু আমেরিকা এবং ভারতের স্বল্পবুদ্ধি সাধারণ মানুষের বাহবা পাওয়া যায় তাতে। দেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিলো ৪৩ বছর আগে। সে যুদ্ধে ভ্রান্ত মতির কিছু লোক পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য আঁকড়ে ধরে ছিলো। তাদের কেউ কেউ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বকে নির্বংশ করার চেষ্টা করেছে, বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে। তাদের বিচারের তাগিদ সর্বজনীন। দেশের মানুষের আবেগের ঝড় তুলে বুদ্ধিজীবী হত্যার কিংবা একাত্তরের যুদ্ধাপরাধের বিচারের নামে জামায়াতের শীর্ষ নেতৃত্বকে (এবং বিএনপিরও দুজনকে) বিতর্কিত আদালতে বিতর্কিত বিচারে চড়ানো হলো, কিন্তু যেসব যুদ্ধাপরাধী মুজিব কোট পরে রাতারাতি আওয়ামী লিগার বনে গেলেন কিংবা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আত্মীয়তা পাতালেন, বিচারের আঁওতা থেকে তারা বাদ পড়লেন। এটা সমর্থন করি কি করে?

বাংলাদেশ কি জঙ্গি দেশ?

জামায়াতকে ইসলামী সন্ত্রাসী বলে মেনে নিতে মার্কিন সরকারও রাজি হয়নি। তাতে কি? মনমোহন সিং তো মনে করেন যে জামায়াত বাংলাদেশের মানুষকে ভারতের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন করে তুলছে। সুতরাং আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে জামায়াতের নিবন্ধন বাতিল করাও, শাহবাগে কয়েকজন ভারতের দালালকে দিয়ে জামায়াতের বিরুদ্ধে শ্লোগান তোলো, তাহলেই ঢাক

পেটানো যাবে যে জামায়াত জঙ্গি দল, তাকে নিষিদ্ধ করতে হবে। জঙ্গিদের কারা মসজিদে নামাজ পড়তে যায় দেখার জন্যে মসজিদে আওয়ামী লীগের গুণ্ডাদের পাঠানো হচ্ছে। তারা মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করছে। বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ মানুষ মুসলমান। এই সরকার বিশ্বব্যাপী ধারণা সৃষ্টি করছে যে তারা সবাই জঙ্গি এবং বাংলাদেশ একটা জঙ্গি দেশ।

ইদানীং একই ব্র্যাকেটে বিএনপিকেও অন্তর্ভুক্ত করার জোর চেষ্টা শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিএনপির প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন, জঙ্গিদের দোসরদেরও ছাড় দেয়া হবে না। খালেদা জিয়া কথা বললে মাহাবুবুল আলম হানিফ সন্ত্রাসের গন্ধ পান। মন্ত্রী হাছান মাহমুদ সকাল-সন্ধ্যা যেভাবে খালেদা জিয়ার নাম জপ করছেন সে রকম ঐকান্তিকতা নিয়ে আল্লাহ্‌র নাম জপ করলে তার জান্নাতবাসী হবার সম্ভাবনা বেড়ে যেতো। তিনি বিএনপি এবং জামায়াতের নাম জপ করছেন একই দমে। ভারতের দুনম্বর প্রিয় আওয়ামী লীগ নেতা আমির হোসেন আমু বলেছেন, জামাত-শিবির নির্মূল হওয়া পর্যন্ত সংসদ নির্বাচন হবে না। অন্য কোন কোন মন্ত্রী বিএনপিকেও নির্মূল করার ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন। ইতোমধ্যে মোনাফেকি এবং ফেরেববাজি করে জাতীয় পার্টিকেও প্রায় নির্মূল করে ফেলা হয়েছে। এ দলটি এখন নিছক শেখ হাসিনার 'ডোমেস্টিকেটেড অপোজিশন'। রওশন এরশাদ এখন এরশাদকে ছেড়ে হাসিনার প্রেমে মজেছেন।

সার কথা হচ্ছে দেশে যাতে আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কোন দল না থাকতে পারে সে ব্যবস্থা অনেকদূর এগিয়ে নিয়েছে সরকার, যেমন করে জার্মানীতে নাৎসি দল আর আর সকল রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা হয়েছিলো। কিন্তু এ দেশের মানুষের বিবেক জাগ্রত হয়েছে কি? আমার মনে হয় না। অন্যকে গুম করে খুন করা হয়েছে, সে তো আমার ভাই-বেরাদার কিংবা আমার দলের কেউ নয়। রুনি-সাগর কিংবা মাহমুদুর রহমানও তো আমার আত্মীয় নন। অন্যের দল বিলোপ করা হচ্ছে, তাতে আমার কি? তাতে হয়তো আমার দলেরই সুবিধা হবে। শাসক দলের গুণ্ডারা অন্যের জমি দখল করে নিচ্ছে, অন্যের মেয়েকে ধর্ষণ করেছে, তাতেও আমার বিশেষ কিছু এসে যায় না। শুধু আমার গায়ে হাত না পড়লেই হলো। কিন্তু আমার গায়ে যেদিন হাত পড়বে সেদিন প্রতিবাদ করার, আমার পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্যে কেউ অবশিষ্ট থাকবে কি? নায়েমোলারের মতো আজ আমারো মনে হচ্ছে বাংলাদেশ আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেজন্যে আমরা সবাই সমানে দোষী।

(লন্ডন, ১১.০৩.১৪)

সরকার যেন আকাশ থেকে পড়ে গেল। ঢাকায় বাংলাদেশ-ভারত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠক শেষে ভারত 'হঠাৎ করেই' বাংলাদেশকে ১০০ কোটি ডলার ঋণ দানের প্রস্তাব দিয়ে বসলো। অন্তত সে ধারণাই দিতে চায় সরকার। তারা বলছে ভারতের কাছে তারা ঋণ চায়নি। প্রথম দৃষ্টিতে সৌভাগ্যই বলতে হবে। না চাইতেই এমন মোটা অঙ্কের ঋণ! চাইলে না জানি আরো কতো মোটা অঙ্কের ঋণ নিয়ে এগিয়ে আসতো ভারত! ভাগ্য ভালো। এখন আমি অর্থ কষ্টে ভুগছি বলা সত্যের অপলাপ হবে। কিন্তু এক কালে অর্থ কষ্ট আমারো ছিলো। তখন কেউ অযাচিত ঋণের প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসেনি। বরং ঋণ চাইবো ভয় করে কেউ কেউ রাস্তার অন্য দিক দিয়ে হেঁটেছেন।

ফাটা কপালের মতো ভারতের এই আকস্মিক ঋণ দানের আগ্রহ সেজন্যেই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। অনেক ভেবেচিন্তে কিছুটা হদিস পাওয়া গেল বাংলাদেশের বাণিজ্য সচিব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন পাটোয়ারি এবং ভারতের যুগ্ম সচিব অরবিন্দ মেহতার কিছু মন্তব্যে। দু'দেশের বৈঠকের সাফল্য সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তারা যেসব কথা বলেছেন তার থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধে ভারতীয় মোটরযান চলাচলের মোটর ভেহিক্যাল চুক্তি, বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ভারতের কন্টেইনার ট্রেন সার্ভিস চালু, নদী পথে ট্রানজিটের জন্যে স্থল বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের ভেতরের লিংক রোডগুলোর উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বৈঠকে।

আপনাদের মনে থাকার কথা, ভারতের অর্থমন্ত্রী থাকাকালে প্রণব মুখার্জী ঢাকা এসে ঘোষণা করেছিলেন যে ভারত বাংলাদেশকে ১০০ কোটি ডলার ঋণ দেবে। বিস্তারিত বিবরণ পাবার পরে জানা গেল ভারতকে রেল সড়ক ও নদীপথে ট্রানজিট দান এবং চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহারের অধিকার দানের জন্যে বাংলাদেশের অবকাঠামোগুলোর উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত হবে সে ঋণ। ভারত আরো শর্ত দিয়েছিলো যে অবকাঠামোগুলোর উন্নতির কাজ নির্বাহ করবেন ভারতীয় প্রকৌশলীরা এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ইত্যাদি আসবে ভারত থেকে। অর্থাৎ অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ হবে বাংলাদেশে কিন্তু তার থেকে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হবে না।

ঢাকায় উভয় দেশের যুগ্ম কমিটির বৈঠকে আরো যেসব অবকাঠামো উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে সেসব কাজও খুবই ব্যয়বহুল হবে। ভারত সরকার জানে 'সমাজতান্ত্রিক' দুর্নীতি, 'ফুটানি প্রকল্প' এবং বিদেশ থেকে রেমিটেন্স আসা দ্রুত হ্রাস পাওয়া ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতির এখন শোচনীয় দৈন্য দশা। ভারতকে ট্রানজিট ট্রান্সশিপমেন্ট ইত্যাদি সুবিধা দেবার জন্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যয় নির্বাহের সামর্থ্য শেখ হাসিনার সরকারের নেই। খুব সম্ভবত সেজন্যেই অগ্রবর্তী হয়ে এই ঋণ দানের প্রস্তাব দিয়েছে ভারত, কেননা হাসিনা যে কিছু দিন গদিতে আছেন তার মধ্যেই যা তারা পেতে চায় উসুল করে নিতে হবে।নইলে অনির্বাচিত হাসিনাকে গদিতে রেখে দিল্লির সরকার যেভাবে বাংলাদেশের মানুষের ক্রোধের মাত্রা আকাশচুম্বী করে তুলেছে তাতে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের মানুষ 'যথাসর্বস্ব' ভারতের হাতে তুলে দিতে রাজি হবে না।

ভারতের দয়া যেতেও কাটে আসতেও কাটে

ইংরেজি হিতোপদেশ হচ্ছে Beware the Greek bearing gifts (যে গ্রীক উপহার নিয়ে আসে তার থেকে সাবধান)। এ প্রবাদের উৎপত্তি প্রাগৈতিহাসিক ট্রয়ের (বর্তমানে তুরস্কে) যুদ্ধ থেকে। দীর্ঘদিন ট্রয় অবরোধ করে রেখেও গ্রীকরা ট্রোজানদের পরাস্ত করতে পারেনি। শেষে নতুন কৌশল করলো তারা। অবরুদ্ধ নগরীর ফটকের বাইরে বিশাল কাঠের ঘোড়া তৈরি করে রেখে তারা ভান করলো যে তাদের নৌবহরে চড়ে দেশে ফিরে যাচ্ছে। ট্রোজানরা ভেবেছিলো গ্রীকরা কাঠের ঘোড়াটা তাদের জন্যে উপহার রেখে গেছে। বিশাল সে ঘোড়া টেনে তারা নগর প্রাকারের ভেতের নিয়ে এলো এবং উৎসবে মেতে উঠলো। রাতের আঁধারে গ্রীকরা ফিরে এলো। কাঠের ঘোড়ার পেটে লুকিয়ে থাকা গ্রীক সৈন্যেরা নেমে ফটক খুলে দিলো। ঘুমন্ত ট্রোজানদের কচুকাটা করেছিলো গ্রীকরা।

ভারতের ঋণদান চুক্তিও সব সময় নিরাপদ মনে করা যাচ্ছে না। যে 'দয়া-দাক্ষিণ্য' তারা দেখাতে এগিয়ে এসেছে সেটাও শাঁখের করাতের মতো – যেতেও কাটে আসতেও কাটে। প্রণব মুখার্জী ১০০ কোটি ডলার ঋণ দিয়েছিলেন ১.৭৫ শতাংশ সুদে। নতুন প্রস্তাবিত ঋণের জন্যে সুদ দিতে হবে লন্ডনের লাইবর (আন্ত-ব্যাংক লেনদেনের সুদের হার) সুদের চাইতে ২.৫ শতাংশ বেশি সুদে। লাইবর সুদের হার বর্তমানে দুই থেকে আড়াই শতাংশ। অর্থাৎ নতুন ভারতীয় ঋণের জন্যে বাংলাদেশকে সাড়ে চার থেকে পাঁচ শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে অতীতে বাংলাদেশ বিশ্ব ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল থেকে ঋণ পেয়েছে এক শতাংশেরও কম হারের সুদে, সাধারণত ০.৭৫ শতাংশ হারে। শেখ হাসিনার সরকারের 'দুর্নীতির সমাজতন্ত্র', পদ্মা সেতু দুর্নীতির হোতাদের শাস্তি দিতে অনিচ্ছা এবং ঝগড়াটে

নীতি ও আচরণের কারণে ওই দুটি বিশ্ব সংস্থা এখন আর বাংলাদেশকে ঋণ দিতে এগিয়ে আসে না।

রেমিটেন্সের দুরবস্থার কারণও এই সরকারের ভ্রান্ত পররাষ্ট্র নীতি। বাংলাদেশ থেকে সর্বাধিক শ্রমিক নিয়োগ করতো মূলত উপসাগরীয় মুসলিম দেশগুলো। হাসিনা সরকারের ইসলাম বিরোধী নীতির কারণে এসব দেশের সরকার বাংলাদেশী শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ অথবা হ্রাস করে দিয়েছে। সর্বশেষ দৃষ্টান্ত হচ্ছে সংযুক্ত আরব আমীরাত। বিদেশী রেমিট্যান্সের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস ছিলো এ দেশটি। কিন্তু আমীরাত এখন সরকারিভাবে বাংলাদেশী শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করে দিয়েছে। ইতোমধ্যেই কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমিকদের স্বদেশে ফেরত পাঠাচ্ছে দেশটি। এমনকি এখন থেকে আমীরাত আর কোন বাংলাদেশীকে ট্রানজিট ভিসাও দেবে না। আমীরাত সম্প্রতি ঘোষণা করেছে নেপাল থেকে তিন লাখ শ্রমিক নিয়োগ করে বাংলাদেশী শ্রমিকদের শূন্যস্থান পূরণ করবে।

আমীরাতের এই কঠোর অবস্থানের কারণ খুবই স্বচ্ছ। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠান করতে চেয়েছিলো কয়েকটা দেশ। দুবাই আর রাশিয়া তাদের অন্তর্ভুক্ত। বিদেশে বর্তমান সরকারের বন্ধু নেই। একমাত্র ভারত ছাড়া। শেখ হাসিনা বন্ধুর সন্ধান করছেন সাবেক সোভিয়েত বন্ধুকে ভারতের পুরাতন মিত্রদের মধ্য থেকে। দৃষ্টান্ত হচ্ছে গত বছর হাসিনার মস্কো ও বেলারুস সফর এবং সে দুটি দেশ থেকে অস্ত্র ক্রয় চুক্তি। বাণিজ্য মেলার জন্যে সরকার আমীরাতের পরিবর্তে সমর্থন দিয়েছে রাশিয়াকে। বাংলাদেশী শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করে আমীরাত এখন প্রতিশোধ নিলো।

সার কথা হচ্ছে ভারতের প্রস্তাবে সরকার যতোই 'বিস্ময়' প্রকাশ করুক শেষ পর্যন্ত কয়েক গুণ বেশি হারের সুদে সে ঋণ গ্রহণ করতে সরকার বাধ্য হবে। বাংলাদেশের মানুষের মাথা বন্ধক রেখে দেশের স্বার্থ বিরোধী এসব কাজ করতে সরকার বাধ্য হচ্ছে এ কারণে যে দেশবাসীর সমর্থন বিহীন ভাবে তারা গদিতে থাকতে চায়। ভারত সে ব্যাপারে তাদের সব রকমের সাহায্য দিচ্ছে। কিন্তু সে সাহায্য শর্তহীন নয়। বিনিময়ে তারা সর্বাধিক সুবিধা আদায় করে নেবেই।

দূর মেয়াদে ভারত লাভবান হবে না

কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে ভারতও হাসিনার সরকারের সঙ্গে অন্যায্য চুক্তিগুলো থেকে খুব বেশি লাভবান হবে না। এই সরকার শুধু নতজানুই নয়, ষষ্ঠাঙ্গে উপুড় হয়ে আছে ভারতের কাছে। সে সুযোগে ভারত ট্রানজিট আদায় করে নিচ্ছে, বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে কন্টেইনার ট্রেনে অস্ত্র পাঠাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্যেও (সাত বোন) বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্যে। এসব কাজ

করতে গিয়ে বাংলাদেশের মানুষের নিত্য নতুন ক্রোধের কারণ সৃষ্টি করে যাচ্ছে দিল্লির সরকার। দেশের মানুষের ক্রোধের আগুন জ্বালিয়ে রেখে কন্টেইনার ট্রেনগুলো যে নিরাপদে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোতে যাবে তার নিশ্চয়তা দেবে কে? তাছাড়া বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে ট্রানজিট ট্রেন কিংবা লরিতে হামলা করাও সাত বোনের মুক্তিযোদ্ধাদের সাধ্যাতীত নয়।

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং শেখ হাসিনার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন তিস্তার পানি বন্টন চুক্তিতে তারা স্বাক্ষর করতে পারলেন না বলে। বাংলাদেশের মানুষ কি খুশি হবে তাতে? আনন্দে হাত তালি দেবে? বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ জানে অভিন্ন নদীগুলোর অবাধ স্রোত এ দেশের অস্তিত্বের ব্যাপার। ফারাক্কায় ভারত বাঁধ তৈরি করেছিলো পদ্মার স্রোত পরিবর্তন করে ভাগীরথী দিয়ে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে। শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়ার সঙ্গে পানি বন্টন চুক্তি করেছিলেন। কিন্তু সে চুক্তি অনুযায়ী পানি বাংলাদেশ কোনো বছরই পায়নি। তার পর থেকে অভিন্ন নদীগুলোর তাদের দিকে অন্তত ৩৫টি বাঁধ ভারত তৈরি করেছে বাংলাদেশের পানির হিস্যা কেড়ে নেবার জন্যে। রাজনৈতিক সমস্যা-সংকটে জর্জরিত বাংলাদেশের মানুষের দৃষ্টি সেদিকে গেছে টিপাইমুখ বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যাবার পরে। বাংলাদেশের মানুষ তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে, কেননা টিপাইমুখ সুরমা-কুশিয়ারা-মেঘনা অববাহিকাকে মরুভূমিতে পরিণত করবে । আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা ইলিয়াস আলী সেই যে ২৩ মাস আগে গুম হয়ে গেছেন আজো অবধি তার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

এখন আবার খবর পাওয়া গেছে যে ভারত অভিন্ন নদীগুলোর পানি উষর মধ্যভারতে নিয়ে যাবার পুরণো পরিকল্পনাটির কাজ শুরু করে দিয়েছে। এ পরিকল্পনায় সবগুলো নদীর মধ্যে সংযোগ খাল তৈরি করে পানি সুদূর মধ্য ভারতে নিয়ে যাওয়া হবে। তাতে মধ্য ভারতের মরুভূমি সুজলা-সুফলা হবে, কিন্তু বাংলাদেশের জন্যে তার প্রতিক্রিয়া কি হবে? শুধু তিস্তা কিংবা সুরমা-কুশিয়ারাই নয়, কোন নদী দিয়েই আর যথেষ্ট পানি বাংলাদেশে আসবে না। অথচ মনমোহন সিং ঢাকঢোল পিটিয়ে ২০১১ সালে ঢাকায় এসেছিলেন তিস্তার পানি বন্টন চুক্তিতে সই করবেন বলে।

আন্তর্জাতিক চুক্তির অবমাননা

শুধু পানির ব্যাপারেই নয়। ভারতের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি। দুদেশের সীমান্ত সহজীকরণ ও ছিটমহল বিনিময় চুক্তি হয়েছিলো ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা গান্ধী ও শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে। শেখ মুজিব কালবিলম্ব না করে

সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী পাস করেন এবং বেরুবাড়ি ছিটমহলটি ভারতের হাতে তুলে দেন। কিন্তু ভারত আজো পর্যন্ত সে চুক্তি অনুমোদন করেনি, তিন বিঘা ছিটমহলটি আজো বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোকে পবিত্র জ্ঞান করা বিশ্ব সভ্যতার অন্যতম খুঁটি। দেখা যাচ্ছে ভারতে নয়। দেশে দেশে চুক্তি যদি লঙ্ঘিত হয় তাহলে আন্তর্জাতিক সুসম্পর্ক অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের মানুষ এখন সঙ্গতভাবেই বলতে পারবে গণবিচ্ছিন্ন হাসিনা সরকারের সঙ্গে ভারত যেসব চুক্তি করেছে সেগুলো মেনে চলতে তারা বাধ্য নয়।

ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করে, একটা অনির্বাচিত অবৈধ সরকারকে গদি আঁকড়ে থাকতে সাহায্য করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের পরম বন্ধু যুক্তরাষ্ট্র তাদের একজন কূটনীতিকের কৃত অন্যায়ের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নিয়েছিলো। ভারত জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে তাতে। ওদিকে ভারত বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে, তার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারে অহরহ হস্তক্ষেপ করেছে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে। সরকারিভাবেই তারা এক হাজার কোটি রুপী ব্যয় করেছে বন্ধু রাষ্ট্র বাংলাদেশের নির্বাচনকে প্রভাবিত করার জন্যে। বাংলাদেশের মানুষ সে নির্বাচনকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। ৩০০ আসনের সংসদে ১৫৩ জন সংসদ সদস্যকে ভোটের তারিখের আগেই নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতে নির্বাচন শুরু হচ্ছে কয়েকদিন পরেই। ভারতের জনতা কি সে নির্বাচনে অন্য কোন দেশের সামান্যতম হস্তক্ষেপও সহ্য করবে? ভোটারবিহীন নির্বাচন ভারতে হলে সে দেশের জনতা কি পথে নামবে না? বিপ্লব হয়ে যাবে না ভারতে? অথচ শেখ হাসিনাকে গদিতে রাখার জন্যে ভারতীয় কূটনীতিকরা বিশ্বব্যাপী তদ্বির করে বেড়াচ্ছেন।

খালেদার আহ্বানে সাড়া দিন

ভারত সরকার, বিশেষ করে ভারতের মানুষ একটা কথা মনে রাখতে পারে। বিগত পাঁচ বছর আড়াই মাসে দিল্লির সরকার বাংলাদেশে যা করেছে সেটা দুদেশের বন্ধুত্বের সম্পর্কে একটা দুষ্টক্ষত সৃষ্টি করেছে। যতোই দিন যাবে সে ক্ষতের পচন ততোই মারাত্মক ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠবে। তাদের নামে দিল্লির গণবিচ্ছিন্ন সরকার যা করেছে তার সঠিক চিত্র জানতে পারলে ভারতের জনসাধারণও নিশ্চয়ই প্রতিবাদ-মুখর হয়ে উঠবে। বাংলাদেশের মানুষ মনে-প্রাণে বন্ধুত্বের, সহযোগিতার সম্পর্কই চায় ভারতের সঙ্গে। কিন্তু বন্ধুত্ব কখনোই একতরফা হতে পারে না। দিল্লির বর্তমান সরকারের নীতি হচ্ছে তারা কেবলই নিতে চায়, বিনিময়ে কানাকড়িও তারা দেবে না।

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং প্রকাশ্যেই বলেছেন জামায়াতে ইসলাম বাংলাদেশের মানুষকে ভারত-বিমুখ করে তুলছে। হয়তো তার সরকারের উসকানিতেই শেখ হাসিনার সরকার জামায়াতের, এবং সাধারণভাবেই, ইসলামের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ চালিয়ে এসেছে। কিন্তু তার পরিণতি কি হয়েছে সাধারণ নির্বাচনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভারতের ভোটদাতাদের সেটা জানা প্রয়োজন। সাদা চোখেও দেখা যাবে বিগত পাঁচ বছরে জামায়াতের শক্তি ও সমর্থন অনেক বেড়ে গেছে। দফাওয়ারি ভাবে যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের উপজেলা নির্বাচন হচ্ছে তাতেও প্রমাণ হয়ে গেছে যে জামায়াত এখন আওয়ামী লীগকে ছুঁই ছুঁই করছে। আওয়ামী লীগের সর্বাত্মক গুণ্ডামী এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস না হলে জামায়াত আওয়ামী লীগের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যেতো। সাধারণভাবেই বিগত পাঁচ বছরে বাংলাদেশের রাজনীতি অনেক বেশি ইসলামী ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে। হাসিনার সরকারের চরম নির্যাতন ও দমন নীতি সেকুলার বাংলাদেশকে ইসলামী মৌলবাদের দিকে অনেকখানি ঠেলে দিয়েছে।

কলকাতার টেলিগ্রাফ পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিন বারের প্রধানমন্ত্রী এবং বর্তমানেও বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় জননেত্রী খালেদা জিয়া যথার্থই বলেছেন ভারতের বর্তমান সরকার বাংলাদেশের মানুষকে বন্ধুত্বের পরিবর্তে ক্রমেই দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। শেখ হাসিনার অবৈধ সরকারকে সমর্থন দান বন্ধ করতে তিনি ভারত সরকারকে অনুরোধ করেছেন। বস্তুত দুদেশের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে এ পথেই-একে অন্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার শর্তে। খালেদা জিয়া জানেন এবং ভারতের মানুষ আরো বেশি করে জানে দিল্লির বর্তমান সরকারের আয়ু হয়তো আর বেশি দিন নয়। এপ্রিল-মের সাধারণ নির্বাচন সব কিছু ওলোট-পালোট করে দিতে পারে। সেজন্যে এটা মনে করাই সঠিক হবে যে বেগম জিয়া প্রকৃতপক্ষে তার আকুল আহ্বান জানিয়েছেন ভারতের ভোটারদের উদ্দেশ্যে। লোকসভার নির্বাচনে ভোট দেবার সময় ভারতীয় ভোটাররা সে আহ্বানের কথা মনে রাখলে দুদেশেরই কল্যাণ হবে।

(লন্ডন, ১৮.০৩.১৪)

সাধারণ নির্বাচন : ভারতে এবং বাংলাদেশে

ইংরেজ প্রায় দুশো বছর তার ভারতীয় সাম্রাজ্য শাসন করেছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কিছু ইংরেজ কর্মকর্তা বহু অনুগ্রহভোগী ভারতীয়ের সাহায্যে এই বিশাল দেশের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে। প্রথমে কলকাতায় এবং পরে দিল্লিতে বসে ব্রিটিশের একজন ভাইসরয় এই বিশাল প্রশাসক বাহিনীকে নির্দেশনা দিয়েছেন। দেশ শাসনের ব্যাপারে কথা বলার অধিকার ভারতীয়দের ছিলো না।

ব্রিটিশের নিজের দেশে কিন্তু এই গোটা সময়টা জুড়ে গণতান্ত্রিক শাসন প্রচলিত ছিলো। দেশের মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ওয়েস্টমিনস্টার পার্লামেন্টে বসে আইন প্রণয়ন করেছেন, নীতি নির্ধারণ করেছেন। ইংরেজেরই কল্যাণে এবং তাদের সাম্রাজ্য প্রশাসনের প্রয়োজনে ভাগ্যবান কিছু ভারতবাসী উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেতে এসেছিলেন। গণতান্ত্রিক শাসন এবং উন্নত মানবাধিকারের সে চিত্র মনে এবং মস্তিষ্কে ধারণ করে তারা স্বদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন থেকেই ভারতবাসীর চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো সংসদীয় গণতন্ত্র, পার্লামেন্ট এবং নির্বাচন। কিন্তু সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যে আরো দীর্ঘকাল তাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছে।

সে ধৈর্যের বাঁধ মজবুত করার কৌশল হিসেবে ১৯৩৫ সালে প্রদেশে এবং তৃণমূলে নির্বাচন চালু করেছিলো ব্রিটিশ শাসকরা। তাতে বরং উল্টো ফল ফলেছে। ভারতীয়দের গণতন্ত্রের পিপাসা তাদের স্বাধীনতার দাবির সঙ্গে সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। যেটা সাধারণ বুদ্ধি এবং মানব ধর্মের সঙ্গে সাংঘর্ষিক সেটা কিছুতেই চিরদিন টিকে থাকতে পারে না। ইংরেজ সাম্রাজ্যেরও অবসান হয়েছে। অপরিমেয় রক্তপাত এবং অসীম দুর্ভোগের মধ্যে বিভক্ত আকারে হলেও ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। বিভক্ত উপমহাদেশের বৃহত্তর অংশ বর্তমান ভারত গণতন্ত্র আর নির্বাচিত সরকারের সে শুকতারার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়নি। স্বাধীনতার ৬৭ বছর পরেও মোটামুটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই শাসিত হয়ে আসছে ভারত। মোটামুটি বলছি এ কারণে যে মাঝে ১৯৭৫ থেকে দু'বছর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করে গণতন্ত্রকে বালির বাঁধ দিয়ে

ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু ভারতবাসী সেজন্যে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছে। ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে ভারতের জনতা মিসেস গান্ধী ও তার কংগ্রেস দলকে বেধড়ক মার দিয়েছিলো।

কিন্তু ইংরেজের কাছ থেকে ভারত গণতন্ত্রের সুফসলের সঙ্গে সঙ্গে উপনিবেশবাদের বিষবৃক্ষের বীজও লুফে নিয়েছিলো। কাশ্মীর ও জুনাগড়ের স্বাধীনতা ভারত তার স্বাধীন জন্মলগ্নের প্রায় সূচনা থেকেই ছিনিয়ে নিয়েছিলো। আরো পরে হায়দরাবাদ, গোয়া ও সিকিমকেও গ্রাস করেছে ভারত। এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রতিবেশীর ওপর তার লোলুপ দৃষ্টি কিছুতেই চাপা থাকছে না। তাদের সম্পূর্ণ কুক্ষিগত করতে না পারলেও শোষণ দোহন ও পদদলিত করে রাখাই গান্ধী-নেহরুর সময় থেকেই স্বাধীন ভারতের প্রয়াস। কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে তার তিন-তিনটি ঘোষিত যুদ্ধ হয়েছে। অঘোষিত যুদ্ধ তো বলতে গেলে লেগেই আছে। নেপাল ভুটান শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপের মানুষ ভারতকে বন্ধু ভাবতে পারে না, ভাবে না। ভারতের দিক থেকে বিপদের আশঙ্কায় সদাই উৎকণ্ঠিত থাকে তারা।

গোরু মেরে জুতা দান

আর বাংলাদেশ? আমাদের প্রধানমন্ত্রী দিল্লির পালিতা কন্যা। ভারতের দয়ায় তিনি গদিতে আছেন এবং ভারতের সেবা ও ইচ্ছা পূরণের জন্যে তিনি সব সময় উন্মুখ। কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এখন আর চেষ্টা করেও ভারতকে বন্ধু ভাবতে পারছে না। অঢেল ইয়াবা আর ফেনসিডিল বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে ভারত। তার বেশি আর কি দিয়েছে গত সোয়া পাঁচ বছরে? আর যা নিয়েছে তার তালিকা সুদীর্ঘ। বাংলাদেশকে দিল্লি সরকার বাড়ির পেছনের বাগানের মতোই দেখছে এখন। যখন যা প্রয়োজন বেগুন, কাঁচা লঙ্কা ইত্যাদি তুলে নিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে উত্তর পূর্বের সাতটি রাজ্যে (সাত বোন) অবাধে পণ্য সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্র পাঠানোর অধিকার আদায় করে নিয়েছে ভারত। সেজন্যে বাংলাদেশের সড়ক, রেল ও নদীগুলো ভারতের অবাধ ব্যবহারের জন্যে খুলে দিয়েছে শেখ হাসিনার সরকার। চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দর ভারতকে অবাধ ব্যবহারের অধিকার দিয়ে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রতিরক্ষা ঝুঁকিগ্রস্ত করে দিয়েছে।

এখন আবার (শোষণকরে) সাত বোন থেকে বিদ্যুৎ নিয়ে যাওয়া হবে মূল ভারতে। বিশাল বিশাল পাইলনগুলো তৈরিতে বাংলাদেশের হাজার হাজার একর উর্বর কৃষি জমি বিরান হয়ে যাবে। অথচ বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচাইতে ঘনবসতি দেশ। জমির স্বল্পতা এদেশের সবচাইতে বড়ো সমস্যাগুলোর একটা।

বাংলাদেশকে টোপ দেয়া হয়েছে বিদ্যুৎ পরিবহনের এই মহাসড়ক তৈরি হলে তাকে একশো মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ দেয়া হবে। কিন্তু যে কথাটা বলা হচ্ছে না সেটা এই যে সাত বোনে এই বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে অভিন্ন নদীগুলোতে আরো বহু বাঁধ তৈরি করে, যেসব নদীর পানির ন্যায্য অংশ বাংলাদেশের পাওনা। ভারতের প্রস্তাবিত বাঁধগুলো এবং মধ্য ভারতে নদীর পানি নিয়ে যাবার সংযোগ খালটি তৈরি হয়ে গেলে বাংলাদেশের সবগুলো নদীরই তিস্তার মতো করুণ দুর্দশা হবে। গোরু মেরে জুতাদানের এর চাইতে মোক্ষম দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

কিন্তু আসলেও কি প্রতিশ্রুত পরিমাণ বিদ্যুৎ পাবে বাংলাদেশ? ভরসা করবেন কি করে? ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা গান্ধী কি ছিটমহল বিনিময় চুক্তি করেননি শেখ মুজিবের সঙ্গে? মুজিব তো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সংবিধান সংশোধন করেছিলেন, বেরুবাড়ি ছিটমহলটি তুলে দিয়েছিলেন ভারতের হাতে। সেটা ৪০ বছর আগের কথা। কিন্তু বাংলাদেশ কি আজো পেয়েছে তিনবিঘা ছিটমহলটি? প্রায় তিন বছর আগে ভারত বলেছিলো তিস্তা নদীর পানি বাটোয়ারার চুক্তি করবে বাংলাদেশের সঙ্গে। সে চুক্তিতে সই করবেন বলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ঢাকঢোল পিটিয়ে ঢাকায় এসেছিলেন।

চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের করুণ ইতিহাস

কিন্তু এখন কি বলছে ভারত? দৃশ্যমান ভবিষ্যতে তিস্তা চুক্তি ও ছিটমহল হস্তান্তরের কোন সম্ভাবনা নেই। এতোগুলো যে বাঁধ তৈরি হচ্ছে এবং সংযোগ খাল কেটে যে পানি মধ্য ভারতের মরুভূমিতে নিয়ে যাওয়া হবে, তারপর আর বাটোয়ারা করার মতো পানি তিস্তায় আসবে কোত্থেকে? শেখ হাসিনা স্বয়ং ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়ার সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন ১৯৯৬ সালের ২৭ ডিসেম্বর ফারাক্কায় গঙ্গার পানি বন্টন সম্বন্ধে, সে চুক্তি অনুযায়ী পানি কি বাংলাদেশ এক বছরও পেয়েছে? তাহলে কি করে আমরা ধরে নেবো যে আমাদের হাজার হাজার একর উর্বর চাষের জমি নষ্ট করে ভারতের পাইলন তৈরি হবার পর প্রতিশ্রুত পরিমাণ বিদ্যুৎ বাংলাদেশ পাবে? তাকে বিশ্বাস করার মতো কোন নজির কি ভারত সৃষ্টি করেছে কখনো?

ভারতে এখন সাধারণ নির্বাচন চলছে। বাংলাদেশে কেউ কেউ প্রত্যাশা নিয়ে এ নির্বাচনের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে আছে। ভারতের মানুষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ নিচ্ছে। আশি কোটির বেশি মানুষ ভোটার তালিকাভুক্ত। এ যাবৎ যা দেখা যাচ্ছে খুবই উঁচু হারে ভোট পড়ছে। এবং একটা উৎসবের পরিবেশ বিরাজ করছে গোটা ভারত

জুড়ে। ভারতের নির্বাচন কমিশন সাধারণত দক্ষ এবং নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পরিচালনা করে থাকে। এবারেও এযাবৎ তার কোন ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে না। রাজনীতিকদের বেসামাল বক্তৃতা-বিবৃতি সম্বন্ধে কঠোর মনোভাব নিয়েছে কমিশন। ভারতে অনেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে পশ্চিমবঙ্গের শেখ হাসিনা বলে বর্ণনা করে থাকে। মমতা নির্বাচন নিয়ে কিছু ঘাড়-ত্যাড়ামী দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কমিশনের দৃঢ়তার কাছে তাকে হার মানতে হয়েছে।

প্রায় সবগুলো ভারতীয় জনমত সমীক্ষাই বলছে যে কট্টর হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল বিজেপির বিরাট জয় হবে এ নির্বাচনে এবং আরো কট্টর নরেন্দ্র মোদি নেহরু-গান্ধী পরিবারের বংশধর রাহুল গান্ধীকে হারিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবেন। বাংলাদেশের মতো ভারতের সংবিধানেরও একটা স্তম্ভ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। কিন্তু বর্তমান নির্বাচনে বিজেপির এবং নরেন্দ্র মোদির দাপট প্রমাণ করছে যে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে সেকুলারিজম সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে শিবসেনা এবং সংঘপরিবার প্রভৃতি বিজেপির কোন কোন অঙ্গ দল গোটা ভারতকে শুধুমাত্র হিন্দুদের বাসভূমি বলে ঘোষণা করেছে। ১৯৯২ সালে অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ভাঙার কাজে বিজেপির শীর্ষ নেতারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বর্তমান নির্বাচনেও জয়ী হলে বাবরী মসজিদের ধ্বংসস্তূপের ওপর রামমন্দির নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন বিজেপি নেতারা। ভারতের সকল মানুষকে তারা হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করতে চায়। মুসলমানদের তারা ভারতের নাগরিক বলে স্বীকার করে না। এই একবিংশ শতকেও বিজেপি বহু খ্রিস্টানকে হত্যা করেছে।

নরম পন্থা নির্বাচনী কৌশল হতে পারে

নরেন্দ্র মোদি ২০০১ সালে পশ্চিম ভারতের গুজরাত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হন। পরের বছর হিন্দু তীর্থযাত্রী বোঝাই ট্রেনের একটি বগিতে আগুন লেগে ৫৯ জন যাত্রী মারা যান। গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে মুসলমানরাই ট্রেনে আগুন লাগিয়েছিলো। সেই যে মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা শুরু হয় সে দাঙ্গা কয়েকদিন ধরে চলেছিলো। মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার দাঙ্গা দমনের পরিবর্তে সে দাঙ্গায় উৎসাহ দিয়েছিলেন বলে বহু অভিযোগ আছে। শত শত মুসলিম ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়। দু'হাজারেরও বেশি মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছিলো সে দাঙ্গায়। পরে অবশ্যি প্রমাণিত হয়েছে যে তীর্থযাত্রীরা শীত থেকে পরিত্রাণের জন্যে ট্রেনের বগিতে আগুন জ্বালিয়েছিলো, আর সে আগুনই গোটা বগিকে গ্রাস করে ফেলে। কিন্তু নরেন্দ্র মোদি কিংবা বিজেপি সেজন্যে দুঃখ প্রকাশ করেন নি, জানমালের ক্ষতির জন্যে মুসলমানদের ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়নি।

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মোদির বিরুদ্ধে মামলা করেন। কিন্তু প্রমাণাভাবে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়নি। আইন সম্বন্ধে যাদের সামান্যতম ধারণাও আছে তারা অবশ্যই জানেন প্রমাণের অভাব মোটেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ প্রমাণিত করে না। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কয়েক বছর ধরে মোদিকে অবাঞ্ছিত করে রেখেছিলো। বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তারা মোদির সঙ্গে যোগাযোগের পথ খুলে দিয়েছে। কিন্তু ওয়াশিংটন এখনো তাকে ভিসা না দেবার সিদ্ধান্ত বাতিল করেনি। নির্বাচনকে সামনে রেখে মোদিকে নতুন ইমেজ দেবার অভিযান শুরু হয়েছে। তাকে উদার মনোভাবাপন্ন হিসেবে দেখানোর প্রচুর চেষ্টা চলছে। সাংবাদিক এম জে আকবর এবং বলিউডের কোন কোন উচ্চাভিলাষী মুসলিম অভিনেতার মতো কিছু লোক বিজেপিকে সমর্থন দিচ্ছেন। মোদি নিজেও কিছু কিছু নরোম ও মধ্যপন্থী কথাবার্তা বলছেন। কিন্তু 'পুনর্মুশিকঃ ভবঃ' কাহিনীটা ভুলে গেলে চলবে না।

হিন্দু পুরাকাহিনীতে আছে, ইঁদুর ফরিয়াদ নিয়ে মুনির কাছে গিয়েছিলো: বেড়ালের ভয়ে সে সদাই আতঙ্কিত। মুনির দয়া হলো। ইঁদুরকে তিনি বেড়াল করে দিলেন। নতুন ফরিয়াদ: এখন তাকে উত্যক্ত করছে কুকুর। মুনির কৃপায় বেড়াল কুকুর হয়ে গেল। আরো পরে সে কুকুরকে বাঘ করে দিলেন মুনি। এবারে বাঘ মুনিকেই খেতে উদ্যত হলো। মুনি তখন বললেন, যাও, আবার তুমি ইঁদুর হয়ে যাও। গদির লোভে শেখ হাসিনা গণতন্ত্র এবং আদর্শের বুলি কপচান। কিন্তু কাজের বেলায় সেসব সব সময়ই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে, হাসিনার সরকার গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে। গদি পেলে নরেন্দ্র মোদি যে আবারো উগ্রচণ্ডী মূর্তিতে ফিরে যাবেন না, কে বলতে পারে?

অদৃষ্টের পরিহাসের অট্টহাসি

জনমতের সমীক্ষা যে সব সময় সত্যি হবে এমন কোন কথা নেই। সত্যি যদি হয় তাহলে বলতেই হবে যে বাংলাদেশের অভিশাপ লেগেছে ভারতের বর্তমান শাসকদের ওপর। একশো-দেড়শো বছর আগের ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের মতো নিজ দেশে তারা গণতন্ত্রের চর্চা করেছে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ যাতে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে না পারে, যাতে তারা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী সরকার পেতে না পারে, সেজন্যে সব রকমের চেষ্টাই করেছে দিল্লির বর্তমান সরকার। অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে তারা বাংলাদেশের সকল অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছে। বিশেষ করে নির্বাচনে। শেখ হাসিনাকে গদিতে বহাল রাখার জন্যে এক হাজার কোটি রুপি ব্যয় করেছে ভারত সরকার। বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই হাসিনার সরকারের অধীনে নির্বাচনের সক্রিয় বিরোধীতা করেছে। তারা নির্বাচন বর্জন করেছে।

কিন্তু ষড়যন্ত্র করে এবং দেশের ভোটদাতাদের গরিষ্ঠ অংশকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে নির্বাচনের আগেই গরিষ্ঠসংখ্যক আসনে শাসকদলকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। অবশিষ্ট আসনগুলোর জন্যে যেখানে আদৌ ভোট পড়েনি বলা চলে সেখানেও সরকারের নির্দেশমতো ৩৯ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে বলে ঘোষণা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ছয় পর্বের উপজেলা নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্বের পরেই প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছুটি নিয়ে আমেরিকায় যান। নির্বাচনে অজস্র দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের অভিযোগ হয়েছে কিন্তু কমিশন কোন ব্যবস্থা নেয়নি। বরং ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিএনপি এবং ১৯ দলের নেত্রীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক বিবৃতি দিয়ে কমিশনের নতজানু ভূমিকার প্রমাণ দিয়ে দিলেন। এই নির্বাচনকে বৈধ বলে জাহির করার জন্যে ভারত সরকারের কূটনেতিক তৎপরতা রীতিমতো ন্যক্কারজনক না বলে উপায় নেই।

কট্টর হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপি দল যদি সত্যি সত্যি জয়ী হয় এবং নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হন তাহলে অদৃষ্টের পরিহাসের অট্টহাসিতে আকাশ-পাতাল প্রকম্পিত হবে। কোন সন্দেহ নেই যে বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের ইসলাম এবং ধর্মীয় রাজনীতি বিরোধী ক্রুসেডের পেছনে দিল্লিতে তার প্রভুদের তাগিদ একটা বড়ো কারণ ছিলো। মনমোহন সিং নিজেই প্রকারান্তরে বলেছেন সে কথা। ২০১১ সালের আগস্ট মাসে তিনি বলেছেন, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মানুষকে ভারতের প্রতি বৈরী করে তুলছে।

ইসলামী সন্ত্রাস দমনের নামে হাসিনার সরকার বাংলাদেশের জাতীয় জীবনকে খণ্ডিত-বিখণ্ডিত এবং রক্তাক্ত করে দিয়েছে। বাংলাদেশে ভারতের দালালরা জামায়াত এবং সাধারণভাবেই ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠেছে। আওয়ামী লীগ এবং হাসিনার তাতে অনীহা নেই। তার পিতা ১৯৭৫ সালে রাজনীতিকেই নিষিদ্ধ করেছিলেন, আওয়ামী লীগসহ সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হয়েছিলো সে সময়। বর্তমান নির্বাচনে যদি হিন্দু দল বিজেপির কাছে মনমোহন সিং ও তার সরকারের পরাজয় হয় তাহলে সেটা বাংলাদেশের ইসলাম-বিরোধীদের গালে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাতের মতোই হবে।

বাংলাদেশ নীতি পরিবর্তিত হবে কি?

নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হলে ভারতের বাংলাদেশ নীতি পরিবর্তিত হবে বলে যারা আশা করে বসে আছেন তাদের হতাশ হতেই হবে। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া প্রমুখ বড়ো দেশগুলোর বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাদের পররাষ্ট্রনীতি কার্যকর করার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে থাকে। কিন্তু সেসব নীতি নির্ধারণ করে থাকেন গোয়েন্দাদের রাজনৈতিক প্রভুরা। এ ব্যাপারে ভারত বিরাট একটা

ব্যতিক্রম। দক্ষিণ এশিয়ায় তার পররাষ্ট্রনীতি রাজনীতিক ও কূটনীতিকরা প্রণয়ন করেন না, সে নীতি নির্ধারণ করে ভারতের বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং ('র')। সে কারণেই ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনার পঙ্কজ শরন বলেছেন যে নির্বাচনী ফলাফল যাই হোক দিল্লির বাংলাদেশ নীতি পরিবর্তিত হবে না। সরকার পরিবর্তন হলেই যে র'য়ের নীতি পরিবর্তন হবে এমন কোন কথা নেই। তবে নরেন্দ্র মোদির রাজনৈতিক শক্তির উৎস গুজরাত। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে এবং যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে বর্তমানে প্রবাসী গুজরাতীরা খুবই প্রভাবশালী। ভারতের গুজরাতী ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদের স্বার্থের খাতিরে ইউরোপ-আমেরিকার সঙ্গে সুসম্পর্ক মোদিকে স্থাপন করতে হবে।

বিগত তিন-চার বছরে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে গুরুতর অবনতি হয়েছে। বহু কারণের মধ্যে একটা হচ্ছে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন সম্বন্ধে মনোভাব। সম্ভবত রাশিয়া ছাড়া আর কোন শিল্পোন্নত দেশ ৫ জানুয়ারির নির্বাচনকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে না। সে নির্বাচনে এবং পরবর্তীকালে দিল্লির ভূমিকায় তারা বিরক্ত। এসব দেশ এখন চায় যে সংলাপের মাধ্যমে সুষ্ঠু নির্বাচনের উপায় উদ্ভাবন করে বাংলাদেশে নিকট-ভবিষ্যতেই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। ওয়াশিংটনকে খুঁশি করার জন্যে সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যদি এই প্রস্তাবে রাজি হন তাহলে দক্ষিণ এশিয়ার জন্যে বিরাট একটা কল্যাণ হবে। মি. মোদি কিংবা অন্য যে কেউ নির্বাচনোত্তর প্রধানমন্ত্রী হন তিনি জেনে রাখলে ভালো করবেন যে গণবিরোধী হাসিনা সরকারের সঙ্গে ভারত যেসব গোপন চুক্তি করেছে বাংলাদেশের মানুষ কোন দিন সেসব চুক্তি সহ্য করবে না। সুযোগ পেলে এসব চুক্তি বাস্তবায়নে তারা বাধা দেবেই। ইতোমধ্যে এসব চুক্তির কারণে বাংলাদেশের মানুষ ক্রোধে ফুঁসছে। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছে এসব চুক্তি ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপের কারণে। জামায়াত কিংবা ধর্মীয় রাজনীতি মোটেই সেজন্যে দায়ী নয়। ভারত যদি আদৌ বাংলাদেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক চায় তাহলে সত্যিকারের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে তাকে সমঝোতায় আসতেই হবে।

(লন্ডন, ১৬.০৪.১৪)

সংসদের ভাষা এবং স্পিকারের মেরুদণ্ড

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর কর্মসূচি প্রতি বুধবার দুপুর বারোটা থেকে আধ ঘণ্টা। প্রধানমন্ত্রী কয়েক মিনিট বিরোধী দলের নেতার প্রশ্নের জবাব দেন। তারপর সাধারণ সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীকে মূলত নিজ নিজ নির্বাচন কেন্দ্রের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী নিয়ে প্রশ্ন করেন। এ রীতি চলে আসছে সনাতনী কাল থেকে। ব্রিটিশ সংসদীয় গণতন্ত্রের এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক।

ইদানীং পিএমকিউ নামে পরিচিত এই গণতান্ত্রিক রীতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে। মূল কারণ এ অনুষ্ঠানের বিতর্ক নিয়ে অতি মাত্রায় উত্তাপ সৃষ্টি। স্পিকার জন বেরকো প্রতি বুধবারই প্রথমে সদস্যদের কণ্ঠ নিচু ও মাথা ঠাণ্ডা রাখার অনুরোধ করছেন। ক্রমেই তাকে কণ্ঠস্বর উঁচু থেকে আরো উঁচু করে 'অর্ডার! অর্ডার! বলে চিৎকার করতে হচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে দু'একজন সদস্যের নামও উচ্চারণ করেছেন তিনি। কোন সদস্যের আচরণ সংসদীয় রীতি পদ্ধতির সীমা ছাড়িয়ে গেলে অথবা সৌজন্যের সীমা অতিক্রম করলে স্পিকার তার নাম উচ্চারণ করেন। উক্ত সদস্যকে তখন সংসদ কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে হয়। পরে সংসদীয় শৃঙ্খলা কমিটি সে সদস্যকে কয়েকটি অধিবেশন থেকে বহিষ্কারও করতে পারেন।

অথচ বুদ্ধিমানরা বুঝতে পারেন এবং মিডিয়ায়ও উল্লেখ করা হয়েছে যে এ সবই কৃত্রিম উত্তেজনা। তারা এটাকে বলে থাকেন 'প্লেয়িং টু দ্য গ্যালারি' অথবা লোক-দেখানো। কারণটাও পরিষ্কার। এদেশে সাধারণ নির্বাচন হবে আসছে বছরের মে মাসে। স্মরণীয় কালের মধ্যেই এ নির্বাচন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হবে। একটা কারণ অবশ্যই এই যে অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের মতো বৃটেনও বিগত প্রায় এক দশক ধরে দারুণ অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছিলো। সরকারের কঠোর ব্যয়সঙ্কোচ নীতির দরুন লাখ লাখ লোক বেকার হয়েছে, মাইনে-মজুরী কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের অর্থকষ্ট চরমে উঠেছিলো। কিন্তু চলতি বছরে লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে বৃটেন এখন সংকটের তীব্রতা কাটিয়ে উঠেছে, অন্যান্য ধনী দেশের তুলনায় তার প্রবৃদ্ধি বেশি উৎসাহব্যঞ্জক। বড়ো দলগুলো আশা করছে এ সময় গদি পেলে তারা নিজ নিজ কর্মসূচি সহজে বাস্তবায়িত করতে পারবে।

প্রধান দুটি দল লেবার ও রক্ষণশীল (টোরি) বাদ দিয়ে তৃতীয় দল লিবারেল ডেমোক্র্যাটরা (লিবডেম) দীর্ঘকাল ক্ষমতার বাইরে ছিলো। কিন্তু তাদের উদার ও প্রগতিশীল নীতি আদর্শবান জ্ঞানী-গুণীদের প্রশংসিত ছিলো। বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) ব্যাপারে তারা সব সময়ই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু অনেককে হতাশ ও হতবাক করে দিয়ে ২০১০ সালের নির্বাচনের পর তারা একক বৃহত্তম দল টোরিদের সঙ্গে কোয়েলিশন করে সরকার গঠন করে। শরিক দল টোরিদের সঙ্গে লিবডেমদের প্রধান আদর্শিক গরমিল ইউরোপীয় ইউনিয়নের ব্যাপারে। বহু টোরি পার্লামেন্ট সদস্য মনে করেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বৃটেনের সম্পর্ক হবে মূলত অভিন্ন বাণিজ্যের বাজার হিসেবে। ইইউর সামাজিক আইনগুলোর ব্যাপারে বহু টোরির প্রবল আপত্তি আছে। দলের 'ব্যাক-বেঞ্চারদের' সঙ্গে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আসছে বছরের নির্বাচনের পর সরকার গঠন করতে পারলে তিনি ইইউ সম্বন্ধে গণভোট করবেন।

এদিকে ইউকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি (ইউকিপ) নামে ক্ষুদ্র একটা দল (পার্লামেন্টে তাদের একটিও আসন নেই) ইইউর সদস্য থাকা না থাকা নিয়েই গণভোট করার আন্দোলন করছে। তাছাড়া তারা বহিরাগমন বন্ধের জন্যে আইন চায়। তাদের প্রভাবে টোরিদের ইইউ বিরোধী অংশ সাধারণ নির্বাচনের আগেই গণভোটের দাবিতে মুখর হয়ে উঠেছে। এই খুবই তরল পরিস্থিতিতে দলগুলো এবং সংসদ সদস্যরাও ভোটারদের মনে রেখাপাত করার জন্যে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর আসরকে মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করছেন। পিএমকিউতে উত্তেজনার এটা হচ্ছে বড়ো কারণ। কয়েকজন সিনিয়র মহিলা সদস্য ইদানীং পিএমকিউ বর্জন করছেন। তারা বলছেন হৈ-হট্টগোল আর চেঁচামেচিতে তাদের মাথা ধরে যায়, তারা বিরক্ত বোধ করেন। স্পিকার হুশিয়ারি দিয়েছেন পিএমকিউতে হট্টগোল সম্বন্ধে তিনি আরো কঠোর হবেন।

ভাষার পবিত্রতা লঙ্ঘিত হচ্ছে না

লক্ষ্যণীয় যে এতো চেঁচামেচি এবং হট্টগোল সত্ত্বেও পার্লামেন্টে ভাষা ব্যবহারে সদস্যরা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন না। সাম্প্রতিক এক পিএমকিউতে প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন বোধ হয় একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। প্রশ্নোত্তর পর্বের এক স্থানে তিনি বেফাঁসে 'ইডিয়ট' (ডাহা মূর্খ) শব্দটি ব্যবহার করে ফেলেছিলেন। কিন্তু কথাটা স্পিকারের কান এড়ায়নি। শব্দটি প্রত্যাহার করে নিতে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বাধ্য করেন।

রাণী রাশমণির সঙ্গে রইশ্যার নানীর তুলনা অবশ্যই হাস্যকর। কিন্তু রইশ্যার নানীকে কেউ যদি রাণীর গদিতে বসাতে চায় তাহলে তুলনা করতেই হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে যারা গদিতে আছেন (সরকার বলছি না তাদের

আইনগত অবস্থান সম্বন্ধে সন্দেহের কারণে) গণতন্ত্র-গণতন্ত্র বলে তারা মুখে ফেনা ওঠান, ভারতীয় অভিভাবকদের সমর্থনের জোরে তারা নিজেদের বৈধ সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার বলে জাহির করার চেষ্টা করেন। সুতরাং অন্তত সংসদে তাদের কথাবার্তা ও আচরণ নিয়ে চুলচেরা বিচার করার অধিকার সকলেরি আছে। প্রবীণ মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ (সাবেক মুজিব বাহিনীর সদস্য এবং রক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক, যে রক্ষী বাহিনীর ইতিহাস ৩০,০০০ রাজনৈতিক কর্মীর রক্তে রঞ্জিত) দিনকয় আগে বিএনপির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তারেক রহমানকে 'আহাম্মক' প্রভৃতি কয়েকটি অশালীন এবং অরুচিকর বিশেষণে ভূষিত করেছেন। লক্ষ্য করার বিষয়, আহাম্মক এবং ডাহা মূর্খ কথাদুটি মোটামুটি সমার্থক এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের স্পিকারের রায় অনুযায়ী পার্লামেন্টে অগ্রহণযোগ্য।

তারেক রহমান সম্প্রতি দুটি দাবি করে আওয়ামী লীগ নেতাদের লেজে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন বলা চলে। তার প্রথম বিতর্কিত দাবি হচ্ছে শহীদ জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি। দ্বিতীয় দাবিটি ছিলো শেখ মুজিবুর রহমানের রাষ্ট্রপতি পদ থেকে প্রধানমন্ত্রী পদে রূপান্তরের কোন আইনগত ভিত্তি ছিলো না। এ দুটি দাবির স্বপক্ষে তিনি বিশিষ্টজনদের উক্তি ও রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ লোক শহীদ হয়েছেন বলে দাবি করে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ বেকায়দায় পড়েছিলো। সে দাবির সমর্থনে কোন প্রমাণ তারা দিতে পারেননি। তারেক রহমানের দাবি দুটি সম্বন্ধে গদিতে আসীন ব্যক্তিদের অতিমাত্রিক স্পর্শকাতরতার এটাও একটা কারণ।

প্রমাণ যাচ্ছে কার বিরুদ্ধে?

প্রকৃত পরিস্থিতি ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করে দেখা যাক। একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানী বাহিনীর হামলা শুরু হতেই আওয়ামী লীগ নেতারা সীমান্ত পেরিয়ে ভারত সরকারের অতিথি হন। মুজিব নিজেই তাদের 'আন্ডারগ্রাউন্ডে' যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ১৭ এপ্রিল কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা মেহেরপুরের এক আম বাগানে দাঁড়িয়ে একটা 'নির্বাসিত বাংলাদেশ সরকারের' ঘোষণা দেন। সে ঘোষণায় শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী (ভারপ্রাপ্ত) রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী বলে উল্লেখ করা হয়। সে আম বাগানটি এখনো 'মুজিব নগর' নামে খ্যাত। লক্ষণীয় যে সাড়ে তিন বছর বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান পদে আসীন থাকলেও মুজিব কখনো মুজিব নগরে পদধূলি দেবার প্রয়োজন বোধ করেননি।

মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন ২৬ মার্চ তারিখে। সে ঘোষণা মুজিব ২৫ মার্চ মাঝ রাতের আগেই গ্রেফতার হবার পূর্বে দিয়ে গিয়েছিলেন বলে কোন প্রমাণ নেই। বতর্মানে একটি রাজনৈতিক দলের নেতা কর্নেল অলি আহমেদ সম্প্রতি বলেছেন যে জিয়ার উক্ত ঘোষণার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অন্তত নীতিগত ভাবে হলেও রাষ্ট্রের একজন

রাষ্ট্রপতি থাকা প্রয়োজন। তারেক রহমান কিছু প্রমাণ উপস্থিত করেছেন যে মেজর জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণার সময় নিজেকে রাষ্ট্রপতি বলে উল্লেখ করেছিলেন। জিয়ার একজন সহসেনা কর্মকর্তা ছিলেন মোহাম্মদ সফিউল্লাহ। ১৯৭৫ সালে তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন। বিদ্রোহী অফিসাররা তার বাড়ি আক্রমণ করলে মুজিব তার কাছেই সাহায্য চেয়েছিলেন। সেনাপ্রধান জেনারেল সফিউল্লাহ তখন মুজিবকে বাড়ির পেছনের দরোজা দিয়ে পালিয়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কি আশ্চর্য! সফিউল্লাহ এখনো সরকার ও আওয়ামী লীগের প্রিয় ব্যক্তি। তিনিও বিগত কয়দিনে বলেছেন যে মেজর জিয়াউর রহমান প্রকৃতই নিজেকে রাষ্ট্রপতি বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন।

মুজিব নগরের ঘোষণা অনুযায়ী মুজিব ছিলেন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট। নিজেকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করার আগে মন্ত্রিসভা কিংবা সংসদের অনুমোদন তিনি নিয়েছিলেন বলে কোন প্রমাণ নেই। বরং প্রয়াত তাজউদ্দীন আহমেদের কন্যা শারমিন আহমেদ তার সর্বসাম্প্রতিক বইতে বলেছেন, তার মুজিব কাকু তার পিতাকে কানে কানে বলেছিলেন যে তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে চান। তার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে গেলেন। মুজিবের জনপ্রিয়তা তখন এতোই তুঙ্গে ছিলো যে তার উক্তি কিংবা কাজ সম্বন্ধে প্রশ্ন করার সাহস কারোই ছিলো না। কিন্তু তাই বলে বলা যাবে না যে তার পদবী পরিবর্তন বৈধ ছিলো।

মুজিবের ইমেজ এবং শেখ হাসিনা

অনেকেই যথার্থ বলেছেন এবং লিখেছেন যে শেখ মুজিবুর রহমান ফেরেশতা ছিলেন না। আর আর মানুষের মতো তারও কিছু ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক ছিলো। স্বাধীনতার আন্দোলনে তার নেতৃত্বের কথা বিবেচনা করে এতোকাল সেসব ভুল ত্রুটি নিয়ে কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাননি। কিন্তু চুলকিয়ে ক্ষত সৃষ্টি করা শেখ হাসিনার বিশেষ প্রতিভা। তার রাজনীতির একমাত্র মূলধন তার পিতার নাম। পিতার কথা ও কাজকে অমোঘ সত্য এবং ত্রুটিহীন প্রমাণ করার জন্যে তিনি এমন আপস-বিহীন ভাবে উঠেপড়ে লেগে যান যে প্রায়-ভুলে-যাওয়া অতীত ইতিহাসের কিছু ঘটনা উল্লেখ না করে উপায় থাকে না। আমি প্রায়ই ভেবেছি এবং বন্ধু-বান্ধবদেরও বলেছি যে শেখ মুজিবুর রহমানের ইমেজের প্রধান শত্রু তার কন্যা শেখ হাসিনা।

তারেক রহমানকে বরাবরই আওয়ামী লীগের ভীষণ ভয়। ২০০১ সালের নির্বাচনে তার সাংগঠনিক প্রতিভার প্রমাণ জুজুর মতো সব সময় আওয়ামী লীগ নেতাদের তাড়া করে বেড়ায়। বিগত কিছু দিনে মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, হাছান মাহমুদ, হাসানুল হক ইনু এবং কামরুল ইসলাম প্রমুখ মন্ত্রীরা তারেক সম্বন্ধে যেসব ইতর উক্তি করেছেন দেশ-বিদেশে সকল সভ্য মানুষ তাতে ছি-ছি করছেন। ছোটবেলা থেকে জ্ঞানী-গুণীদের মুখে শুনে এসেছি মেরুদণ্ড

বিহীন মানুষ যখন যুক্তিতর্কে হেরে যায় তখনই তারা ইতর গালি-গালাজ শুরু করে দেয়। উপরোক্ত মন্ত্রীদের সম্বন্ধে মানুষ কি ভাবছে আপনারাই বুঝে নিন।

বাংলাদেশের সংবিধান ওয়েস্টমিনস্টার পার্লামেন্টের অনুকরণে প্রণীত। যেসব দেশে এ পদ্ধতি চালু আছে (ভারত, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ক্যানাডা প্রভৃতি) তারা ওয়েস্টমিনস্টার পার্লামেন্টের আইন-কানুন ও নজির মেনে চলে। সংসদের পবিত্রতা রক্ষায় এসব দেশে স্পিকাররা সযত্নে অসংসদীয় ভাষা পরিহারের চেষ্টা করেন। কিন্তু বিগত সোয়া পাঁচ বছরে বাংলাদেশ সংসদে যেসব অসংসদীয়, অসভ্য এবং ইতর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তাতে সংসদের আসবাব এবং দেয়ালও পূতিগন্ধময় হয়ে রয়েছে বলে আমার মনে হয়।

দুজন স্পিকার এ সময়ে সংসদের নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক ছিলেন। তারা হচ্ছেন আব্দুল হামিদ ও শারমিন চৌধুরী। শেখ হাসিনা এ সময় সংসদে বহু অমার্জিত ও অশালীন গালিগালাজ করেছেন। কোন স্পিকার কি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের স্পিকার জন বেরকোর মতো তাকে কোন উক্তি প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেছেন? প্রধানমন্ত্রী কেন, কোন মন্ত্রী কিংবা সাংসদকে তারা তিরস্কার করেছেন অশালীন উক্তি করার জন্যে? মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ যে তারেক রহমানকে 'আহাম্মক' বলে গালি দিলেন স্পিকার কি তাকে সেটা প্রত্যাহার করতে বলেছেন? নিশ্চয়ই বলেননি।

কারণটাও কারো অজানা নয়। বর্তমানের মন্ত্রী, সাংসদ, স্পিকার এরা কেউই জনসাধারণের ভোটে কিংবা নিজ গুণে এসব পদে বহাল হননি। এসব পদ তারা পেয়েছেন শেখ হাসিনার অনুগ্রহে। হাসিনাকে খুশি করার জন্যেই মন্ত্রী ও সাংসদরা প্রতিযোগিতা করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে অশালীন গালিগালাজ করেন। মেরুদণ্ডের জোর নেই বলেই স্পিকার প্রতিকার করতে সাহস পান না। নিজের শক্তিতে নয়, পরের অনুগ্রহে যারা উচ্চপদ পান তাদের মেরুদণ্ড সব সময়ই দুর্বল হয়। প্রভুর কথা কিংবা কাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস তাদের থাকে না। শেখ হাসিনার নিজের বেলাতেও একই কথা প্রযোজ্য। দেশের মানুষের ভোটের জোরে নয়, দিল্লির প্রভুদের অনুগ্রহে তিনি গদি দখল করে আছেন। দিল্লির সরকার ১৯৭৪ সালের সীমান্ত সহজীকরণ চুক্তি কার্যকর করছে না, তিন বিঘা ছিটমহলটি বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করছে না। নদীর পানির ন্যায্য অংশ তারা বাংলাদেশকে দিচ্ছে না। কথা দিয়েও তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তিতে তারা সই করছে না। তাদের এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেবার সাহস হাসিনার নেই। বরং বাংলাদেশের মানুষ যখন পানির দাবিতে লং মার্চ করে হাসিনার মন্ত্রীরা তাদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হন। তাদের হুমকি দেন। ভারত বিশ্বের চোখে বিব্রত হতে পারে সে ভয়েই তারা কাতর। সাময়িকভাবে হলেও তিস্তায় কিছু পানি পেতে হলে বিএনপিকে লং মার্চ করতে হয়।

(লন্ডন, ২৩.০৪.১৪)

এ বইয়ের প্রকাশ আওয়ামী লীগের ফাটলকে তুলে ধরেছে

বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে, প্রবাসে বাংলাদেশীদের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক বাংলা মিডিয়ায় (সামাজিক মিডিয়াসহ) সবচাইতে আলোচিত বই হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদের কন্যা শারমিন আহমেদের 'তাজউদ্দীন আহমদ নেতা ও পিতা'। প্রয়াত তাজউদ্দীন আহমেদকে আমি ভালো করেই চিনতাম। তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের উদ্যমশীল নেতা, আর আমি উৎসাহী তরুণ সাংবাদিক। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল তিনি মুজিবনগরে নির্বাসিত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন। পেশাগত কারণে তখন আরো বেশি করে তার প্রতি বিশেষ নজর রাখতে হয়েছে আমাকে।

তাজউদ্দীন আহমেদকে আমি বরাবরই শ্রদ্ধা ও প্রশংসার চোখে দেখেছি। অজস্রবার আমি ভেবেছি শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বৈরতন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী না হয়ে যদি জাতির পিতা হিসেবে নতুন স্বাধীন দেশের অভিভাবক হয়ে বসে থাকতেন, আর তাজউদ্দীন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে যেতেন তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাস ভিন্নভাবে লেখা হতো কিনা। বস্তুত পাকিস্তান থেকে দেশে ফেরার পথে লন্ডনে আমি তাকে বাংলাদেশের গান্ধী হবার পরামর্শ দিয়েও ছিলাম। তবে বলতে বাধ্য হচ্ছি অনেক পরে যখন জানতে পারি যে তাজউদ্দীন ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের সাথে একটা সাতদফা গোপন চুক্তি করেছিলেন এবং সে চুক্তিতে বিডিআরের অস্তিত্ব লোপ করে বিএসএফের তত্ত্বাবধানে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বাহিনী গঠন এবং বাংলাদেশের নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি না রাখার শর্তে রাজি হয়েছিলেন তখন ভয়ানক একটা আঘাত পেয়েছিলাম মনে।

কিন্তু একাত্তরের সে কালো দিনগুলোর কথা মনে রেখে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছি। তাজউদ্দীন ও আওয়ামী লীগ নেতারা প্রাণভয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাদের অনুপস্থিতিতে দেশের মানুষ পাকিস্তানী হানাদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে সাহসী হবে বলে তাদের ভরসা ছিলো না। এবং ভারতের সাহায্য না পেলে তারা আর কখনো দেশে ফিরতে পারবেন কিনা ইত্যাদি বিষয়েও তাদের মনে প্রচুর সংশয় ছিলো। ইন্দিরা গান্ধীর সরকার যখন একটা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলো তখন সেটা গ্রহণ না করে

তাদের উপায়ান্তর ছিলো না। পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী হয়ে শেখ মুজিবুর রহমান সে চুক্তি মেনে নিতে অস্বীকার করেন এবং ভারতীয় সেনাদের বাংলাদেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য করেন। শুনেছি এ বিষয়টি নিয়ে তাজউদ্দীনের সঙ্গে তার কিছু বাকবিতণ্ডাও হয়েছিলো।

শারমিন আহমেদের বইখানি আমি এখনো সংগ্রহ করতে পারিনি। তবে বাংলাদেশে এক স্বনামধন্য বন্ধু বলেছেন সংগ্রহ করে লন্ডনে আমাকে পাঠানোর চেষ্টা করবেন। ইতোমধ্যে মিডিয়ায় বইখানির বিভিন্ন অংশের যে কয়টি উদ্ধৃতি পড়েছি তার ভিত্তিতেই আলোচনার চেষ্টা করবো। প্রথমেই বলে রাখি শেখ হাসিনার সরকারের নাকের ডগাতেই বাংলাদেশের এক প্রতিথযশা প্রকাশক যে বইখানি প্রকাশ করতে সাহস পেয়েছেন তাতেই আমি বিস্মিত হয়েছি। বাংলাদেশের মিডিয়া এবং পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক জগতের সঙ্গে আমার মোটামুটি যোগাযোগও আছে। বহু পুস্তক বিক্রেতা সরকারের কোন সমালোচকের লেখা পুস্তক বিক্রি করতেও অস্বীকার করেন। আমি জানি বিরুদ্ধ মত ও সমালোচনা সম্বন্ধে বর্তমান সরকার ভয়ানক অসহিষ্ণু।

শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী হয়েই মতিয়ুর রহমান রেন্টুর 'আমার ফাঁসি চাই' বইখানি নিষিদ্ধ করে প্রকাশকদের একটা আগাম হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছিলেন। তার সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদে চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত ও ইসলামী টেলিভিশন চ্যানেলগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে বিনা বিচারে বৎসরাধিককাল জেলে রেখে নির্যাতন করা হয়েছে, আমার দেশ পত্রিকাটির মুদ্রণ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।সেলফ সেন্সরশিপের আতঙ্কে সম্পাদকদের আহার নিদ্রা হারাম হয়ে রয়েছে বলা চলে। শুনেছি টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর টকশোতে কাকে আমন্ত্রণ করা যাবে আর কাকে যাবে না সে সম্বন্ধেও সরকারের নির্দেশ আসে। সত্য প্রকাশের কারণে একের পর এক কয়েকটি জনপ্রিয় ইন্টারনেট ব্লগও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

প্রকাশকের সাহস এক বিস্ময়

এই যেখানে অবস্থা সেখানে প্রকাশক নিশ্চয়ই শারমিন আহমদের বইখানি প্রকাশের আগে বহুবার ভেবে দেখেছেন। আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে বিশেষ কোন শক্তিশালী মহলের চাপ কিংবা ভরসা ছাড়া বর্তমান সময়ে এই বই বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হতো না। এই শক্তিশালী মহল কারা সে সম্বন্ধে জল্পনা করতে গেলে অনেকগুলো মহলের এবং সম্ভাবনার কথা মনে আসতে বাধ্য। সংশ্লিষ্ট মহলের পরিচয় জানা গেলে বাংলাদেশের রাজনীতির ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা সম্বন্ধে কিছু আঁচ অনুমান করা যাবে।

বাংলাদেশের ইতিহাস নতুন করে লেখার জন্যে বর্তমান সরকার যে কয়টি মূল দিকনির্দেশ দিয়ে রেখেছে সেগুলো এরকম: (১) শেখ মুজিবুর রহমান যে লন্ডনে বেমওকা বলে ফেলেছিলেন মুক্তিযুদ্ধে তিন মিলিয়ন (তিন লাখের পরিবর্তে) লোক মারা গেছে সেটার নড়চড় করা যাবে না। দেব-বাক্যের মতো সে সংখ্যা আঁকড়ে থাকতে হবে। (২) যদিও শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি এবং দিতে রাজি হননি, তথাপি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে লিখে রেখে যেতে হবে যে সে ঘোষণা তিনিই দিয়েছেন, মেজর জিয়াউর রহমান নয়, কেননা জিয়া পরিবারের প্রতি জাতক্রোধ সরকার ভবিষ্যৎকেও উপহার দিতে চায়। আওয়ামী লীগের যে মহল স্বীকার করেন যে ২৬ মার্চ মুজিব পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হেফাজতে ছিলেন, স্বাধীনতার ঘোষণা তিনি দেননি, তারাও যুক্তি দেখান যে ৭ মার্চের রেসকোর্স ময়দানের বক্তৃতায় সে ঘোষণা দেয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু শেখ হাসিনার উপদেষ্টা এইচ টি ইমামও বলেছেন যে ৭ মার্চ মুজিব 'রক্তপাতের ভয়ে' স্বাধীনতার কোন ঘোষণা দেননি। (৩) মেজর জিয়া তার স্বাধীনতার ঘোষণার সঙ্গে নিজেকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান বলে যে ঘোষণা দিয়েছিলেন তার পক্ষে তারেক রহমান সম্প্রতি লন্ডনে অনেকগুলো প্রামাণ্য তথ্য উত্থাপন করেছেন। সে সঙ্গে তারেক রহমান আরো প্রমাণ পেশ করেছিলেন যে 'রাষ্ট্রপতি মুজিব' থেকে 'প্রধানমন্ত্রী মুজিবে' রূপান্তরের প্রক্রিয়া কোন আইন অনুযায়ী হয়নি।

সরকারের দিক থেকে যুক্তি দিয়ে এই বক্তব্যগুলোর কোনটি খণ্ডন করা সম্ভব হয়নি। তর্কে হেরে গিয়ে মন্ত্রীরা শুধু গালিগালাজ করেছেন কাপুরুষ জনোচিত ভাষায়। উপরোক্ত তিনটি ব্যাপারে ইতিহাসকে বিকৃত করে রাখা আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ইমানের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলা যায়। শারমিন আহমেদ আলোচ্য বইয়ের এ যাবৎ মিডিয়ায় প্রকাশিত অংশে এই বিকৃতিগুলো অসত্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন তার পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে। তিনি বলেছেন, ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় তাজউদ্দীন স্বাধীনতা ঘোষণার খসড়া লিখে এবং টেপরেকর্ডার সঙ্গে নিয়ে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর রোডের বাড়িতে শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বহু অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও মুজিব ঘোষণা রেকর্ড করতে রাজি হননি। তিনি ভয় করছিলেন যে তেমন কোন ঘোষণা পরবর্তীকালে পাকিস্তানীরা তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। ২৫ মার্চ রাতেও তিনি অখণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্ন ভুলতে পারেননি।

রহস্যজনক নীরবতা

শারমিন একস্থানে মন্তব্য করেছেন তার 'মুজিব কাকু' বদলে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, পাকিস্তান থেকে দেশে ফিরে মুজিব কাকু তার আব্বুর কানে

কানে বলেন যে তিনি রাষ্ট্রপতি থাকতে চান না, প্রধানমন্ত্রী হতে চান। তার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন। আর সকলেই জানে মুজিবনগর ঘোষণা অনুযায়ী তাকে যে রাষ্ট্রপতি করা হয়েছিলো তার সে পদবী পরিবর্তনে সংসদের, এমনকি মন্ত্রীসভারও অনুমোদন নেওয়া হয়নি। অর্থাৎ আওয়ামী লীগের ও বর্তমান সরকারের ইতিহাস বিকৃত করার খুঁটিগুলোর কোন ভিত্তি ছিলো না। শারমিনের বইটি প্রকাশিত হওয়ায় তাদের পায়ের তলার জমিটাও ধসে পড়লো। শারমিন আরো লিখেছেন যে বাকশাল পদ্ধতি চালু করার বিরুদ্ধে তার পিতা প্রবল আপত্তি করেছিলেন।

এ সরকারের একটা বিশেষত্ব হলো তাদের ভুল দাবির বিপক্ষে কোন বক্তব্য পেশ করা হলে তারা ভয়ানক ক্ষেপে যায় এবং উল্টোপাল্টা যুক্তি সৃষ্টি করে বক্তাকে 'ডিসক্রেডিট' (সুনাম হানির) করার চেষ্টা করে। অতীতে আমাকেও সে অভিজ্ঞতায় পড়তে হয়েছে। কিন্তু কি বিস্ময়! কি বিস্ময়!! শারমিন আহমেদের বইয়ের ব্যাপারে এ যাবৎ সরকারের কোন প্রতিক্রিয়া দেখিনি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরাবরই সকাল-সন্ধ্যা ক্রুদ্ধ হুঙ্কার আর গালাগালিপূর্ণ বিবৃতি দিতে ভালোবাসেন। তাজউদ্দীন কন্যার বইটি নিয়ে ব্যাপক আলোড়ন চললেও হাসিনা আশ্চর্য রকম নীরব আছেন সে সম্বন্ধে। শুধু দলের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় কাতারের কেউ একজন মতিয়ুর রহমান রেন্টুর আমার ফাঁসি চাই-য়ের মতো এই বইখানিও নিষিদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছেন। তাছাড়া একটা দুর্বল যুক্তিতে শারমিন আহমদকে 'ডিসক্রেডিট' করার হাস্যকর চেষ্টা করেছেন একজন লেখক শারমিনের বয়সের প্রশ্ন তুলে। মুক্তিযুদ্ধের সময় শারমিনের বয়স নাকি ছিলো এগারো বছর এবং এ বয়সের কোন কথা নাকি তার মনে থাকার কথা নয়। এ লেখকের জন্যে আমার করুণা হয়। তিনি নিশ্চয়ই খুবই 'লেট ডেভেলপার' ছিলেন।

মহিলাদের বয়স প্রশ্ন নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনা যে অমার্জিত রুচির পরিচয় দেয় সে কথা আওয়ামী লীগে কারো মনে থাকবে বলে কেউ বিশ্বাস করে না। পাঁচ ও ছয় বছর বয়সে আমি বাড়ির পাশের হিন্দু তাতীদের গ্রামের পাঠশালায় যেতাম ছাতা মাথায় দিয়ে। আকারে খাটো ছিলাম। আম্মা-চাচীরা হাসাহাসি করতেন, বলতেন একটা ছাতাকে তারা হেঁটে আসতে দেখেছেন। সেসব স্মৃতি প্রায়ই আমার মনে আসে। দুটি সন্তানকে হারিয়েছি আমার স্ত্রী ও আমি। কিন্তু দুটি প্রাপ্তবয়স্ক নাতি আছে। গল্পচ্ছলে অজস্র কথা তারা বলেছে ছোটবেলার স্মৃতি থেকে। এগারো বছরেরও অনেক আগের ঘটনা তারা সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে বর্ণনা করে থাকে। আমার কোন সন্দেহ নেই বাংলাদেশের যে কোন সাধারণ বুদ্ধির মানুষ বলে দেবে সাত-আট বছর থেকে পারিপার্শ্বিক ঘটনাগুলো তাদের মনে

আছে। বাংলাদেশের অনেক মন্দভাগ্য পরিবারে এগারো-বারো বছরের ছেলেরা সংসারের দায়িত্ব নিতে বাধ্য হয়।

পত্নী জোহরা তাজউদ্দীন আহমেদের রাজনৈতিক সহকর্মীও ছিলেন। শেখ মুজিবের স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে অস্বীকৃতি এবং স্বাধীনতার পরে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে তাকে অপসারণ ও গ্রেফতার ইত্যাদি তিক্ত ও মর্মন্তুদ ঘটনাগুলো নিয়ে নিশ্চয়ই তিনি স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং সেসব বেদনাদায়ক ঘটনাগুলোর কথা তাদের সন্তানদের মনে অবশ্যই স্থায়ী রেখাপাত করেছে।

ঐক্যের আঠা এখন অকেজো হয়ে গেছে

আমার বিস্ময় আদৌ বইটির প্রকাশের ব্যাপারটি। আওয়ামী লীগ সরকারের অভ্যন্তরে দ্বিমত কিংবা ফাটলের কোন আভাস এ ঘটনা থেকে পাওয়া যায় কি? মতভেদ সকল রাজনৈতিক দলেই কিছু কিছু থাকে। এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেটা অভিপ্রেতও বটে। কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব নিয়ে গুরুতর মতদ্বৈধের কানাঘুষা আগেও শোনা গেছে। সম্প্রতি আবার সিনিয়র মন্ত্রীরাও বস্তার ভেতর ছুঁচোর দাপাদাপির মতো ইতি-উতি বেসামাল কথাবার্তা বলে চলেছেন। ফখরুদ্দীন-মইনুদ্দিন বর্ণচোরা সামরিক সরকারের আমলে 'মাইনাস-টু' নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা হয়েছে। ভারতের অর্থমন্ত্রী (বর্তমানে রাষ্ট্রপতি) প্রণব মুখার্জি তখন ঢাকায় এসেছিলেন এবং চারজন আওয়ামী লীগ নেতাকে (তোফায়েল আহমেদ, আমির হোসেন আমু, আব্দুর রাজ্জাক ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত) নিয়ে তিন-চার ঘণ্টার গোপন বৈঠক করেছিলেন। তখন জল্পনা শোনা গিয়েছিলো শেখ হাসিনাকে বাদ দিয়ে সম্ভবত তোফায়েল আহমেদকে প্রধান করে আওয়ামী লীগের নতুন নেতৃত্ব গড়ে তোলা দিল্লির অভিপ্রায় ছিলো।

কিন্তু আওয়ামী লীগের ভেতরের কোন্দলের এতোকাল বাড়াবাড়ি হয়নি কতগুলো কারণে। গদি, দুর্নীতির ওপেন জেনারেল লাইসেন্স, আইনের শাস্তি থেকে অব্যাহতির প্রায় সুনিশ্চিত আশ্বাস ইত্যাদির আঠা দিয়ে শেখ হাসিনা দলকে মোটামুটি জোড়া দিয়ে রেখেছিলেন। বর্তমানে এমন কতগুলো কার্যকারণ দেখা দিয়েছে যাতে মনে করা যেতে পারে যে সে আঠা ভেতরের টানাপড়েনগুলো জোড়া দিয়ে বুঝি আর রাখতে পারবে না।

জানুয়ারিতে আওয়ামী লীগে যারা মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য হয়েছেন তারা ভালো করেই জানেন কোন রকম ম্যান্ডেটের ভিত্তিতে নয়, গুণ্ডাগার্দি এবং দলীয়কৃত র‌্যাব-পুলিশের আর আওয়ামী ক্যাডারের জোরেই তারা গদি পেয়েছেন। এখন তারা দেখছেন দুর্নীতির মধুর হাঁড়ি প্রায় নিঃশেষিত। আগের পাঁচ বছরেই দেশের সম্পদের প্রায় সবটাই লুটপাট হয়ে কুয়ালালামপুর, দুবাই

কিংবা লন্ডনে পাচার হয়ে গেছে। কোটি কোটি টাকা খরচ করে তারা গদি কিনেছেন। সে টাকা উসুল হবে কিনা কারো কারো মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তাছাড়া তাদের মধ্যে যারা নিরেট মস্তিষ্ক নন তারা অবশ্যই জানেন এ গদি আর বেশিদিন টিকবে না, টিকতে পারে না। দেশের মানুষ তাদের চায় না। একমাত্র ভারত ছাড়া আর কোন দেশ বর্তমান সরকারকে বৈধ বিবেচনা করে না। বহির্বিশ্ব থেকে নানা রকম চাপ আসছে যথাশীঘ্র সকলের গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে।

বর্তমানে এই চাপ ঠেকিয়ে রাখা হচ্ছে ভারতের কূটনৈতিক তৎপরতার জোরে। সে তৎপরতাও আর বেশিদিন বজায় থাকবে বলে মনে হয় না। ভারতের নির্বাচন এখন মাঝপথে। মে মাসের খুব সম্ভবত ১৬ তারিখে ফলাফল ঘোষণা করা হবে। বর্তমানের কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন সরকার আবার ক্ষমতায় আসবে বলে ভারতের কোন জনমত সমীক্ষায় বলা হচ্ছে না। অনেকেই বলেছেন নির্বাচনের পরে যারাই দিল্লিতে সরকার গঠন করুক তাদের বাংলাদেশ নীতি পরিবর্তন হবে না। এক হিসেবে সেটা অবশ্যই সত্যি কথা।

ভারতের বাংলাদেশ নীতি কি? তারা বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক চায় সম্পূর্ণ নিজেদের স্বার্থে। বাংলাদেশকে তারা তাদের অচল পণ্য, ফেনসিডিল আর ইয়াবার ডাম্পিং গ্রাউন্ড করে রাখতে চায়। তারা চায় সাত বোন নামে পরিচিত উত্তর-পূর্বের সাতটি অঙ্গরাজ্যে পণ্য, সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠানোর জন্যে সড়ক, রেল ও নদীপথে করিডোর ও ট্রানজিট। পূর্ব ভারতের বিদেশী বাণিজ্যের জন্যে যথেষ্ট বন্দর সুবিধা নেই ভারতের। বাংলাদেশের দুটি সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম আর মংলার অবাধ ব্যবহার চায়তারা। আর সে বন্দর দুটির ব্যবহারের অজুহাতে তারা বঙ্গোপসাগরে তাদের নৌ-আধিপত্যও বিস্তার করতে চায়।

ডুবন্ত জাহাজের ইঁদুর

ভারতে পরবর্তী সরকার যারাই গঠন করুক তারাও অবশ্যি উপরোক্ত সুবিধাগুলো বজায় রাখতে চাইবে। কিন্তু তারা বুঝে গেছে হাসিনা যেসব গোপন চুক্তিই করে থাকুক ভারতের সঙ্গে, সময় এলে এবং সুযোগ পেলে বাংলাদেশের মানুষ সেগুলো ভণ্ডুল করে দেবে। অন্তত সেসব চুক্তি বাস্তবায়নে পদে পদে বাধা দেবে তারা। বাংলাদেশের মানুষ হাসিনাকে বিশ্বাস করে না। তারা বিশ্বাস করে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের নয়, ভারতের স্বার্থেই কাজ করছেন। দিল্লির বর্তমান সরকার মারাত্মক ভুল করেছে। হাসিনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গিয়ে তারা বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষকে বৈরী করে ফেলেছে। এ অবস্থায় হাসিনাকে গদিতে রেখে বেশিদিন তাদের স্বার্থ বজায় থাকবে না। তাছাড়া বাংলাদেশকে ঘিরে দিল্লির বর্তমান সরকার বহির্বিশ্বের বিরক্তি উৎপাদন করেছে। সেটা তার

দূরমেয়াদী বিশ্ব স্বার্থের বিপরীতে যেতে বাধ্য। বাংলাদেশে নতুন নির্বাচনের ব্যাপারে বিশ্ব সমাজের সঙ্গে সহমত্য প্রকাশ করে ভারতের নতুন সরকার বাকি বিশ্বের সঙ্গে সহজেই সম্পর্ক মেরামত করতে পারবে।

অর্থাৎ এ সম্ভাবনা এখন জোরালো যে দিল্লিও হয়তো চলতি বছরের মধ্যেই বাংলাদেশে নতুন নির্বাচন দেখতে চাইবে। দিল্লি আশা করবে নতুন একজন প্রধানমন্ত্রীর অধীনে বাংলাদেশের মানুষ শেখ হাসিনার সঙ্গে সম্পাদিত গোপন চুক্তিগুলোর অন্তত কিছু কিছু পরিবর্তিত এবং সংশোধিত আকারেও মেনে নিতে রাজি হবে। আওয়ামী লীগের রাজনীতিকরা সাধারণত নিজেদের স্বার্থের ব্যাপারটা বোঝেন। তারা মনে মনে হিসেব করে ফেলেছেন হাসিনাকে বাদ দিয়ে একজন বিকল্প নেতার অধীনে নির্বাচন হলে তারা হয়তো কিছু ভোট ও কিছু সংসদীয় আসন পেতে পারেন। ভবিষ্যতে আবারো সংসদ সদস্য হবার আশায় তাদের অনেকেই হাসিনাকে ছেড়ে অন্য কোন নেতার দিকে ঝুঁকতে চাইবেন। কথায় আছে না, জাহাজডুবির আশঙ্কা দেখা দিলে ইঁদুরগুলো সবচাইতে আগে সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়।

(লন্ডন, ২৯.০৪.১৪)

আর কতো লাশ পড়লে আতঙ্কিত হবার অনুমতি পাবো

জমিদারীর অরণ্য থেকে কেটে আনা গাছ ফেঁড়ে লাকড়ি করা হয় রান্না আর বাড়ি গরম রাখার জন্যে। ছেলের শখ হলো সেও লাকড়ি ফাঁড়বে। বাবা ছোট একটা কুড়োল কিনে দিলেন। বিকেলে বাড়ি এসে দেখেন সখ করে নতুন যে চেরি ফলের বাগান লাগিয়েছিলেন তিনি তার একটা চারাগাছও আর দাঁড়িয়ে নেই। সবগুলো চারা কেটে শুইয়ে দেয়া হয়েছে। ক্রুদ্ধ গর্জন করে তিনি জানতে চাইলেন, কে করেছে এই জঘন্য অপকর্ম? ছেলে এগিয়ে এসে দোষ স্বীকার করলো। যথারীতি শাস্তিও সে মেনে নিলো মুখ বুঁজে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই ছেলে জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। ছোটবেলা পাঠ্যবইতে এ কাহিনী পড়েছিলাম। আরেকটু বড়ো হয়ে কর্তব্যজ্ঞান ও দায়িত্ববোধের বহু কাহিনী পড়েছি। পড়েছি ক্যাসাবিয়াঙ্কার কাহিনী। সেটা ১৭৯৮ সালের একটা সত্যিকারের কাহিনী। ক্যাসাবিয়াঙ্কার বয়স তখন ছিলো দশ বছর। নীল নদের যুদ্ধে তার বাবা ছিলেন ফরাসী রণতরী ওরিয়েন্টের কাপ্তেন। ছেলে তার অধীনে কাজ করে। বাবা ছেলেকে বলেছিলেন ডেকের নির্দিষ্ট একটা স্থানে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে। হঠাৎ শত্রু কামানের গোলার ঘায়ে জাহাজে আগুন ধরে যায়। সে গোলার আঘাতেই বাবা মারা গিয়েছিলেন। অন্য নাবিক সেনাসামন্ত সবাই লাফিয়ে পানিতে পড়ে। কিন্তু ক্যাসাবিয়াঙ্কা বাবার আদেশ ছাড়া তার পাহারা স্থান ছেড়ে যাবে না। জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে তারও মৃত্যু এবং সলিল সমাধি হয়েছিলো। ইংরেজ কবি ফেলিসিয়া ডরোথিয়া হেম্যান ১৮২৬ সালে লেখা এক কবিতায় ক্যাসাবিয়াঙ্কার কাহিনী অমর করে রেখেছেন।

বড়ো হয়ে চাকরির জন্যে অনেক ইন্টারভিউ দিয়েছি, নিয়েছিও অনেক ইন্টারভিউ। প্রখরভাবে অনুভব করেছি প্রার্থীর কর্তব্যবোধ ও দায়িত্বজ্ঞান কর্মদাতার একটা বড়ো বিবেচনা। সে দৃষ্টিকোণ থেকে ভেবে দেখেছি বাংলাদেশের বর্তমান সরকার যে শুধুই বৈধতাহীন তাই নয়, তারা অকর্মণ্য এবং অপদার্থও বটে।

লক্ষ করে দেখেছি বর্তমান সরকারের আমলে, বিশেষ করে জানুয়ারি মাসের নির্বাচনী তামাসার পরবর্তী সরকারের আমলে পত্রপত্রিকার পাতায় সবচাইতে

বেশি ব্যবহৃত শিরোনামগুলো হচ্ছে ছিনতাই, গুম, খুন ও লাশ সম্পর্কিত। মানুষের জানমালের নিরাপত্তা-বিধান যেকোন দেশেই সরকারের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। দেখা যাচ্ছে শেখ হাসিনার অধীনের বাংলাদেশ তার একমাত্র ব্যতিক্রম। এদেশে যে জানমালের নিরাপত্তা নেই সেটা কাউকেই বলে দিতে হবে না। তার চাইতেও জঘন্য হচ্ছে যে সে নিয়ে সরকারের কোন মাথাব্যথা নেই। বরং প্রধানমন্ত্রী এবং তার দেখাদেখি চাটুকার ষড়যন্ত্রী মন্ত্রীরা বাংলাদেশের মৃত্যু উপত্যকা বা কিলিং ফিল্ড নিয়ে রসিকতা করেন।

প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং দায়িত্ব ও কর্তব্য এড়িয়ে গিয়ে তৃপ্তি পান। দেশের যাবতীয় ব্যর্থতা অন্যায় অবিচার, গুম-খুন ইত্যাদি সবকিছুর জন্যে বিএনপি দলের ওপর দোষ চাপান। অথচ তিনি হচ্ছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। নীতিগতভাবে যে কোন অবস্থায় এসবের চূড়ান্ত দায়িত্ব তার ওপর বর্তায়। আওয়ামী লীগের নেত্রী হয়ে তিনি বিবিসির স্টুডিওতেই বলেছিলেন যে তার বাবা-মা এবং ভাইয়েদের 'ওরা' খুন করেছে; কেউ তাদের জন্যে চোখের পানি ফেলেনি; তার প্রতিশোধ নিতেই তিনি রাজনীতিতে এসেছেন। মনে হচ্ছে সে প্রতিশোধের পালা এখনও পুরোদমে চলছে এবং বাংলাদেশের ঘরে ঘরে শোকের আহাজারি পড়ে যাওয়া পর্যন্ত প্রতিশোধের ক্ষুধা মিটবে না।

লাশের মিছিল এবং নির্লজ্জ সরকার

দেশের মানুষ এবং বিদেশী পর্যবেক্ষকরা চোখের সামনে দেখছে আজকের বাংলাদেশে যা কিছু অন্যায় ঘটছে তার জন্যে দায়ী প্রধানমন্ত্রীর আদরের দুলাল ছাত্রলীগ ও যুবলীগ। আর আওয়ামী লীগের সশস্ত্র ক্যাডার। তাদের সাত খুন নয়, সাতশো খুনও মাফ। তারা দিনে দুপুরে খুন করছে। তারা পুলিশ ও আমলা পেটাচ্ছে, থানার ওপর হামলা করছে, ছাত্রীদের ওপর সম্ভাব্য সকল রকম নির্যাতন চালাচ্ছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ শাখার সভাপতি শরিফুল ইসলাম বড়ো গলায় দাবি করেছেন, তার কাছে 'কেন্দ্রীয় নির্দেশ' আছে যে 'দুই একটা সাংবাদিকের গলা কেটে ফেললে কিছুই হবে না'। নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগের গডফাদার শামীম ওসমান প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েছেন তিনি কাউকে 'কেয়ার করেন না', কেন না শেখ হাসিনা তাকে রক্ষা করবেন।

পুলিশ এবং র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব) সম্পূর্ণরূপে আওয়ামী লীগ দলের পেশীশক্তিতে পরিণত হয়েছে। গোড়ায় হয়তো অপরাধ দমনের কিছু স্পৃহা তাদের ছিলো। কিন্তু সরকার নির্লজ্জভাবে তাদের দিয়ে বহু অপকর্ম করিয়েছে। সরকারের রাজনৈতিক বিরোধীদের হত্যা এবং গুম-খুনের কাজে পুলিশ ও র‍্যাবকে ব্যবহার করা হচ্ছে। তারা বুঝে গেছে কর্তব্য এবং আদর্শকে গিলে খেয়ে আখের গোছানোই বুদ্ধিমানের কাজ। তারা বিরোধীতা না করে প্রধানমন্ত্রীর ক্যাডারদের পাশাপাশি দুর্নীতি আর গুম-খুন চালাচ্ছে বলে ব্যাপক

অভিযোগ আছে। মনে হতে পারে যে দুই তরফে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। নারায়ণগঞ্জে ২৭ এপ্রিল সাত জনের অপহরণ এবং হত্যা থেকে মনে হতে পারে র‍্যাব এখন মাফিয়ার কায়দায় 'কন্ট্রাক্ট কিলিং' ব্যবসায়ে নেমেছে।

ক্ষমতাসীনরা কতোখানি নির্লজ্জ হলে কোন দেশে এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র নজরুল ইসলাম, আইনজীবী চন্দন সরকারসহ সাতজনের লাশ শীতলক্ষ্যা থেকে উদ্ধারের ঘটনা থেকেই সেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আদালত থেকে ফেরার পথে দিনে দুপুরে তাদের ছিনতাই করা হয়। তিন দিন পরে শীতলক্ষ্যায় তাদের লাশ ভেসে ওঠে। প্রকাশিত খবরাদি থেকে কতগুলো বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই খুনিরা সাধারণ খুনি নয়, স্পষ্টতই বুদ্ধিমান, পেশাদার এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। লাশের পেট ফুলে যায়, সে লাশ পানিতে ভেসে ওঠে। সেটা এড়াতে তারা সাতটি লাশেরই পেট চিরে দিয়েছিলো। তারপর থলেভর্তি ইট পেটে বেঁধে তারা লাশগুলো নদীতে ফেলে দেয়। তারা ভেবেছিলো শিগগির সেসব লাশ কেউ দেখতে পাবে না, তারা আপাতত নিরাপদে থাকতে পারবে। কিন্তু 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে'। লাশগুলো চার দিনের মাথায় ভেসে উঠেছিলো।

কোন রকম বিব্রতও হয়েছিলো কি সরকার? মোটেই না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গুপ্ত হত্যা ও চোরাগোপ্তা হামলার জন্যে আবারো বিএনপিকে দায়ী করেছেন। এসব ঘটনা নিয়ে তিনি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন। মানুষের জীবন-মৃত্যু তার কাছে হাস্য-রসিকতা মনে হয়। আবারো মনে রাখতে হবে যে শেখ হাসিনা স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রকৃত মন্ত্রী। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, জানমালের নিরাপত্তা রক্ষা প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তারই দায়িত্ব। আরো নির্লজ্জ তার স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। এই প্রতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল লাশগুলো ভেসে ওঠার দিন বলেছেন, "গুম-অপহরণ বাড়েনি। আতঙ্কিত হবার কিছু নেই।"

আওয়ামী লীগের ১৯৯৬-২০০১ সরকারের আমলে ৭৬৭টি রাজনৈতিক হত্যা হয়েছিলো। ২০০৯ থেকে ২০১৩ সময়ে হয়েছে ৫৬৪টি। আর বিভিন্ন হিসাব অনুযায়ী চলতি বছরের চার মাসে চারশোরও বেশি রাজনৈতিক হত্যা হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৩ সালের শেষ পর্যন্ত র‍্যাব আর পুলিশের হাতে বিচার-বহির্ভূত হত্যা হয়েছে ৭৬৪টি। চলতি বছর এখন মাত্র পাঁচ মাসে পড়লো, বিচার-বহির্ভূত হত্যার সঠিক হিসেব এখনো পাইনি, কিন্তু সেটা তিন-চারশো তো হবেই। পুলিশ সদর দফতরের হিসাব অনুযায়ী ২০০৯ থেকে গত বছর পর্যন্ত বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশে ২০ হাজার ৭২০ ব্যক্তি খুন হয়েছেন। সাধারণ বুদ্ধিতেই বলে এসব খুনের অধিকাংশের সঙ্গেই আওয়ামী লীগ এবং তাদের অঙ্গ-সংস্থাগুলো জড়িত ছিলো।

অপহৃতদের উদ্ধার সরকারের কাম্য ছিলো না

মনে রাখতে হবে এরা নিছক পাটিগণিতের সংখ্যা কিংবা মশা-মাছি নয়। এরা সকলেই ছিলো মানুষ, মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। তাদের সকলের বাবা-মা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও আত্মীয় আছে এবং শোকের আগুন তাদের হৃদয়ে অনন্তকাল ধরে দাউ দাউ করে জ্বলবে। তাদের আত্মার অভিশাপ একদিন অত্যাচারীদের দগ্ধ করতে বাধ্য। এই যে হাজারে হাজারে মানুষ খুন করা হলো সে জন্যে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর কোন ক্ষোভ কিংবা আক্ষেপ নেই। তিনি বলেছেন আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। আর কতো রাজনৈতিক ও বিচার-বহির্ভূত হত্যা, গুম আর খুন হলে বাংলাদেশের মানুষ উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত হবার 'যোগ্যতা' অর্জন করবে? নাকি আতঙ্কিত হবার জন্যে তাদের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর পরিবারের লোকেদের গুম-খুন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে? মানুষের জীবন ও মৃত্যু নিয়ে যারা এ ধরনের হৃদয়হীন উক্তি করতে পারে কোন বিচারে তাদের মানুষের পর্যায়ে ফেলবো বুঝতে পারছি না।

প্রতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল পরে বলেছেন, আলোচ্য সাতব্যক্তি অপহৃত হবার তিনদিন পরে, অর্থাৎ লাশগুলো ভেসে ওঠার পরে তিনি প্রধানমন্ত্রীর (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) নির্দেশ চাইতে গণভবনে গিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তাকে কি নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনিই জানেন। কিন্তু এতগুলো মানুষ গুম হলো। তাও দেশে অজস্র মানুষ গুম ও খুন হবার পরে। এই তিনদিন প্রতিমন্ত্রী নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়েছিলেন? এই মানুষগুলোকে উদ্ধারের নির্দেশ পুলিশকে দেয়া কর্তব্য বলে তার একবারও মনে হয়নি? খুব সম্ভবত লোকগুলোকে উদ্ধার করা আদৌ প্রধানমন্ত্রীর কাম্য ছিলো কিনা সেটা তিনি বুঝে উঠতে পারেননি। কাম্য হলে প্রধানমন্ত্রী নিজেই তাকে নির্দেশ দেবেন বলে সম্ভবত ধরে নিয়েছিলেন আসাদুজ্জামান খান কামাল।

নিহত প্যানেল মেয়র নজরুল ইসলামের স্ত্রী অপহরণের পরপরই থানায় এজাহার দিয়েছিলেন। খুব সম্ভবত অন্য ছয়জনের স্ত্রী কিংবা আত্মীয়রাও এজাহার দিয়ে থাকবেন। নজরুল ইসলামের স্ত্রী তার এজাহারে সিটি কর্পোরেশনের অন্য একজন ওয়ার্ড কাউন্সিলার এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা নূর হোসেনকে প্রধান সন্দেহভাজন ব্যক্তি বলে তার এজাহারে উল্লেখ করেছিলেন। পুলিশ সাতদিন পর (লাশ উদ্ধারের তিনদিন পর) তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে রক্তমাখা একখানি মিনিবাস, মোবাইল ফোন ইত্যাদি কিছু জিনিস উদ্ধার করেছে। প্যানেল মেয়র নজরুলের স্ত্রী বলেছেন সঙ্গে সঙ্গেই তল্লাশি চালানো হলে তার স্বামী ও অন্যদের হয়তো জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হতো। কিন্তু পুলিশ কি প্রকৃতই অপহৃতদের উদ্ধার করতে চেয়েছিলো? নাকি লাশগুলো পাবার পরে লোকদেখানো ভাবে একটা তল্লাশি তারা চালিয়েছে?

সীমান্তে রেড-এলার্ট দেবার কথা সরকারের মনে হয়েছে আটদিন পরে। মিডিয়ার খবর অনুযায়ী এক ও দু নম্বর আসামি তার আগেই দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। ঘোড়া পালাবার পর আস্তাবলের দরোজা বন্ধ করার এমন দৃষ্টান্ত হাসিনা-শাসিত বাংলাদেশ ছাড়া আর কোথায় পাওয়া যাবে?

কে এই নূর হোসেন? ধীরে ধীরে আরো তথ্য বেরিয়ে আসছে। নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না বলেছেন,"নারায়ণগঞ্জে অপহরণের পর সাতজনকে হত্যা মামলার প্রধান আসামি নূর হোসেনের নামে (আগেই) থানায় গ্রেফতারী পরোয়ানা ছিলো। অথচ আওয়ামী লীগের জনৈক নেতার নির্দেশে ওয়ারেন্ট থেকে অব্যাহতি দিয়ে তাকে দেশপ্রেমিকের সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে।" এ ব্যাপারটার কি অর্থ করতে হবে বাংলাদেশের মানুষকে বলে দিতে হবে না।

র‍্যাবের বিরুদ্ধে কেন অভিযোগ হচ্ছে

বাংলাদেশে কে কবে সরকারের সমালোচনা করেছে, কে সরকারের রাজনৈতিক বিরোধীদের কাতারে পড়ে তার নাড়ি-নক্ষত্র পুলিশ আর র‍্যাবের জানা আছে। তাদের কাকে কোথায় গেলে ধরা যাবে সেটাও তারা জানে। শুধু দিনে দুপুরে প্রকাশ্য রাজপথে যখন মানুষকে গুম করে খুন করা হয় তখন তারা কোন কিংবা কারো খবর রাখেনা। গোড়া থেকেই মানুষের সন্দেহ হচ্ছিলো। বিশেষ করে যখন দেখা যেতে শুরু করে যে ছিনতাইগুলো করছে মূলত র‍্যাবের ইউনিফর্ম পরিহিত লোকেরা র‍্যাবের চিহ্নযুক্ত মাইক্রোবাস ব্যবহার করে। দুবছর আগে বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ইলিয়াস আলীকে র‍্যাবের লোকেরাই ছিনতাই করেছিলো বলে স্থানীয় কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণও ছিলো। তারপর থেকে দেশের মানুষ প্রতীতি নিয়ে দাবি করে যাচ্ছে যে ছিনতাই আর হত্যার ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে র‍্যাবের লোকেরাই।

শেখ হাসিনার এককালের প্রিয় মন্ত্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত গত চার মাস অপেক্ষা করেও প্রভাবশালী কোন মন্ত্রীপদ পাননি। সুতরাং মৃদু কিছু সমালোচনার সময় হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। বিগত কিছুদিন ধরে তিনি বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অভাব, বিচার-বহির্ভূত হত্যা এবং গুম-খুনের দায় সরকারের ওপর চাপানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন। উপযুক্ত পরিবেশ হলে যোগাযোগমন্ত্রী ওবায়েদুল কাদের প্রভাবশালী নেতা হতে পারতেন। সুকৌশলে তিনিও বলেছেন 'আমরা গুম-খুন আর অপহরণের দায় এড়াতে পারি না'। 'এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে?'ওদিকে বুদ্ধিমানেরা আগেই বুঝে গেছেন মিন মিন করে মৃদু সমালোচনার দিন অনেক আগেই ফুরিয়ে গিয়েছে। সিনিয়র আইনজীবী ড. শাহদীন মালিকসহ কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রকাশ্যেই বলে দিয়েছেন 'আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর খুবই প্রশিক্ষিত অংশ গুম-খুনে জড়িত'।

সামাজিক মিডিয়ায় কয়েকদিন আগে থেকেই অভিযোগ হচ্ছে যে শেখ হাসিনার অতি পরিচিত এক গডফাদার মন্ত্রীর জামাতা এবং র‍্যাবের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হচ্ছেন গুম-খুন আর কন্ট্রাক্ট কিলিংয়ের প্রধান হোতা। নিহত প্যানেল মেয়র নজরুল ইসলামের শ্বশুর শহিদুল ইসলাম অভিযোগ করেছেন প্যানেল মেয়র নজরুল ইসলাম, সিনিয়র আইনজীবী চন্দন সরকার এবং অন্য পাঁচজনকে 'কনট্রাক্ট কিলিং' করেছে র‍্যাব ছয় কোটি টাকার বিনিময়ে। প্রমাণাভাবে এসব অভিযোগকে অবশ্যই গুজব এবং অভিযোগ হিসেবেই দেখতে হবে। কিন্তু কথায় বলে 'যা রটে তার অর্ধেক তো বটে'। বাংলাদেশের মানুষ তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বুঝে গেছে এদেশে যা রটে তার অর্ধেকের অনেক বেশি সত্যি হয়।

এ তদন্ত নিরপেক্ষ নয়

হাইকোর্ট স্বতঃ-প্রণোদিত (সুয়োমোটো) হয়ে নারায়ণগঞ্জে আলোচ্য সাত ব্যক্তির অপহরণ ও হত্যায় র‍্যাবের ভূমিকা সম্বন্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। সেটা অবশ্যই প্রশংসনীয়। তার জের ধরে র‍্যাব একটা অভ্যন্তরীণ তদন্ত করবে বলেছে। মন্ত্রী আমির হোসেন আমু বলেছেন সরকারও র‍্যাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ খতিয়ে দেখবে। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে হাইকোর্টের নির্দেশিত তদন্তের ফলাফলও অন্য দুটি তদন্তের মতোই লোকদেখানো 'আই-ওয়াশ' ছাড়া আর কিছুই হবে না। হাইকোর্ট সরকারের সাতজন আমলাকে নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু গোটা বিশ্ব জানে বাংলাদেশের প্রশাসন বর্তমানে ষোলো আনার পরিবর্তে আঠারো আনা দলীয়কৃত। এই দলীয়কৃত আমলারা সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন রায় দেবেন বলে কল্পনাও করা যায় না। হাইকোর্ট ইচ্ছা করলে নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিতে পারতেন। কিন্তু সে নির্দেশ তারা দেননি। কোন নিরপেক্ষ উপস্থিতি ছাড়া এ তদন্তের নির্দেশ খুবই হতাশাব্যঞ্জক।

সাধারণত কোন ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তদন্তের সময় উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে সাময়িকভাবে নিজেদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। অন্যথায় তারা সাক্ষ্য-প্রমাণ নষ্ট করার প্রয়াস পেতে পারেন। সত্যিকারের নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করতে হলে হাইকোর্ট তদন্তসাপেক্ষে গোটা র‍্যাব বাহিনীকে নিজেদের ব্যারাকে বন্ধ রাখার নির্দেশ দিতে পারতেন। এবং এ নির্দেশও দেয়া যেতে পারতো যে এই সময়ের মধ্যে র‍্যাব পরিচয়ে কেউ কোন অ্যাকশন কিংবা অপারেশনে গেলে তাদের গণধোলাই দেয়ার, এমনকি আত্মরক্ষার্থ তাদের হত্যা করার অধিকারও নাগরিকদের থাকবে। কিন্তু এসব অবশ্যই অতিরিক্ত প্রত্যাশা, কেন না সারা বিশ্ব জানে যে বাংলাদেশের বিচার বিভাগ ও আদালত মোটেই নিরপেক্ষ নয়।

(লন্ডন, ০৬.০৫.১৪)

আইন-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে

বন্যা পলিমাটির দেশ বাংলাদেশের চির সাথী। বন্যা আসে। বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভেঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আবার বন্যা আসে। পলি জমে আগেরবারের ভাঙ্গন ভরাট হয়। বাংলাদেশের বর্তমান আইন-শৃঙ্খলার অবস্থাও এক হিসেবে সে রকমের বলা চলে।

বিদেশী প্রভুদের মদদে ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগ মাস্টারপ্ল্যানের নির্বাচনে জয়ী হয়। ১৯৯১ আর ২০০১ সালের নির্বাচনে তারা ভীষণ মার খেয়েছিলো। তারা লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছিলো হারজিতের রাজনীতি আর করবে না। ভবিষ্যতে নির্বাচন কিংবা নির্বাচনের প্রকৃতি বড়ো বিবেচনা হবে না, মূল লক্ষ্য হবে গদি যাতে হাতছাড়া না হয় সে ব্যবস্থা করা। অত্যন্ত বিতর্কিত একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির আরো বেশি বিতর্কিত রায়ের অর্ধেকের দোহাই দিয়ে সংবিধানের ১৫ নম্বর সংশোধনী পাস হলো। বিরোধী দল বর্জিত এবং আলোচনা-বিহীনভাবে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন পদ্ধতি বাতিল করা হয়। নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে তারা হেরে যায়। সুতরাং পরাজয় যাতে আর না হয় আপাতত সে ব্যবস্থা তারা পাকা করে ফেলে।

শহীদ জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালে আমাকে বলেছিলেন, গণতন্ত্র নেশার মতো বাংলাদেশের মানুষের ধমনীতে গেড়ে আছে। এবারেও তার সত্যতা প্রমাণিত হলো। তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি ফিরিয়ে আনার দাবিতে খালেদা জিয়ার পেছনে কাতারবন্দী হয়ে বাংলাদেশের মানুষ আন্দোলন শুরু করে । যারা গদিতে আছে তারা বন্যার ভাঙ্গন-গড়নের মতো করে তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি ও গণতন্ত্রের আন্দোলন ভণ্ডুল করার অরাজনৈতিক পথ বেছে নেয়।

শেয়ার বাজারে ৩৫ লাখ পরিবারের লগ্নি লুণ্ঠন নিয়ে দেশজোড়া ক্রোধ দেখা দিয়েছিলো। কুইক রেন্টাল বিদ্যুতের নামে সরকারের আপন লোকেদের ২০ হাজার কোটি টাকা লুট করার সুযোগ দিয়ে মানুষের উষ্মা ও ক্রোধকে ভিন্ন খাতে সরিয়ে দেয়া হলো। তার পরেই টেলিভিশন সাংবাদিক দম্পতি মেহেরুন রুনি ও তার স্বামী সাগর অমানুষিকভাবে নিজেদের শোবার ঘরে পাঁচ বছরের ছেলের সামনে খুন হন। জানা আছে যে তারা কুইক রেন্টাল দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত করছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের শিশুপুত্র মেঘকে কোলে নিয়ে আদর

করলেন, তার দায়িত্ব বহনের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং অনতিবিলম্বে খুনিদের গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তি বিধানের আশ্বাস দিলেন। হাসিনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন আরো নির্দিষ্ট করে বলেছিলেন যে, ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই খুনিদের গ্রেফতার করা হবে।

মেহেরুন রুনির মা কিছুকাল আগে বলেছেন, শেখ হাসিনা পরে আর কখনো অনাথ শিশু মেঘের কোন খোঁজও নেননি, তার দায়িত্ব বহন দূরের কথা। সবাই আমরা জানি যে খুনিরা গ্রেফতার হয়নি, কাউকে শাস্তি দেয়া হয়নি। বাজারে জোর গুজব রটেছিলো যে খুনিরা সরকারের কাছের লোক ছিলো এবং তাদের ৪৮ ঘন্টার আগেই বিদেশে পাচার করে দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু পত্রপত্রিকায় এই হত্যা নিয়ে আবেগের বহিঃপ্রকাশ হাল্কা হবার আগেই নতুন নতুন কেলেঙ্কারীর খবর ফাঁস হয়। ডেসটিনি ও হলমার্ক কেলেঙ্কারীতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর বহু হাজার কোটি টাকা লুণ্ঠিত হয়। এবং প্রায় একই সঙ্গে খবর আসে যে পদ্মা সেতুর দুর্নীতির প্রধান আসামী যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনের বিচার করতে সরকারের অসম্মতির কারণে বিশ্ব ব্যাংক সেতুর অর্থায়ন স্থগিত করেছে।

এদিকে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ এগিয়ে আসছিলো। জাতিসংঘ এবং গোটা বিশ্ব (ভারত ছাড়া) সকল দলের গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচন পদ্ধতি নির্ধারণের জন্যে বিএনপির সঙ্গে সরকারকে সংলাপের তাগিদ দিতে শুরু করে। সরকার গোটা বিশ্বকে কলা দেখিয়েছে। গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দূরের কথা, সংলাপে বসতেও তারা রাজি হয়নি। প্রতিবাদে বিশ্বের সকল দেশ বাংলাদেশের নির্বাচন বয়কট করেছে।

প্রশাসনিক পদ্ধতির নির্বাচন

নির্বাচন হয়েছে প্রশাসনিক পদ্ধতিতে। ভোট ও ভোটার ছাড়াই নির্বাচন কমিশন সরকারের দেয়া তালিকা অনুযায়ী ফলাফল ঘোষণা করে দিয়েছে। শুধু নির্বাচন এবং পদ্মা সেতু দুর্নীতির ব্যাপারেই নয়। বিচার বহির্ভূত হত্যা, সাংবাদিক নির্যাতন ও সংবাদের স্বাধীনতা হরণ ইত্যাদি অনেকগুলো ব্যাপারে তারা বিশ্ব সমাজ এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলোর অভিমতের প্রতি চরম তাচ্ছিল্য দেখিয়েছে। লক্ষণীয় যে একটি দুর্নীতি ও অপরাধ নিয়ে যখন গোটা দেশ ক্ষুব্ধ ও আন্দোলিত হয় ঠিক সে সময়েই সরকার আরেকটি কেলেঙ্কারী ঘটিয়ে বসে – যাতে আগের কেলেঙ্কারী থেকে জনসাধারণের মনোযোগ ভিন্নমুখী হয় এবং পরের কেলেঙ্কারী সম্বন্ধেও প্রতিক্রিয়া খুব বেশি তীব্র না হয়।

গত সপ্তাহের কলামে উল্লেখ করেছিলাম ২০০৯ সাল থেকে ২০১৩ সালের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে ২০ হাজার ৭২০টি হত্যার ঘটনা ঘটেছে এবং এগুলোর

অধিকাংশের সঙ্গেই সরকারের কিংবা শাসক দলের অঙ্গ-সংস্থাগুলো জড়িত ছিলো। এ সময়ের মধ্যে পুলিশ আর র‍্যাবের হাতে বিচার-বহির্ভূত হত্যা হয়েছে ৭৬৪টি। তারপর থেকে আরেকটি হিসেব আমাদের হাতে এসেছে। ২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত র‍্যাব, পুলিশ ও আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের হামলায় বিএনপির ২৭২ জন নেতাকর্মী খুন এবং ২৫ জন নেতাকর্মী গুম হয়েছেন। সর্বশেষ ব্রিটিশ নাগরিক এবং যুক্তরাজ্যে বিএনপির একজন নেতা মুজিবুর রহমান গুম হয়েছেন সুনামগঞ্জে। দুবছর আগে বিএনপির সংগঠন সম্পাদক ইলিয়াস আলী গুম হবার সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইলিয়াস আলীর স্ত্রীকে এবং জাতিকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে শিগগিরই ইলিয়াস আলীকে উদ্ধার করা হবে। এ জাতীয় আরো বহু প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন বিভিন্ন গুম-খুন ও বহু অপরাধের ব্যাপারে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস যে শুধু কথার কথা এবং রাজনৈতিক পরিহাস বাংলাদেশী জাতি এবং গোটা বিশ্ব এখন সেটা বুঝে গেছে।

বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক আপনাকে বলে দেবে পুলিশ কিছু বিচার-বহির্ভূত হত্যার জন্যে দায়ী হলেও এ জাতীয় অধিকাংশ হত্যা এবং প্রায় সবগুলো গুম-খুনের জন্যে দায়ী হচ্ছে র‍্যাব। সরকার নাকি অপরাধীদের খুঁজে পায়না। সেটা কেউই বিশ্বাস করে না এবং করবে না, কেননা সকলেই জানে র‍্যাব ও পুলিশ এই ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ নির্দেশে। অন্তত প্রত্যেকটি ঘটনা সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী অবগত থাকেন। নারায়ণগঞ্জে সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র নজরুল ইসলাম এবং সিনিয়র আইনজীবী চন্দন সরকারসহ সাতজনের অপহরণ, হত্যা এবং তাদের লাশ নদীতে ফেলে দেয়ার জঘন্য অপরাধের সুরাহা করার ব্যাপারে সরকারের গড়িমসি আবারো সন্দেহের জন্ম দেয় যে সরকার প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেফতার ও যথাযোগ্য শাস্তি দানের ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী নয়।

সব দুষ্কর্মে র‍্যাব জড়িত

শেখ হাসিনা ৫ মে তারিখে মন্ত্রীসভার বৈঠকে বলেছেন, "অপরাধী যেই হোক, তার বিচার হবেই। কাউকে ছাড়া হবে না।" তারপর থেকে বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতিতে একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন তিনি। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করছে কি তার প্রতিশ্রুতিকে? অন্তত আলামত দেখে তো মনে হয় এ ঘটনার ব্যাপারেও সরকারের আন্তরিকতার অভাব আছে। গুরুতর অপরাধের ন্যায় বিচার করতে গেলে ঘটনার অব্যবহিত পরেই কতগুলো বিশেষ পুলিশী ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া খুবই জরুরি। অপরাধের প্রমাণ যাতে নষ্ট না হয় সেজন্যে সর্বপ্রথমে ব্যবস্থা নিতে হবে। অপরাধী কিংবা প্রবল সন্দেহভাজনদের পুলিশী

হেফাজতে নিতে হবে, যাতে দুষ্কৃতকারী পালিয়ে যেতে কিংবা সাক্ষ্য-প্রমাণ নষ্ট না করতে পারে। কিন্তু নারায়ণগঞ্জের সাত খুনের ব্যাপারে তেমন কোন ব্যবস্থা চোখে পড়ছে না।

নারায়ণগঞ্জের সাত খুনের ঘটনায় র‍্যাবের তিনজন কর্মকর্তা এবং কয়েকজন সদস্য যে দায়ী সে ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ অজস্র। এই তিনজন কর্মকর্তা সশস্ত্র বাহিনীগুলো থেকে ডেপুটেশনে র‍্যাবে এসেছিলেন। তাদের সশস্ত্র বাহিনীর কমিশন থেকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাদের কোর্ট মার্শালের (সামরিক আদালতের) কঠোর বিচার ও কঠোর শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। তাদের গ্রেফতারের কোন উদ্যোগ সরকার নেয়নি। শেষে ড. কামাল হোসেনের রিট আবেদনের জের হিসেবে হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট এই তিন অফিসারকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছেন। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সেজন্যে ড. কামাল হোসেনের বিরুদ্ধে মিডিয়ায় ক্রুদ্ধ বিবৃতি দিয়েছেন। এ প্রবন্ধ যখন লিখছি তখনো পর্যন্ত সরকারের পুলিশ এই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেফতারের কোন উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানা যায়নি, যদিও মিডিয়ায় খবর বেরিয়েছে যে হাইকোর্টের নির্দেশ পুলিশ কর্মকর্তাদের হাতে পৌঁছেছে।

সরকার পাইকারীভাবে নারায়ণগঞ্জ থেকে র‍্যাব এবং পুলিশের অফিসার ও সদস্যদের বদলি করে সাক্ষ্য-প্রমাণ বিনষ্ট করার ব্যাপক ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এতো বড়ো ঘটনাটি যে ঘটলো র‍্যার ও পুলিশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সদস্যরা সম্পৃক্ত না হলেও নিশ্চয়ই সে সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। সাক্ষ্য আছে যে সাত খুনের দিন আদালত প্রাঙ্গণে একজন র‍্যাব সদস্য পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করেছিলো সে র‍্যাবের একটি 'অপারেশন' উপলক্ষেই আদালত প্রাঙ্গনে এসেছিলো। আরো সাক্ষ্য পাওয়া গেছে যে, শেষ রাতে একটি চেকপোস্টে পুলিশ তিনখানি মাইক্রোবাস থামায় এবং র‍্যাবের একজন লোক এসে তিনখানি মাইক্রোবাসের এগিয়ে যাবার অনুমতি আদায় করে। এখন বিশ্বাস করা হয় যে, সে তিন মাইক্রোবাসেই উক্ত সাত ব্যক্তির লাশ নদীতে ফেলার জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। পুলিশের এই সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ না করে অন্যত্র বদলি করে দেয়া গুরুতর অন্যায় হয়েছে। ন্যায় বিচার ও অপরাধীর শাস্তি যদি প্রকৃত উদ্দেশ্য হয় তাহলে এই পুলিশ সদস্যদের কাছে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া সম্ভব ছিলো।

র‍্যাবের একটি ইউনিটকে বদলি করে অন্য একটি ইউনিটকে নারায়ণগঞ্জে নিয়োগও সন্দেহের উদ্রেক করছে। র‍্যাবের তিনজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে যে, তারা ছয় কোটি টাকার বিনিময়ে এই হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। তারা নিশ্চয়ই এই দুষ্কর্মে র‍্যাবের আরো কিছু সদস্যের সাহায্য নিয়েছেন। নিহত

প্যানেল মেয়র নজরুল ইসলামের শ্বশুর শহীদুল ইসলাম অভিযোগ করেছেন র‍্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক কর্নেল জিয়াউল আহসানও হত্যাকণ্ডে জড়িত ছিলেন। তারপর থেকে মিডিয়ায় ব্যাপক অভিযোগ হচ্ছে যে, কর্নেল জিয়াউল আহসানের সহায়তায়ই প্রধান আসামী নূর হোসেন কলকাতায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ মনে করা যেতে পারে প্রথমে যে তিনজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছে তারা ছাড়াও র‍্যাব সংগঠনের আরো কোন কোন সদস্য সাত খুনে হয় জড়িত না হয় অন্তত ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন।

র‍্যাবকে সক্রিয় রাখা মারাত্মক ভুল হবে

এমনিতেই র‍্যাবের বিরুদ্ধে দেশের সকল অঞ্চলে বিভিন্ন গুম, খুন, নির্যাতন ও দুর্নীতির অভিযোগ আছে। শোনা যায় যে র‍্যাবের অন্তত দু'হাজার সদস্যের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলাও হয়েছে। এমতাবস্থায় 'কিছুই হয়নি' ভণিতা করে র‍্যাবকে আবার মোতায়েনের – বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জে – সিদ্ধান্ত কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। বিএনপির ও ১৯ দলের জোটের নেত্রী এবং তিন বারের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া, বিএনপির মহাসচিব মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় প্রমুখ নেতা ও চিন্তাবিদরা র‍্যাব বাহিনীকে ভেঙ্গে দেবার দাবি জানিয়েছেন। এমনকি আওয়ামী লীগ স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য এবং সাবেক মন্ত্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্তও বলেছেন যে, র‍্যাবের ব্যাপক সংস্কার জরুরি।

এসব কারণে মনে করা স্বাভাবিক যে, পরের বন্যার পলি জমার মতো পরবর্তী কোন ঘটনা দিয়ে এই নারকীয় হত্যার ঘটনাও চাপা দেয়া যাবে আশা করে অপরাধীদের গ্রেফতার এবং সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহের ব্যাপারে সরকার গড়িমসি করছে। বর্তমান সরকারের অন্যায় ও অপকর্মের তালিকা ইতোমধ্যেই এতো দীর্ঘ হয়ে উঠেছে যে আল্লাহ্‌র আরশও প্রকম্পিত হবার সময় হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ আর কতোদিন এই দুষ্কৃতকারী সরকার ও তাদের দস্যুতন্ত্রকে সহ্য করতে রাজি হবে কে জানে?

আরো একটি বিষয় এ প্রসঙ্গে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্য হিসেবে বিদেশে যাওয়া এবং জাতিসংঘ ডলার উপার্জন বর্তমানে সেনাবাহিনীতে যোগদানের প্রধান আকর্ষণ। নারায়ণগঞ্জের সাত খুন এবং দেশব্যাপী গুম-খুন ইত্যাদিতে র‍্যাবের যেসব সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে তাদের অনেকেই সেনাবাহিনীর সদস্য। তাদের অপরাধের ওপর এখন জোরালোভাবে আলোকপাত হচ্ছে। দুষ্কৃত ও দুর্নীতিতে জড়িত সদস্যদের কারণে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত না করার দাবি যে কোন সময় উঠতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুষ্কৃতকারীদের শাস্তির প্রতিশ্রুতি বহুবার দিয়েছেন কিন্তু সেসব প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করতে পারেননি। এমনও হতে পারে যে যারা দুষ্কৃতি করছে তারা প্রধানমন্ত্রী ও তার সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। ছাত্রলীগ-যুবলীগকে নিয়ন্ত্রণের দাবি বেশ কিছুকাল আগে থেকে আওয়ামী লীগের ভেতর থেকেও উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ছাত্রলীগকে সংযত হবার পরামর্শ দিয়েছেন। তাতে কোন কাজ হয়েছে কি? মোটেই হয়নি। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, শাসক দলের অঙ্গ সংগঠনগুলো, শেখ হাসিনার সশস্ত্র ক্যাডার এবং র‍্যাব ও পুলিশ এতোকাল সরকারের রাজনৈতিক বিরোধীদের নিধন করে যে 'অভিজ্ঞতা' অর্জন করেছে সে অভিজ্ঞতা তারা এখন নিজেদের পকেট ভারী করার কাজে ব্যবহার করছে।

তারা গ্রেফতার বাণিজ্য চালাচ্ছে, মানুষ অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করছে এবং নারায়ণগঞ্জের ঘটনা থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, তারা এখন কন্ট্রাক্ট কিলিংয়ের ব্যবসায়ও করছে। তারা বুঝে গেছে বর্তমান সরকার বৈধ সরকার নয়, এ সরকারের পেছনে জনগণের ম্যান্ডেট নেই এবং সে কারণে এ সরকার আর বেশিদিন গদিতে থাকতে পারবে না। যে কিছুদিন তারা গদিতে আছে সে সময়ের মধ্যেই ঘাতক বাহিনী নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে চায়। যতোদিন একটা নির্বাচিত এবং প্রতিষ্ঠিত সরকার গদিতে না আসছে ততোদিন বর্তমান দস্যুতন্ত্র এবং ত্রাসের রাজত্ব চলতে বাধ্য।

নির্বাচিত ও গণতান্ত্রিক সরকারের সঙ্গে অনির্বাচিত স্বৈরতন্ত্র সরকারের তফাৎ নাটকীয়ভাবে ফুটে উঠেছে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক পদত্যাগে। একটি ফেরি ডুবে ১৮৭ জন যাত্রী (অধিকাংশই স্কুলছাত্র) মারা গেছে, শতাধিক এখনো নিখোঁজ, মনে করা হচ্ছে যে তারাও সকলে মারা গেছে। উদ্ধার কাজে ত্রুটির জন্যে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন, প্রেসিডেন্ট প্রকাশ্যে জাতির কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। বাংলাদেশে পোশাক তৈরির কারখানায় অনেকগুলো দুর্ঘটনায় কয়েকশো শ্রমিক মারা গেছে। ২০১২ সালের নবেম্বরে তাজরীন কারখানার একটি অগ্নিকাণ্ডেই মারা গেছে সোয়াশো শ্রমিক। তারপর গত বছর রানা প্লাজা ভবনটি তলিয়ে গিয়ে ১১ শোরও বেশি শ্রমিক মারা গেছে, শতাধিক শ্রমিকের কোন সন্ধান আজো পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কি একবারও জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়ার কথা ভেবেছেন? বরং নিহতদের ক্ষতিপূরণের জন্যে ব্রিটিশ ও ইউরোপীয় কম্পানিগুলো যে মোটা অঙ্কের অর্থ দিয়েছে সে অর্থও ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবার আজো পায়নি। জানা গেছে বিদেশী সাহায্যের শতাধিক কোটি টাকা প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ডিম পাড়ছে।

নারায়ণগঞ্জে সেদিন যে সাতজন খুন হয়েছেন এবং যাদের লাশ শীতলক্ষ্যায় পাওয়া গেছে শুনেছি তারাও আওয়ামী লীগেরই রাজনীতি করতেন। নূর হোসেন. ইয়াসিন প্রমুখ যারা হত্যার ঠিকাদারী দিয়েছেন তারা অবশ্যই আওয়ামী লীগের পেশীশক্তি। অন্যথায় সরকারের, পুলিশের এবং র‍্যাবের চোখের সামনে প্রধান আসামী নূর হোসেন নিষিদ্ধ মাদক ব্যবসায়ের একটা সাম্রাজ্য চালাতে পারতেন না।

আরো জানা কথা যে নিহত প্যানেল মেয়র নজরুল ইসলাম এবং প্রধান আসামী নূর হোসেন উভয়েই ছিলেন নারায়ণগঞ্জের গডফাদার শামীম ওসমানের ডান হাত –বাঁ হাত। সাত খুনের লাশ পাবার দিনই শামীম ওসমান দাবি করেছেন যে তিনি'কাউকে কেয়ার করেন না', কেননা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার রক্ষক। কার্যতও সেটাই দেখা যাচ্ছে। নারায়ণগঞ্জ রাজনৈতিক গুম-খুনের কারখানা বলা চলে। সরকার কাউকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু শামীম ওসমান পেয়েছেন পুলিশের নিরাপত্তা।

আওয়ামী লীগের ভেতরে বর্তমানে যে গৃহযুদ্ধ চলছে নারায়ণগঞ্জের সাত খুন এবং পরবর্তী ঘটনাবলী তার আরো একটি প্রমাণ। দেশের সকল অঞ্চল থেকে খবর আসছে অর্থ, প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তারের লোভে আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগ-যুবলীগ সহ অঙ্গ-সংগঠনগুলোর মধ্যে রক্তারক্তি আর খুনোখুনি চলছে। কারণটা আগেই বলেছি। যে গাভী আর দুধ দেবে না তাকে জবাই করে খেয়ে ফেলাই ভালো। এ সরকারের মেয়াদ সংক্ষিপ্ত, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তাদের স্বার্থের কথা না ভেবে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে সকলে উঠেপড়ে লেগেছে। এ অবস্থা আর বেশিদিন চলতে থাকলে গোটা বাংলাদেশই গোরস্থানে কিংবা লাশের স্তূপে পরিণত হবে। নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবেও শেখ হাসিনা গদি ছেড়ে দিতে রাজি হতে পারছেন না। তাকে পদত্যাগে বাধ্য করতে যা করা প্রয়োজন সেটা অবিলম্বে এবং আপস-বিহীন ভাবেই করতে হবে। বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিকরা গা-ছেড়ে-দেওয়া ভাব নিলে মারাত্মক ভুল করবেন।

(লন্ডন, ১৩.০৫.১৪)

নরেন্দ্র মোদির হাজারো সমস্যা, দেশে ও বিদেশে

ভারতে কোন রাজনৈতিক দল নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করলো ৩০ বছর পর। ফলাফল এক হিসেবে ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সঙ্গে তুলনীয়। সে নির্বাচনে মুসলিম লীগের মূলোৎপাটিত হয়েছিলো। ভারতের এবারের নির্বাচনেও ক্ষমতাসীন দলের মূলোৎপাটিত হয়ে গেল। সে দেশের স্বাধীনতার স্থপতি এবং ক্ষমতাসীন কংগ্রেস কোয়ালিশন এমনই চরম পরাজয় বরণ করেছে যে আনুষ্ঠানিক বিরোধী দল হবার যোগ্যতাও তারা অর্জন করতে পারেনি। এই পরাজয় আশাই করা গিয়েছিলো। অর্থনীতিতে যে দ্রুত অগ্রগতির ফলে ভারত বহু দেশের ঈর্ষার উদ্রেক করতো সে অর্থনীতি বিগত তিন বছরে মুখ থুবড়ে পড়েছে। দুর্নীতি এ সময়ে পাগলা ঘোড়ার মতো বেসামাল বেড়ে গেছে। কমনওয়েলথ গেমসের প্রস্তুতি পর্বের দুর্নীতি বিশ্ব মিডিয়ায় দিনের পর দিন শিরোনাম হয়ে ছিলো।

নির্বাচন কমিশন পাঁচ সপ্তাহ জুড়ে ৮০ কোটি ১০ লাখ ভোটদাতার এ নির্বাচন যেভাবে পরিচালনা করেছে তাতে কোন দলের পক্ষ থেকেই উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদ কিংবা সমালোচনা হয়নি। বস্তুত ভারতে নির্বাচন পরিচালনা নিয়ে প্রতিবাদ খুব কমই হয়। প্রশাসনকে দলীয় এবং সরকারি প্রভাবমুক্ত রাখার সুফলগুলোর এটা একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এর বিপরীতে বাংলাদেশে গত ৫ জানুয়ারির নির্বাচনী তামাশা এবং পরবর্তী উপজেলা নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে সর্বত্র ছি-ছি করেছে মানুষ। চাকরি বাঁচানোর তাগিদে কোন কোন শীর্ষ আমলা কতো নিচে নামতে পারেন বর্তমান বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন তার একটা উৎকৃষ্ট নমুনা।

স্বাধীনতার পরবর্তী ৬৭ বছর ধরে নেহরু-গান্ধী বংশ ভারতের রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করে থেকেছে। সকল রাজনৈতিক দলেরই জনপ্রিয়তায় জোয়ার-ভাটা হতে পারে। ভারতে ১৯৭৫ সাল এমন একটা সময় ছিলো। তখন নির্বাচন হলে কংগ্রেস অবশ্যই হেরে যেতো। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী গদি ছাড়তে রাজি ছিলেন না। জরুরি অবস্থা জারি করে আরো দুবছর তিনি গদিতে ছিলেন। কিন্তু ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসকে শোচনীয় রকম পরাজিত করে ভারতের ভোটদাতারা সে দুষ্কর্মের উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছিলো।

কিন্তু পরাজয় নিশ্চিত জেনেও মনমোহন সিংহের সরকার তেমন কোন পশ্চাৎদ্বার পথে যায়নি। তারা গণতন্ত্রকে নিজের গতিতে চলতে দিয়েছে।

নতুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতের রাজনীতিতে সম্ভবত সবচাইতে বিতর্কিত এবং বিভাজক ব্যক্তি। রাজনীতিতে তার সবচাইতে বড়ো দাবি নিজ রাজ্য গুজরাতের অর্থনীতিতে গতিশীলতা সঞ্চার করা। গোটা ভারতে সে গতিশীলতা সঞ্চলিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি নির্বাচনে বিরাট বিজয় লাভ করেছেন। কিন্তু সে গতিশীলতা নিয়ে গুজরাতেও বিতর্ক আছে। ১৩ বছর গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি শ্রমিকদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে পুঁজিপতিদের স্বার্থকে সংরক্ষণ দিয়েছেন। বিচিত্র নয় যে মোটর গাড়ি নির্মাণসহ বিভিন্ন শিল্পে বিদেশী পুঁজি সহজেই আকৃষ্ট হয়েছিলো।

পুঁজিপতি তোষণ দিয়ে দারিদ্র্য দূর হয় না

কিন্তু বিদেশী পুঁজি আকর্ষণ ভারতের একমাত্র সমস্যা নয়। অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারের পাশাপাশি বেকার সমস্যা দূরীকরণ, কৃষকের ঋণের বোঝা হালকা করা, পানীয় জল সরবরাহ এবং পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ ইত্যাদি অত্যন্ত জরুরি সমস্যা। প্রতি বছর ঋণ পরিশোধ এবং পরিবার প্রতিপালনে অসমর্থ লাখ লাখ কৃষকের আত্মহত্যার মর্মান্তিক কাহিনী ভারতীয় মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়। স্যার বিদ্যা নাইপাল নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ঔপন্যাসিক এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত ত্রিনিদাদের নাগরিক। প্রায় পঁচিশ বছর আগে পিতৃপুরুষের স্বদেশ ভারত সফরের পর ব্যঙ্গ করে তিনি লিখেছিলেন, ভারতীয়রা ক্ল্যস্ট্রোফোবিয়ায় (আবদ্ধ স্থান সম্বন্ধে আতঙ্ক) ভোগে; ভোর হলেই তারা জলভর্তি ঘটি নিয়ে খোলা মাঠে ছোটে। সে অবস্থার উন্নতি হয়নি। ল্যাট্রিনের অভাবে ভারতের অধিকাংশ মানুষ আজো খোলা মাঠেই মলমূত্র ত্যাগ করে। কিন্তু ভারতবাসীর মনোভাবে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। তারা আধুনিক আবর্জনা নিষ্কাশন ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ চায়। খুবই দ্রুত এসব সমস্যার সমাধানে মনোযোগী না হলে নরেন্দ্র মোদির জনপ্রিয়তায় ভাটা শুরু হতে বিলম্ব হবে না। এবং এ কথাও তাকে মনে রাখতে হবে যে পুঁজিপতিদের তোষণ করে নিপীড়িত মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন সম্ভব নয়।

কয়েক বছর আগে ভারতের একজন অত্যন্ত ধনী ব্যবসায়ী আমাকে নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তিনি বলছিলেন, ভারত খুবই সমৃদ্ধ দেশ; সমস্যা হচ্ছে যে বহু কোটি খুবই দরিদ্র মানুষের পিছু টানে তার অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। আগে তাদের বলা হতো অচ্ছুৎ; এখন করুণা করে বলা হয় দলিত। এখনো তারা সমাজে অবহেলিত, শোষিত এবং নির্যাতিত। কিন্তু টেলিভিশনের দৌলতে তারা বাকি বিশ্বের মানুষের উন্নত জীবনের দৃষ্টান্ত দেখছে অহরহ।

তারাও এখন উচ্চাভিলাষী হয়ে উঠেছে। নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্যে তারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বড়জোর দুই কিংবা এক বছর সময় দেবে। চা-ওয়ালার পুত্র নরেন্দ্র বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। দলিতরা অন্ত ত দুবেলা খাবার, পরিবার প্রতিপালনের এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ চায়।

মোদির অতীত কলঙ্কিত হয়ে আছে অন্য একটি কারণে। ২০০১ সালে একটি ট্রেনের বগিতে আগুন ধরার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুজরাতের নতুন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভূমিকা বিশ্বব্যাপী নিন্দিত ও ধিকৃত হয়েছিলো। হিন্দু জনতা ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মোদির সরকার দাঙ্গা প্রতিরোধের কোন উদ্যোগ নেয়নি। বরং ব্যাপক ভাবে শোনা গিয়েছিলো যে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং দাঙ্গাবাজদের উৎসাহ দিয়েছিলেন। সে দাঙ্গায় প্রায় দুহাজার মুসলমান মারা গিয়েছিলো, মুসলমানদের হাজার হাজার ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বৃটেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মোদিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে তাকে ভিসা দিতে অস্বীকার করে। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মোদির বিরুদ্ধে মামলা করেন। কিন্তু 'প্রমাণাভাবে' তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়নি। সে দাঙ্গায় ভূমিকা নিয়ে ভারতের মুসলমানরা তো বটেই অজস্র সেকুলার এবং বুদ্ধিজীবী হিন্দুও অদ্যাবধি নরেন্দ্র মোদিকে ক্ষমা করতে পারেননি।

বিপজ্জনক বাগাড়ম্বর ও রূঢ় বাস্তবতা

নির্বাচনী প্রচারণায় 'অবৈধ বাংলাদেশীদের' বিতাড়িত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। এতে অভিনবত্ব কিছু নেই। বিগত কয়েক দশকে ইউরোপ-আমেরিকার বহু উচ্চাভিলাষী রাজনীতিক সস্তা জনপ্রিয়তার আশায় বহিরাগতদের বিষয়টা রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে বেছে নিয়েছেন। বৃটেনে ১৯৬২ সালে হ্যারোল্ড ম্যাকমিলানের কনজারভেটিভ (টোরি) সরকারের মন্ত্রী ইনোক পাওয়েল এক বক্তৃতায় হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে বহিরাগমন বন্ধ করা না হলে বৃটেনে 'রক্তের নদী' বয়ে যাবে। কিছুদিন হৈচৈ হয়েছিলো সে নিয়ে। কিন্তু সে বক্তৃতাকে ইনোক পাওয়েলের রাজনৈতিক জীবনের যবনিকাপাতের সূচনা বলতে হবে। তারপর থেকে বৃটেনে বহিরাগত কর্মীর সংখ্যা বহু গুণে বেড়ে গেছে। সবগুলো সরকারই বুঝে গেছে দেশের অর্থনীতির বিকাশে বহিরাগত কর্মীরা বিশিষ্ট ভূমিকা রাখছে।

লেবার পার্টির শাসনামলে টোরিরা বহিরাগমন বিরোধী বহু কথাবার্তা বলেছে। বর্তমানে ডেভিড ক্যামেরনের টোরি দলীয় সরকার ক্ষমতাসীন। এখন সরকারের বহিরাগমন নীতির সমালোচনা করে রাজনৈতিক ফায়দা নেবার চেষ্টা

করছে কিছু ক্ষণজীবী ভুঁইফোঁড় দল। প্রথমে ব্রিটিশ ন্যাশনাল পার্টি কিছু বহিরাগমন বিরোধী ও বর্ণবাদী বক্তৃতার তুবড়ি ফুটিয়ে প্রতিষ্ঠা পাবার চেষ্টা করেছিলো। তারা এখন অস্তগামী। এখন আবার বহিরাগমন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিরোধীতা করে বাজার গরম করছে ইউ কে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি (ইউকিপ)। এ সপ্তাহের (২২ মে) ইউরোপীয় ইউনিয়ন পার্লামেন্ট নির্বাচনে তারা ভালো করবে বলেও মনে হচ্ছে। কিন্তু এক মাঘে যেমন শীত যায় না, এক নির্বাচনেও তেমনি কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব পাকাপোক্ত হয় না।

তবু একথা সত্যি যে বহিরাগমন বিরোধী গরম গরম বক্তৃতা অশিক্ষিত, বিদ্বিষ্ট এবং বেকার জনতাকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্যে যথেষ্ট। বিগত প্রায় দুই যুগ ধরে মার্কিন রিপাবলিকান পার্টি সে পথে হেঁটেছে। পশ্চিম ইউরোপেও কোন কোন নীতি ও আদর্শের দেউলিয়া রাজনীতিক সাময়িক জনপ্রিয়তার এই সস্তা পথ থেকে লাভবান হবার চেষ্টা করেন। সাময়িক কিছু সুবিধা হলেও দূর মেয়াদে বিশেষ কোন উপকার তাদের হয় না। নরেন্দ্র মোদিও নিশ্চয়ই বাগাড়ম্বর সংযত করতে বাধ্য হবেন। বাংলাদেশী অবৈধ অভিবাসী বলতে তিনি অবশ্যই বাংলাভাষী ভারতীয় মুসলিমদের বোঝাতে চেয়েছেন। সেটা বুঝতে পেরেই মমতা ব্যানার্জী ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছেন। তার ফলও পেয়েছেন তিনি। তার তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের ৪২টি লোকসভা আসনের ৩৪টিতেই জয়ী হয়েছে। জ্যোতি বসুর ক্যারিশমা ও প্রতিপত্তির তুঙ্গেও বামফ্রন্ট কখনো লোকসভার এতো বেশি আসনে বিজয়ী হতে পারেনি।

নরেন্দ্র মোদি তার বাগাড়ম্বর সংযত করতে বাধ্য হবেন আরো কিছু কারণে। পশ্চিমবঙ্গের মতো উত্তরপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুতেও উল্লেখযোগ্য মুসলমান সংখ্যালঘু ভোটার আছে। সে কথা মনে রেখে শক্তিশালী আঞ্চলিক দলগুলো কোন ঢালোয়া মুসলিম বিতাড়ন কর্মসূচিতে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। তার সাম্প্রদায়িক দুর্নাম সত্ত্বেও বহু মুসলমান এবারের নির্বাচনে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। মিঃ মোদিকে তাদের কথাও বিবেচনায় রাখতে হবে। তাছাড়া তার পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী রাহুল গান্ধী যথার্থই বলেছেন যে 'স্বপ্ন বিক্রি করে' নরেন্দ্র মোদি নির্বাচনে জিতেছেন। সে স্বপ্নের কিছুটাও বাস্তবায়িত করতে হলে কিছু পরিমাণেও জাতীয় ঐক্য অর্জনের চেষ্টা তাকে করতে হবে। সাম্প্রদায়িকতার বাড়াবাড়ি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে না।

তেলে জলে মিশ খায় না

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যদি সত্যি সত্যি বাংলাভাষী ভারতীয় মুসলমানদের বাংলাদেশে ঠেলে দেবার চেষ্টা করেন তাহলে তার পরিণতি হবে চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের মতো ভয়াবহ। চল্লিশের দশকে দেশ ভাগের সময়

লাখ লাখ মানুষের প্রাণহানি হয়েছিলো। পঞ্চাশ সালে বিহারের দাঙ্গার পর হাজার হাজার মুসলমান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসে। তাদের নিয়ে সমস্যার সুসমাধান অদ্যাবধি হয়নি। আবারো যদি উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় মুসলমানকে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়া হয় তাহলে এ অঞ্চলের শান্তি বিঘ্নিত হবে। পাঁচ লাখেরও বেশি ভারতীয় নাগরিক অবৈধভাবে বাংলাদেশে চাকরি ও ব্যবসায় করছেন। তাদের পাঠানো রেমিটেন্স ভারতের অর্থনীতিতে একটা উল্লেযোগ্য ফ্যাক্টর। তাদের বাংলাদেশে থাকা আর নিরাপদ হবে না। মিঃ মোদির সরকারকে সেটাও বিবেচনা করতে হবে।

জাপানসহ কয়েকটি উন্নত দেশ মনমোহন সিং সরকারের আমলেও বিশেষ করে গুজরাতে উদার লগ্নি করেছে। কিন্তু সুপারমার্কেট প্রভৃতি খুচরা পণ্য বাজারজাত করার ব্যাপারে মতানৈক্যের কারণে ব্রিটেনসহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। মনমোহন সিং সরকারের বাংলাদেশ নীতি, বিশেষ করে বাংলাদেশের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উপরোক্ত দেশগুলোর সঙ্গে দিল্লির দূরত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্রুত অর্থনীতির বিকাশ এবং কোটি কোটি বেকারের কর্মসংস্থান করতে হলে ইউরোপ-আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি করতে হবে নতুন সরকারকে। সেখানে বাংলাদেশে একটি অবৈধ, অনির্বাচিত স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের সঙ্গে বিদায়ী সরকারের অতিরিক্ত মাখামাখির প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। কারো কারো মতে ওই দেশগুলো অবিলম্বে বাংলাদেশে সকলের গ্রহণযোগ্য নতুন একটা নির্বাচন করার জন্যে নরেন্দ্র মোদির সরকারের ওপর চাপ দেবে।

ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করার জন্যে বাংলাদেশে যারা লাফালাফি করছেন ভারতের কট্টর হিন্দু জাতীয়তাবাদী সরকারের কাছে তারা বেশি আশ্‌কারা পাবেন বলে মনে হয় না। নরেন্দ্র মোদি প্রকৃত গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন। অন্যদিকে শেখ হাসিনা শুধু নির্বাচনই নয়, গোটা নির্বাচনী প্রক্রিয়াই ডাকাতি করে গদি দখল করে আছেন। অনির্বাচিত এবং বিরোধী দলের রক্তে হাত রঞ্জিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলোচনায় বসতে নরেন্দ্র মোদির অভিরুচি হবে কি? 'তেলে জলে মিশ খায়না'। স্বৈরতন্ত্রী হাসিনার সঙ্গে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত নরেন্দ্র মোদির ঘনিষ্ঠতাও তেমনি অস্বাভাবিক মনে হবে। ঢাকায় এখন যারা ক্ষমতায় আছেন দিল্লির নতুন সরকারের সঙ্গে লেনদেনের চেষ্টার আগে অনেক ব্যাপারেই তাদের নতুন করে চিন্তা করতে হবে।

এই গোপন আঁতাত মোটেও বন্ধুত্ব নয়

বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বাংলাদেশের সঙ্গে 'বন্ধুত্বের সম্পর্ক' বজায় রাখার পরামর্শ দিয়ে গেছেন তার উত্তরসূরিকে। প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই সে

পরামর্শকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন। বাংলাদেশের বাণিজ্যের বাজার ভারতের জন্যে কতোখানি গুরুত্বপূর্ণ সেটা তিনি অবশ্যই বুঝবেন। তাছাড়া উত্তর-পূর্বের সাতটি রাজ্যের (সাতবোন) সঙ্গে সড়ক, রেল ও নদী পথে করিডোর ও ট্রানজিটের যে গোপন চুক্তি শেখ হাসিনার সঙ্গে করেছে মনমোহন সিংয়ের সরকার তার সামরিক বিবেচনা দিল্লির জন্যে অসীম গুরুত্ব বহন করে। সাতবোনের বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহ দমনের বিষয় তো আছেই। সে ব্যাপারে বাংলাদেশের সহযোগিতা এবং সেখানে সৈন্য ও অস্ত্র পাঠানোর সংযোগ পথ ভারতের প্রয়োজন। তাছাড়া চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এখনো আদর্শস্থানীয় নয়। এবং অরুণাচল অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকার মালিকানা নিয়ে দুদেশের বিরোধ এখনো ধিকি ধিকি জ্বলছে। আবার যদি ১৯৬২ সালের মতো দুদেশের মধ্যে যুদ্ধ দেখা দেয় তাহলে রণাঙ্গনে সরবরাহ পাঠানোর জন্যে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ছাড়া সুবিধাজনক পথ নেই। মিঃ মোদিকে অবশ্যই বুঝতে হবে নতজানু হাসিনা সরকারের কাছ থেকে যেসব সুবিধা আদায় করে নেওয়া হয়েছে তাকে আর যাই হোক বন্ধুত্ব বলা যাবে না।

এই গোপন চুক্তিগুলো এবং শেখ হাসিনার অবৈধ সরকারের প্রতি মনমোহন সরকারের নির্লজ্জ সমর্থন বাংলাদেশের মানুষকে ভারতের প্রতি তিক্ত এবং বৈরী ভাবাপন্ন করে তুলেছে। অথচ বাংলাদেশে এমন কোন মানুষের কথা আমি জানি না যে মানুষ ভারতের সঙ্গে প্রকৃত বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছাড়া অন্য কিছু কামনা করে। ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন না এবং হাসিনা-মনমোহন আঁতাতের ওপর বাংলাদেশের মানুষ খুবই ক্রুদ্ধ। দুদেশের সম্পর্ক পারস্পরিক সমঝোতা ও মর্যাদার ওপর স্থাপিত করা না হলে দূর মেয়াদে গোপন চুক্তিগুলো কার্যকর করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতে পারে।বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত রোববার (১৮ মে) টেলিফোনে মিঃ নরেন্দ্র মোদিরসঙ্গে দীর্ঘ আলাপ করেছেন। তিনি নিশ্চয়ই বাংলাদেশের মানুষের মনের কথা ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রীকে বুঝিয়ে বলে থাকবেন।

নাটক চমক ইতিহাস ও শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনা চমক দেখাতে এবং নাটক করতে ভালোবাসেন। বাংলাদেশে নিশ্চয়ই এমন মানুষ খুব কম আছেন প্রধানমন্ত্রীর এই বৈশিষ্ট্যগুলো যাদের নজর এড়িয়ে গেছে। এগুলো ব্যক্তিগত সৌকর্য, জ্ঞান ও অভিরুচির ব্যাপার। কিন্তু ইতিহাসকেও তিনি প্রায়ই ব্যক্তিগত অভিরুচির ব্যাপার করে তুলতে চান। মনের অভিপ্রায়কে প্রায়ই তিনি ইতিহাস বলে চালিয়ে দিতে চান। সেটা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

গত শনিবার (১৭ মে) ছিলো তার ভারতের আশ্রয় ছেড়ে বাংলাদেশে ফিরে আসার ৩৩ বছর পূর্তির দিন। স্বভাবসিদ্ধ রাজসিক আড়ম্বরের সঙ্গে তিনি সে বার্ষিকী উদযাপন করেছেন। তাতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু সে অনুষ্ঠানে যে ভাষণ তিনি দিয়েছেন তাতে অনেকেরই ভ্রু কুঞ্চিত হবে।

শেখ হাসিনা বলেছেন, প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আওয়ামী লীগের নাম-নিশানা মুছে দিতে চেয়েছিলেন। আশা করবো স্মৃতিভ্রষ্ট হবার বয়স এখনো শেখ হাসিনার হয়নি। তাহলে অবশ্যই বলতে হবে যে ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি সত্যকে বিকৃত করছেন। প্রকৃত পরিস্থিতি তার সম্পূর্ণ বিপরীত। বরং এটাই সত্যি যে আওয়ামী লীগকে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে পুনরুজ্জীবিতই করেছিলেন শহীদ জিয়াউর রহমান।

হাসিনার পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বাকশাল পদ্ধতি চালুর সময় আওয়ামী লীগসহ সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, চারখানি সরকারি পত্রিকা ছাড়া অন্য সব পত্র-পত্রিকা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সে বছরের ১৫ আগস্ট থেকে শুরু করে একপ্রস্থ সামরিক অভ্যুত্থান ও ব্যর্থ অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার পর সাধারণ সৈনিকরা গৃহবন্দী জেনারেল জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসান। তখন থেকে জিয়াউর রহমান তার গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে দিল্লিতে ভারত সরকারের আশ্রয় থেকে মুজিবের দুই কন্যা হাসিনা ও রেহানাকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্যে ভারত সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনা শুরু করেন। কিন্তু হয় হাসিনা ও রেহানা তখন দেশে ফিরে আসতে চাননি, নতুবা দিল্লিতে তাদের তত্ত্বাবধানকারী র' তাদের ফেরত পাঠাতে চায়নি।

জেনারেল জিয়া ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এক দীর্ঘ একান্ত বৈঠকে আমাকে বলেছিলেন যে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার পদ্ধতি নিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপকসহ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন। তার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আওয়ামী লীগসহ সকল রাজনৈতিক দলকে আবার বৈধ ঘোষণা করেন। শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনার জন্যে তিনি আওয়ামী লীগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. কামাল হোসেন ও মহাসচিব আব্দুর রাজ্জাককে দিল্লি পাঠান। তার পরেই ১৯৮১ সালের ১৭ মে দুই বোন দেশে ফিরে আসেন। জেনারেল জিয়া অবিলম্বে হীরক মুকুটসহ সাড়ে ৩৩ কোটি টাকার (তখনকার মূল্যে) বিষয় সম্পত্তি ও অলঙ্কার শেখ হাসিনাকে বুঝিয়ে দেন। জিয়ার অবশ্যই জানা ছিলো না যে তিনি তার নিজের মৃত্যুর আয়োজনই সম্পন্ন করেছিলেন। তার মাত্র ১৩ দিন পরেই অত্যন্ত গভীর এক ষড়যন্ত্রে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হন।

(লন্ডন, ২০.০৫.১৪)

শহীদ জিয়ার অভাব এখন তীব্র অনুভূত হচ্ছে

শেখ হাসিনা দ্বিতীয় দফায় প্রধানমন্ত্রী হন ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে। তখন থেকে কয়েকটি কলামে আমি লিখেছিলাম গোড়া থেকেই তিনি যেন জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করার জন্যে সুপরিকল্পিতভাবে উঠেপড়ে লেগেছেন। যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি জাতীয় ঐক্য ছাড়া দেশ ও জাতির উন্নতি সম্ভব নয়, বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো সমস্যাসঙ্কুল দেশে। বিভিন্ন কলামে প্রাচীন ভারতবর্ষের সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের অমাত্য চাণক্যের কাহিনী বিবৃত করে এ-ও বলেছিলাম, সম্রাট কোন রাজ্য দখল করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে চাণক্য প্রথমে সেদেশে গোয়েন্দা পাঠাতেন। গোয়েন্দারা বিবাদ-বিসম্বাদ ঝগড়াঝাটি ও দলাদলি সৃষ্টি করে জাতীয় এক্য বিনষ্ট করতো। সে রাজ্য তাতে দুর্বল হয়ে পড়তো এবং রাজ্যটি দখল করা চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যদের জন্যে সহজ হয়ে যেতো।

একাই আমি সকল কৃতিত্ব নেবার চেষ্টা করছি না। বাংলাদেশের বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি এবং বেশ কয়েকজন কলামিস্ট ও সাংবাদিক মোটামুটি একই রকম পরামর্শ দিয়েছেন শেখ হাসিনাকে। কিন্তু কার কথা কে শোনে? শেখ হাসিনা হয় নিজেকে সকল জ্ঞান-বুদ্ধির আধার মনে করেন, নয়তো পরামর্শ সীমান্তের ওপার থেকে না এলে তার মনঃপূত হয় না। অন্যদিকে শহীদ জিয়াউর রহমানের সঙ্গে ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারির একটি একান্ত আলাপের কথা লিখে লিখে পাঠকদের বিরক্তি উৎপাদন করছি কিনা ভয় হয়। সে আলোচনায় তৎকালীন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান দেশের বিদ্যমান সমস্যাবলী সনাক্ত করে সমাধানের জন্যে তার চিন্তা ভাবনার উল্লেখ করছিলেন।

জেনারেল জিয়া বলেছিলেন যে সেনাবাহিনীতে চেন-অব-কমান্ড ফিরিয়ে আনা তার একটা বড়ো ভাবনা। তিনি বলেন তরুণদের, বিশেষ করে শিক্ষিত বেকারদের গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা না হলে ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা ও অশান্তি দেখা দেবে। গণতন্ত্র বাংলাদেশের মানুষের রক্তে মিশে আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বাকশাল প্রতিষ্ঠার সময় সকল বেসরকারি পত্রপত্রিকা বন্ধ করে দেয়া এবং আওয়ামী লীগসহ সবগুলো রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা দেশের মানুষের মনঃপূত হয়নি। জিয়া বলেন যে তিনি অবিলম্বে পত্রপত্রিকার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবেন। গণতান্ত্রিক

রাজনীতি ফিরিয়ে আনার পন্থা সম্বন্ধে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপকসহ চিন্তাবিদদের সঙ্গে আলোচনার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন।

আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়নি এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছে তাদের কেন তিনি জাতীয় জীবনে পুনর্বাসনের সুযোগ দিচ্ছেন। জেনারেল জিয়া তার চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, দেখুন, এরা তো এদেশেরই লোক, আর কোন্ দেশ তাদের নেবে আপনিই বলুন। একটু হেসে তিনি বলেন, আপনি তো বিলেতে থাকেন, সে দেশের সরকারকে বলে দেখুন না, তারা এদের নেবে কিনা। আর যদি কেউ না নেয় তাহলে এদের নিয়ে আমি কি করবো বলুন? আমি কি তাদের বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিয়ে আসবো? তাদের যদি জাতীয় জীবনে সম্পৃক্ত না করি তাহলে সব সময় আমাকে পিঠের দিকে চোখ রাখতে হবে, ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে কখন কে ছুরি মারে। সব সময় যদি পিঠ বাঁচানোর চিন্তায় ব্যস্ত থাকি তাহলে দেশের হাজারো সমস্যার সমাধানের চিন্তা করবো কখন?

বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তার পিতাকে সম্ভবত দেবতাদের চাইতেও উঁচুতে স্থাপন করতে চান। কিন্তু শেখ মুজিব যা বুঝেছিলেন সেটা বুঝতেও তিনি রাজি নন। একাত্তরে এবং পরবর্তী বছরগুলোতে সংশ্লিষ্ট খবরাদি বিবিসি থেকে প্রচার করা এবং বিশ্ব মিডিয়াকে বোঝানো আমার কাজ ছিলো। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী একাত্তরে যে নৃশংসতা দেখিয়েছে তার দৃষ্টান্ত বিশ্বের ইতিহাসে খুব বেশি নেই। তাদের ভেতর ১৯৫ জন পাকিস্তানী সেনাকে জঘন্যতম যুদ্ধাপরাধের দায়ে শনাক্ত করা হয়েছিলো। শেখ হাসিনার পিতা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে শুধু যে ৯৩ হাজার পাকিস্তানী সৈন্যকে মুক্তি দিয়েছেন তা নয়, জঘন্যতম অপরাধী সে ১৯৫ জনকেও মুক্তি দিয়েছিলেন। এভাবে পাকিস্তানের এবং মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে তিনি সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চেয়েছিলেন। সে লক্ষ্যে তিনি ইসলামী সম্মেলনে যোগ দিতে লাহোরে গিয়েছিলেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোরতর বিরোধী জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গেও কোলাকুলি করেছিলেন।

স্বদেশে তিনি যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন তাদের জন্যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন। দেশেও প্রতিহিংসা আর প্রতিশোধের বিষাক্ত পরিবেশের অবসান করা তার লক্ষ্য ছিলো। তাছাড়া সে সিদ্ধান্তের পেছনে তার এ অনুভূতিও ছিলো যে নিজেও তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অখণ্ড পাকিস্তানে বিশ্বাস করতেন এবং অখণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার আশায় আপস সমঝোতার ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। সময় এবং সুপরামর্শ পেলে হয়তো তিনি রাজাকার-আলবদরদেরও ক্ষমা করে দিতে পারতেন। পিতাকে দেবতা বানাতে চাইলেও শেখ হাসিনা পিতার দৃষ্টান্ত থেকে উপকৃত হতে

পারেননি, তার স্মৃতিকে যথাযথ সম্মান দেখাতে পারেননি। উল্টো তিনি ৪০ বছরের পুরাতন কাসুন্দি ঘেঁটে প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসাকে দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য করে তুলেছেন। আমরা যারা গোড়া থেকেই তাকে হুঁশিয়ারি ও সুপরামর্শ দিয়েছিলাম তাদের আশঙ্কা শতগুণে এখন সত্যে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে এখন কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, সকলেই পরস্পরকে শত্রু ভাবে, সন্দেহ করে। সকলেই চায় পিঠ বাঁচাতে। তার পরিণতি কি হয়েছে সেটা কি কাউকে বলে দিতে হবে?

মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য কারো মনে আছে?

বাংলাদেশে এখন কি কারো মনে আছে কেন আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম, মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম? জেনারেল জিয়া প্রকৃতই বলেছিলেন গণতন্ত্র বাংলাদেশের মানুষের রক্তে মিশে আছে। গণতন্ত্রটা এখন কোথায় দয়া করে কেউ কি আমাকে দেখিয়ে দেবেন? এখন বাংলাদেশে অবাধ ও ন্যায্য নির্বাচন হতে পারে না, হতে দেয়া হয় না। তিনমন্ত্রী নির্বাচন কমিশনে বসে যে সংখ্যা এবং যাদের নাম লিখে দেন কমিশন তাদের নির্বাচিত ঘোষণা করে। ভোটদাতারা এবং সাধারণ মানুষ এখানে অবান্তর। মুখে কুলুপ এঁটে দিয়ে এবং ক্যাডার পুলিশ ও র‍্যাব নামের তিন বাহিনীর ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে একটা অবৈধ সরকার বিদেশী প্রভুদের নির্দেশ অনুযায়ী মূলত শোষণ এবং নামমাত্র শাসন চালাচ্ছে।

বিরোধী দলগুলোকে কথা বলার অধিকার তারা দিতে চায় না। পথে মিছিল করার, মুক্তাঙ্গনে সভা করার, এমনকি রুদ্ধদ্বার সম্মেলন কক্ষেও সভা-সমাবেশ করার অধিকার বিরোধীদের দেয়া হয় না। সড়ক বন্ধ করে দিয়ে তিনবারের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী এবং সর্বজনস্বীকৃত দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে জনসমাবেশে যেতে বাধা দেয়া হয়, সম্মেলনে তার যাবার কথা থাকলে পুলিশ দিয়ে সম্মেলন স্থলের প্রবেশপথ বন্ধ করে দেয়া হয়। সত্য প্রকাশ করার চেষ্টা করলেও সাংবাদিকরা মেহেরুন রুনি ও তার স্বামী সাগরের মতো খুন হন, মাহমুদুর রহমানের মতো বিনা বিচারে কারা ভোগ করেন এবং রিমান্ডে নির্যাতিত হন। শেখ মুজিব বাকশাল দিয়ে পত্রপত্রিকা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। শেখ হাসিনা পত্রপত্রিকা এবং টেলিভিশন চ্যানেল বন্ধ করেন পুলিশ দিয়ে। প্রতি মুহূর্তে ক্ষমতাসীনদের ভয় তাদের দুষ্কর্ম, দুর্নীতি ও কুশাসনের কথা সাধারণ মানুষ জেনে গেলে তাদের পিঠের চামড়া আস্ত থাকবে না. গদি দূরের কথা। যে সাবেক বিচারপতির বিতর্কিত রায়ের অর্ধেকের দোহাই দিয়ে বাংলাদেশকে একটা রণক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছে তিনিও এখন বলছেন বাংলাদেশে কে যে সরকার তিনি বুঝতে পারেন না।

পারার কথাও নয়। পেশীশক্তি দিয়ে এ সরকার গদি দখল করে রাখতে চেয়েছিলো। সে পেশীশক্তি এখন পশুশক্তি হয়ে সরকারকেই খেতে উদ্যত হয়েছে। প্রথম দফায় গদি পেয়ে এ দৈত্যকে শেখ হাসিনা বোতল থেকে বের করে দিয়েছিলেন। লক্ষ্মীপুরের বিএনপি নেতা নূরুল ইসলামকে গডফাদার আবু তাহেরের ছেলে টুকরো টুকরো করে কেটে বস্তাবন্দী করে নদীতে ফেলে দিয়েছিলো। বাংলাদেশের আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলো, কিন্তু আবার গদি পেয়ে হাসিনার সরকার তাকে ছেড়ে দিয়েছে, সে ছেলে আবার খুনখারাপীর তাণ্ডব চালাচ্ছে। লক্ষ্মীপুরে এখন হচ্ছে কি? আওয়ামী লীগের গুণ্ডাদের খুন করছে আওয়ামী লীগেরই অন্য গুণ্ডারা। নারায়ণগঞ্জের গডফাদার শামীম ওসমান এবং ফেনীর গডফাদার জয়নাল হাজারির খুনখারাপী সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় প্রথম দফার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের ধমক দিয়েছিলেন। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগকে তিনি 'একটির বদলে দশটি লাশ ফেলার' নির্দেশ দিয়েছিলেন।

নারায়ণগঞ্জে যে সাত খুন (এবং আরও চারজন সম্ভাব্য সাক্ষী খুন) হলো তারা কি আওয়ামী লীগের লোক নয়? যারা খুন করেছে তারাও কি আওয়ামী লীগের গুণ্ডা-পাণ্ডা নয়? এবং সকল পক্ষই কি এখন গডফাদার শামীম ওসমানের দিকে আঙ্গুল দেখাচ্ছে না? ফেনীর ফুলগাজী উপজেলার আওয়ামী লীগ দলীয় চেয়ারম্যান একরামুল হক খুন হলেন। সরকারের দুজন গডফাদার জয়নাল হাজারি আর নিজাম হাজারি বহু অভিযোগ করলেন পরস্পরের বিরুদ্ধে। পুলিশ গ্রেফতার করলো উপজেলা আওয়ামী লীগ চেয়ারম্যান জিহাদ চৌধুরীকে। বাংলাদেশের এই হচ্ছে সর্বশেষ প্রবণতা। দেশের এ মাথা থেকে ও মাথা সর্বত্র থেকে খবর আসছে একই রকম। আওয়ামী লীগের ক্যাডারদের একদল অন্য দলকে আক্রমণ করছে, খুনখারাপী চলছে। এতোদিন তারা খুন করেছে সরকারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে। এখন প্রতিপত্তি আর লুণ্ঠিত সম্পদের ভাগাভাগির লোভে তারা দলের ভেতরেই গৃহযুদ্ধ চালাচ্ছে। এখন কুকুরের মাংস কুকুরে খাচ্ছে।

দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছিলো র‍্যাব আর পুলিশের ওপর। তাদের দিয়ে সরকার বিরোধী দলকে দমন, দলন, নির্যাতন ও খুনখারাপী করিয়েছে। তারাও এখন বুঝে গেছে এ সরকারের কোন নৈতিক কিংবা সাংবিধানিক অধিকার নেই গদিতে থাকার। এ সরকারের হুকুম তারা আর মানতে রাজি নয়। তারা এখন ফ্রিল্যান্স দুর্নীতি এবং কন্ট্রাক্ট কিলিংয়ে মনোযোগ দিয়েছে। সরকার এখন অসহায়। কাউকেই নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তাদের নেই। হাজার ফুট গভীর গিরিখাদের ওপর দাঁড়িয়ে শেখ হাসিনা ফাঁকা বুলির ফানুশ ওড়াচ্ছেন। দেশ ছেড়ে এখন বিদেশীদের 'চমক' দেখানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছেন।

এই ভয়াবহ অবস্থা যাতে সৃষ্টি হতে না পারে সে লক্ষ্য নিয়েই জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নিয়েছিলেন। তার স্বপ্ন অনুযায়ী জাতিকে যদি ঐক্যবদ্ধ করা যেতো, বেকার সমস্যার যদি সমাধান করা হতো, দেশের মানুষের কর্মশক্তিকে যদি গঠনের এবং উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত করা যেতো, বর্তমান বিভীষিকা কি তাহলে অনিবার্য ছিলো? নদী সংস্কার ও খাল খননের কাজ যদি চলতে দেয়া হতো তাহলে পানির অভাবে দেশের মানুষ কি হাহাকার করতো? দুর্নীতি আর চুরির দায়ে যাদেও জেলে থাকার কথা, আর যাদের পাগলা গারদে রাখাই উচিত ছিলো, সে লোকগুলোকে যদি ধরে ধরে মন্ত্রী বানানো না হতো তাহলে কি সাংবিধানিক ও নৈতিক কর্তৃত্বের দেউলিয়াত্ব দেখা দিতো দেশে?

'দেশের মানুষের রক্তে মেশা' গণতন্ত্রকে কি চোখে দেখেছিলেন শহীদ জিয়াউর রহমান? নিষিদ্ধ পত্রপত্রিকাগুলো প্রকাশের অনুমতি দিয়েছিলেন তিনি, নতুন পত্রপত্রিকা প্রকাশের ওপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে দিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও জাসদসহ সকল রাজনৈতিক দলকে তিনি আবার বৈধ ঘোষণা করেছিলেন, নতুন রাজনৈতিক দল গঠনেরও অবারিত সুযোগ করে দিয়েছিলেন। শেখ মুজিবের দুই কন্যাকে দিল্লি থেকে দেশে ফিরিয়ে আনতে তিনি আওয়ামী লীগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. কামাল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাককে দিল্লি পাঠিয়েছিলেন।

ড. কামাল হোসেন ও আব্দুর রাজ্জাক যে দিল্লিতে গিয়েছিলেন সেকথা স্বীকার করতে শেখ হাসিনা কোন অজ্ঞাত কারণে সম্পূর্ণ নারাজ। অতীতে আমার এক কলামের প্রতিবাদে সরকারি প্রেসনোট জারি করে সে কথা অস্বীকার করা হয়েছিলো। কিন্তু শেখ হাসিনার প্রয়াত স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়ার রোজনামচা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছিলাম যে আমার বক্তব্য সঠিক ছিলো। মাঝে মাঝেই এ জাতীয় উক্তি করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী অযথা বিতর্ক সৃষ্টি করেন। সম্প্রতি তিনি আবারো অভিযোগ করেছেন যে দিল্লি থেকে ফিরে আসার পর তাকে পিত্রালয়ে ঢুকতে পর্যন্ত দেয়া হয়নি এবং তার জিনিসপত্র রাস্তায় ফেলে রাখা হয়েছিলো।

নিত্যনতুন বিতর্ক সৃষ্টি

রাষ্ট্রপতি জিয়া সব সময় কর্মব্যস্ত থাকতেন। লাল গালিচা পেতে কুর্নিশ করতে করতে শেখ হাসিনাকে তার পিতার বাড়িতে তুলে দেবার কথা হয়তো তার মনে হয়নি। কিন্তু তালিকা তৈরি করে এবং রসিদ নিয়ে হীরক মুকুট সহ সাড়ে তেত্রিশ কোটি টাকা দামের সম্পত্তি তিনি শেখ হাসিনাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তার জিনিসপত্র রাস্তায় ফেলে রাখার প্রশ্নই ওঠে না। আসলে কারো জিনিসপত্র রাস্তায় ফেলে রাখার ঐতিহ্য শেখ হাসিনার। প্রথম দফার প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় তিনি নিজের স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়াকে তার নিজের বাড়ি সুধা সদন থেকে ব্যক্তিগত জিনিসপত্র সমেত রাস্তায় বের করে দিয়েছিলেন,

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরমাণুবিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ মিয়া জীবনের শেষ বছরগুলো কাটিয়েছেন বঙ্গভবনের একটি নিঃসঙ্গ কক্ষে – নিজের বাড়ি সুধাসদন কিংবা স্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে নয়। বেগম খালেদা জিয়াকে তিনি ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছিলেন।

মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছিলেন – এ কথা শুনলেও শেখ হাসিনা তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। বহু প্রমাণ আগেও দেয়া হয়েছে কিন্তু সেসব গ্রাহ্য করতেও তিনি প্রস্তুত নন। সম্প্রতি একাত্তরের নির্বাসিত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং স্বাধীন বাংলাদেশেরও প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কন্যা শারমীন আহমদ তার বইতে লিখেছেন, একাত্তরের ২৫ মার্চ সন্ধ্যেবেলা তার পিতা স্বাধীনতার ঘোষণার খসড়া আর টেপরেকর্ডার নিয়ে শেখ মুজিবের বাড়ি গিয়েছিলেন, কিন্তু মুজিব সে ঘোষণা রেকর্ড করতে রাজি হননি। শারমীন আহমদ আরো লিখেছেন, মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা শুনে তার পিতা তাজউদ্দীন আহমদ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। শেখ মুজিব যাকে সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করেছিলেন সেই জেনারেল সফিউল্লাও কয়েকদিন আগে স্বীকার করেছেন যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন জিয়াউর রহমান এবং সে ঘোষণায় তিনি আরো বলেছিলেন যে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিচ্ছেন।

বহুকাল আগে শেকসপিয়ারের হ্যামলেট নাটকের অনুবাদের এক স্থানে লিখেছিলাম, কল্পনা প্রবল হয় দুর্বল শরীরে। শেখ হাসিনা সম্বন্ধে আমার প্রায়ই মনে হয়, বাবা-মার শোকস্মৃতি মনে হলেই তার কল্পনা প্রবল হয়, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী জিয়াউর রহমানের পরিবারের বিরুদ্ধে মনগড়া অভিযোগ ম্যানুফ্যাকচার করতে শুরু করেন।

শহীদ জিয়ার সঙ্গে শেখ হাসিনার তুলনা করার প্রশ্ন ওঠে না। বস্তুত দুজনের নাম এক দমে উচ্চারিত হওয়াও উচিত নয়। কিন্তু যে অন্ধ রৌদ্রস্নাত দিন দেখেনি ঘুরঘুট্টি অমানিশার বিভীষিকা সে বুঝবে কি করে? জিয়ার চিন্তা ও আদর্শের কথা চিন্তা করলেই বুঝতে পারি শেখ হাসিনা দেশটাকে সর্বনাশের দিকে কতোখানি নিয়ে গেছেন। হয়তো আধুনিক কোন চাণক্যের ইশারায় নিজের দেশকে পরের হাতে তুলে দেবার মতলবে দেশে হিংসা-দ্বেষ ও ভেদাভেদ সৃষ্টি করে চলেছেন, জাতীয় ঐক্য অসম্ভব করে তুলেছেন। গভীর এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র করে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা হয়েছিলো। কিন্তু অনেক দুঃখ ভুগে ভুগে বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে জিয়ার আদর্শ ক্রমেই বেশি ভাস্বর হয়ে উঠছে। বিচার করার সময় যখন আসবে ষড়যন্ত্রকারীদের পরিচয় সেদিন সারা বিশ্বের জানা হয়ে যাবে।

(লন্ডন, ২৮.০৫.১৪)

আতঙ্কে ওদের আহার-নিদ্রা হারাম হয়ে যাচ্ছে

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান হঠাৎ করে সাধারণ নির্বাচন ডাকেন ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ। ফ্লিট স্ট্রিটের যেসব সাংবাদিক মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সমর্থন দিয়েছেন তাদের কয়েকজন বিবিসির অফিসে আমাকে টেলিফোন করেন। বাংলাদেশ সংসদের মেয়াদ তখনো প্রায় অর্ধেক বাকি। তিন-চারজন বাদ দিয়ে সব সদস্যই আওয়ামী লীগ দলের। সুতরাং সরকারের গরিষ্ঠতা নিয়ে কোন সমস্যা দেখা দিচ্ছে না। এমতাবস্থায় মুজিব কেন নির্বাচনের প্রয়োজন বোধ করলেন? তার চাইতে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ ও অর্থনীতির পুনর্গঠনে মনোযোগ দেয়া কি বেশি প্রয়োজনীয় ছিলো না? মূলত সেটাই ছিলো তাদের প্রশ্ন। সেদিন বিবিসির সকাল বেলার সম্পাদকীয় বৈঠকেরও প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিলো সেটাই। যতোদূর মনে পড়ে সেদিনের দু-একটি সংবাদ ভাষ্যেও এ প্রশ্নটি উথাপিত হয়েছিলো।

নির্বাচন উপলক্ষে আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম। আর গিয়েছিলেন আমার সহকর্মী মার্ক টালি (বর্তমানে স্যার মার্ক টালি)। একাত্তরে বাংলাদেশ বিষয়ে তার সংবাদ, প্রতিবেদন ও সংবাদ-ভাষ্য শোনার জন্যে বাঙালি মাত্রেই আকুল হয়ে থাকতেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তার নাম উচ্চারণ করতেন 'আমার বন্ধু মার্ক' বলে। মার্ক টালিকে তিনি শিল্পী মুবিনুল আজিমের একখানি চমৎকার পেন্টিং উপহার দিয়েছিলেন। মার্ককে সে উপহার নিয়ে গর্ব করতে বহুবার শুনেছি।

স্বাধীন বাংলাদেশে সেটাই ছিলো প্রথম নির্বাচন এবং নির্বাচনে সহিংসতার শুরুও তখন থেকে। আওয়ামী লীগ ছাড়া উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল ছিলো ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)। মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার পর ন্যাপ প্রথমে কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলো এবং সক্রিয়ভাবে আওয়ামী লীগে যোগ দেওয়ার কথা ভাবছিলো। রক্ষীবাহিনী আগে থেকেই জাসদসহ সরকারের বিরোধী ও সমালোচকদের নিধনের কাজ চালাচ্ছিলো। আওয়ামী লীগের কর্মীদের হুমকি-ধমকি উপেক্ষা করে অল্প কয়েকজন জাসদ সদস্য ও স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা-ভাইস প্রেসিডেন্ট, যুক্তফ্রন্ট সরকারের সিনিয়র মন্ত্রী এবং আরো পরে আওয়ামী লীগ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী খান আতাউর রহমান স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছিলেন ধামরাই নির্বাচনী এলাকা থেকে।

আওয়ামী লীগের কর্মীরা তাকে ছিনতাই করে এবং কয়েকদিন গুম করে রাখে। শেষে তার পরিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের (আওয়ামী লীগে খান আতাউর রহমানের জুনিয়র কর্মকর্তা এবং যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগ সরকারে তার জুনিয়র মন্ত্রী) কাছে এসে কান্নাকাটি করেন। তার পরেই খান আতাউর রহমান মুক্তি পান। আমার নিজের প্রতিবেদনের উল্লেখ করছি না। মার্ক টালি তার খবর ও প্রতিবেদনে সে নির্বাচনে 'ব্যাপক সহিংসতার' উল্লেখ করেছেন এবং বলেছিলেন যে তিনি সঠিক জানেন অন্তত চারটি আসন আওয়ামী লীগ দখল করেছে সহিংসতা ও অন্যান্য অসাধু উপায়ে।

ফলাফল প্রকাশিত হয় ৮ মার্চ রাতে। টেলিফোনে প্রধানমন্ত্রী মার্ক টালিকে এবং আমাকে পরদিন সকালে তার অফিসে ডাকেন। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল থেকে হেঁটেই আমরা মিন্টো রোডে তার অফিসে গেলাম। সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ রেডক্রসের চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তাফা, ঢাকা কলেজের একজন লেকচারার এবং রক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক তোফায়েল আহমেদ। আমাদের বসতে বলে মুজিব ভাই গোড়াতেই প্রশ্ন করলেন: "নির্বাচন করলাম, নির্বাচনে জিতলাম, এখন বল্ কি করি?" আমি তাকে পরামর্শ দিলাম সেদিন সন্ধ্যেবেলায় তার উচিত রেডিয়ো-টেলিভিশনে যুগপৎ ভাষণ দেয়া। আমি এও বললাম যে তিনি হুকুম দিলে আমি নিজেই ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে একটা খসড়া লিখে তার অনুমোদনের জন্যে নিয়ে আসতে পারি।

প্রধানমন্ত্রী জানতে চাইলেন সে খসড়ায় আমি কি লিখবো। বললাম, লিখবো যে নির্বাচন গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। কিন্তু স্বভাবতই নির্বাচন বিভাজক প্রক্রিয়া। এখন নির্বাচন হয়ে গেছে, গণতন্ত্রের প্রয়োজনও মিটেছে; এখন সকলের উচিত ভেদাভেদ ভুলে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ ও অর্থনীতির পুনর্নির্মাণে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা। আমার বক্তব্য শেষ না হতেই পাশে থেকে গাজী গোলাম মোস্তাফা বলে উঠলেন: "না, অইবো না।"

বেয়াদপীর সঠিক সংজ্ঞা কি?

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন অইবো না গাজী সাহেব? তিনি বললেন, "অরা বেয়াদপী করছে। কনটেস্ট করছিলো ক্যান? উনি (প্রধানমন্ত্রী) ভিক্টোরি মার্চে যাইবো।" এতোক্ষণ মুজিব ভাইয়ের বাঁ হাত ছিলো আমার কাঁধের ওপর। তিনি সে হাত নামিয়ে নিয়ে আগ্রহ সহকারে ডান দিকে মোড় ঘুরে গাজী গোলাম মোস্তাফার দিকে তাকালেন। বললেন, "গাজী, তো তোরা ভিক্টোরি মার্চ

করবি, কোন রুটে যাবি, সিকিউরিটির কি হবে?" মার্ক টালির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম হতাশা মূর্ত হয়ে উঠেছে সে মুখে। চোখ ঠেরে তিনি ইশারা করলেন আমাকে। মুজিব ভাইয়ের কাছে মাফ চেয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম। পুরাতন গণভবন থেকে বেরিয়ে এসে মার্ক বললেন, "সিরাজ, মাই হার্ট ব্লীডস ফর দিস ম্যান"– সিরাজ, এই লোকটার জন্যে আমার হৃদয়ের রক্ত ঝরছে।

ভারাক্রান্ত মনে প্রায় নীরবে হাঁটতে হাঁটতে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। নির্বাচনে প্রায় সম্পূর্ণ বিজয় হয়েছে তার, বলতে গেলে একদলীয় সংসদ নির্বাচিত হয়েছে। তার পরেও বিজয় মিছিল করে নামমাত্র বিরোধীদের নাকমুখ মাটিতে ঘসে দেবার কি প্রয়োজন ছিলো মুজিবের? আমার মনে পড়লো ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটরা সুন্দরবনে বাঘ শিকার করতেন। তারপর মরা বাঘের গায়ের ওপর বুট পরা পা তুলে চাকর-বাকর ও পাইক-পেয়াদাসহ ছবি তোলাতেন। আরো মনে হলো খান আতাউর রহমান মুজিবের গুরু এবং রাজনৈতিক পিতা না হলেও চাচা ছিলেন অন্তত। তাকে ছিনতাই করে গুম করে রাখা তার বেয়াদপী মনে হয়নি। অন্যদিকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা পবিত্র গণতান্ত্রিক অধিকার – যে গণতন্ত্রের কথা মুজিব সারা জীবন বলে এসেছেন এবং যে গণতন্ত্রের গ্যারান্টি নতুন স্বাধীন দেশের সংবিধানে দেয়া হয়েছে। সে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে বেয়াদপী বলায় মুজিব প্রতিবাদ করলেন না, বরং খুশি হলেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আমার বহু সাক্ষাৎকার এবং আলোচনার মধ্যে এ বৈঠকটার কথা আমার বিশেষ করে মনে পড়েছিলো ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে জেনারেল জিয়াউর রহমানের সঙ্গে একান্ত বৈঠকের পরে। জিয়ার কথায় আমার প্রতীতি হয়েছিলো যে ঐক্যবদ্ধ জাতির সাহায্য-সমর্থন নিয়েই তিনি দেশের সমস্যাগুলোর সমাধান করতে চান। অথচ ১৯৭৩ সালের ৯ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়ে ভাষণ দিতে অস্বীকার করেছিলেন।

যে বাংলাদেশে এবং যে সমাজে আমার জন্ম হয়েছিলো 'আদব-কায়দা' কথা দুটো সে সমাজের মূলমন্ত্র ছিলো বলা চলে। সকলকে, বিশেষ করে বয়সে এবং গুণে যারা বড়ো তাদের সম্মান করে চলতেই হবে – এ শিক্ষা শৈশব থেকে সকলেই দিয়েছেন আমাদের। কিন্তু বাংলাদেশে এখন যারা বড়ো হচ্ছে কি ঐতিহ্য নিয়ে তারা গড়ে উঠবে? সকাল-সন্ধ্যা তারা টেলিভিশনে মন্ত্রী ও নেতাদের মুখে শুনছে গালাগালি, খিস্তিখেউড়। জিয়াউর রহমান আর বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী হাসিনা সংসদে, জনসভায়, সংবাদ সম্মেলনে যেসব অকথ্য গালিগালাজ করছেন সেগুলো প্রচার করতে মিডিয়াকে

বাধ্য করা হচ্ছে। আর অবুঝ শিশুরা সর্বক্ষণ শুনছে সেসব খিস্তিখেউড়। তারা নিশ্চয়ই ধরে নিচ্ছে বড়ো হতে গেলে এসব ভাষাতেই কথা বলতে হবে।

গালাগালির কোরাস

আওয়ামী লীগের মন্ত্রী ও নেতাদের মুখে এসব গালিগালাজের কিছু কারণ আমি বুঝতে পারি। দুর্বল শরীরের মতো দুর্বল এবং শোকাতুর মানসেও কল্পনা প্রবল হয়। প্রায় ছয় বছর দিল্লিতে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় র'য়ের হেফাজতে থেকেছেন শেখ হাসিনা। ওখান থেকেই তিনি দেখেছেন জিয়াউর রহমান জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে, সকলের সমন্বয়ে দেশের বহুবিধ সমস্যার সমাধানের জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন আর সেজন্যে সকলেই তার প্রশংসা করছে। অন্যদিকে তার পিতার সাড়ে তিন বছরের শাসনের সমালোচনা হয়েছে সর্বত্র। র' তাকে বাংলাদেশের ইতিহাসের যে ভাষ্যটি শিখিয়েছে সেটিকে দেববাক্যবৎ বিশ্বাস করে তিনি মনে মনে সংকল্প করছিলেন যে জিয়াউর রহমানের সুনাম নষ্ট করার জন্যে দেশে ফিরে তিনি পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করবেন। তার দেশে ফেরার ১৩ দিনের মাথায় আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে জিয়া শহীদ হয়েছেন। গোড়া থেকেই সে চেষ্টা তিনি করেছেন। কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হয়নি এবং হচ্ছে না। এখন তিনি প্রধানমন্ত্রীর গদিতে আছেন, কিন্তু তার শাসনের বিপরীতে জিয়ার সাড়ে পাঁচ বছরের শাসনের অভাবই দেশের মানুষ বোধ করছে। শেখ হাসিনার আক্রোশ তাতে বেড়ে যাচ্ছে।

শৈশবে যদি তিনি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাষা শিখেও থাকেন আক্রোশের এবং প্রতিশোধ বাসনার উদগ্রতার কারণে সেসব তিনি ভুলে গেছেন। তাকে তুষ্ট করতে আওয়ামী লীগের অপদার্থ এবং পদলেহী মন্ত্রী ও নেতারাও বর্বর, অসভ্য ভাষা রপ্ত করেছেন। তিনি যদি বলেন হুক্কা, মন্ত্রীরা সমস্বরে হুয়া-হুয়া বলে প্রতিধ্বনি তোলেন। মাহাবুব-উল আলম হানিফ প্রমুখ যারা এককালে আওয়ামী লীগের নিচের কাতারে থেকে ফুটফরমাশ খেটেছেন তারা হাসিনা-তোষণ করে যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জন করেছেন এবং শত শত একর জমিসহ অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছেন বলে শোনা যায়। তারা যখন তিনবারের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী এবং বর্তমানেও দেশের মানুষের অবিসম্বাদিত নেত্রী খালেদা জিয়া সম্বন্ধে অপমানকর ভাষা ব্যবহার করেন তখন বিস্মিত হবার কোন কারণ ঘটে না।

সম্প্রতি কোরাসে তারেক রহমানকে গালাগাল শুরু করেছেন মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতারা। সকাল-সন্ধ্যা তাদের মুখে 'তারেক বন্দনা'। তার পরিবর্তে সে সময়টা তারা যদি একসঙ্গে বসে আল্লাহ-রাসূলের নামোচ্চারণ করতেন, দুটো দোয়া-দরূদ পড়তেন তাহলে তাদের কিছু আধ্যাত্মিক ও পারত্রিক কল্যাণ হতে পারতো। স্বভাব-বেয়াদব মন্ত্রী কামরুল ইসলাম হঠাৎ করে সিগমন্ড

ফ্রয়েডের চেলা হয়ে গেছেন; বলেছেন তারেক রহমান মনঃস্তাত্ত্বিক চাপে ভুগছেন। ওবায়েদুল কাদের সাধারণত প্রগলভ নন। কিন্তু তিনিও বলেছেন দেশ তারেক রহমানের হাতে পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে– যেন দেশের সর্বনাশ হতে কিছু বাকি রেখেছে এই সরকার। আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের সম্ভ্রান্ত পরিবার সম্বন্ধে আমি অবগত আছি। হয়তো প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার গরজে তিনিও নিন্দার কোরাসে যোগ দিয়েছেন, বলেছেন 'তারেক রহমান চরম বেয়াদব একটা ছেলে'।

তাসের ঘর এখন খসে পড়েছে

কারণটাও কারো জানতে বাকি নেই। আওয়ামী লীগের গদির দাবি কতগুলো মিথ্যার ওপর স্থাপিত একটা তাসের ঘর ছাড়া আর কিছু নয়। এতোকাল জেনে-শুনেও অনেকে মুখ বন্ধ করে থেকেছেন। তারা স্বাধীনতার আন্দোলনের নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানকে সম্মান দিতে চেয়েছেন। ভেবেছেন বর্তমান রাজনীতির উত্তেজনা থিতিয়ে গেলে মুজিবের ভাবমূর্তিকে আবার মর্যাদার আসনে স্থাপন করা যাবে। কিন্তু 'সুখে থাকতে ভূতে কিলায়'। দিন-রাত শেখ হাসিনা এবং তার অনুকরণে আওয়ামী লীগের ছোট-বড়ো-পাতি নেতারা শহীদ জিয়া ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে চলেছেন। তারা আশা করছেন জিয়া পরিবারকে ঠেলে নিচে নামানো গেলে শেখ পরিবারের মাথা উঁচু দেখা যাবে। তারা বুঝতে পারছেন না যে ঢিল ছুঁড়লে পাটকেলটি খেতে হয়। আসল সত্যটি বেরিয়ে গেলে পরিণতি হবে তাদের আশার সম্পূর্ণ বিপরীত। সেটাই ঘটছে এখন। তারেক রহমান আর চুপ করে থাকা বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করছেন না। তিনি সত্য উদঘাটন করতে শুরু করেছেন। আওয়ামী লীগে এবং তাদের অবৈধ সরকারের আঁতে এখন মারাত্মক ঘা লেগেছে। মন্ত্রীদের চাপাবাজি সেজন্যে।

গায়ের জোরে আওয়ামী লীগ দাবি করছিলো যে জিয়াউর রহমান নন, মুজিবই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। অনেকেই সে দাবি বিশ্বাস করেননি। অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে তারেক সে দাবিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। তার জের ধরে ওয়াকেফহালরাও এখন মুখ খুলছেন। প্রয়াত তাজউদ্দীন আহমদের কন্যা শারমীন আহমদ তার তথ্যবহুল বইতে লিখেছেন যে একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে তাজউদ্দীন আহমদ স্বাধীনতার ঘোষণার খসড়া লিখে এবং সে ঘোষণা বাণীবদ্ধ করার জন্যে টেপ রেকর্ডার নিয়ে মুজিবের বাড়িতে গিয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানীরা বিরক্ত হবে, ভবিষ্যতে সে রেকর্ডিং তার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে অজুহাত দেখিয়ে মুজিব সে ঘোষণা রেকর্ড

করতে অস্বীকার করেছিলেন। তাজউদ্দীন আরো বলেছিলেন যে মেজর জিয়ার কণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা শুনে তিনি অনুপ্রাণিত বোধ করেছিলেন। শারমীন আহমদের বইয়ের জের ধরে মুজিবের আমলের সেনাপ্রধান জেনারেল সফিউল্লাহও এখন বলেছেন যে জিয়াউর রহমানই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং সে ঘাষণায় তিনি নিজেকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বলেও উল্লেখ করেছিলেন। অথচ তারেক রহমান সম্প্রতি ঠিক এ কথাগুলোই বলেছিলেন বলে তার বিরুদ্ধে বিষোদ্গারের তোপ দাগা শুরু হয়। কিন্তু তাতে আর কোন লাভ হবে না। একে-দুয়ে তথ্যাভিজ্ঞরা যখন মুখ খুলতে শুরু করেছেন তখন আরো মুখ খুলে যাবে এবং থলে থেকে আরো বিড়াল বেরিয়ে আসবে।

জিয়ার শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে লন্ডনের এক সভায় তারেক আরো কিছু তথ্য তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন যে শেখ মুজিবের সাড়ে তিন বছরের শাসন ছিলো ব্যর্থ শাসন। সে কথা সারা দুনিয়ার মানুষ দেখেছে, শুনেছে। বহু সাংবাদিক ও ভাষ্যকার লিখেছেন এবং ঢাকার যে কোন চায়ের দোকানে অজস্রবার আলোচিত হয়েছে, দুর্নীতি অশাসন-কুশাসনে যখন বাংলাদেশ তলিয়ে যাচ্ছিলো তখন স্রোতের মতো স্তাবক ও চাটুকার এসেছে পুরাতন গণভবনে। তারা তাকে ফুলের মালা দিয়েছে, স্তব-স্তুতি আর কবিতা শুনিয়েছে। আমি নিজেও বিবিসি থেকে সে সময়কার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সঙ্কটের আর কলাপাতায় জড়িয়ে লাশ কাফনের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ প্রচার করেছি। সেসবের কিছু কিছু আমার 'ইতিহাস কথা কয় ও নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ' বইতে (প্রকাশক শিকড়, বাংলাবাজার, ঢাকা) সঙ্কলিত হয়েছে। চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষে যে ৭০ হাজার মানুষ মারা গিয়েছিলো সেটা কোন কল্পকথা নয়, সৌভাগ্যবশত বহু প্রত্যক্ষদর্শী আজো জীবিত আছেন।

বোবা আক্রোশ এবং হনুমানের ল্যাজে আগুন

তারেক রহমান লন্ডনের সে সভায় বাংলাদেশ সংসদের কার্যবিবরণীর নথি থেকে ১৯৭৩ সালের ৬ জুলাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি থেকে একটা উদ্ধৃতি দেন। সে বিবৃতিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, "১৯৭২ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৭৩ সালের জুন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দেশে দুহাজার ৩৫টি গুপ্ত হত্যার ঘটনা ঘটেছে; দুষ্কৃতকারীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন চার হাজার ৯২৫ জন।" তারেকের এ উক্তি যে মিথ্যা ছিলো না সেটা প্রমাণ করা মোটেই কঠিন নয়। তারেক রহমান এর পরে বলেছেন, মুজিব-কন্যা শেখ হাসিনার শাসনামলেও একইভাবে গুম-খুন-অপহরণ অব্যাহত রয়েছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ এবং সন্ত্রাস যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। তার এ উক্তিগুলোর সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে

কোন দলিল-দস্তাবেজের প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশের প্রতিটি নর-নারী-শিশুর চোখের সামনে এখন কিস্তি-বন্দী গণহত্যা চলছে। প্রতিদিনই মিডিয়ায় হত্যা ও সহিংসতার খবর প্রকাশিত হচ্ছে। নারায়ণগঞ্জের, ফেনীর, লক্ষ্মীপুরের হত্যাকাণ্ড প্রমাণ করে দিচ্ছে যে সরকারের পুলিশ-র‍্যাব কন্ট্রাক্ট কিলিং চালাচ্ছে।

এমনিতেই তারেকের ওপর সরকার ও মন্ত্রীরা ক্রুদ্ধ। ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাকে দিল্লি সফরের আমন্ত্রণ জানিয়ে মন্ত্রীদের ক্রোধের মাত্রা অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। তারেক রহমান তথ্য-ভিত্তিক কথা বলছেন। প্রকৃত তথ্য বাংলাদেশের বর্তমান কোন মন্ত্রী জানেন বলে আমার মনে হয় না। সেজন্যেই তারেকের কথার প্রতিবাদ করার হিম্মৎ তাদের নেই। বিপদ হয়েছে সেখানেই। বোবা আর তোৎলা কথা বলার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। সে ব্যর্থতা তাকে ক্রোধে অস্থির করে তোলে; সে কান্নায় ফেটে পড়ে। তারেক রহমানের সমালোচনাগুলো মিথ্যা প্রমাণ করতে পারলে মন্ত্রীরা কিছু স্বস্তি পেতেন, তাদের গৃহপালিত মিডিয়া প্রচুর লাফালাফি করতে পারতো। সেটা তারা পারছেন না। তারেকের সমালোচনায় সেজন্যেই তাদের ল্যাজে আগুন ধরে। তবে মনে রাখতে হবে ল্যাজের আগুন বিপজ্জনক হতে পারে। রামায়ণের কাহিনীতে হনুমানের ল্যাজের আগুনে লঙ্কাদ্বীপ জ্বলেপুড়ে গিয়েছিলো। সরকারের মন্ত্রীদের হাব-ভাবে মনে হয় বিনা বাধায় চুরি-ডাকাতি আর গণহত্যা চালাতে না পারলে ল্যাজের আগুনে দেশটাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিতেও তাদের আপত্তি নেই।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিগত কয়েকদিনে এমন কিছু কথাবার্তা উঠেছে যাতে রাজনীতির তাপমাত্রা আরো বেড়ে যেতে বাধ্য। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সেজন্যে অনেকখানি দায়ী। রাজনীতিতে এখন জন্ম-বৃত্তান্তের কথা উঠেছে। এ বৃত্তান্ত নিয়ে বেশি টানাটানি করা হলে আরো কোন কোন জন্মের অপ্রীতিকর বৃত্তান্ত বেরিয়ে আসতে পারে। জিয়াউর রহমান বেঁচে থাকলে প্রধানমন্ত্রী নাকি তার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনতেন। কিন্তু জিয়ার ঘাতক ও ষড়যন্ত্রকারীদের পরিচয় প্রকাশ পেলে আরো অভিযোগ উঠবে ভবিষ্যতে। অভিযোগ আরো আগের ঘটনাবলী নিয়েও উঠতে পারে। সুতরাং 'সাধু সাবধান।'

(লন্ডন, ০৩.০৬.১৪)

গণতন্ত্রের যারা শত্রু আর যারা মিত্র তাদের চিনে রাখুন

গণতন্ত্র কাজ করে দলীয় পদ্ধতিতে। রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের কর্মসূচি জনসাধারণকে জানাবে, নির্বাচনে নিজ নিজ প্রতিনিধি দাঁড় করাবে। দলীয় কর্মসূচি এবং প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব বিবেচনা করে ভোটাররা ভোট দেবেন। কিন্তু নির্বাচন হয়ে গেলে বিজয়ী প্রার্থী আর নিজ দলের স্বার্থের প্রতিভূ থাকবেন না। তিনি সংসদে তার গোটা নির্বাচনী এলাকার স্বার্থে কাজ করবেন। এ হচ্ছে গণতন্ত্রের সংস্কৃতি। গণতন্ত্রের প্রসূতি সদন বৃটেনে বাস করছি ৫৪ বছর ধরে। লন্ডন আবার বিশ্বের মিডিয়া ক্যাপিটাল বলেও বিবেচিত। অর্থাৎ বহু দেশেই গণতন্ত্রের কার্যপ্রণালী এবং তাদের সাফল্যের চাবিকাঠি অনুধাবনের সুযোগ পেয়েছি। তার থেকে গণতন্ত্রের এ নির্যাসটাই বুঝতে পেরেছি।

গণতন্ত্রের জন্যে বাংলাদেশের মানুষ বহু রাজনৈতিক আন্দোলন এবং শেষত মুক্তিযুদ্ধ করেছে। দুর্ভাগ্যবশত যতোই দিন যাচ্ছে গণতন্ত্র এদেশের মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে। কোন কোন দল ও নেতা এ ব্যর্থতার সব দায়িত্ব সেনাশাসনের ওপর চাপিয়ে দায়মুক্ত হবার চেষ্টা করেন। সত্যি বটে যে সেনাশাসিত স্বৈরতন্ত্র গণতন্ত্রের গুরুতর ক্ষতিকারক। বলতে গেলে জাতশত্রু। উচ্চাভিলাষী স্বৈরতন্ত্রী (সামরিক এবং বেসামরিক) প্রথমেই গণতন্ত্রের মূলোৎ-পাটনে ব্রতী হন। গণতন্ত্রকে তাদের দারুণ ভয়। গণতন্ত্র প্রাণবন্ত হলে স্বৈরতন্ত্র শেকড় গাড়তে পারে না। অবিভক্ত পাকিস্তানে সামরিক স্বৈরতন্ত্র আর বাংলাদেশে জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসনামলে সেটা আমরা পরিষ্কার দেখেছি।

বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতারা বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ব্যর্থতার সকল দায়দায়িত্ব জেনারেল জিয়াউর রহমানের ওপর চাপিয়ে দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে, নিজের দোষ পরের কাঁধে চাপানোর ব্যর্থ চেষ্টায় সংশ্লিষ্টরা প্রায়ই আগ্রাসী হয়ে ওঠেন। জিয়াউর রহমানের ভূমিকা কি ছিলো? দেশে যখন চরম নৈরাজ্য আর হানাহানি চলছিলো তখন গৃহবন্দী দশা থেকে সাধারণ সৈনিকরা তাকে মুক্ত করে ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রশ্ন হলো এই নৈরাজ্য আর হানাহানি শুরু হয়েছিলো কি কারণে? আগেই বলেছি বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্রের জন্যে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলো। সে গণতন্ত্রকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিলো বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে।

কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি গণতন্ত্র-গণতন্ত্র করে নেতৃত্ব পেয়েছিলেন, তিনি আজীবন রাষ্ট্রপতি হবার আশায়

গণতন্ত্রকে হত্যা করে বাকশাল চালু করেছিলেন খেয়ালখুশিমতো সংবিধানকে পরিবর্তন করে। দেশ অসন্তোষের অনলে টগবগ করে ফুটছিলো। তার ওপর যুক্ত হলো শেখ পরিবারের কোন কোন সদস্যের সঙ্গে সেনাবাহিনীর মধ্যম স্তরের কোন কোন অফিসারের ব্যক্তিগত বিরোধ। মধ্যম স্তরের কয়েকজন সেনা অফিসার বিদ্রোহ করে মুজিব ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে হত্যা করে। এ রক্তঝরা অভ্যুত্থান তারা করলেও দেশের মানুষ তাতে অখুশি হয়নি। শেখ হাসিনা নিজেই বলেছেন তার নিহত পরিবারের জন্যে কেউ চোখের পানি ফেলেনি বলে প্রতিশোধ নিতেই তিনি রাজনীতিতে এসেছেন। সেনা অফিসাররা খোন্দকার মুশতাকের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে দেয়। এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে দেশে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার আশায় মুজিবের সরকারের আটজন আওয়ামী লীগ মন্ত্রী মুশতাকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার গঠন করেন। মুশতাক নিজেও প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই আওয়ামী লীগের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। সুতরাং তার সরকার প্রকৃতই একটা আওয়ামী লীগ সরকার ছিলো।

বিদেশী স্বার্থে স্থিতিশীলতা বিনষ্ট

কিন্তু বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা দেশে ও বিদেশে কিছু লোকের সহ্য হয়নি। তারা আবার জেনারেল খালেদ মোশারফকে দিয়ে আরেকটা অভ্যুত্থান ঘটায়। খালেদ মোশাররফ তার পথের কাঁটা সেনা অফিসারদের হত্যা করেন এবং জেনারেল জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী করেন। শেখ মুজিব তার ক্ষমতা নিরাপদ করার লক্ষ্যে সকল বেসরকারি পত্রপত্রিকা বন্ধ এবং আওয়ামী লীগসহ সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। আজীবন স্বৈরতন্ত্রী হবার কোন লোভ জিয়াউর রহমানের ছিলো না। তিনি অবিলম্বে পত্রপত্রিকার ও বাক স্বাধীনতার ওপর থেকে সকল বিধিনিষেধ তুলে নেন, আওয়ামী লীগসহ সব রাজনৈতিক দলকে আবার বৈধ ঘোষণা করেন এবং নতুন দল গঠনের পথও প্রশস্ত করে দেন। শুধু তাই নয়, আওয়ামী লীগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. কামাল হোসেন আর সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাককে দিল্লি পাঠিয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে দেশে ফিরিয়ে আনেন।

হাসিনার দেশে ফেরার ১৩ দিনের মাথায় দেশী-বিদেশী সামরিক চক্রান্তে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করা হয়। সে রাতে শেখ হাসিনা বোরকা পরে কসবা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে পালিয়ে যাবার চেষ্টার সময় ধরা পড়েন। স্মরণীয় যে আরো পরে জেনারেল খালেদ মোশাররফও ভারতে পালিয়ে যাবার সময় সিপাহীদের হাতে ধরা পড়েন ও নিহত হন। জিয়া হত্যার পর ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তার সংবিধান অনুযায়ী ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হন এবং সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ডাকেন। ড. কামাল হোসেন সে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সাত্তারের

প্রশাসনের ছয় মাস পড়তেই সেনাপ্রধান লে.জে. এরশাদ সামরিক অভ্যুত্থান করে গদি দখল করেন। আওয়ামী লীগের নেত্রী শেখ হাসিনার গণতন্ত্রপ্রীতি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলো। সামরিক স্বৈরতন্ত্রের বিরোধীতার পরিবর্তে তিনি ঘোষণা করেন যে এরশাদের অভ্যুত্থানে তিনি 'অখুশি হননি'। আওয়ামী লীগের পত্রিকা বাংলার বাণী সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এরশাদের সামরিক সরকারের 'সাফল্যের জন্যে মোনাজাত' করেছিলো।

অন্যদিকে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া গোড়া থেকেই এরশাদের সামরিক স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম শুরু করেন। তা সত্ত্বেও সামরিক স্বৈরতন্ত্র নয় বছর স্থায়ী হতে পেরেছিলো মূলত শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের সমর্থনে। সবগুলো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মতৈক্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে শেষ মুহূর্তে আওয়ামী লীগ ১৯৮৬ সালের ৬ মে তারিখের ভোটারবিহীন নির্বাচনে অংশ নেয় এবং অনেক ধানাইপানাই করে হলেও তেলেসমাতির সংসদে যোগ দেয়। দেশবাসী এবং ছাত্রসমাজের চাপে হাসিনা মাঝেমধ্যে খালেদার নেতৃত্বে গণতন্ত্রের আন্দোলনে মৌখিক সমর্থন ঘোষণা করলেও কার্যত তার সমর্থনের কারণেই সামরিক স্বৈরতন্ত্র এতো দীর্ঘস্থায়ী হতে পেরেছিলো।

সামরিক স্বৈরতন্ত্র কারা আনে?

বাংলাদেশে এ যাবৎ সর্বশেষ সামরিক স্বৈরতন্ত্র এসেছিলো ২০০৭ সালে, যদিও বর্ণচোরাভাবে। সংবিধান মেনে চলতে শেখ হাসিনার আপত্তির জের ধরেই সে ট্র্যাজেডি ঘটে। হাসিনা নিজেই ২০০৭ সালের ১৫ এপ্রিল বিদেশে যাবার সময় বিমানবন্দরে গর্ব করে সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে ফখরুদ্দীন-মইন উ আহমেদের সরকার তার 'আন্দোলনেরই ফসল'। তিনি আরো বলেছিলেন যে ক্ষমতা পেলে সে সরকারের সকল কাজকর্ম তিনি বৈধ করে দেবেন। বর্তমানে একটি অবৈধ ও অনির্বাচিত সরকারের প্রধান হিসেবে শেখ হাসিনার সরকারও একটা বেসামরিক স্বৈরতন্ত্র মাত্র।

এ দৃষ্টান্তগুলোতেই পরিষ্কার হয়ে যাবে যে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশের সব সামরিক ও বেসামরিক স্বৈরতন্ত্রের জন্যেই দায়ী আওয়ামী লীগ। এ দলটির চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী তারা নিজেদের কৃত অন্যায়ের দায়িত্ব বিএনপি ও জিয়া পরিবারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বকধার্মিক হতে চায়। সে সঙ্গে অনৈতিকভাবে রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ও তাদের উদ্দেশ্য।

শেখ হাসিনা দ্বিতীয় দফা প্রধানমন্ত্রী হন ভারতের নেতৃত্বে একটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ফলে। গোড়া থেকেই তারা প্রমাণ দিয়েছেন যে গোটা দেশের প্রয়াজনে কিংবা কল্যাণের জন্যে শাসনের কোন ইচ্ছা তাদের নেই। তারা শুধু আওয়ামী লীগের স্বার্থেই শাসনের নামে শোষণ চালাতে চান। এ কারণেই দুর্নীতি পরায়ণদের রক্ষা করতে গিয়ে দেশের অর্থনীতির সর্বনাশ করা হয়েছে,

পদ্মা সেতু নির্মাণ কয়েক বছর পিছিয়ে গেছে। এ-বিচার সে-বিচারের নামে প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের বিষ-বাষ্প ছড়িয়ে দিয়ে ঘরে ঘরে, পরিবারে পরিবারে হানাহানি সৃষ্টি করা হয়েছে। সরকারের আচরণে মনে হতে বাধ্য যে জাতীয় ঐক্য অসম্ভব করে তোলাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। সরকারের সে দলীয় চরিত্রও এখন আর অবশিষ্ট নেই। তারা আরো ক্ষুদ্র একটা গোষ্ঠীতন্ত্রে পরিণত হয়েছে এবং তাদের গদি আঁকড়ে রাখার মূলে আছে একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর সন্ত্রাসতন্ত্র। দিনকয় আগে সংসদে শেখ হাসিনার একটা বিবৃতিতে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে এই শোষণতন্ত্র ও সন্ত্রাসতন্ত্রের সর্বনাশা পথ থেকে সরে আসার কোন ইচ্ছা সরকারের নেই।

সংরক্ষণ শুধু গডফাদারদেরই জন্যে

সংসদের আলোচ্য বিবৃতিতে শেখ হাসিনা নারায়ণগঞ্জের শামীম ওসমানের পরিবারের দেখাশোনার ও সে পরিবারকে রক্ষা করার নিঃশর্ত প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছেন। শামীম ওসমানের বিরুদ্ধে সারা দেশের মানুষের অজস্র অভিযোগ শেখ হাসিনার প্রথম সরকারের আমলে ছিলো এবং বর্তমান সরকারের আমলেও আছে। নারায়ণগঞ্জে সাম্প্রতিক সাত খুনের মামলা প্রসঙ্গেও তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশিত হয়েছে। তার আগেও ত্বকী হত্যার ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যক্ষ। হাসিনার জন্যে শামীম ওসমান ও ওসমান পরিবারের ব্যক্তিগত সেবা ও আনুগত্যের কথা অনস্বীকার্য। স্বভাবতই তিনি ব্যক্তিগতভাবে শামীম ও তার পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করতে পারেন। সংসদে আলোচ্য বিবৃতি দেবার সময় শেখ হাসিনা ভুলে গিয়েছিলেন যে তিনি শুধু ব্যক্তিমাত্রই নন, যে কোন প্রকারেই হোক তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী। দেশের সকল মানুষের প্রতি তার কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে– যদিও সে দায়িত্ব পালনের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ওসমান পরিবারের প্রতি সুবিচার যদি প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য হতো তাহলে তার উচিত ছিলো শামীম ওসমানের বিরুদ্ধে নথিভুক্ত এবং অনথিভুক্ত অভিযোগগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রমাণ করা যে শামীম প্রকৃতই নির্দোষ।

কিন্তু শেখ হাসিনা সুবিচার ও ন্যায়বিচারে বিশ্বাস করেন তা তার পরম শত্রুতেও বলবে না। শামীম ওসমানও সেটা জানেন। সাত খুনের ব্যাপারে যখন ঘন ঘন তার নাম উচ্চারিত এবং তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশিত হচ্ছিলো তখন তিনি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন যে শেখ হাসিনা তাকে রক্ষা করবেন। প্রকৃতই তার দু-একদিনের মাথাতেই খবর পাওয়া গেল যে শামীম ওসমানের নিরাপত্তার জন্যে তাকে পুলিশ সংরক্ষণ দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারছে না। গোটা ব্যাপারটাই তাদের পরিহাস মনে হচ্ছে। তাদের চোখের সামনে দেশজোড়া অপহরণ, গুম ও খুন ঘটছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাণ হারাচ্ছে নিরীহ মানুষ এবং সেসব হত্যার জন্যে দায়ী ছাত্রলীগ, যুবলীগ, আওয়ামী লীগের ক্যাডার এবং র‍্যাব ও পুলিশ। এসব নিরীহ

সাধারণ মানুষকে সংরক্ষণ দেবার কথা শেখ হাসিনা কখনো ভেবেছেন বলে মনে হয় না।

শেখ হাসিনা প্রায়ই অভিযোগ করেন তিনি ও তার বোন যখন দিল্লিতে ভারতের আশ্রয়ে ছিলেন তখন কেউই তাদের খোঁজ নেয়নি, তাদের দেখতেও যায়নি। কিন্তু তার প্রয়াত স্বামী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পারমাণবিক বিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ মিয়াও তখন দিল্লিতে তার সঙ্গে ছিলেন। তার সে সময়কার রোজনামচা পড়লেই দেখা যাবে হাসিনার সে অভিমানসঞ্জাত উক্তিগুলো পুরোপুরি সত্যি নয়। যাক, সংসদের বিবৃতিতে শেখ হাসিনা বলেছেন, "১৯৭৫ সালে জাতির পিতাকে হত্যার পর আমরা যখন অসহায় অবস্থায়, আমরা যখন ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় নিই, '৭৮ সালে জেল থেকে মুক্ত হয়ে জোহা কাকা (শামীম ওসমানের পিতা শামসুজ্জোহা) দিল্লি গিয়েছিলেন। অল্প যে কয়জন আমাদের খবর নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে জোহা কাকা একজন।"

আওয়ামী লীগের ইতিহাসও বিকৃত

শেখ হাসিনার কৃতজ্ঞতার পালা এখনেই শেষ হয়নি। সংসদকে তিনি আরো বলেছিলেন, "আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা হয়েছে ওসমান পরিবারে। জোহা কাকা রাজনীতির নীতি-আদর্শ মেনে চলতেন। এই পরিবারের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক সব সময় ছিলো। যদি তাদের প্রয়োজন হয় দেখাশোনা করবো।"

শেখ হাসিনা কোন্ আওয়ামী লীগের কথা বলেছেন বুঝতে পারি না। আমরা যারা আওয়ামী লীগের জন্মবৃত্তান্ত জানি তারা অবশ্যই ভুলে যাইনি যে আওয়ামী মুসলিম লীগের মূল প্রতিষ্ঠাতা চাষাড়ার শামসুজ্জোহা ছিলেন না, ছিলেন মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। তার উদ্যোগে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন (পলাশী দিবস) ঢাকার প্রাক্তন মেয়র এবং পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রয় প্রতিষ্ঠান প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী কাজী মোহাম্মদ বশিরের সিদ্ধেশ্বরীস্থ বাসভবন রোজ গার্ডেনে এক সভায় আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়।

সে সভায় মওলানা ভাসানীকে সভাপতি, আইনজীবী আতাউর রহমান খানকে ভাইস প্রেসিডেন্ট, শামসুল হককে সেক্রেটারি এবং খোন্দকার মুশতাক আহমেদ ও শেখ মুজিবুর রহমানকে যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক করে আওয়ামী মুসলিম লীগের কমিটি গঠন করা হয়। কোন শামসুজ্জোহা সে সভায় উপস্থিত ছিলেন বলেও সে সময় শুনিনি। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও সভাপতি পদে আওয়ামী লীগে যোগ দেন তার প্রায় দুবছর পরে। দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাসের মতো আওয়ামী লীগের ইতিহাসকেও শেখ হাসিনা সময় ও সুযোগমতো সুবিধাজনকভাবে পরিবর্তিত করে বয়ান করেন।

শামীম ওসমানের মতো শেখ হাসিনার সরকারের মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়াও প্রধানমন্ত্রীর স্নেহধন্য এবং আশ্রয়পুষ্ট মনে হচ্ছে। তিনিও গর্বভরে

দাবি করেছেন, "আমাকে নামানোর ক্ষমতা কারো নাই।" উল্লেখ্য যে নারায়ণগঞ্জের সাত খুনের মামলার প্রধান ঘাতক বলে অভিযুক্ত হয়েছেন মায়ার জামাই র‍্যাব-এগারোর কমান্ডার লে. কর্নেল তারেক সাঈদ। আরো বাহ্যিক প্রমাণ পাওয়া গেছে যে প্রধান অভিযুক্ত নূর হোসেন ও তারেকের মধ্যে দরকষাকষি ও টাকার লেনদেনের কাজটা করেছিলেন মায়ার পুত্র। নারায়ণগঞ্জ হত্যার পরে দেশজোড়া মন্ত্রিসভা থেকে তার বহিষ্কারের ব্যাপক দাবি উঠেছে। শেখ হাসিনার প্রথম সরকারের আমলে মায়ার বিরুদ্ধেও হত্যাসহ নানা দুষ্কৃতির অভিযোগ উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

এরা সেই চার গডফাদার

শামীম ওসমানের মতো মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, ফেনীর জয়নাল হাজারি এবং লক্ষ্মীপুরের আবু তাহের হাসিনার প্রথম সরকারের আমল থেকেই গডফাদার বলে বর্ণিত। সে সময়কার বহু হত্যা ও দুষ্কৃতির ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো। পত্রিকা পাঠকদের অবশ্যই মনে থাকার কথা সংবাদ সম্মেলনে এই চার গডফাদারের বিরুদ্ধে অভিযোগের উল্লেখ করায় প্রথম দফার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের ওপর রীতিমতো ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। সম্প্রতি ফেনীর ফুলগাজীতে একজন আওয়ামী লীগ নেতা ও উপজেলা চেয়ারম্যানের হত্যা প্রসঙ্গেও নিজাম হাজারির সঙ্গে সঙ্গে জয়নাল হাজারিরও নাম উঠেছে। বিগত সাড়ে পাঁচ বছরে লক্ষ্মীপুরে অনেকগুলো হত্যার ব্যাপারে আবু তাহেরের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অভিযোগ করা হয়েছে।

এই গডফাদারদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত আনুগত্য ও নির্ভরশীলতার কারণ কি? অনেকেই আমাকে বলেছেন এই গডফাদাররা হাসিনার গদি দখল করে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় পেশীশক্তির জোগান দেন। প্রয়োজনবোধে তাদের 'সাত খুন' মাফ করে দেয়া এবং তাদের সংরক্ষণ দেয়াকে প্রধানমন্ত্রী প্রয়োজনের তাগিদ মনে করেন। প্রধানমন্ত্রী নিজে বলেছেন কিনা জানি না, কিন্তু তার পুত্র জয় গর্ব করে বলেছেন যে তার মাতার ব্যক্তিগত দেহরক্ষীরা এতোই নির্ভরযোগ্য যে শেখ হাসিনা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

এ প্রস্তাবনা বোধ হয় কারোই অজানা নয় যে শেখ হাসিনার দেহরক্ষীরা আসলে ভারতীয়। কিন্তু সেটা কি এতোই নির্ভরযোগ্য যে শেখ হাসিনা তাদের ওপর নির্ভর করে থাকতে পারবেন? হিটলার-মুসোলিনী, এমনকি পাকিস্তানের ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খানেরও পেশীশক্তি কিংবা নির্ভরযোগ্য দেহরক্ষীর অভাব ছিলো না। আরো মনে রাখা প্রয়োজন যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দেহরক্ষীরাও ছিলো ভারতীয়।

(লন্ডন, ১০.০৬.১৪)

সুষমা স্বরাজের সফর ও অন্ধের হাতি দেখা

তিনি এলেন, তিনি দেখলেন এবং তিনি স্বদেশে ফিরে গেলেন। উচিত ছিলো সকলে সুস্থ মস্তিষ্কে এই যাত্রার মূল্যায়ন করবে, তার থেকে উপকৃত হবে। কিন্তু সুস্থ মস্তিষ্ক আপনাকে খুঁজতে হবে অন্যত্র, বাংলাদেশে যারা গডফাদারতন্ত্রের জোরে অবৈধভাবে গদি দখল করে আছে তাদের মধ্যে নয়।

ভারতে নতুন নির্বাচন হয়েছে, নতুন সরকার ক্ষমতা পেয়েছে। সুষমা স্বরাজ সে সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বাংলাদেশ আর ভারতের সুসম্পর্ক উভয় দেশের জন্যেই সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে যে সরকার দিল্লিতে ক্ষমতায় ছিলো তারা বাংলাদেশকে চিনতে পারেনি, চিনতে চায়নি। যে কোন প্রকারে হোক শেখ হাসিনাকে গদিতে রাখা এবং বিনিময়ে গোয়ালের গোরুর দুধ দোহনের মতো করে তার কাছ থেকে ইচ্ছে মতো সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেওয়া ছিলো মনমোহন সিং সরকারের বাংলাদেশ নীতি। সে নীতির বিষময় ফল সারা বিশ্ব দেখেছে কিন্তু মনমোহন সরকার দেখেনি। একটা অনির্বাচিত, অবৈধ এবং স্বৈরতন্ত্রী সরকারকে গায়ের জোরে গদিতে টিকিয়ে রেখে দিল্লির সরকার গণতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে অপ্রীতির সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে। মনমোহন সরকারের ভুল-ভ্রান্তির দায়-দায়িত্ব নরেন্দ্র মোদির সরকারের জন্যে বাধ্যতামূলক নয়। তারা ইউরোপ-আমেরিকার সঙ্গে সুসম্পর্ক ফিরে পেতে চায়। সুতরাং বিচিত্র নয় যে মোদি সরকার বাংলাদেশ নীতি সম্বন্ধেও নতুন করে ভেবেচিন্তে দেখতে চাইবে। সে কারণেই সুষমা স্বরাজের সফর স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত ছিলো।

আওয়ামী লীগ সরকার দিল্লিকে অনেক কিছু দিয়েছে। ঐতিহ্যবাহী বিডিআর বাহিনী দেশের সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী ছিলো। মুক্তিযুদ্ধে তারাই প্রথম অস্ত্র হাতে হানাদার বাহিনীর আগ্রাসনের মোকাবেলা করেছে। স্বাধীন বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের কোন অনুপ্রবেশ অথবা ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশের জমি দখল বিডিআর সহ্য করেনি। বিডিআর যতোদিন বজায় ছিলো অবলীলায় সীমান্তে ফেলানীদের মতো বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যার ঘটনাও ঘটতে পারেনি। ভারতীয় ফেনসিডিল আর ইয়াবা বড়িতে বাংলাদেশের বাজার সয়লাব হয়ে যেতে পারতো না।

কিন্তু মনমোহন সিং সরকারের পোষ্য আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সালে গদি পাবার দেড় মাসের মাথায় দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র করে বিডিআর বাহিনী ভেঙে দেয়া হলো, তাদের ৫৭ জন সিনিয়র অফিসারের হত্যা রোধ করার জন্যে বাংলাদেশের জাতীয় সেনাবাহিনীকে হস্তক্ষেপ করতে বাধা দিয়েছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কয়েকশো বিডিআর সিপাহী বিচারাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। আরো হাজার হাজার বিডিআর কর্মীকে কঠোর দণ্ড দেয়া হয়েছে, কিন্তু যে কারণে এবং যেসব ষড়যন্ত্রে বিডিআর বিদ্রোহ হলো সে সম্বন্ধে গুরুত্ব দিয়ে কোন তদন্তই হলো না। এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্যে প্রকৃতই কে বা কারা দায়ী ছিলো বাংলাদেশের মানুষ জানতে পারলো না।

বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ভারতকে উত্তর-পুবের সাত রাজ্যের স্বাধীনতার যুদ্ধ দমনের উদ্দেশ্যে এবং ভবিষ্যতে চীনের সঙ্গে যুদ্ধ হলে সমরাস্ত্র ও সৈন্য পাঠানোর পথ হিসেবে সড়ক রেল ও নদী পথে করিডোর দিয়ে দিয়েছে বর্তমান সরকার। দিতে তারা বাধ্য হয়েছে, নইলে দিল্লি তাদের গদিতে বহাল রাখতো না। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মশিউর রহমান তখনো বলেছিলেন এবং অতি সম্প্রতি আবারও বলেছেন যে করিডোর, ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্টের জন্যে কোন প্রকার মাশুল নেয়া বাংলাদেশের জন্যে অসভ্যতা হবে। উল্লেখ্য যে পৃথিবীর অন্য যে যে স্থানে এসব ধরনের ব্যবস্থা আছে সেখানেই এবং অনিবার্য ভাবেই মাশুল দেয়া-নেয়ার ব্যবস্থা আছে। শুল্ক না দিয়ে সুয়েজ খাল কিংবা পানামা খাল দিয়ে একখানি ডিঙি নৌকাও পার হতে পারে না। কিন্তু তাতে সভ্যতা উল্টে গেছে বলে শুনিনি।

‘এসওএস’ কি আর কোন কাজে লাগবে?

মইন-ফখরুদ্দীন বর্ণচোরা সামরিক সরকার বেগম খালেদা জিয়াকে কারাবন্দী করেছিলো। সে সঙ্গে লোক-দেখানোর মতো করে শেখ হাসিনাকে আটক করা হয়েছিলো। কিন্তু তখনও ভারতীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জীর কাছে ‘এসওএস’ পাঠিয়েছিলেন শেখ হাসিনা। প্রয়োজনে মনমোহন সিংয়ের সরকার সৈন্য পাঠিয়ে হলেও তাকে রক্ষা করবে, সে আশ্বাস ভারত সরকারের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন। সেটাও প্রমাণ করে যে বিগত ভারত সরকারের আমলে বাংলাদেশের ভেতরের কলকাঠিও ঘোরাতো দিল্লির সরকার। পাঁচ জানুয়ারির তামাশার নির্বাচন এবং পরবর্তী কালের কূটনৈতিক তৎপরতাই বাংলাদেশের ভেতরে ভারতের কদর্য হস্তক্ষেপের অকাট্য প্রমাণ দেয়।

খালেদা জিয়া নির্বাচনী বিজয়ে নরেন্দ্র মোদিকে অভিনন্দন পাঠিয়েছিলেন। তারেক রহমানও পাঠিয়েছিলেন অভিনন্দন। মি. মোদি তারেককে দিল্লি সফরের

আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ঈর্ষাতুর অশিক্ষিত নারীর মতো এই ব্যাপারগুলো সহ্য করা বাংলাদেশের অবৈধ সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। আসলে এ ব্যাপারটার মধ্যে বিগত সাড়ে পাঁচ বছর ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের সুন্দর একটা বর্ণনা পাওয়া যাবে। হাসিনার সরকারের মনোভাব এই ছিলো যে ভারত সরকার শুধুমাত্র তার এবং তার সরকারের সঙ্গেই বন্ধুত্ব রাখবে – অন্য কোন রাজনৈতিক দল কিংবা বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে নয়। গণতন্ত্রের বিবেচনা সেখানে মোটেই মুখ্য ছিলো না।

বিনিময়ে ভারতও আশা করেছে যে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারে শুধুমাত্র তার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা রাখবে, অন্য কারো সঙ্গে নয়। চীনের সঙ্গে সখ্য হাসিনা সরকার সে জন্যেই এড়িয়ে চলেছে। অতি সম্প্রতি হাসিনার বেইজিং সফরে পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিলো যে চীন সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্র বন্দরটি তৈরি করে দেবার চুক্তি করতে রাজি হয়েছে। সে প্রস্তাব বেইজিং সরকার আগেও দিয়েছিলো। কিন্তু গোড়ায় উৎসাহ দেখালেও শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার কি মনে করবে সে অজুহাত দেখিয়ে বাংলাদেশী পক্ষ বেইজিংয়েই পিঠটান দেয়। 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বের' পুরাতন ঘোষিত নীতিকে শেখ হাসিনা মনমোহন সিং সরকারের আশ্রয় ও সংরক্ষণের বিনিময়ে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিয়েছিলেন।

খালেদা কি বলবেন তাকে এতো ভয় কেন?

বাংলাদেশ সফরকালে সুষমা স্বরাজ যাতে খালেদা জিয়া কিংবা অন্য কোন সরকার-বিরোধী নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেন সেজন্যে সরকারের চেষ্টা-তদ্বিরের অন্ত ছিলো না। সরকার সত্যি সত্যি আশা করেছিলো যে মিজ স্বরাজ তাদের অনুরোধ ও চেষ্টা-তদ্বির অগ্রাহ্য করে অন্তত খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না। খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলামকে অনেকেই ফাজিল আর ফাৎরা বলে বর্ণনা করেন। তিনি তার উল্লাস চেপে রাখতে পারেননি। দাবি করেছিলেন যে সুষমা স্বরাজের বাংলাদেশ সফরে (বিএনপিকে এড়িয়ে) বিএনপির মুখে চুনকালি লেপিত হয়েছে। কিন্তু উল্লাসটা তিনি সময় হবার আগেই করে ফেলেছিলেন। সরকারের সকল তদ্বির উপেক্ষা করে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীর্ঘ ৪০ মিনিট ধরে খালেদা জিয়ার সঙ্গে আলাপ করেছেন, তার মধ্যে আবার ১২ মিনিট কোন উপদেষ্টা ছাড়াই, একান্তে। কামরুল ইসলামের গালে এখন শুধু চুনকালিই নয়, সে সঙ্গে কিছু গোবরও কি মাখামাখি হয়ে যায়নি?

প্রধানমন্ত্রী এবং তার সাঙ্গো-পাঙ্গরা এখন অন্য সুর ধরেছেন। তারা বলছেন খালেদা জিয়া সুষমা স্বরাজের কাছে নালিশ করেছেন, কান্নাকাটি করেছেন।

'আঙ্গুর ফল টক' আর কাকে বলে? ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যদি বাংলাদেশের প্রকৃত পরিস্থিতি জানতে চান (এবং সেটাই ছিলো তার উদ্দেশ্য) তাহলে তিন বারের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের ৯৫ শতাংশ মানুষের অবিসম্বাদিত প্রতিনিধি খালেদা জিয়া ছাড়া আর কার সঙ্গে কথা বলবেন তিনি? অবৈধভাবে গডফাদারতন্ত্রের জোরে গদি আঁকড়ে থাকা 'প্রধানমন্ত্রীর' সঙ্গে এককভাবে? আওয়ামী লীগের কোন কোন মহল এবং ভারতে তাদের গুণগ্রাহী আনন্দবাজার পত্রিকা মিন মিন শুরু করেছে এই বলে যে খালেদা জিয়ার সঙ্গে বৈঠক করে সুষমা স্বরাজ মহা অন্যায় করে ফেলেছেন, প্রটোকলের নাকি সর্বনাশ করেছেন তিনি। কিন্তু কোন প্রটোকল বলে শেখ হাসিনার বোন ব্রিটিশ নাগরিক শেখ রেহানা এবং ক্যানাডীয় নাগরিক কন্যা পুতুলের সঙ্গে সুষমা স্বরাজের বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিলো সে প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে কেউ এগিয়ে আসছেন না।

সুষমা স্বরাজ বাংলাদেশ সফর শেষ করে দিল্লিতে ফিরে গেছেন। দিল্লি এবং ঢাকা ছাড়াও পৃথিবীর আরো কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ রাজধানীতে এই সফর এবং পরবর্তী বিবর্তন ইত্যাদি নিয়ে প্রচুর জল্পনা-কল্পনা হবে। বাংলাদেশে এ সফরের বিভিন্ন মূল্যায়ন অন্ধের হাতি দেখার কাহিনী মনে পড়িয়ে দিতে বাধ্য। একদল অন্ধ হাতি দেখতে গিয়েছিলো। বিভিন্ন জন হাতির বিভিন্ন অঙ্গ ছুঁয়ে দেখেছে। তাদের হাতির বর্ণনাও ছিলো ভিন্ন ভিন্ন। যে কান ধরেছিলো সে বললো যে হাতি কুলার মতো। যে শুঁড় ধরেছিলো তার বর্ণনায় হাতি মোটা পাইপের মতো। একজন বলেছিলো যে হাতি থামের মতো। আর একজনের বর্ণনায় হাতি নাকি মোটা দড়ির মতো। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাম্প্রতিক সফর নিয়েও বাংলাদেশে ভিন্ন ভিন্ন এবং পরস্পর-বিরোধী বিশ্লেষণ দেয়া হচ্ছে।

কিছু উক্তি খুবই আশাব্যঞ্জক

গোপনে সুষমা শেখ হাসিনাকে কি বলে গেছেন আমাদের জানার কথা নয়। কিন্তু অবৈধ সরকার বাহ্যত জাহির করতে চাইছে যে দিল্লির নতুন সরকার তাদের সঙ্গে লেনলেন করবে বলে আশ্বাস দিয়ে গেছেন মিজ স্বরাজ। সরকারের দিক থেকে কৃত্রিম উল্লাসের অবধি নেই। তাদের পোষ্য মিডিয়া ঢাকঢোল পেটাচ্ছে সে নিয়ে। চুলচেরা বিচার করলে দেখা যাবে যে এ আশ্বাস রীতি রক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়। আধুনিক কালের অবস্থা এমনই যে এক দেশ অন্য দেশের সঙ্গে লেনদেন না করেই পারে না। অন্তত অধিকাংশ ক্ষেত্রে। সে জন্যেই রীতি হচ্ছে, যে সরকার গদিতে আছে অন্য দেশগুলো সে সরকারের সঙ্গেই লেনদেন করে।

গত ৫ জানুয়ারির তামাশার নির্বাচনকে বৃটেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন কিংবা জাপান কেউই বিশ্বাসযোগ্য কিংবা জনমতের প্রতিভূ বলে স্বীকার করেনি। কিন্তু বর্তমান অবৈধ সরকারের সঙ্গে লেনদেন করতে তারা বাধ্য হচ্ছে। তার অর্থ এই নয় যে এ সরকারকে তারা বৈধ কিংবা বন্ধু মনে করে। বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ওয়াশিংটনে ধরনা দিয়েও পোশাক রফতানির জিএসপি আদায় করে আনতে পারেননি। ব্যর্থ হয়ে উল্টো-পাল্টা কথাবার্তা বলছেন। এদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভারত থেকে প্রথমে আম আর পরে পান আমদানির লাভজনক ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে।

সুষমা স্বরাজ অন্য এমন কিছু কথা বলেছেন যা আমার আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। তিনি বলেছেন ভারতের নতুন সরকার 'বিশেষ কোন রাজনৈতিক দল কিংবা বিশেষ কোন দলের সরকারের প্রতি আনুকূল্য দেখানোর পরিবর্তে জাতিতে জাতিতে সুসম্পর্কের ওপর জোর দিতে চায়'। একটু খতিয়ে দেখলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে যে অতীতে, বিশেষ করে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারগুলোর আমলে, দিল্লি আওয়ামী লীগের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, শেখ পরিবারকে স্বজনের মতো যত্ন করেছে। তারা দেশে দেশে এবং জাতিতে জাতিতে সুসম্পর্কের পরিবর্তে কংগ্রেসে-আওয়ামী লীগেই সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। বাংলাদেশে আর কে কি ভাবছে সেটাকে তারা গ্রাহ্য করেনি। দিল্লির নতুন সরকার যদি এই অশুভ গোলক ধাঁধা ভঙ্গ করতে পারে তাহলে দু'দেশের এবং গোটা উপমহাদেশে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা হতে পারে।

খোন্দকার মুশতাক আহমাদের সরকার চেষ্টা করেও দিল্লির মন জয় করতে পারেনি– যদিও সেটাও ছিলো একটা আওয়ামী লীগ দলীয় সরকার। জিয়াউর রহমান শুধু স্বাধীনতার ঘোষক এবং প্রথম প্রেসিডেন্টই ছিলেন না, অবশ্যই তাকে গণতন্ত্র ও সংবাদের স্বাধীনতার পুনঃপ্রবর্তক বলতেই হবে। তার বন্ধুত্বের ডাকে দিল্লি সাড়া দেয়নি। নতুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সার্ক সম্বন্ধে উৎসাহী বলেই মনে হয়। এই সার্কের প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো রাষ্ট্রপতি জিয়ার উদ্যোগে। ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ছিলো তার উদ্দেশ্য। কিন্তু ভারত সরকার তখন থেকে সার্ককে সতীন পুত্রের মতোই দূরে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে।

ভারতীয় জুজুর ভয় কি আর নাই?

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরেকটা অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলেছেন এ প্রসঙ্গে। তিনি বলেছেন, 'বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় বাংলাদেশের জনগণই মেটাবে।' এ উক্তির তাৎপর্য খতিয়ে দেখা যাক। সুষমা স্বরাজ কার্যত বলে দিলেন যে দিল্লি

কোন সরকারকে বাংলাদেশের গদি থেকে সরিয়ে দেবে না। সরকার পরিবর্তন করতে হবে বাংলাদেশীদের। সেটা তারা আন্দোলন করেই হোক অথবা অন্য যে কোন প্রকারেই হোক। বস্তুত বৃটেন, আমেরিকা, জার্মানী প্রমুখ দেশগুলো বাংলাদেশে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি এবং ন্যক্কারজনক নির্বাচন সম্বন্ধে যেসব কথা বলেছে তার মধ্যেও এমন কোন আশ্বাস ছিলো না যে সরকার পরিবর্তনে তারা বাংলাদেশীদের সাহায্য করবে। বস্তুত কূটনৈতিক সমর্থনের ওপর অতিমাত্রিক নির্ভরশীলতা বিএনপির গণতন্ত্রের আন্দোলনে অনেক ক্ষতি করেছে। কিন্তু সুষমা স্বরাজ যে বললেন নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিষয় জনগণই মেটাবে তাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার প্রচ্ছন্ন আছে।

কংগ্রেস কোয়েলিশন সরকার প্রকাশ্যে এবং ইঙ্গিতে বলে এসেছে যে শেখ হাসিনাকে সকল প্রকার সংরক্ষণ দিয়ে আসবে, প্রয়োজনে সৈন্য পাঠিয়েও। আন্দোলন করে শেখ হাসিনার সরকারকে গদিচ্যুত করার ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপ ও সেনা পাঠানোর ভয়টা একটা বাস্তব বিষয় ছিলো। আন্দোলনে বাড়াবাড়ি হলে ভারত সৈন্য পাঠাবে, বহু মানুষ তারা হত্যা করবে – এসব বিবেচনায় ইচ্ছা থাকলেও অনেকে ভয়ে খালেদা জিয়ার আন্দোলনে যোগ দেননি। ২৯ ডিসেম্বরের কর্মসূচির দিনে বিএনপিরও কোন কোন নেতা যে ঘরের বাইরে বেরোননি, এই হচ্ছে তার কারণ। সুষমা স্বরাজ এখন এই আশ্বাস দিয়ে গেলেন যে কোন দলকে, এমনকি শেখ হাসিনার দলকেও গদিতে বহাল রাখার কিংবা গদি থেকে বিতাড়িত করার ব্যাপারে দিল্লির নতুন সরকার কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না।

(লন্ডন, ০১.০৭.১৪)

সরকারের ভুয়া প্রতিশ্রুতি এবং বিএনপির দুর্বল আন্দোলন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সর্বশেষ প্রতিশ্রুতি :

পদ্মা সেতুকে ঘিরে হংকংয়ের মতো নগরী তৈরি হবে (যে হংকং প্রায় তিনশো বছর ধরে গড়ে উঠেছে), ২০১৯ সালের মধ্যে ঢাকায় মেট্রোরেল চলবে। আড়িয়ল বিলে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এবং নতুন রাজধানী নির্মাণের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন তিনি। সাম্প্রতিককালে আরো অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ধনী দেশে পরিণত হবে। আরো আগে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিলো যে ২০২১ সালের মধ্যে এই দেশ ডিজিটাল দেশে পরিণত হবে। ৫ জানুয়ারির তামাশার নির্বাচনের পরেই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে তিন বছরের মধ্যে (অর্থাৎ ২০১৭ সালের জানুয়ারির আগে) পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে যানবাহন চলাচল করবে। আরো আগে শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ডে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। হাসি-ঠাট্টা আর কৌতুকবোধ বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে অবশিষ্ট থাকলে শেখ হাসিনার সর্বশেষ প্রতিশ্রুতিতে তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত অট্টহাসি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতো।

বাংলাদেশের মানুষ চোখের ওপরে দেখছে একটা ডিজিটাল ডাকাতের দেশ। ব্যাংক ডাকাতি, শেয়ার বাজার লুট, কুইক রেন্টাল ডাকাতি, ডেসটিনি আর হলমার্ক কেলেঙ্কারী, পদ্মা সেতু নিয়ে বিশ্ব-নিন্দিত দুর্নীতি আজকের বাংলাদেশের সঠিক পরিচয়। প্রকল্প বরাদ্দের ৪০ শতাংশই দুর্নীতিবাজদের পকেটে যেতো বলে দুই-আড়াই বছর আগেও বলাবলি হতো। এখন শোনা যায় ৬০ ভাগই যায় দুর্নীতিবাজদের পকেটে। বাকি ৪০ শতাংশ দিয়ে প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও দেখতে দেখতে পুঁজি ফুরিয়ে যায়, প্রকল্প শেষ হয় না। আরো মজার ব্যাপার দুর্নীতিবাজরা ধরা পড়ে না এবং ধরা পড়লেও তারা ফসকে বেরিয়ে যায়, শাস্তি কারো হয় না।

বাংলাদেশের মানুষ বুঝে গেছে বর্তমানের অবৈধ সরকার তাদের ঘনিষ্ঠ মহলকে সকল প্রকার দুর্নীতি দিয়ে বিত্ত-সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলে সোভিয়েত-

উত্তর রাশিয়ার মতো একটা অলিগার্ক শ্রেণী সৃষ্টি করছে। তাদের ভরসা এই অলিগার্করাই অর্থ, খুনী আর সন্ত্রাসী দিয়ে বর্তমান শাসকদের গদিতে বহাল রাখবে, যদিও তারা দেশের মানুষের অসহনীয় হয়ে গেছে। দেশ থেকে একাধিক বন্ধু জানিয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর জনসভাতেও এখন আর লোক হয় না, এখন আর ভাড়া করেও 'সমর্থক' পাওয়া যায় না, কাঠ-ফাটা রোদে স্কুলের শিশুদের সড়কে জড়ো করে মন্ত্রীদের 'জনসমর্থন' দেখাতে হয়।

প্রতিশ্রুতির স্বরূপ বাংলাদেশের মানুষ অনেকদিন আগেই চিনে ফেলেছে। কোথায় দশ টাকা কেজি দরের চাল? আর কোথায় রাতারাতি বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান এবং মিডিয়ায় সাংসদ ও মন্ত্রীদের বিত্ত-সম্পদের বিবরণ নিয়মিত প্রকাশ করা? অথচ সেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। মানুষ এখন বুঝে গেছে এই সরকারের প্রতিশ্রুতিগুলো নিছক কল্পনার ফানুশ, সেসব প্রতিশ্রুতি পালনের কোন ইচ্ছা প্রতিশ্রুতি-দাতাদের নেই। সুতরাং আকাশ-পাতাল মানুষের হাতে তুলে দেবার প্রতিশ্রুতি দিতেও কারো আটকায় না। কল্পনার রসগোল্লা খাইয়ে মানুষকে খুশি করার ব্যর্থ চেষ্টায় নেমেছে সরকার এখন।

উন্নয়ন গণতন্ত্রের বিকল্প নয়

প্রধানমন্ত্রী এখন আর বলছেন না যে আওয়ামী লীগের জন্ম হয়েছিলো নারায়ণগঞ্জের ওসমান পরিবারে এবং জনৈক 'জোহা কাকা' ছিলেন এই দলটির জনক। মন্ত্রীরা এর-তার জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে কুৎসা রটনা করতে চান কিন্তু আওয়ামী লীগের সঠিক জন্মবৃত্তান্ত খুঁজে বের করার কোন চেষ্টা তাদের মধ্যে দেখা যায় না। প্রসূতি সদন কিংবা জন্মদাতার পরিচয় সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়েই ২৩ জুন (পলাশী দিবস) ঘটা করে আওয়ামী লীগের জন্মদিবস পালন করা হয়েছে। সে উপলক্ষে বর্তমান অবৈধ সরকারের 'সাফল্য ও কীর্তি' জাহির করার জন্যে ফলাও করে একাধিক পোস্টার ও পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

আপনাদের অনেকেরই মনে থাকার কথা। সামরিক স্বৈরশাসক লে.জে. হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের রাজত্বকালে প্রায়ই দাবি করা হতো উন্নয়ন দিয়ে দেশ সয়লাব করে দেয়া হয়েছে। ভাড়া করা লেখকদের দিয়ে কবিতা আর রচনা লিখিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে উন্নয়নের গুণ-কীর্তন করে। গদি হারানোর শোক এরশাদ সাহেব এখনো ভুলতে পারেন না। সুযোগ পেলেই তিনি বদহজমের রোগীর পূতিগন্ধময় ঢেঁকুর তোলার মতো তার রাজত্বকালের 'উন্নয়নের' স্মৃতি চারণ করেন। আরেক জন সামরিক শাসক ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের সামরিক স্বৈরশাসনের কথা সম্ভবত অপেক্ষাকৃত কম লোকের মনে আছে। আইয়ুবী

শাসনের দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বহু কোটি টাকা খরচ করে পেশাদার লেখকদের লেখা হাজার হাজার কলাম গুণকীর্তন পত্রপত্রিকায় ছাপানো হয়েছে, বহু অর্থ ব্যয়ে বর্ণাঢ্য সংকলন 'ডিকেড অব ডেভেলপমেন্ট' ছাপানো হয়েছে এবং আলতাফ গওহরকে দিয়ে প্রেসিডেন্টের বনামে 'ফ্রেন্ডস নট মাস্টার্স' নামের ভারি গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে।

এমন দৃষ্টান্ত বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে ভূরি ভূরি। চিলিতে জেনারেল পিনোশে নির্বাচিত ও জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট আইয়েন্দেকে হত্যা করে গদি দখল করেছিলেন। বহু হাজার গণতন্ত্রী দেখতে দেখতে গুম হয়ে যান। পরে জানা গেছে সামরিক বিমান থেকে এই ব্যক্তিদের জীবন্ত অথবা তাদের লাশ প্রশান্ত মহাসাগরে ফেলে দেয়া হয়েছিলো। পিনোশে ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রায়ই তার 'উন্নয়নের' প্রচার চালাতেন। যেন যৎসামান্য কিছু উন্নয়ন হলেই তার গদি দখল করে থাকার অধিকার চিরস্থায়ী হবে। ফিলিপাইনে ফ্রেডরিক মার্কোসও উন্নয়নের দোহাই দিয়ে গদি আঁকড়ে থাকতে চেয়েছিলেন। বাস্তবে কি দেখেছে ইতিহাস? আসলে এই ডিক্টেটারদের কারোই চিন্তার মৌলিকত্ব কিংবা অভিনবত্ব বলে কিছু ছিলো না। অনেকেই উন্নয়নের নামে একটা অলিগার্ক শ্রেণী গড়ে তুলেছিলেন। অন্যদিকে ধ্রুব সত্য হচ্ছে উন্নয়ন গণতন্ত্রের বিকল্প হতে পারে না। একবিংশ শতকের সাধারণ মানুষও সেটা বুঝে গেছে।

সামরিক অলিগার্করা কল্যাণ করে না

পাকিস্তানে আইয়ুব খান ও ইয়াহিয়া খান নিজেদের আসন মজবুত করার মিথ্যা আশায় দেশের শিল্প বাণিজ্য অর্থনীতি সবই সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সেনাবাহিনী এবং সামরিক পরিবারগুলো পাকিস্তানে অভিজাত শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তাতে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা, রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা এবং অর্থনীতি শক্তিশালী হবার পরিবর্তে দুর্বল হয়েছে। অনেকে আশঙ্কা করছেন পাকিস্তান রাষ্ট্রটির অস্তিত্বই আজ বিপন্ন। চিলিতে এবং ফিলিপাইনেও ঘটেছে একই রকমের অবস্থা। সার কথা হচ্ছে অলিগার্করা দীর্ঘমেয়াদে আইয়ুব খান এবং পিনোশে প্রমুখদের গদি পোক্ত করার পরিবর্তে দুর্বলই করেছে। অলিগার্কদের দেবার মতো আর কিছু যখন তাদের হাতে অবশিষ্ট ছিলো না তখন অলিগার্করাই তাদের পতনের কারণ ঘটিয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান অবৈধ ও অনির্বাচিত সরকার সর্বক্ষণ সেনাবাহিনীকে তোষণের উপায় খুঁজছে বলে মনে হয়। তারা ইতিহাস থেকে বেছে বেছে ব্যর্থ ও ধিকৃত মডেলগুলোই অনুসরণ করছে। ইতিহাসের আপৎ ঘণ্টাধ্বনি তারা শুনতে পাচ্ছে না।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে পাকিস্তান থেকে যখন স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন তখন তার জনপ্রিয়তা ছিলো প্রায় বিশ্বজনীন। চার বছরের মধ্যেই সে জনপ্রিয়তা যে শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছিলো সেজন্যে দায়ী ছিলো তার নেতৃত্বের ও নীতির ব্যর্থতা। গণতন্ত্র সাধারণত ক্ষমাশীল। তা সত্ত্বেও মানুষ প্রশাসনিক ব্যর্থতা, নির্যাতন ও নিপীড়নে এতোই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলো যে তার মর্মান্তিক হত্যাতেও কেউ চোখের পানি ফেলেনি। পিতার সিকিভাগ জনপ্রিয়তাও শেখ হাসিনার কখনোই ছিলো না। কিন্তু তিনি পিতার ব্যর্থ প্রমাণিত পথেই চলেছেন, নির্যাতন নিপীড়ন এবং গণতন্ত্র হত্যার পথে তিনি গদি আঁকড়ে থাকতে চান। সরকারের ব্যর্থতা ও অপ্রিয়তা যতোই বেশি প্রকট হচ্ছে তাদের কুশাসন-অত্যাচার ও গুম-খুনের মাত্রা ততোই বেড়ে চলেছে।

সাধারণ মানুষও লক্ষ্য না করে পারে না। ইংরেজি প্রবাদে আছে "যা হাড়ে আছে তা মাংসে বেরিয়ে পড়বেই।" সরকারের ব্যর্থতা যতো বেশি জাজ্বল্যমান হয়ে যাচ্ছে মন্ত্রীদের স্বভাবের দুর্বৃত্তপনা ততোই বেশি জাহির হয়ে পড়ছে। ৫ জানুয়ারি থেকে তাদের মুখের ভাষা আরো বেশি কদর্য আর আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে। এখন আবার তথ্য (ঘাতক) মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু প্রকাশ্যেই বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়াকে হত্যার হুমকি দিয়েছেন। খালেদা জিয়াকে হত্যা করা গেলে কারো কারো যে হাড় জুড়াতো সেটা বিগত দুই-তিন দশক থেকেই পরিষ্কার। কিন্তু তারা সাহস পাচ্ছে না এজন্যে যে তেমন হত্যার যে পরিণতি হবে দেশে এবং বিদেশে সেটা সামাল দেবার ক্ষমতা তাদের নেই।

হতাশ ও বীতশ্রদ্ধ জনগণ

অবশ্যি কিছু মানুষ বিএনপি এবং খালেদা জিয়ার ওপর পুরোপুরি সন্তুষ্ট নয়। সন্তুষ্ট নয় এজন্যে যে বিগত অন্তত দুই-আড়াই বছর যে বর্তমান শাসকরা গদিতে বহাল থাকতে এবং দেশকে আরো বেশি দুর্নীতি ও সন্ত্রাসে তলিয়ে দিতে পারছে সেজন্যে বিএনপি ও খালেদা জিয়া কিছু পরিমাণে দায়ী। দেশের মানুষ ষোলো-আনা সমর্থন দিয়েছিলো তাদের। তাদের পেছনে কাতারবন্দী হয়ে স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাৎ করতে তারা এগিয়ে এসেছিলো। বিএনপি নেতারা মুখে বলেছেন যে তারা নির্যাতক সরকারের পতন ঘটাতে চান। কিন্তু জনতার উদ্দীপনা যখন তুঙ্গে উঠেছে তখনই আন্দোলন যেন পথের ধারে বসে জিরিয়ে জিরিয়ে পান-তামাক খাওয়া ও গল্প-গুজারিতে কালাতিপাত করেছে। আমি নিজেও বহুবার লিখেছি যে আন্দোলনের অবস্থা ছিলো সেনাবাহিনীকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ডেকে নিয়ে সংলাপ-সংলাপ খেলার মতো।

ফলটা কি হয়েছে? জনতা তাদের উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলেছে। তারা ভাবছে দেশ যে আজ দুর্ভাগ্যের অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে আন্দোলনের দুর্বলতাও সেজন্যে কিছু পরিমাণে দায়ী। একের পর এক রাজনৈতিক দল খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিরোধী জোটে যোগ দিয়েছে। কিন্তু আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পাবার পরিবর্তে দুর্বল হয়েছে বলেই মনে হয়। জামায়াত আন্দোলনের একটা বড়ো শক্তি ছিলো। তাদের এখন গা-ছাড়া ভাব মনে হয়। শোনা যাচ্ছে নানা প্রলোভন দেখিয়ে শাসকরা জামায়াতকে দলে টানার চেষ্টা করছে। হেফাজতে ইসলাম দেশের মানুষের আন্দোলনে শরিক হতে পারতো। তারাও দূরে সরে যাচ্ছে। মনে হয় ফাজিল মন্ত্রীদের অবিরাম বিদ্রূপে বিএনপি নিজেদের দৃঢ়তা থেকে সরে গেছে এবং স্বাভাবিক মিত্রদের দূরে সরে যেতে দিয়েছে। অন্তত বিদেশ থেকে মনে হয় বিএনপির নেতৃত্ব সম্বন্ধে হতাশ মহলগুলোকে প্রলুব্ধ করে নিজেদের দিকে টেনে নিয়ে সরকার কিছুটা সমর্থন ও বৈধতা সংগ্রহের ষড়যন্ত্র করছে।

বিএনপির উঁচু পর্যায়ের নেতৃত্বের দুর্বলতা বেশ কিছুকাল থেকেই পরিষ্কার। প্রথম কাতারের নেতৃত্বের একাংশের আনুগত্য অবিচল বলে কিছুতেই মনে হয় না। তাদের মধ্যে শত্রুপক্ষের কিছু চর থাকাও স্বাভাবিক। আন্দোলনের সাফল্যের অভাবে স্বার্থান্বেষী ও দুর্বলমতি কোন কোন মহল সরকারের প্রলোভনে দোলাচলে রয়েছেন বলে মনে হয়। কোন কোন মহল কিছু সম্বল সংগ্রহ করেছেন। এখন তারা আন্দোলনের পরিবর্তে শান্তিতে সে সম্পদ উপভোগকেই শ্রেয় মনে করছেন। অন্তত ২৯ ডিসেম্বরের কর্মসূচির ব্যর্থতা থেকে সেটাই মনে হয়। আরো কোন কোন মহল 'শরীরে ও মনে ক্লান্ত' হয়ে পড়েছেন। অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে এসব মহল আর আন্দোলনের শক্তি-সম্পদ নন। তারা রীতিমতো আবর্জনা ও আন্দোলনের পায়ের শেকল।

আগে পুনর্গঠন পরে আন্দোলন

খালেদা জিয়া শীর্ষ নেতৃত্বের পুনর্গঠন করবেন বলে বেশ কিছুকাল ধরেই শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও গড়িমসি বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দলের ওয়ার্কিং কমিটি ও স্ট্যান্ডিং কমিটি পুনর্গঠনে অসুবিধার বিশেষ কোন কারণ থাকার কথা নয়। নেতৃত্বের পচা কাঠগুলো ফেলে দিয়ে কাঠামো মজবুত করার প্রয়োজন অনেক আগে থেকে অনুভূত হচ্ছে। নেতৃত্বের আরেকটা ব্যর্থতার পরিচয় হচ্ছে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে বছরের পর বছর 'ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব' করে রাখা। খালেদা জিয়া কি একথা বুঝতে পারেন না যে অনির্দিষ্টকাল পুরস্কার-বিহীন ভার বহন মানুষের উৎসাহ ও মনোবল নষ্ট করে দেয়? এই কয় বছরে মির্জা আলমগীর অন্য কোন নেতার চাইতে কম সক্রিয়

ছিলেন না। ত্যাগ স্বীকারও তিনি অনেকের চাইতে বেশি করেছেন। তবু এতো বছর যে তাকে ভারপ্রাপ্ত করে রাখা হয়েছে তার অর্থ কি এই নয় যে খালেদা জিয়া অধিকতর উপযুক্ত কাউকে খুঁজে পাচ্ছেন না? সেটাই যদি বাস্তব পরিস্থিতি হয় তাহলে তিনি মীর্জা আলমগীরকে ভারমুক্ত করে দিতে পারতেন। অধিকতর যোগ্য কাউকে পাওয়া গেলে মহাসচিব পরিবর্তন করাও কঠিন হতো না।

বেগম জিয়া ঘোষণা করেছেন যে ঈদের পরে তিনি সরকার উচ্ছেদের আন্দোলন ঘোষণা করবেন। সরকারের চর ও আওয়ামী লীগের পাণ্ডাদের বিদ্রূপের হাসি বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। ফাজিল মন্ত্রীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তো রীতিমতো অসহনীয়। বস্তুত খালেদা জিয়ার কর্মসূচির হুমকি কিছুটা শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতির মতো অন্তঃসারশূন্য শোনাতে শুরু করেছে। এদিকে যতোই দিন যাচ্ছে সরকার ততোই নানা ষড়যন্ত্র করে নিজেদের আসন আরো মজবুত করার সময় পাচ্ছে। বিএনপি নেত্রী যদি সত্যি সত্যি সফল কোন আন্দোলন করার ইচ্ছা পোষণ করেন তাহলে তার উচিত হবে ঈদের এক সপ্তাহের মধ্যে পূর্ণ মহাসচিবের নিয়োগ দেয়া এবং স্ট্যান্ডিং কমিটি পুনর্গঠিত করে তারপর আন্দোলনের ঘোষণা দেয়া। তাহলে তিনি প্রমাণ পাবেন যে দেশের মানুষ সর্বশক্তি নিয়ে তার পেছনে কাতারবন্দী হয়েছে।

(লন্ডন; ০৮.০৭.১৪)

গাজার গণহত্যা ও নতুন প্রজন্মের জাগ্রত বিবেক

এই কলাম যখন লিখতে বসেছি গাজায় ইসরাইলি হামলা তখন ৩৫ দিনে পড়লো। মাঝে ৭২ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি হয়েছিলো। তার মেয়াদ শেষ হয়েছে গত শুক্রবার। ইসরাইলিরা মেয়াদ বাড়াতে চেয়েছিলো কিন্তু গাজার প্রধান রাজনৈতিক দল হামাস তাতে রাজি হয়নি। স্থিতাবস্থা বজায় রেখে যুদ্ধবিরতির অর্থ হতো তাদের মৃত্যুদণ্ড এবং ইসরাইলের গণহত্যা কিছুদিন স্থগিত করা মাত্র। গাজাবাসী সঠিক অর্থেই খাঁচার মধ্যে বাস করছে। উত্তর আর পূর্ব দিকে ফটকগুলো ইসরাইলিরা তালা-কুলুপ দিয়ে বন্ধ রাখে। পশ্চিমে ভূমধ্য সাগরে সর্বক্ষণের ইসরাইলি নৌ পাহারা। এখানেই সৈকতে খেলতে গিয়ে গাজার চারটি শিশু ইসরাইলি জাহাজের শেলের ঘায়ে মারা গিয়েছিলো। দক্ষিণে রাফায় যে ফটক আছে মিসরের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসির স্বল্পকালীন আমলে সে ফটক খুলে দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইসরাইল-বান্ধব সাবেক সেনাপ্রধান আবুল ফাতাহ্ আল সিসি গদি দখল করে সে ফটকটি আবার বন্ধ করে দিয়েছেন। গাজাবাসী জানে স্বল্পকালীন যুদ্ধবিরতি করে ইসরাইল তার প্রায় শূন্য হয়ে যাওয়া অস্ত্রভাণ্ডার নতুন করে গড়ে তোলার সুযোগই পাবে।

হামাস এবং গাজাবাসীর এ অভিজ্ঞতা নতুন নয়। বিগত ছয় বছরে এটা তাদের বিরুদ্ধে জায়োনিস্ট রাষ্ট্রের তৃতীয় সর্বাত্মক আক্রমণ। দু বছর আগের যুদ্ধে প্রায় ১২০০ গাজাবাসী প্রাণ হারিয়েছেন। ২০০৮-৯ যুদ্ধেও গাজার কাছাকাছি সংখ্যক ফিলিস্তিনীকে হত্যা করেছিলো ইসরাইল। কিন্তু তখন তাদের নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি তেমন কিছু হয়নি। খুশিতে তারা (এবং বিদেশে তাদের পৃষ্ঠপোষকরা) বগল বাজাচ্ছিলো। এবারে কিন্তু ওয়াক-ওভার পায়নি তারা। সত্যি বটে তারা ৭২ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি পর্যন্ত প্রায় দুহাজার ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে, প্রায় ৬৫ হাজার ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়েছে এবং গাজার মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশকে বাস্তুহারা করেছে। এও সত্যি যে ১০ থেকে ১২ হাজার গাজাবাসীকে তারা জখম করেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে গাজার মানুষ এখন মরিয়া হয়ে প্রতিরোধ করতে শুরু করেছে। এ দফার যুদ্ধে দেখা যাচ্ছে গাজীবাসী শুধু মরতেই নয়, মারতেও শিখেছে। তারা ৬৫ জন ইসরাইলি সৈন্যকে হত্যা

করেছে, আহত করেছে প্রায় ১০০০ (এক হাজার) জনকে। গোটা ইসরাইল জুড়ে হাহাকার আর আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। ইসরাইলিরা অন্যের প্রাণ নিতে এবং ফিলিস্তিনীদের রক্ত ঝরাতে ভালোবাসে। কিন্তু নিজেদের প্রাণ এবং রক্ত দিতে তাদের বড়োই ভয়, বড়োই আপত্তি। হামাসের এতোকালের বৈশিষ্ট্য ছিলো রকেট তৈরি করতে পারার দক্ষতা। দেখা যাচ্ছে এখন তারা ইসরাইলি সৈন্য হত্যার কৌশলও আয়ত্ত করেছে।

পঁয়ষট্টি জন সৈন্য হারানো এবারের যুদ্ধে ইসরাইলির প্রধান ক্ষতি নয়। জায়োনিস্ট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী এবারে যেমন প্রবল জনমত সৃষ্টি হয়েছে আগে আর কখনো ঘটেনি। বিগত শতকের চল্লিশের দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার ইহুদিদের বিরুদ্ধে নানা রকম অত্যাচার করেছে, লাখে লাখে ইহুদি পালিয়ে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে এবং বৃটেনে আশ্রয় নিয়েছে, আর হিটলারের বন্দী শিবিরগুলোতে হাজার হাজার শিশুসহ কয়েক লাখ ইহুদিকে হত্যা করা হয়েছিলো। এই ইতিহাস নিয়ে ইহুদিরা বিশ্ববাসীকে ব্ল্যাকমেইল করে এতোকাল বলতে গেলে সব কিছুই আদায় করে নিয়েছে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড ব্যালফুরের কাছ থেকে তারা প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলো যে যুদ্ধ শেষে আরবদের দেশ ফিলিস্তিনে পূর্ব ইউরোপের ইহুদিদের জন্যে একটা 'স্বদেশ' তৈরি করে দেবে। যুদ্ধ শেষে মূলত পোলিশ সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ইরগুন ও স্টার্ন গ্যাং অবৈধভাবে ইউরোপীয় ইহুদিদের ফিলিস্তিনে আমদানি করতে থাকে। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ফিলিস্তিনের একটা বিশেষ অংশে প্রস্তাবিত ইসরাইল রাষ্ট্রের একটা চৌহদ্দি বেঁধে দেয়। কিন্তু সে চৌহদ্দি মেনে নেওয়া কখনই ইসরাইলের উদ্দেশ্য ছিলো না।

উড়ে এসে জুড়ে বসা ও উটের নাক বাঁচানো

গল্পে আছে, শীতের রাতে উট তাবুতে নাক গোঁজার অনুমতি ভিক্ষা করেছিলো। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল ঠেলা ঠেলি করে উট গোটা তাবুই দখল করে নিয়েছে, আর বেচারা মালিক চাদর মুড়ি দিয়ে বাইরের শীতের বাতাসে ঠক ঠক করে কাঁপছে। ফিলিস্তিনেও ঘটেছে সে রকম ব্যাপার। ইরগুন ও স্টার্ন গ্যাং '৪৮ সালেই তাদের সন্ত্রাসী তৎপরতা দিয়ে আট লাখ ফিলিস্তিনীকে উৎখাত করে তাদের ভিটেবাড়ি ও জোত-জমি দখল করে নিয়েছিলো। তারপর ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ফিলিস্তিনের প্রায় সবটাই দখল করে নিয়েছে। জাতিসংঘ কয়েকটি প্রস্তাবে দখলীকৃত আরব ভূমি থেকে সরে যেতে ইসরাইলকে নির্দেশ দেয়। কিন্তু সরে যাওয়ার পরিবর্তে ইসরাইল দখলীকৃত এলাকায় ইহুদি বসতি স্থাপন শুরু করে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ প্রতিবাদে বাধ্যতামূলক প্রস্তাব পাস করতে

চেয়েছিলো, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোর কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। ফল হয়েছে এই যে পশ্চিম তীরের বিচ্ছিন্ন কয়েকটি টুকরো এবং গাজা ছাড়া গোটা ফিলিস্তিনেই এখন ইসরাইলিরা বসবাস করছে।

যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যা এখন মোটামুটি ৩০০ মিলিয়ন। তার ভেতর ইহুদি নাগরিকরা ১০ মিলিয়নেরও কম। কিন্তু মার্কিন অর্থনীতি বলতে গেলে সম্পূর্ণরূপে তাদের হাতের মুঠোয়। সে সঙ্গে মিডিয়া এবং রাজনীতির নিয়ন্ত্রণও। তাদের প্রভাব এখন এতোই ব্যাপক যে ইসরাইলি লবিগুলোর আপত্তি ডিঙিয়ে কোন আইন পাস করার, এমনকি গদিতে টিকে থাকাও কোন প্রশাসনের পক্ষে সম্ভব নয়। বৃটেনের মোট ৬০ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে ইহুদিদের সংখ্যা তিন লাখেরও কম। কিন্তু অর্থনীতি ও মিডিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণের কারণে সাড়ে ছয়শো সদস্যের পার্লামেন্টে ইহুদি এমপির সংখ্যা আনুমানিক দেড়শো থেকে দুশো। বিচিত্র নয় যে এদেশে রাজনীতি কিংবা ব্যবসায় করতে হলে ইসরাইল-বিরোধী কথাবার্তা না বলাই ভালো। সেজন্যেই কিস্তিতে কিস্তিতে ফিলিস্তিনী গণহত্যা এবং ফিলিস্তিনীদের স্বদেশ কেঁড়ে নিয়েও ইসরাইল পার পেয়ে যাচ্ছিলো।

গত ৮ জুলাই ইসরাইল গাজার বিরুদ্ধে যে অমানুষিক হিংস্র আক্রমণ চালিয়েছে দীর্ঘ মেয়াদে ইহুদি রাষ্ট্রের তাতে লাভের চাইতে লোকসান বেশি হবে বলেই মনে হচ্ছে। ৩৫ দিনের এ আক্রমণের ক্ষয়ক্ষতি মানুষ মাত্রকেই স্তম্ভিত, শোকাহত করে তুলেছে। দুহাজার নিহত ফিলিস্তিনির মধ্যে ৮০ শতাংশেরও বেশি ছিলো নর নারী ও শিশু। শিশুর সংখ্যাই ছিলো সাড়ে চারশো। বর্বর ইসরাইলি বাহিনী হাজার হাজার শরণার্থীর আশ্রয় শিবির বলে জাতিসংঘের চিহ্নিত স্কুল এবং কয়েকটি হাসপাতালের ওপরও বোমা ফেলেছে। বেশ কয়েকজন ডাক্তার ও নার্সসহ শত শত লোক এসব আক্রমণে নিহত হয়েছেন। এমনকি জাতিসংঘের নয়জন কর্মকর্তা এবং দুজন সাংবাদিককেও তারা হত্যা করেছে।

ইউরোপের প্রতিবাদ ও আদর্শের জাগরণ

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত মানুষ ইসরাইলিদের এই বর্বরতা ও অমানুষিকতায় আতঙ্কিত হয়েছে। তারপর থেকে প্রতি সপ্তাহান্তে ইউরোপের রাজধানীগুলোতে হাজার হাজার, লাখো লাখো মানুষ গাজায় আক্রমণের প্রতিবাদে মিছিল ও সমাবেশ করেছে। গত শনিবার প্রায় এক লাখ মানুষ মার্কিন দূতাবাসের সামনে দিয়ে মিছিল করে লন্ডনের হাইডপার্কে গিয়ে সমাবেশ করেছে। ইসরাইল বিরোধী বহু রকমের শ্লোগান দিচ্ছিলো আর ব্যানার বহন করছিলো তারা। অনেকে শ্লোগান দিচ্ছিলো 'আমরা সকলেই এখন ফিলিস্তিনি'।

প্রতিবাদী কণ্ঠ এবারে ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও উচ্চারিত হচ্ছে। পররাষ্ট্র দফতরের প্রতিমন্ত্রী ব্যারনেস সাঈদা ওয়ার্সি ইসরাইলি বর্বরতার বিরুদ্ধে সরকারের নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদ করে পদত্যাগ করেছেন। কয়েকটি টেলিভিশন ও রেডিও অনুষ্ঠানে তিনি ইসরাইলের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষপাতিত্বের কঠোর সমালোচনা করেছেন। এসবের জের ধরে এখন জানা যাচ্ছে যে পার্লামেন্ট সদস্য, এমনকি মন্ত্রীদের মধ্যেও সরকারের ফিলিস্তিন নীতির বেশ কিছু সংখ্যক সমালোচক আছেন। জনমত সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ব্যারনেস ওয়ার্সির পদত্যাগের জের ধরে সরকারের জনপ্রিয়তায় বড়ো রকম ধস নেমেছে।

বহু অপ্রত্যাশিত মহল থেকে এবারে ইসরাইলের সমালোচনা উঠছে। প্রেসিডেন্ট ওবামা ও তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি ইতস্তত করে হলেও বলেছেন গাজায় ইসরাইলি আক্রমণ অনানুপাতিক রকম হিংস্র হয়েছে এবং নিরীহ লোকেদের, বিশেষ করে এতো বেশি সংখ্যক শিশুর হত্যা গ্রহণযোগ্য নয়। বহু বছরের মধ্যে মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে ইসরাইলের এমন কঠোর সমালোচনা শোনা যায়নি। হোয়াইট হাউসের এবং জাতিসংঘের সামনে কয়েকটি প্রতিবাদ মিছিল হয়েছে গাজায় ইসরাইলি হামলার বিরুদ্ধে। খুব সম্ভবত এই প্রথমবার কয়েকশো মার্কিন ইহুদি গাজা আক্রমণের প্রতিবাদ করে যুক্তরাষ্ট্রে মিছিল করেছে। খোদ ইসরাইলে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে কোন আক্রমণের প্রতিবাদ কিংবা সমালোচনা এতোকাল কল্পনাও করা যেতো না। এবারে কিন্তু গাজা আক্রমণের বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রতিবাদ মিছিল করেছে বামপন্থীরা। ডানপন্থী ইসরাইলিরা মিছিলগুলোর ওপর হামলা চালিয়েছে। হারেৎস পত্রিকার বিখ্যাত কলাম লেখক গিডিয়ন লেভি গাজা আক্রমণের সমালোচনা করে ডানপন্থীদের আক্রোশে পড়েছেন। পত্রিকাটি এখন দুজন দেহরক্ষী দিয়েছে তাকে। মিসরের মধ্যস্থতায় মীমাংসা আলোচনার সুযোগ করার জন্যে ফিলিস্তিনি আর ইসরাইলিদের মধ্যে আরেকটি ৭২ ঘণ্টার যুদ্ধ বিরতি হয়েছে। সারা বিশ্বের সমালোচনায় ইহুদি রাষ্ট্রের বোধোদয় হয়েছে কিনা শিগগিরই বোঝা যাবে।

লক্ষণীয় যে যুক্তরাষ্ট্রে এবং ইসরাইলে যেসব ইহুদি গাজায় ইসরাইলি আক্রমণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন, প্রতিবাদ করেছেন তাদের প্রায় সকলেই নিম্ন-পঁচিশ বয়সী আদর্শবাদী তরুণ। পিতা-মাতা-পূর্ব পুরুষরা বিভিন্ন কারণে অন্ধভাবে ইসরাইলের সকল অন্যায় সমর্থন করার দাসখত লিখে দিয়েছিলেন, তেমন কোন অঙ্গীকার এরা দেননি। হিটলারের হলোকস্টের জন্যে ব্ল্যাকমেইল সহ্য করতেও এরা রাজি নন। ইসরাইলের এই দৃষ্টান্ত থেকে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়েও আশাবাদী হওয়া যাবে কি?

প্রতিবেশীর স্বরূপ ফাঁস

এখন প্রমাণ হয়ে গেছে বাংলাদেশ সরকারের ১৪ দল গাজায় প্রতিনিধিদল পাঠানোর যে ঘোষণা দিয়েছিলো সেটা নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া আর কিছু ছিলো না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাঁচ সপ্তাহ পরে গাজার ব্যাপারে বিশ্ব সমাজের নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা করেছেন। হয়তো রমজান আর ঈদ সংক্রান্ত রাজনীতি নিয়ে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। হয়তো সে কারণেই তিনি লক্ষ করেননি যে তার এতোকালের পৃষ্ঠপোষক পাশের দেশও গাজার গণহত্যার কোন প্রকাশ্য সমালোচনা করেনি। উল্টোটাই বরং সত্যি বলতে হবে। গাজা আক্রমণের গোড়ায় দিল্লির পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ বলেছেন ইসরাইলের সঙ্গে ভারতের আন্তরিক সম্পর্ক বজায় থাকবে। শাসক বিজেপি দলের একজন শীর্ষ নেতা ড. সুব্রাহ্মনিয়াম সোয়ামি জনসভা করে ইসরাইলের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেছেন। আর গাজায় যখন ইসরাইলের গণহত্যা চলছিলো তখন ভারত ইসরাইল থেকে বহু হাজার কোটি রুপির যুদ্ধাস্ত্র ক্রয়ের চুক্তি করেছে।

বাংলাদেশে পবিত্র রমজান এলো আর গেল। ঈদুল ফেৎরের দীর্ঘ ছুটিও শেষ হয়েছে কয়েকদিন আগে। আমাদের জাতীয় জীবনে কোন পরিবর্তন এসেছে কি? অথচ আজীবন শুনে এসেছি রমজান আত্মশুদ্ধির মাস। এ মাসে লোভ লিপ্সা ক্রোধ ঘৃণা আর প্রতিহিংসাকে জয় করাই হচ্ছে মূল শিক্ষা।

মানবাধিকার সংস্থা অধিকারের হিসেবে রমজানের মাসে বিচার-বহির্ভূত হত্যা হয়েছে ১৫টি। এই খুন করেছে তারা, যারা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করে আর ন্যায় বিচারকে সমুন্নত রেখে নাগরিকের জানমাল রক্ষার জন্যেই নিয়োজিত। অধিকারের বিবৃতিতে দেখেছি এবং ইন্টারনেটে পড়েছি, আরো বহু খুন-খারাপী ধর্ষণ চুরি-ডাকাতি ঘটেছে রমজান মাসেও। ঈদে ভারতের পাখি শাড়ি না পাবার দরুন গৃহবিবাদের, এমনকি অভিমানী স্ত্রীর আত্মহত্যার খবরও পড়েছি। ভারতীয় টেলিভিশনের 'সোপ অপেরার' একটি পর্ব দেখতে না পেয়ে এক তরুণী আত্মহত্যা করেছেন। প্রেমিকার নগ্ন দেহের ভিডিও ধারণ করে অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে বিক্রি করা হয়েছে। বিদেশী টেলিভিশন আর অপসংস্কৃতি আমাদের জাতীয় জীবনকে কতোখানি বিষিয়ে দিয়েছে এসব হচ্ছে তার দৃষ্টান্ত।

সাংস্কৃতিক শূন্যতা ও অপসংস্কৃতির দৌরাত্ম্য

পদার্থ বিজ্ঞানে আছে, প্রকৃতি শূন্যতাকে ঘৃণা করে। প্রচণ্ড গরমে বাতাস ঊর্ধ্বমুখী চলতে থাকলে আশপাশ থেকে শীতল বাতাস হু-হু করে ছুটে আসে সে শূন্যতা পূরণ করতে। প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের এটা হচ্ছে কারণ। এককালে আমাদের সংস্কৃতি ছিলো, সে সংস্কৃতি বহু জাতির ঈর্ষার কারণ ঘটাতো। প্রায়ই ভাবি সে সংস্কৃতি এখন গেল কোথায়? কি করে এমন একটা শূন্যতা সৃষ্টি হলো

যে গা-ঘিন-ঘিন করা অপসংস্কৃতি ঝড়ো হাওয়ার মতো ছুটে এসে আমাদের জাতীয় জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে?

যারা নেতা হন, যারা রাষ্ট্রকে পরিচালনা করেন, সংস্কৃতির সুস্বাস্থ্য, ভালোমন্দ দেখার দায়িত্ব তাদের ওপর। দুর্ভাগ্যবশত স্বাধীন জাতি হিসেবে আমাদের যাত্রা আশানুরূপ হয়নি। দৃষ্টান্ত সৃষ্টির পরিবর্তে আমাদের নেতারা বিত্ত-সম্পদের পাহাড় তৈরি করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। তার থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মগুলোর ধারণা হয়েছে ভালো মন্দ যে কোন উপায়ে সম্পদ অর্জন করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। কার্লমার্কস আবিষ্কার করেছিলেন মানুষকে ধর্ম ভোলানো না গেলে তাদের প্রকৃত কমিউনিস্ট বানানো যাবে না। তাই তিনি প্রচার করেছিলেন ধর্ম হচ্ছে জনগণের জন্যে আফিমস্বরূপ। সে নেশা ছাড়ানো না গেলে কমিউনিজমের বীজ গণমনে গেড়ে বসবে না।

বাংলাদেশেও হয়েছে তাই। তরুণ সমাজের মনে অর্থলিপ্সার বীজ গেড়ে দেয়া হয়েছে, এ আশায় যে অতঃপর নীতি ও আদর্শের কথা তারা আর ভাববে না। ভোগলিপ্সা তাদের মনে এমনভাবে গেড়ে বসেছে যে চুরি-ডাকাতি খুন-খারাপী কোন কিছুই তাদের বিবেককে পীড়িত করে না। সেজন্যেই দেখতে পাই ব্যাংক ডাকাতি করতে গিয়ে যারা পুলিশের গুলিবিদ্ধ হয়েছে তাদের জন্মদিবস-মৃত্যুদিবস এমন ঘটা করে পালন করা হয় যেন তারা দেবতার পর্যায়ে উঠে গেছে। তরুণ সমাজের এই মগজ ধোলাই করা হয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্যে। ভোগলিপ্সা খুন-খারাপী আর যৌন বিকৃতি নিয়ে ডুবে থাকলে নীতি আর আদর্শের কথা, ন্যায়বিচারের কথা, গণতন্ত্রের কথা সেই পঙ্কিল মস্তিষ্কে স্থান পাবে না। ক্ষমতাসীনদের নিদ্রায় তাতে ব্যাঘাত হবে না।

বহুকাল পরে পশ্চিমের নতুন প্রজন্মের মনে আশাবাদের জাগরণ ঘটেছে। মানবিক আদর্শ তাদের উজ্জীবিত করেছে। গাজার গণহত্যায় তাদের বোধোদয় ঘটেছে যে ইসরাইল একটি পরদেশ গ্রাসকারী নির্যাতক রাষ্ট্র, এ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো কর্তব্য। ভবিষ্যতের জন্যে এটা আশার কথা। নতুন প্রজন্ম বাংলাদেশেও এসেছে, আরো আসবে। এ দেশেও একটা গদিগ্রাসী নির্যাতক শক্তি আছে রাষ্ট্রের সর্বনাশ করা যাদের মূল লক্ষ্য। এই অপশক্তির বিরুদ্ধে নতুন প্রজন্মের রুখে দাঁড়ানোর সময় কি এখনো আসেনি?

(লন্ডন, ১৩.০৮.১৪)

হরিহরের পাঁঠা মানৎ এবং সরকারের পদ্মা সেতু নির্মাণ

হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতির অতি পুরাতন কাহিনী। ধরে নিন লোকটার নাম হরিহর। স্কুল-কলেজে পড়ার পরও বহুদিন বেকার। বেকার ছেলের কাছে কেউ মেয়ে বিয়ে দিতে চায় না। সংসার শুরু করার জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠেছিলো হরিহর। একদিন কালী মন্দিরে গিয়ে উপুর হয়ে ধরনা দিলো। মনে মনে মানৎ করলো ভালো একটা চাকরি হলে মাকালীর নামে জোড়া পাঁঠা বলি দেবে।

কিছু দিনের মধ্যেই একটা চাকরি হলো, চাকরি পাকাও হলো। কিন্তু পাঁঠা বলির নাম নেই। মাকালী স্বপ্নে দর্শন দিলেন। হরিহর তার কথা রাখেনি বলে তম্বি করলেন। সে সবিনয়ে বললো, একটু ধৈর্য ধরো মা, একটা বাসা কেনার চেষ্টা করছি, হয়ে গেলে পাঁঠা ঠিকই দেবো তোমাকে। বাসা কেনা হয়ে গেল, মাকালী আবার স্বপ্নে তাগিদ দিলেন। হরিহর বললো, মাকালী, পাঁঠার দাম আজকাল কেমন তুমি জানো। দুটোর বদলে একটা দিলে হয় না? দেবী বললেন, বেশ, তাই দে। তার পরেও পাঁঠা বলির নাম-নিশানা নেই। দেবী স্বপ্নে আবার আবির্ভূত হলেন তাগিদ দিতে। হরিহর বললো, ভালো একটা বিয়ের প্রস্তাব এসেছে, বিয়েটা হয়ে গেলেই পাঁঠা বলি দেবে।

যথাসময়ে ঘটা করে বিয়েটাও হয়ে গেল। কিন্তু কোথায় কার পাঁঠা? মাকালী এবার স্বপ্নে ঈষৎ রাগত স্বরে কৈফিয়ৎ চাইলেন। হরিহর মুখ কাঁচুমাচু করে বললো, বিয়ে ইত্যাদিতে অনেক টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। তুমি যদি কিছু মনে না করো তাহলে একটা কবুতরই না হয় বলি দিলাম। দেবী তাতেও রাজি হলেন। কবুতরও বলি দেয়া হলো না। তার বদলে ফড়িং বলিতেও রাজি হলেন দেবী। তাতেও বিলম্ব দেখে দেবী আবার স্বপ্নে দেখা দিলেন। হরিহর আর কৈফিয়ৎ খুঁজে পাচ্ছিলো না। সরাসরি বলে দিলো, দেবী, তোর যখন এতোই খাঁকতি, কষ্ট করে নিজেই কেন ধরে খাস না?

পদ্মার ওপর সেতু তৈরি নিয়ে বর্তমান সরকারের কথা ও কাজ নিশ্চয়ই সকলকে হরিহরের কাহিনী মনে করিয়ে দেবে। সেতুর নকশা তৈরি ও অনুমোদন আগেই হয়ে ছিলো। অর্থায়নেরও আয়োজন পাকাপাকি। মোট ব্যয়ের মূল অংশ খুবই সস্তা সুদে ঋণ দেবে বিশ্বব্যাংক। মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১১-১২ সালেই মাওয়া থেকে সোয়া ছয় কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক ও রেল সেতু নির্মাণ

শেষ হবার কথা। কিন্তু সমস্যা দেখা দিলো আওয়ামী লীগ সরকারের চরিত্র নিয়ে। প্রকল্পের কাজ হবে কিন্তু মন্ত্রী, তাদের লেজুড় আর শাসক দলের সংসদ সদস্যরা মোট বাজেটের বখরা পাবে না, এ কেমন কথা? পদ্মা সেতুর কাজ শুরু না হতেই উপদেষ্টা ও ঠিকাদার নির্বাচনের পর্যায়েই হরির লুট শুরু হয়ে গেল। ক্যানাডায় আর যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া রাজ্যে (আলেকজান্দ্রিয়া ও আর্লিংটনে) অন্তত তিনটে প্রাসাদোপম অট্টালিকার মরগেজ রাতারাতি শোধ হয়ে গেল।

এই হরির লুটের কেলেঙ্কারি বিশ্বব্যাংকেরও দৃষ্টি এড়ালো না। তারা বেঁকে বসলো। এসব দুর্নীতির তদন্ত ও বিচার না হলে তারা সেতু তৈরির টাকা দেবে না। বিশ্বব্যাংকের উদ্বিগ্ন হবার যথেষ্ট কারণ ছিলো। এ জাতীয় প্রকল্পে কিছু কিছু দুর্নীতি বহু দেশেই হয়ে থাকে। তবে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের আমলে সেটা যে বহুগুণে বেড়ে গেছে সেটা এখন আর কারো অজানা নেই। সংশ্লিষ্ট মহলে এখন বলা কওয়া হয় যে বাজেট বরাদ্দের ৬০ শতাংশই এখন শাসক দলের মন্ত্রী-সাংসদ আর তাদের লেজুড়দের পকেটে চলে যায়। ফলে বাংলাদেশে বহু প্রকল্পের কাজ এখন অর্থাভাবে মাঝ পথে থেমে যায়। বিশ্বব্যাংক প্রমাদ গুণলো। পদ্মা সেতুর কাজও যদি মাঝ পথে থেমে যায় সরকার তখন বিশ্ব ব্যাংককে ব্ল্যাকমেল করবে, ব্যাংকের গলায় পা দিয়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করার জন্যে বাড়তি টাকা আদায় করে নেবে। বলাই বাহুল্য, মন্ত্রী ও লেজুড়দের পকেট তাতে আরো ভারী হতে থাকবে। ব্যাংক সাফ বলে দিলো তদন্ত, বিচার ও শাস্তি না হলে তারা টাকা দেবে না।

ব্যাংকের এ অবস্থানে প্রধানমন্ত্রীসহ সকল স্তরে সরকারের অবিশ্বাস্য ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার কথা আপনারা ভুলে যাননি, আশা করি। আসলে এটা হচ্ছে এই সরকারের চরিত্রের আরেকটা বড়ো দিক। হাজার অন্যায় আর দুষ্কর্ম করে তারা পার পেয়ে যাচ্ছে। কোথাও ধরা পড়ে গেলে কপট ক্রোধ আর গালাগালির ধূলিঝড় তুলে তারা নিজেদের দুষ্কর্মগুলো চাপা দিতে চায়। আবার বড়ো কোন দুষ্কর্ম করার কিংবা খুবই বিতর্কিত কোনো কাজ করার আগে তারা বিএনপি এবং খালেদা জিয়া ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে অযথা অসত্য গালিগালাজের ঝড় তুলে দেশবাসীর দৃষ্টি ভিন্নমুখী করতে চায়, যেমন বর্তমান সময়ে শেখ হাসিনা রোজই সকালে দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে নতুন নতুন অসত্য গালাগালি করে চলেছেন।

হ্যাটের ভেতর জাদুকরের খরগোশ

বলছিলাম পদ্মা সেতু নিয়ে বিশ্বব্যাংকের সাফ জবাবের পর সরকারের প্রতিক্রিয়ার কথা। বহু ধানাই-পানাই করে সরকার বিশ্বব্যাংকের অভিযোগের তালিকা থেকে কয়েকজন মন্ত্রীর নাম তাদের নতজানু দুর্নীতি দমন কমিশনে পাঠাতে রাজি হলেও প্রধান অভিযুক্ত তৎকালীন যোগাযোগমন্ত্রী আবুল হোসেনের

বিরুদ্ধে তদন্তে কিছুতেই সম্মতি দেয়নি। পাঠকদের আরো মনে থাকার কথা যে, দেশব্যাপী ব্যাপক ধারণা হচ্ছে যে উক্ত মন্ত্রী সরকারের শীর্ষতম পর্যায়ের কারো কারো পক্ষে প্রক্সিতে দুর্নীতি করতেন। এ ধারণায় কিছুটা বিশ্বাসযোগ্যতা থাকা স্বাভাবিক। অন্যদের বাদ দিয়ে শুধু এ মন্ত্রীকে বাঁচানোর জন্যে সরকারের মরণপণ বাধা দানের আর কি ব্যাখ্যা হতে পারে? সরকারের পক্ষ থেকে প্রচারণা শুরু হয়ে যায় যে (সাধাসাধি করলেও) তারা বিশ্বব্যাংকের টাকা নেবে না। পরিবর্তে জাতির কাছ থেকে চাঁদা তুলে সেতুর ব্যয় নির্বাহ করা হবে। ছাত্রলীগ-যুবলীগ আরো এক দফায় চাঁদাবাজির ত্রাস সৃষ্টি করে। কিছুদিন পরে নতুন ঘোষণা হয় যে চাঁদার টাকা থেকে নয়, সরকার রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে সেতু তৈরির টাকা দেবে। এই তুগলকি কাণ্ড-কারখানার ফাঁকতালে সরকারের ক্যাডাররা কতো কোটি টাকা দেশের মানুষের কাছ থেকে আদায় করেছে তার হিসাব কে দেবে?

ওদিকে ভেতরে ভেতরে সেতুর জন্যে ঋণ সংগ্রহের তদ্বির চলেছে বহু দেশে। প্রথমত কোনো দেশই ঋণ দিতে রাজি হয়নি। বিশ্বব্যাংক যে দেশকে বিশ্বাস করতে পারে না সে দেশকে ঋণ দেওয়ার ঝুঁকি কে নেবে? কোনো কোনো দেশ এতো উঁচু হারে সুদ চাইলো যে এ সরকারও তাতে রাজি হতে পারেনি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঋণের তদ্বিরে দেশবিদেশে ঘুরে এলেন। শেষে নাকি চীন ঋণ দিতে এবং সেতুটি তৈরি করতে রাজি হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের অবস্থা এখন ম্যাজিক শোর দর্শকের মতো। ম্যাজিশিয়ান তার হ্যাট থেকে জ্যান্ত খরগোশ বের করেছেন। কি করে বিশ্বাস করা যায় যে, সে খরগোশ আসলেই খরগোশ? তার ওপর সরকারের মন্ত্রীরা অনবরত সেতু তৈরি কাজ শুরু ও শেষ হওয়ার নিত্যনতুন সাল-তারিখ দিয়ে চলেছেন। এখন আর কোনো কথাতেই মানুষ বিশ্বাস করতে পারছে না।

গত বছর বহু মন্ত্রী বহুবার ঘোষণা দিয়েছেন নির্বাচনী পুল সিরাৎ পার হয়ে গেলেই সেতু তৈরির কাজ শুরু হবে। সত্যিকারের নির্বাচন করার কোনো ইচ্ছা সরকারের আদৌ ছিলো না। তারা প্রতারণা করে আর ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে বাকশালী কায়দায় গদি ধরে রাখতে চেয়েছিলো। নির্বাচন হওয়ার আগেই প্রশাসনিক ঘোষণা দিয়ে সংসদে গরিষ্ঠতা লাভের কাজটা সমাধা হয়ে গেল। তারপর ৫ জানুয়ারি ভোটারবিহীন নির্বাচনে অবশিষ্ট আসনগুলো। 'নির্বাচনী বিজয়ের' বৈধতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা সংগ্রহের ব্যর্থ চেষ্টায় ভারতীয় ও বাংলাদেশী কূটনীতিকরা বহু দেশের রাজধানী চষে বেড়ালেন। শেষে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শেখ হাসিনার গোপন বৈঠকের মিথ্যা বিবরণ প্রচার করে বেকায়দায় পড়লেন সরকারের কূটনীতিক ও প্রবক্তারা। এদিকে সেতু নিয়ে জিজ্ঞাসা-সমালোচনা আবার সোচ্চার হয়ে ওঠে।

সেতুর নির্মাণ কাজ ও কাজীর গোরু

মন্ত্রী হওয়ার আগে ওবায়দুল কাদেরের কিছু বিশ্বাসযোগ্যতা ছিলো। অন্তত আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে তো বটেই। দেশবাসীকে ভুয়া আশ্বাস দেয়ার প্রয়োজনে তাকেও বলতেই হলো যে চলতি বছরের জুন মাসে সেতু তৈরির কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে। ভুয়া আশ্বাসের একটা সমস্যা এই যে দাতা কখন কি আশ্বাস দিলেন সব সময় মনে রাখতে পারেন না। ওবায়দুল কাদেরও সে সমস্যার ফাঁদে পড়লেন। মাত্র দিন কয়েক আগে তিনি সম্ভবত বেমওকা বলে বসলেন যে পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ শুরু হবে ২০১৫ সালে অর্থাৎ আগামী বছর। মুখের কথা বেরিয়ে যাবার পরেই মন্ত্রী বোধ হয় বুঝতে পারলেন, অথবা সহকর্মীদের কেউ তাকে বলে দিলেন যে মারাত্মক ভুল করে ফেলেছেন তিনি। গত বৃহস্পতিবার 'বোকা মানুষদের' চোখ ঠারার চেষ্টায় তিনি বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে সেতু তৈরির কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

কাজীর গোরু নাকি কেতাবেই থাকে, গোয়ালে নয়। মাওয়া ঘাটে কিংবা পদ্মার ওপারের জাজিরায় কোনো নির্মাণকাজ কেউ চোখে দেখছে না। সোয়া ছয় কিলোমিটার সেতুর জন্যে অনেক স্তম্ভ তৈরি করতে হবে। একটার কাজও, এমনকি খোঁড়াখুঁড়িও শুরু হয়েছে বলে কেউ শোনেনি। এক আঁটি লোহার রডও কি দেখা গেছে পদ্মার ধারে? অ্যাপ্রোচ রোড ইত্যাদির জন্যে কিছু জমি সংগ্রহ হয়েছে, কিন্তু সেটা তো অনেক দিন আগেই হয়ে গেছে। সেটা নিয়ে শেয়ালের কুমিরের বাচ্চা দেখানোর অভিনয় কারোই বিশ্বাসযোগ্য হবে না।

তবে সরকারের 'তৎপরতার' একটা চিহ্ন দেখতে পেলাম পত্রান্তরে। সরকার নাকি 'সেতুর জন্যে' ৩৮ খানি পাজেরো এবং সমমানের বিলাসবহুল গাড়ি কিনেছে। নিশ্চয়ই বহু কোটি টাকা খরচ হয়েছে তাতে। দুদিন ধরে ভাবছি সেতু তৈরির কি কাজে লাগবে এসব গাড়ি। যেসব শ্রমিক সেতু তৈরি করবে, এমনকি অ্যাপ্রোচ রোডও তৈরি করবে, তাদের কি কোনোদিন পাজেরো গাড়িতে চড়ার সৌভাগ্য হবে? সেতুর ইট-কাঠ লোহা-লক্কড়ও এসব গাড়িতে যাবে না। চীনের ঠিকাদাররা সেতু তৈরি করবে। তাদের প্রকৌশলী এবং পরিচালকরা ঠিকাদার কোম্পানির যানবাহন ব্যবহার করবে। অন্তত সেটাই হচ্ছে নিয়ম। সরকারের মন্ত্রী আর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কিংবা প্রশাসকদের মাঝে মাঝে মাওয়ায় কিংবা জাজিরায় যেতে হতে পারে। গোটা যোগাযোগ বিভাগ তো আর রোজ রোজ নির্মাণ স্থানে যাচ্ছে না যে ৩৮ খানি পাজেরো গাড়ি ক্রয়ের প্রয়োজন দেখা দিলো!

তাহলে এই বিরাট বিলাসবহুল গাড়ির বহর কার ভোগে লাগবে? দিব্য চোখে দেখতে পারছি মন্ত্রী-সচিব আর তাদের পরিবার এসব গাড়িতে চড়ে বাজার করতে কিংবা আত্মীয় বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছেন, বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে

মনোরম কোথাও পিকনিকে যাচ্ছেন। এসব গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ, ড্রাইভারের বেতন, পেট্রলের দাম ইত্যাদি সবই আসবে জনসাধারণের দেয়া রাজস্ব তহবিল থেকে। দেশের অসহনীয় যানজট আরো দুঃসহ হবে, পরিবেশের দূষণ বেড়ে যাবে। কিছুকাল আগে পত্রিকায় পড়েছি বিভিন্ন সময়ে সরকারি কাজে ব্যবহারের জন্যে যেসব গাড়ি কেনা হয়েছিলো তার ভেতর কয়েকশ গাড়ি কোথায় আছে কেউ জানে না। গত কয়েক বছরে শত শত সরকারি গাড়ি লোপাট হয়ে গেছে। পদ্মা সেতুর নামে কেনা এই ৩৮টি গাড়ির কোনো কোনোটিরও নিশ্চয়ই সে দশা হবে এবং সরকারের কোনো কোনো প্রিয়ভাজন ব্যক্তির সম্পদের পরিমাণ আরো কিছু স্ফীত হবে।

এ সরকারের আমলে সম্ভব নয়

ইতোমধ্যে সেতুর অভাবে দেশের অর্থনীতির কি পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে কেউ হিসাব করে দেখেছেন কি? প্রায়ই ইন্টারনেটে পড়ছি প্রমত্তা পদ্মায় পানি কম অথবা চর সৃষ্টি হওয়ায় ফেরি চলাচল বন্ধ। স্রোত খুব বেশি হলেও ফেরি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। মাওয়া, পাটুরিয়ায়, দৌলদিয়ায় শ' শ' ট্রাক ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন অচল পড়ে থাকছে। বাড়তি পেট্রল, বসে থাকা ট্রাকের ভাড়া, নিষ্ক্রিয় ড্রাইভারের বেতন ইত্যাদি বাবদ অর্থনীতির কোটি কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে। আরো বড়ো ট্রাজেডি ঘটছে মাঝে মাঝে। মাত্র সেদিন একখানি ফেরি ডুবে গেল। বহু নিরীহ যাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন। কিছু লাশ উদ্ধার হয়েছে, অধিকাংশই হয়নি। এমনকি ফেরি জাহাজখানিও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। শুনেছি নৌপরিবহনমন্ত্রী শাহজাহান খানের তিন ভাস্তি-ভাগ্নি ছিলেন মৃতদের মধ্যে। তাতে কি মন্ত্রী কিংবা সরকারের কিছু এসে যায়? শাহজাহান খান প্রায়ই দম্ভ করেন, তার আমলে ফেরি দুর্ঘটনা কম হচ্ছে। ওদিকে বিদেশীরাও বলছেন যথাসময়ে পদ্মা সেতুটি তৈরি হলে কতো প্রাণহানি এড়ানো যেতো, অর্থনীতির কতো কোটি টাকা অপচয় হতো না।

পদ্মা সেতুর কাজ শুরু হয়েছে কি হয়নি, না হলেও কবে হবে, এসব নিয়ে জল্পনা অবান্তর। বর্তমান অবৈধ বাকশালী সরকারের অধীনে সেতু আদৌ তৈরি হবে কিনা আমার সন্দেহ আছে। নির্মাণকাজ শুরু হয়ে গেলে সংশ্লিষ্টদের আবার বখরা আদায়ের কথা মনে হবে, নির্মাণকাজ বন্ধ না হলেও বিলম্বিত হবে। অর্থনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ নীতি হচ্ছে উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির সর্বোত্তম পরিবেশ গণতন্ত্র, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মধ্যে। এই তিন শর্তের অনুপস্থিতি পদ্মা সেতুর কাল হয়েছে।

(লন্ডন, ২৬.০৮.১৪)

বাংলাদেশের সিকিমীকরণ দ্রুত এগিয়ে চলেছে

একাত্তরের ২৫ মার্চের সে কালরাত্রির পর আওয়ামী লীগ নেতাদের অসহায় অবস্থা কল্পনা করা মোটেই কঠিন নয়। প্রতিরোধ সংগ্রাম করতে নয়, হাতে অস্ত্র তুলে নিতেও নয়, তাদের পালিয়ে যাবার নির্দেশ শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই দিয়েছিলেন। সেদিন বিকেল ৪টায় মুজিব তার একান্ত সচিব (যিনি নিজেকে বলতেন তল্পিবাহক) জমির উদ্দিনকে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে পাঠান তার ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব সম্বন্ধে জুলফিকার আলী ভুট্টোর অভিমত জেনে আসতে। পরবর্তী বিবরণ জমির উদ্দিনের নিজের কথায়:

"তখন আমাকে মোস্তাফা খার (ভুট্টোর প্রবক্তা) বললেন যে ভুট্টো সাহেব এখন ঘুমুচ্ছেন, তুমি সন্ধ্যা ৮টায় এসো। আমি যখন ৮টার সময় গেলাম তো উনি আমাকে সুইমিং পুলের দিকে নিয়ে যান। নিয়ে যেয়ে বলেন যে 'চিড়িয়া তো ভেগে গিয়েছে'। চিড়িয়া বলতে তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে বুঝিয়েছেন। আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসলাম। এসে মুজিব ভাইকে বললাম, মুজিব ভাই, প্রেসিডেন্ট তো চলে গেছেন। তিনি কথাটা হা-করে শুনলেন। আর কিছু বললেন না আমাকে। আমাকে আবার বললেন, তুমি আবার যাও, ভুট্টো কি বলে শুনে আসো। আমি আবার গেলাম। তখন প্রায় ১০টা বাজে। মোস্তাফা খার বললেন– তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান না, ভুট্টো সাহেব দেখা করতে চান না। আবার আসলাম, খুব ভারাক্রান্ত মনে শেখ মুজিবের বাড়িতে আমি ঢুকলাম।

"তখন প্রায় সাড়ে ১০টা বাজে। আমি দেখলাম যে আমিরুল ইসলাম সাহেব বেরিয়ে যাচ্ছেন। আর ছিলেন আমাদের পুলিশের আইজি জনাব মহিউদ্দিন সাহেব। তিনি আমাকে দেখে বেরিয়ে গেলেন। আমি দেখলাম যে মুজিব ভাই একটা সোফার ওপর শুয়ে আছেন। আমার মনে হল যে তার প্রায় পাঁচ পাউন্ড ওজন কমে গিয়েছে, সকালে আমি যখন দেখি তখন থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ে। পাইপটা হাতে ছিলো তার। আমি বললাম ভুট্টো সাহেব তো দেখা করলো না। উনি বললেন, জানিরে, ওরা আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। এরপর আমি খুব নিকটে গিয়ে তার সোফার কাছে বসলাম– কার্পেটের উপরে। আমি তার গায়ে হাত দিলাম। তিনি আমাকে বললেন যে 'আমি তাজউদ্দীনদেরকে বলেছি আন্ডারগ্রাউন্ডে যাওয়ার জন্য। কিন্তু আমি কি করি

বল। যদি আমি ধরা না দিই ওরা তো পাগলা কুত্তার মতন আমার সব ওয়ার্কারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।"

আওয়ামী লীগ নেতারা 'আন্ডারগ্রাউন্ড' নয়, 'ওভারগ্রাউন্ডে' সদলবলে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ সাঙ্গোপাঙ্গও নিয়েছিলেন দু'একজন, কেউ কেউ বলতে গেলে এক বস্ত্রে। ভিন্ন দেশে থাকার আশ্রয়, অন্ন বস্ত্রের সংস্থান ইত্যাদি কেমন দুরূহ কাউকে বলে দিতে হবে না। তাদের কপাল ভালো ছিলো। ভারত সরকার দুবাহু বাড়িয়ে তাদের অভ্যর্থনা করেছিলো। দয়া-দাক্ষিণ্যের কারণে নয়, বৈষয়িক স্বার্থে। তার কিছু ঐতিহাসিক কারণ ছিলো। চব্বিশ বছর আগে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে হিন্দুস্থান (ভারত) ও পাকিস্তান হয়েছে – হিন্দুদের রাজনৈতিক সংস্থা কংগ্রেসের ঘোরতর বিরোধীতা সত্ত্বেও। কাশ্মীর, জুনাগড়, হায়দরাবাদ প্রভৃতি রাজ্য এবং পূর্ব পাকিস্তানের এখানে-সেখানে বিতর্কিত ও অবাস্তব সীমান্ত নিয়ে দুই রাষ্ট্রের জন্মের সময় থেকেই অনেকগুলো বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিলো। ভারতীয়রা গোড়া থেকেই ধরে নিয়েছিলো যে বিভক্ত ও দুর্বল রাষ্ট্র পাকিস্তান বেশিদিন টিকতে পারবে না, অন্তত তারা টিকতে দেবে না।

কিন্তু বিশ্ব পরিস্থিতির বাস্তবতাকে তারা বিবেচনায় নেয়নি। কমিউনিস্ট সোভিয়েত সাম্রাজ্য আর মার্কিন নেতৃত্বে ধনতান্ত্রিক পশ্চিমী বিশ্বের মধ্যে বিরোধ বিশাল একখানি কালো মেঘের মতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর আকাশকে ঘনঘটাচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। নতুন স্বাধীন ভারত সোভিয়েটের পক্ষ নেয়ায় ধনতান্ত্রিক জোটের উদ্বেগ আরো বেড়ে যায়। সোভিয়েতকে ঘিরে সমরবলয় সৃষ্টির (এবং ভারতের সমরশক্তির পাল্টা হিসেবে) উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গঠিত সমরজোট সেন্ট্রাল ট্রিটি অর্গানাইজেশন (সেন্টো) ও সাউথইস্ট এশিয়ান ট্রিটি অর্গানাইজেশনে (সীটো) পাকিস্তানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং বলতে গেলে অঢেল সমরাস্ত্র দিয়ে পাকিস্তানকে প্রথম শ্রেণীর সমরশক্তিতে পরিণত করা হয়। তার মোকাবেলায় ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যয় হু-হু করে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তা সত্ত্বেও কাশ্মীর নিয়ে ১৯৪৮ এবং ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে ভারত পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ পরাজিত করতে পারেনি, তার বিজয় চূড়ান্ত হয়নি। পূর্ব ও পশ্চিম দুটি ফ্রন্টে সার্বক্ষণিক সমর প্রস্তুতি বজায় রাখার জন্যে ক্রমবর্ধমান প্রতিরক্ষা ব্যয় ভারতের জন্যে দুঃসহ হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের রণকৌশলীরা এর একমাত্র সমাধান দেখতে পান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে বিভিক্ত ও বিচ্ছিন্ন করার মধ্যে।

দৈব আশীর্বাদ

পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধ ভারতের জন্যে সম্পূর্ণরূপে দৈব আশীর্বাদ হয়েই এসেছিলো। পলাতক আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের আপ্যায়নের জন্যে ভারত সেজন্যে কোন ব্যয়েই কুণ্ঠিত হয়নি। স্বাধীনতার পরে কলকাতায় গিয়ে শুনেছি

আওয়ামী লীগ নেতাদের কারো কারো নৈশ সঙ্গিনীর ব্যয়ও বহন করেছে ভারত সরকার। খুব সম্ভবত আওয়ামী লীগের সংজ্ঞা অনুযায়ী সেটাই ছিলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। কিন্তু ভারতের বেনিয়া বুদ্ধি তখনো সক্রিয় ছিলো। আওয়ামী লীগ নেতাদের আশ্রয়, আপ্যায়ন-বিনোদন দানের বিনিময়ে তারা ভবিষ্যতের জন্যে যথাসম্ভব সবকিছু আদায় করে নিতে চেয়েছিলো। তার অন্যতম ছিলো পূর্ব পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে না দিয়ে প্রথমে সিকিমের মতো ভারতের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করা এবং পরে যথাসময়ে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া। তার কাঠামো হিসেবেই ভারতাশ্রয়ী অসহায় অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে দিয়ে সাত দফা ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়া হয়।

সে চুক্তির মূল কথা ছিলো যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও প্রতিরক্ষা পরিচালিত হবে দিল্লি থেকে। সাউথ ব্লক (পররাষ্ট্র মন্ত্রক) পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ ও পরিচালনা করবে, আর ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের বহির্দেশীয় প্রতিরক্ষার দায়িত্ব নেবে। চুক্তিতে বলা হয় যে বাংলাদেশের নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী থাকবে না। সেজন্যেই স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় বাহিনী অপসারণ দিল্লির কাম্য ছিলো না। চুক্তিতে আরো বলা হয় যে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিডিআরকে (যারা একাত্তরে পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথমেই অস্ত্র ধারণ করেছিলো) ভেঙে দেয়া হবে এবং তার স্থলে ভারতের সীমান্তরক্ষী "বিএসএফ বাহিনীর তত্ত্বাবধানে একটি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) বাহিনী গঠন করা হবে।"

পাকিস্তান থেকে লন্ডন হয়ে দেশে ফেরার পথে দিল্লিতে স্বল্পকালীন যাত্রাবিরতি কালেই শেখ মুজিবুর রহমানকে সাত দফা চুক্তিটির কথা জানানো হয়েছিলো। সে যা হোক, প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করার পরে পরেই মুজিব স্থির করেছিলেন যে সাত দফা চুক্তিটি কিছুতেই তার গ্রহণযোগ্য নয়। ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের জন্যে তিনি পীড়াপীড়ি শুরু করেন। এমনকি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ং ঢাকা সফর করেও মুজিবকে মত পরিবর্তনে রাজি করাতে পারেননি। মুক্তিযুদ্ধে বিশ্ব সমাজ বাংলাদেশকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিলো। শেখ মুজিবুর রহমানের জনপ্রিয়তাও তখন তুঙ্গে। সে পরিস্থিতিতে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে যাওয়া ভারত বিজ্ঞজনোচিত মনে করেনি।

ওরা মুজিব হত্যার সুযোগ নিতে চেয়েছিলো

সে হিসেবে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের ঘটনাবলীতে সাউথ ব্লকের খুব বেশি অসন্তুষ্টির কারণ ঘটেনি। কিন্তু বিদ্রোহী সেনাকর্মকর্তারা যখন খোন্দকার

মুশতাককে রাষ্ট্রপতির আসনে বসায় তখন দিল্লি প্রমাদ গুণেছিলো। তারা অবশ্যই জানতো যে মুশতাক কিছুতেই সাত দফা চুক্তি ফিরিয়ে আনতে রাজি হবেন না। তাজউদ্দীন আহমদ যখন সে চুক্তিতে সই করতে বাধ্য হন খোন্দকার মুশতাক তখন নির্বাসিত সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। চুক্তির বিরুদ্ধে তার দৃঢ় অবস্থান ভারত সরকারের বিরক্তি এবং তাজউদ্দীনের বিব্রতির কারণ ঘটিয়েছিলো। ভারতপন্থী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খালেদ মোশাররফের সামরিক অভ্যুত্থান এসব কারণেই ঘটেছিলো বলে অনেকে তখন মনে করতেন। জেনারেল জিয়াউর রহমানের প্রবল জাতীয়তাবাদী অবস্থানের পরিচয় পেতেও ভারতের বিলম্ব হয়নি। সে কারণেই জিয়া প্রশাসনের সঙ্গে ভারত সরকার সহযোগিতা সামান্যই করেছে। এমনকি রাষ্ট্রপতি জিয়ার উদ্যোগে গঠিত সার্ক সংস্থার বিকাশেও ভারত তেমন উৎসাহ দেখায়নি।

শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা গভীর শোকের সময় ভারতে আশ্রয় পেয়েছিলেন। দিল্লির প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা খুবই স্বাভাবিক। দিল্লিতে তাদের তত্ত্বাবধান করেছিলো র'। দিল্লির সমাজ জীবনের সঙ্গে তাদের মেলামেশার সুযোগ ইন্দিরা গান্ধীর সরকার রাখেনি। অর্থাৎ বাংলাদেশের সে সময়ের ইতিহাস তারা জেনেছিলেন সম্পূর্ণরূপে র'য়ের বয়ান অনুযায়ী। আরো পরে, ২০০৬-২০০৯ সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর নিয়ামক ছিলো ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। একটি পত্রিকা গোষ্ঠী এবং তৎকালীন সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদ তাদের সহযোগিতা দিয়েছেন। আর শেখ হাসিনা তো নিজেই বলেছেন বর্ণচোরা সামরিক সরকার ছিলো তারই 'আন্দোলনের ফসল'। তাছাড়া কারোই এখন অজানা নেই যে শেখ হাসিনা ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন এই চক্রান্তেরই ফলে।

তার গদি লাভের দুমাসের মধ্যেই বিডিআরের বিদ্রোহ ঘটে এবং যেন কলমের এক আঁচড়ে একাত্তর সালের সাত দফা চুক্তিটির অনেকটাই বাস্তবায়িত হয়ে যায়। শেখ হাসিনা অতি সম্প্রতি সে বিদ্রোহের জন্যে বিএনপির ও ২০ দলের নেতা খালেদা জিয়াকে দোষী বলে ঘোষণা করেছেন। দেশে এবং বিদেশে তার এ দাবি কেউ বিশ্বাস করবে না। কারণ এই যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চরিত্রের পরিচয় পেতে এখন আর কারো বাকি নেই। ঈর্ষাতুর নারী যেমন তার চাইতে সুন্দরী কাউকে দেখলে অন্তত মনে মনেও শাপ-শাপান্ত, গালিগালাজ করেন, খালেদা জিয়ার আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা তেমনি তাকে তেলে-বেগুনে জ্বালিয়ে তোলে। তখন তিনি যেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেন। নিজের কৃত অপকর্মগুলোর দায় খালেদা জিয়ার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে স্বস্তি পেতে চান।

সন্দেহের অঙ্গুলী উল্টো দিকে দেখাচ্ছে

অনেকগুলো কারণে সন্দেহের অঙ্গুলী বরং সরকারের দিকেই নির্দেশিত হয়। প্রথমত, আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা (প্রধানতঃ তাপস, আজম আর নানক) বিদ্রোহের কয়েকদিন আগে থেকে মুঠোফোনে বিদ্রাহীদের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন বলে তখনও খবর রটেছিলো। দ্বিতীয়ত, প্রথম দফা খুনের পর বিদ্রোহীরা গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করছিলো এবং তারপর প্রধানমন্ত্রী তাদের জন্যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা দেন। তৃতীয়ত, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন এবং আরো দু-তিনজন মন্ত্রী তারপর পৃথক পৃথকভাবে পিলখানায় যান এবং সেদিন সন্ধ্যায় নতুন করে খুনোখুনি শুরু হয়ে যায়। চতুর্থত, সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন থেকে মেজর জেনারেল পর্যন্ত ৫৭ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা পিলখানায় সমূহ বিপদের মধ্যে ছিলেন। তাদের উদ্ধারের জন্যেও সেনাবাহিনীকে পিলখানায় যেতে দেয়া হয়নি। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মাঝপথে তাদের থামিয়ে দেন। তা না হলে সে অফিসারদের অনেকেই হয়তো প্রাণে বেঁচে যেতে পারতেন। গুজবও অনেক ছিলো। একখানি রহস্যঘেরা বাসভর্তি মাথায় রুমাল বাঁধা কিছুসংখ্যক রহস্যজনক ব্যক্তির হঠাৎ আবির্ভাব এবং হত্যাকাণ্ডগুলোর পর হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া নিয়ে বহু জল্পনা হয়েছে। বিডিআরের শত শত সদস্যের শাস্তি হয়েছে, বন্দী অবস্থায় অনেকে মারা গেছে। তথাকথিত একটা তদন্তও হয়েছে। কিন্তু বহুল প্রচারিত উপরোক্ত অভিযোগগুলোর কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

অন্যদিকে বাংলাদেশের মানুষের প্রাণের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিডিআর বাহিনীটি ভেঙে দেয়া হয়েছে (একাত্তরের সাত দফা চুক্তিতে যে শর্ত ছিলো) এবং সাত দফা চুক্তির সঙ্গে হুবহু মিল রেখেই একটা বিজিবি বাহিনী গঠন করা হয়েছে। ৫৭ জন উচ্চপদস্থ অফিসারের হত্যা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবলুপ্তির সূচনা কিনা একমাত্র ভবিষ্যতই বলতে পারবে। কিন্তু গুজব আছে যে সেসব পদে বেছে বেছে আওয়ামী লীগ সমর্থক সেনাসদস্যদের পদোন্নতি দেয়া হয়েছে এবং ডিজিএফআই ও এনএসআই নামে দুটি সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীতে বহু ছাত্রলীগ সদস্যকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

বিজিবি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আজিজ আহমেদ গত সপ্তাহে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন যে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ বিজিবি বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেবে। আরো উল্লেখ্য যে মাত্র কয়েকদিন আগে খবর পাওয়া গিয়েছিলো বিএসএফ কয়েকজন বিজিবি সদস্যকে তাদের কার্যক্রম দেখাতে কাশ্মীর সীমান্তে নিয়ে গিয়েছিলো। আরো কিছু কিছু সন্দেহের পর আলোচ্য দুটো খবর থেকে সাব্যস্ত হয় যে বিজিবি

প্রকৃতই ১৯৭১ সালের সাত দফা চুক্তি অনুযায়ী (শেখ হাসিনার পিতা যে চুক্তি অগ্রাহ্য করেছিলেন) বিএসএফের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে।

বিএসএফ কি শেখাবে বিজিবিকে?

শিক্ষক, এমনকি গৃহশিক্ষক নিয়োগের বেলাতেও প্রার্থীর যোগ্যতা ও চরিত্র বিবেচনা করা হচ্ছে নিয়ম। তাই এ প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে বিএসএফের কাছ থেকে বিজিবি কী শিক্ষা নেবে। বিএসএফের অতীত ইতিহাসও অবশ্যই বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর এ সংস্থাটি কখনো পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী মানুষকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। ভারতীয়রা পূর্ব পাকিস্তানে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশে ঢুকে গরু-ছাগল ধরে আর ফসল কেটে নিয়ে গেছে, বাংলাদেশীদের জমি দখলও করে নিয়েছে বহুবার। এবং প্রায় সময়ই এসব অপকর্ম করেছে বিএএফের সংরক্ষণে থেকে। বিএসএফ সদস্যরা অজস্রবার বাংলাদেশ সীমান্তের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। রংপুরের পীরগঞ্জে একটি ঘটনায় তাদের একটা দল বাংলাদেশের কয়েক মাইল অভ্যন্তরে ঢুকে বিডিআরের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে কয়েকজন মারা যায়।

বিগত ছয় বছরে সীমান্তে বিএসএফের ঔদ্ধত্য বিশ্ব সংবাদ সৃষ্টি করেছিলো। প্রায় প্রতিদিনই সীমান্তে বাংলাদেশীদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ফেলানীর নাম তাদের প্রতীক হিসেবে ইতিহাসে লেখা হয়ে থাকবে। শেখ হাসিনার সরকারের মন্ত্রীরা এবং ভারত সরকারের মন্ত্রী, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অজস্রবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে 'সীমান্তে মারণাস্ত্র ব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ হবে', বাংলাদেশীদের আর হত্যা করা হবে না। সাড়ে পাঁচ বছর পর মনে হয় বন্দুকের ব্যবহার যেন কমেছে। গুলির পরিবর্তে পিটিয়ে মারা হচ্ছে বাংলাদেশীদের। আমি ভাবছি যে লোকটা মারা গেল রাইফেলের গুলির পরিবর্তে লাঠিপেটা খাওয়ায় তার মান-মর্যাদায় কোন ইতর-বিশেষ হলো কিনা।

যতোদূর জেনেছি যেসব ছিঁচকে চোরাচালানী ভারত থেকে সামান্য কিছু জিনিস এনে বাংলাদেশে বিক্রি করে সামান্য মুনাফা করতে চায়। ঘুষের অঙ্ক নিয়ে বিরোধের কারণেই বিএসএফের জওয়ানরা এই হতভাগ্য মানুষগুলোকে অবলীলায় খুন করছে। অন্যদিকে দেখুন, বাংলাদেশের ইলিশ শত শত টনে সীমান্ত পেরিয়ে যাচ্ছে। ইলিশের দেশের মানুষের জন্যে মৎস্যরাণী ইলিশ এখন সুদূর অতীতের স্মৃতি মাত্র। সেজন্যে কি কোন চোরাচালানী গুলি কিংবা লাঠিপেটা খাচ্ছে? মারা যাচ্ছে কোন ইলিশ চোরাচালানী? বিএসএফের কাছ থেকে এসব ব্যাপারে কি প্রশিক্ষণ নিয়ে আসবে বিজিবি বাহিনী? তারা কি শিখে আসবে যে বিএসএফ যেমন বিনা বাধায় বাংলাদেশী ইলিশ ভারতে চলে যেতে

দিচ্ছে তেমনি ভারতীয় ফিনসিডিলও যেন বিনা বাধায় বাংলাদেশে আসতে দেয়া হয়?

ফেনসিডিলের কারখানা কেন আমাদের সীমান্তে?

আরেকটা খবর যেন চীনা বাদামের খোসার মতো অবহেলায় ফেলে দেয়া হয়েছে আলোচ্য সংবাদ সম্মেলনে। বাংলাদেশের সীমান্ত বরাবর ফেনসিডিল তৈরির কারখানাগুলো ভারত বন্ধ করবে না। অজুহাত হিসেবে বলা হয়েছে ফিনসিডিল নাকি ভারতে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার হয়। আমার বুদ্ধি বোধ হয় এখন আর আগের মতো চটপট কাজ করছে না। ওষুধের প্রয়োজন যদি বিশাল ভারতের হয় তাহলে কারখানাগুলো কেন বাংলাদেশের সীমান্তের লাগোয়া তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে? কারখানাগুলো কেন ভারতের অন্যত্র তৈরি হচ্ছে না? – যেমন করে বিয়ার, হুইস্কি ইত্যাদি সুরা জাতীয় পানীয়ের অজস্র কারখানা ছড়িয়ে আছে ভারতের সর্বত্র?

কিছুদিন আগে বাংলাদেশের এক শিল্পপতি ব্যবসায় উপলক্ষে ইউরোপে আর যুক্তরাজ্যে এসেছিলেন এবং পথগতিকে আমার সঙ্গে দেখা করে যান। তিনি বলছিলেন উত্তর বাংলাদেশসহ যেসব সীমান্তবর্তী এলাকায় বিএনপির প্রভাব বেশি ফেনসিডিলের চালান সেখানেই আসছে। এই বিষাক্ত মাদক সেবন করে বিএনপি কর্মীরা প্রথমে কিছু চেঁচামেচি ও মাৎলামী করে। ধীরে ধীরে তারা সকল কর্মোন্মাদনা হারিয়ে ফেলে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ ক্যাডারদের জন্যে আসে সস্তা ভারতীয় হুইস্কি। সে হুইস্কি পান করে তারা রাতে ফূর্তি করে, আর দিনের বেলা লুঙ্গি ও টুপি পরে 'মসজিদের চাঁদা' তুলতে যায়।

বাংলাদেশকে সিকিমে পরিণত করে দেওয়ার সব হাতিয়ার শেখ হাসিনা গোড়া থেকেই ভারতের হাতে তুলে দিয়েছেন। ২০১০ সালের জানুয়ারিতে দিল্লিতে গিয়ে কতগুলো গোপন চুক্তির মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের সড়ক, রেল, নদী ও বন্দরগুলো বিনা মাশুলে ব্যবহারের অধিকার ভারতকে দিয়ে এসেছেন। তখন থেকেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপ বেড়ে গেছে। সাধারণ নির্বাচনের ব্যাপারে গত বছর দিল্লি যেমন অশোভনভাবে হস্তক্ষেপ করেছে আধুনিককালে তার নজির সত্যি বিরল। ৫ জানুয়ারির তামাশার নির্বাচনের পরে অবৈধ সরকারের পক্ষে স্বীকৃতি আদায়ের জন্যে ভারতীয় কূটনীতিকরা যেমন বিশ্বব্যাপী দাপাদাপি করেছেন তার থেকে অবশ্যই প্রমাণ হয় যে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি সত্যি সত্যি পরিচালিত হচ্ছে সাউথ ব্লক থেকে।

(লন্ডন, ০২.০৯.১৪)

সূর্যরশ্মিকে শেকলবন্দী করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে সরকার

এয়ার মার্শাল এ কে খোন্দকার সৎসঙ্গে আছেন। একটা অবৈধ সংসদে তার নতুন প্রকাশিত বই নিয়ে যারা গালিগালাজের তাণ্ডব করেছেন, কিচির মিচির করে তার বই নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন এবং যে মন্ত্রী তার বই পুড়িয়েছেন তাদের দৃষ্টান্ত মধ্যপ্রাচ্যেও কোন কোন দেশে মেলে। নিকটজন কেউ মারা গেলে নিজেদের, এমনকি পারিবারিক শোকও তাদের যথেষ্ট মনে হয় না। ঋণ করে হলেও তারা শোক দেখানোর জন্যে লোক ভাড়া করে আনে। নইলে পাড়া-পড়শীর কাছে মান বাঁচে না।

এবং হলফ করে বলতে পারি দু'একজনের বেশি মন্ত্রী কিংবা সংসদ সদস্য আদৌ বইখানি পড়েননি। পড়লেও বোঝার ক্ষমতা বড়জোর অল্প কয়েকজনেরই থাকতে পারে। এ কে খোন্দকার যে সময়ের ইতিহাস লিখেছেন এ বইতে সে সময় এসব মন্ত্রী-সংসদ সদস্যদের অনেকে প্রাইমারী স্কুলেও ভর্তি হননি। তখন যা সত্য ছিলো কিংবা ছিলো না তারা জানবেন কি করে? বইয়ের কিছু কথা প্রভুর পছন্দ হয়নি, সে রকম শোনা কথাও তাদের জন্যে যথেষ্ট। পুতুলের স্প্রিংয়ে দম দেয়া হয়ে গেছে, সুতরাং সে পুতুল নর্তন-কুর্দন করবেই।

"বাপে যারে ভরম (সম্ভ্রম) করে, পুতে তারে নরোম করে", অতি পরিচিত বাংলা প্রবাদ। বর্তমান বাংলাদেশে এটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ড. কামাল হোসেন ছিলেন আওয়ামী লীগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, শেখ মুজিবুর রহমানের আইন উপদেষ্টা ও বন্ধু ছিলেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে মুজিবের সঙ্গে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েছিলেন, ১৯৭২ সালের ৭ জানুয়ারি নেতার সঙ্গেই লন্ডনে ফিরেছেন, মুজিবের সরকারের আইনমন্ত্রী হিসেবে তিনি বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করেছেন। শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে থাকলে তার অবশ্যই জানার কথা ছিলো। তাছাড়া শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার আশাতেই যে মুজিব সমূহ বিপদের মুখে দেশবাসী, নিজের দলের নেতা ও কর্মীদের ফেলে পাকিস্তান চলে গিয়েছিলেন সেটাও ড. কামাল হোসেন জানতেন। সেজন্যেই তিনি মুজিবকে স্বাধীনতার ঘোষক বলতে রাজি হতে পারেননি। সে কারণে শেখ হাসিনা অত্যন্ত দুঃখজনক ভাষায় বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন দফায় ড. কামাল হোসেনকে গালাগালি করেছেন।

সেই ৭ জানুয়ারি ভোরে ড. কামাল হোসেন লন্ডন বিমান বন্দর থেকে সরাসরি এবং সপরিবারে ভগ্নিপতি আমান উল্লাহ খানের সঙ্গে তার বাড়িতে চলে

যান, আর ভারতের হাইকমিশনার আপা ভাই পন্থ বিমান বন্দর থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্ল্যারিজেস হোটেলে নিয়ে যান। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দফতর থেকে খবর পেয়ে আমি সোজাসুজি ক্ল্যারিজেসে চলে গিয়েছিলাম। বাংলাদেশী হিসেবে আমাকে মুজিব ভাই প্রথম দেখেছিলেন। পাকিস্তানে তাকে এ ধারণা দেয়া হয়েছিলো যে বাংলাদেশকে তার দাবি অনুযায়ী পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছে, সুতরাং দেশে ফিরে উগ্রপন্থী কর্মীদের শায়েস্তা করা তার কর্তব্য হবে। দেশ যে স্বাধীন হয়েছে সে খবর সর্বপ্রথম আমি তাকে দিয়েছিলাম। শুনে আমাকে জড়িয়ে ধরে অনেক কেঁদেছিলেন তিনি। আমিও কেঁদেছি তার সঙ্গে। ততোক্ষণে আরো কয়েকজন বাংলাদেশী এসে পড়েছিলেন। তারা সকলে সাক্ষী ছিলেন সে ঘটনার। সেদিন বিবিসি থেকে তার মুক্তির খবর প্রথম প্রচার করেছিলাম আমি। তার আগে মুক্তিযুদ্ধের আনুপূর্বিক বিবরণ তাকে দিয়ে যাই। আমি তাকে এও বলেছিলাম যে শহীদানের সঠিক হিসেব কেউ রাখেনি, তবে বিভিন্ন মহলের প্রচারিত খবর খুবই সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে বিবিসিতে আমরা অনুমান করেছি যে তিন লাখ লোক শহীদ হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে। সেদিন শেখ মুজিবুর রহমান ভ্রমণক্লান্ত, নিদ্রাকাতর এবং আকস্মিক অপ্রত্যাশিত খবরে উদভ্রান্ত এবং বিভ্রান্ত ছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এসব কারণেই মুহূর্তের স্খলনে ডেভিড ফ্রস্টকে তিনি তিন লাখের পরিবর্তে তিন মিলিয়ন বলে ফেলেছিলেন। ২০১১ সালের ২৩ মে লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক প্রসঙ্গে উপরোক্ত তথ্যগুলো আমি প্রকাশ করি।

আওয়ামী সরকারের বিশ্বাসের তিন খুঁটি

তার প্রতিক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সচিবালয় থেকে প্রকাশিত প্রেসনোটে কার্যত আমাকে মিথ্যাবাদী বলে আমার বক্তব্য উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হয়। শুধু তাই নয়, লন্ডনে নিযুক্ত বর্তমান ও সাবেক প্রেস মিনিস্টারদ্বয়কে দিয়ে গার্ডিয়ানে এবং ডেইলি স্টার পত্রিকায় লেখানো বিস্তারিত প্রবন্ধে বলা হয় যে আপা ভাই পন্থ শেখ মুজিবকে অভ্যর্থনা করতে বিমান বন্দরে যাননি। আরো দাবি করা হয় যে আমি মোটেই ক্ল্যারিজেস হোটেলে যাইনি, সেবারে মুজিবের সঙ্গে আমার দেখাও হয়নি। ক্ল্যারিজেস হোটেলে প্রায় ২০০ সাংবাদিকের আন্তর্জাতিক সংবাদ সম্মেলনে মাইক্রোফোন হাতে শেখ মুজিবের গা ঘেঁসে যে আমি বসেছিলাম ডকুমেন্টারি ফিল্ম এবং ভিডিওতে সেটা পরিষ্কার। কিন্তু মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করার ব্রত নিয়ে যেন শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন।

বর্তমান সরকার তিনটি অসত্যের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ শাসনের রাজকীয় অধিকার দাবি করে। অন্তত (অবৈধ) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিবেচনায় এগুলো আওয়ামী ধর্ম বিশ্বাসের ঈমানের অঙ্গ। এ তিনটি অসত্য হচ্ছে: শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ লোক শহীদ হয়েছেন, এবং আওয়ামী লীগের যেসব নেতা পালিয়ে গিয়ে ভারত

সরকারের আতিথেয়তা ভোগ করছিলেন কিংবা ভারতের মিলিটারী একাডেমিতে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন তারাই হচ্ছেন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা। বাংলাদেশের ভেতরে থেকে যেসব সেনা অফিসার বিভিন্ন সেক্টরে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, যে ছাত্র-জনতা তাদের অধীনে সংগঠিত হয়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছেন, যেসব নারী নির্যাতিত ও নিগৃহিত হয়েছেন এবং যেসব সাধারণ মানুষ নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছেন ও প্রাণ দিয়েছেন তাদের কেউ মুক্তিযোদ্ধা নন। আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার সরকার বিভিন্ন সময়ে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, লে. জে. মীর শওকত আলী, কাদের সিদ্দিকী বীর বিক্রম, মেজর এম এ জলিল, এমনকি জেনারেল সফিউল্লাহকে পর্যন্ত রাজাকার বলে অভিহিত করেছে। দেশে ও বিদেশে যারা প্রচারণা, আন্দোলন ও অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে বিশ্ব জনমত গঠন করে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় সম্ভব ও সহজ করেছেন তাদের কারো স্বীকৃতি নেই এই দল ও এই সরকারের কাছে।

সর্বশেষ তাদের কাতারে শামিল হয়েছেন এয়ার মার্শাল এ কে খোন্দকার। মুক্তিযুদ্ধে তিনি ছিলেন উপ-প্রধান সেনাধ্যক্ষ। পরবর্তীতে বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। অস্ট্রেলিয়া আর নতুন দিল্লিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন তিনি। এমনকি শেখ হাসিনার সরকারের যতোদিন বৈধতা ছিলো (৪ জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত) ততোদিন তিনি সে সরকারের পরিকল্পনামন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু মনে হচ্ছে তিনি আওয়ামী লীগের ঈমানের তিনটি খুঁটির কোন কোনটির সমালোচনা করেছিলেন তার বইতে। সুতরাং আওয়ামী লীগের বিচারে তিনি ধর্মত্যাগী – ক্ষমার অযোগ্য। মুক্তিযুদ্ধের আরো অনেক নায়কের মতো তাকেও সরকার ও শাসক দল রাজাকার আপবাদ দিয়ে দিয়েছে। বাইবেলে 'চোখের বদলে চোখ' প্রতিশোধের কথা বলা হয়েছে। নামটা মনে নেই, কিন্তু একজন মনীষী বলেছেন, সকলেই যদি পরস্পরের চোখ উপড়ে ফেলে তাহলে দেশটা শিগগিরই অন্ধের দেশে পরিণত হবে। যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন এবং যারা সে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন একে একে তাদের সবাইকে যদি রাজাকারের দলে ঠেলে দেয়া হয় তাহলে জাতির গৌরব করার জন্যে অবশিষ্ট থাকবেন কারা? একে একে সবগুলো প্রদীপ যদি নিভিয়ে দেয়া হয় তাহলে মরণপুরীর অন্ধকার সৃষ্টি হয় না কি?

এক বৃক্ষের অরণ্য

কয়েক বছর আগে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত কলামে লিখেছিলাম যে শেখ হাসিনা এক বৃক্ষের অরণ্য সৃষ্টি করতে চান, যে অরণ্যে একটি মাত্র বিশাল বৃক্ষ থাকবে। সমস্যা হচ্ছে ঝড় যদি ওঠে তাহলে সে বৃক্ষটি 'পপাৎ ধরণীতলে' হতে বিলম্ব হবে না। অরণ্যে শত বৃক্ষ থাকে বলেই প্রচণ্ডতম ঝড়েও বহু বৃক্ষ অক্ষত থাকে। শেখ হাসিনা চান যে বাংলাদেশে তার পিতাই একমাত্র নায়ক, একমাত্র সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে অবশিষ্ট থাকবেন। তার পরিণতিও এখন সকলের চোখের সামনে। শেখ মুজিবুর রহমানের বহু ভুলত্রুটি বাংলাদেশের মানুষ ভুলতে

চলেছিলো। স্বাধীনতার আন্দোলনে তার নেতৃত্বের কথা স্মরণ করে ধীরে ধীরে তিনি জাতির পিতার মর্যাদা ফিরে পেতে চলেছিলেন। বিগত প্রায় ছয় বছর ধরে পিতাকে এক বৃক্ষের অরণ্যের আসনে বসাতে গিয়ে হাসিনা বরং তার স্মৃতিকে সকল সমালোচনার ঝড়ের একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত করেছেন। বহু তথ্য জানা সত্ত্বেও যারা এতোকাল ব্যক্তিগতভাবে মুজিবের সমালোচনা করেননি তারাও এখন এয়ার মার্শাল খোন্দকারের মতো এতোকালের চাপা দিয়ে রাখা তথ্যগুলো প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। তাদের এখন অনেক বয়স হয়েছে, মৃত্যুর আগে তারা অন্তত কিছু সত্য প্রকাশ করে যেতে চান।

এয়ার মার্শাল এ কে খোন্দকারের বইখানি এখনো পড়ার সুযোগ পাইনি। এই সুদূরে বাংলাদেশের বই সংগ্রহ করা প্রায়ই সময় সাপেক্ষ। সুতরাং সে বইয়ের ওপর প্রেক্ষিত দৃষ্টিপাত আমি করতে যাবো না। শুনেছি খুবই জনপ্রিয় হয়েছে সে বই, লোকে ভিড় করে কিনছে, আত্মীয়-বন্ধুদের উপহার দিচ্ছে। কিন্তু বইখানি যদি পৃথিবীর সবচাইতে ওঁছা বইও হতো তাহলেও যে মন্ত্রী সে বই পুড়িয়েছেন, যেসব মন্ত্রী ও অবৈধ সাংসদ সে বই বাজেয়াপ্ত করার দাবি জানাচ্ছেন তাদের আমি নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষের কাতারে ফেলবো। বই পুড়িয়ে মানুষের চিন্তা ও মননশীলতাকে হত্যা করাব প্রয়াস পেয়েছিলেন অ্যাডলফ হিটলার। কিন্তু কোথায় এখন সে হিটলার? কোথায় তার নাৎসিবাদ? মানবজাতি এখন একবাক্যে তাকে 'স্টুপিড' বলে রায় দেয়। গুম, খুন আর হত্যা দিয়ে যারা মন্ত্রী ও সাংসদ হয়েছেন ইতিহাস থেকে অন্তত কিছু শিক্ষাও তাদের নেয়া উচিত ছিলো।

বই বাজেয়াপ্ত করায় শেখ হাসিনার অরুচি আছে বলে আমি মনে করি না। প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হয়েই 'আমার ফাঁসি চাই' বইখানি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন তিনি। সে বই লিখেছিলেন মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু। তিনি ও তার স্ত্রী বছরের পর বছর শেখ হাসিনার অন্দর মহলের সহকারী ছিলেন। কিন্তু রেন্টুর বইয়ের অজস্র ফটোকপি বাজারে বিক্রি হয়েছে এবং এখনো বিক্রি হয়। বইখানি নিষিদ্ধ না হলে তার এক শতাংশ কপিও বিক্রি হতো কিনা সন্দেহ। হাসিনা এখন মতামত স্তব্ধ করার, সত্যকে চাপা দেবার ভিন্ন পথ ধরেছেন। তিনি দিগন্ত টেলিভিশন ও ইসলামী টেলিভিশন বন্ধ করে দিয়েছেন, চ্যানেল ওয়ানকে নির্বাক করে দেয়া হয়েছে। তিনি সাজানো অভিযোগে এবং বিনা বিচারে সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে আটক করে রেখেছেন দুবছর হতে চললো, আমার দেশ পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করা হয়েছে, আরো পত্রিকা বন্ধ করার হুমকি দেয়া হয়েছে, মিথ্যা মামলায় জড়ানো আর দৈহিক নির্যাতন করা হচ্ছে সাংবাদিকদের। তাতেও মন উঠছে না এই সরকারের। সত্য প্রকাশ অসম্ভব করে তোলার জন্যে নতুন আইন করা হচ্ছে। কিন্তু সত্য এমন এক বস্তু যা কখনো না কখনো সকল অন্তরাল ডিঙিয়ে প্রকাশিত হবেই। সরকার সূর্যের আলোকে শেকলবন্দী করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে মাত্র।

(লন্ডন, ০৯.০৯.১৪)

হাসিনার নির্বাচনী বিজয়ের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে

মনে মনে ক্ষীর খাচ্ছেন শেখ হাসিনা। তবে বুঝতে অসুবিধে হবে না যে খুবই ত্রস্তে আছেন তিনি। তিনি জানেন হাতে তার সময় বেশি নেই।

গত সপ্তাহের বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) অবৈধ সংসদে তিনি বলেছেন, জনগণ চাইলে তিনি হরতাল বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে পারেন। এ বক্তব্যের তাৎপর্য বুঝতেও কারো অসুবিধা হবে না, আশা করি। হাসিনা জরুরিভাবে হরতাল-আন্দোলন বন্ধ করতে চান। কিন্তু বিপুল গরিষ্ঠ দেশবাসী বর্তমান সময়ে তাতে সাড়া দেবে না। ওদিকে তার নিজের দল থেকেও সোচ্চার দাবি উঠছে না। দাবি যাতে ওঠে তার ব্যবস্থা তিনি করে দিলেন। শাসক দল, এ-দল ও-দলের নামে তিনশো সমর্থককে তিনি সংসদের সদস্য করে দিয়েছেন। তার কাছে অনেক ঋণ তাদের। শেখ হাসিনার ইচ্ছা পূরণের জন্যে অবশ্যই অভীপ্সু দাবিটি তুলতে হবে তাদের।

প্রশ্ন উঠবে জনগণ বলতে কি বুঝবো আমরা? দেশের মানুষ জানে নির্বাচনের ঘোষিত তারিখের কয়েকদিন আগেই প্রশাসনিক ঘোষণার জোরে সংসদীয় গরিষ্ঠতা পেয়ে গিয়েছিলো আওয়ামী লীগ। অন্যেরাও নির্ধারিত তারিখে ভোটার-বিহীন তামাশায় নির্বাচিত ঘোষিত হয়েছেন। সুতরাং সুদর্শন সংসদ ভবনের ভেতরে বসে যারা এখন নর্তন-কুর্দন করছেন, সরকারের রাজনৈতিক বিরোধীদের গালাগাল করছেন ও হুঙ্কার দিচ্ছেন, তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কারো প্রতিনিধিত্ব করেন না। জনগণের হয়ে কথা বলার অধিকার তাদের নেই। কিন্তু বিদেশীরা অতো-শতো জানবে কি করে? আর অতো গরজই বা তাদের কি? হাসিনাও এখন বুঝে গেছেন বর্তমান সময়ে দেশে একমাত্র রাজনীতি বিদেশীদের হাতে। তাদের যদি ধোঁকা দেয়া যায় যে ওরা সংসদে বসেছেন, সুতরাং তারা অবশ্যই জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন – যেমন বৃটেন প্রমুখ গণতান্ত্রিক দেশে সংসদের সদস্যদের জনপ্রতিনিধি মনে করা হয় – তাহলে শেখ হাসিনার অভিপ্সার ৮০-৯০ শতাংশ পূরণ হয়ে যায়।

তর্ক-বিতর্কের ঝড় তুলে আর ধানাই পানাই করে ৫ জানুয়ারির পরেও নয়টি মাস তিনি গদি দখল করে আছেন। এদিকে লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই যে অবৈধ সংসদে আইন পাস করার হিড়িক পড়ে গেছে। কিন্তু তার প্রকৃত কারণ সবাই

বুঝতে পেরেছেন কি? কারণ হচ্ছে শেখ হাসিনাও এখন বুঝে গেছেন বিশ্বের কোথাও কেউ (শুধুমাত্র ভারত ছাড়া) সংসদ ভবনের বর্তমান তামশগীরদের (তামাশা সৃষ্টিকারী) বৈধভাব নির্বাচিত সংসদ বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে না। হাসিনা তাই মনে মনে সাব্যস্ত করে ফেলেছেন যে অদূর ভবিষ্যতে কোন প্রকারের একটা নির্বাচন তাকে দিতেই হবে। সে সঙ্গে তিনি স্থির করে নিয়েছেন যে গদি তিনি ছাড়বেন না। সুতরাং নির্বাচনের প্রকার ও প্রকৃতিকে তিনি নতুন করে ঢেলে সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

প্রস্তুতি পর্বে গোড়াতেই সম্প্রচার নিয়ন্ত্রণের আইন করা হচ্ছে। তারপর আসছে উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের ইচ্ছে মতো শাস্তি দেবার ও বরখাস্ত করার লক্ষ্যে সংসদীয় অভিশংসন আইন। শেখ হাসিনার পিতা বাকশাল করার সময় রাষ্ট্রীয় ফরমান বলে সকল বেসরকারি পত্রপত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বিশ্বব্যাপী তার কি ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া হবে তিনি কল্পনা করতে পারেননি। এমনকি লন্ডনের হিথরো বিমান বন্দরের ভিআইপি স্যুইটে হলভর্তি ব্রিটিশ ও অন্যদেশীয় সাংবাদিকদের সামনে আমার সঙ্গে তার প্রকাশ্য বিতর্ক উপস্থিত সাংবাদিক মহলে দারুণ আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলো। বাংলাদেশে তখন মুক্ত মিডিয়া বলতে কিছু ছিলো না। কিন্তু দেশের মানুষ কেমন ক্রুদ্ধ হয়েছিলো ১৫ আগস্টের ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া থেকে সেটা বেশ বোঝা গেছে।

নদীর ভাঙন এবং কিস্তিবন্দী মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ

পিতার অভিজ্ঞতা থেকে অন্তত এই একটি ব্যাপারে শেখ হাসিনা শিক্ষা নিয়েছেন মনে হয়। মিডিয়ার বিরুদ্ধে থোক ব্যবস্থা নেবার পরিবর্তে তিনি কিস্তিতে কিস্তিতে মিডিয়ার স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছেন, যেমন করে নদীর কূল ভেঙে ভেঙে গোটা জনবসতিকেই গিলে খায়। প্রথমেই সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে তার ক্যাডারদের লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। ভয় দেখিয়ে সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ করাই ছিলো উদ্দেশ্য। বহু সাংবাদিক তাদের হাতে দৈহিক নির্যাতন সহ্য করেছেন। মাঝে মাঝে কলাম লেখেন বলে সুপ্রিম কোর্ট এলাকায় অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ্র ওপর সন্ত্রাসী আক্রমণ সর্বশেষ একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। ক্রমে ক্রমে সাংবাদিকদের হত্যাও শুরু হয়েছে। সাংবাদিক দম্পতি মেহেরুন রুনি ও তার স্বামী সাগরের হত্যা সারা বিশ্বের মানুষ জেনে গেছে। এরপর শুরু হয় সরকারের নতজানু আইনী প্রক্রিয়াকে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার। আইনের নামে সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে বিনা বিচারে জেলে আটক রাখা হয়েছে দুবছর হতে চললো। শুনেছি মাঝে মাঝেই তাকে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করা হচ্ছে। তার পত্রিকা আমার দেশের প্রকাশ বন্ধ তখন থেকে। সাজানো অভিযোগে বহু সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। বিভিন্ন পত্রিকাকে সাময়িক বন্ধ করা অথবা বন্ধ করার হুমকি দেয়া হয়েছে।

ইলেকট্রনিক মিডিয়াও সরকারের কোপ এড়াতে পারছে না। টকশোগুলোতে কাকে আমন্ত্রণ করা যাবে কি যাবে না সে সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে নির্দেশ আসে বলে শুনেছি। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং বিভিন্ন টকশোর হোস্ট বা অতিথির বিরুদ্ধে অযাচিত ও অমূলক সমালোচনা করছেন। চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি ও ইসলামী টেলিভিশন তো এখনো বন্ধ আছে। এ নিয়ে বেশি উচ্চবাচ্য হয়নি, কিন্তু অনেকেই জানেন একের পর এক অন-লাইন সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। কিছুকাল আগে সোনারবাংলাদেশডটকম বন্ধ করে দেয়া হয়েছিলো। মিডিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করা বরাবরই ছিলো উদ্দেশ্য। এখন ছুরির আগার খোঁচার পরিবর্তে কুড়ালের ঘা আসছে। সম্প্রচারের ওপর টেনে ধরা রশি আরো শক্ত করার জন্যে সম্প্রচার আইন হচ্ছে। লক্ষ্য হচ্ছে হাসিনার পরিকল্পিত 'নির্বাচনী তামাশা' সম্বন্ধে দেশের কিংবা বিদেশের মানুষ যেন বিশেষ কিছু জানতে না পারে। এ আইন পাস হলে বাংলাদেশে সংবাদের স্বাধীনতা বলে কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। এমনি করে মতামত প্রকাশের অধিকারকে হত্যা করেছিলো হিটলারের নাৎসিরা।

হাসিনার পুতুল খেলা

সরকারের সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও আদালতের সম্পূর্ণ দলীয়করণ তারা এখনো করতে পারেনি। এ সরকারের আগের কিছু বিচারপতি এখনো বহাল আছেন। দলীয় বিচারকদের কেউ কেউ ভবিষ্যতে মত পরিবর্তন করতে পারেন। বিশেষ করে পরিকল্পিত নির্বাচন প্রসঙ্গে আদালতের দিক থেকে কোন সমালোচনা সরকারের জন্যে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এমন নয় যে আদালত ও আইনী পদ্ধতি সম্বন্ধে তাদের সামান্যতমও শ্রদ্ধাবোধ আছে। সম্প্রচার আইন করে দেশের ভেতরের জনমতকে অবশ্যই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানোর আয়োজন করা হয়েছে। সরকার কি করছে জানতে না পারলে দেশবাসী কি করে সরকার সম্বন্ধে মতামত গঠন করবে? সে ক্ষেত্রে সমালোচনা কিংবা বিরোধিতার প্রশ্নই উঠবে না।

কিন্তু কোন বিচারপতি বিরূপ রায় দিলে বিদেশীরা সেটা নিয়ে হৈচৈ করতে পারে। এবং বিদেশীদের চোখ ঠারার জন্যেই সরকার নির্বাচন দিতে বাধ্য হবে বলে মনে হয়। তাদের স্বীকৃতি পাওয়া না গেলে হাসিনার গদি আঁকড়ে থাকা কঠিন হবে। এসব সম্ভাবনার পথ বন্ধ করারও উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সংবিধানের আরো একটি সংশোধন এবং অভিশংসন আইন দিয়ে বিচারপতিদের ঘাড়ের ওপর ডেমোক্লিসের তরবারি ঝুলিয়ে দেয়া হচ্ছে। সম্পূর্ণ সরকারের নিজের লোক দিয়ে গঠিত তথাকথিত সংসদকে বিচারপতিদের বিচার ও বরখাস্ত করার অধিকার দেবার আয়োজন হচ্ছে। সরকারের নির্দেশ ও অভিপ্রায়ের

বিরুদ্ধে রায় দেয়া হলে বিনা ঝামেলায় সংশ্লিষ্ট বিচারপতিকে বরখাস্ত করা যাবে। কোন্ বিচারপতির ঘাড়ে দুটো মাথা আছে যে এরপর তিনি স্বাধীন অভিমত ও বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী রায় দেবেন?

ছোটবেলায় গ্রামে দেখতাম খুকুমণিরা গভীর মনোনিবেশ সহকারে কাদা কিংবা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে পুতুল তৈরি করছে। কিন্তু সে ধৈর্য বেশিক্ষণ টিকে থাকছে না। কোথাও কিছু মনমতো না হলে, কিংবা খেলার সাথীদের কেউ বিরূপ মন্তব্য করলে সে পুতুল ভেঙে কিংবা ছিঁড়ে খুকুমণি ছুঁড়ে ফেলে দিলো। হয়তো খেলার আসর থেকেও উঠে গেল সে। বাংলাদেশে যিনি নিজেকে প্রধানমন্ত্রী বলে দাবি করেন তিনিও 'খুকুমণি মনঃস্তত্ত্বে' ভুগছেন বলেই মনে হয়। সংবিধানকে তিনি খেলার ছলে রদবদল করছেন। স্বাধীন নির্বাচন হলে তিনি হেরে যান। অতএব ১৯৯৫-৯৬ সালে তিনি হরতাল, অবরোধ, ভাঙচুর ও হত্যা দিয়ে বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি এবং দেশকে অচল করে দিয়েছিলেন। একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ছাড়া দেশে তিনি নির্বাচন হতে দেবেন না। দেশের সর্বনাশ এড়ানোর লক্ষ্যে খালেদা জিয়ার সরকার অবশেষে সে দাবি মেনে নিলেন। সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি চালু করা হলো।

বিজয়ের গ্যারান্টি চেয়েছিলেন তিনি

কিছুকালের মধ্যেই হাসিনা প্রমাণ পেলেন যে তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতিও তার নির্বাচনী বিজয়ের যথেষ্ট গ্যারান্টি নয়। ২০০১ সালের অক্টোবর মাসের নির্বাচনে তিনি শোচনীয় রকম হেরে গেলেন। তখন তিনি কি রকম তাণ্ডব করেছিলেন দেশবাসী এখনো ভুলে যায়নি, আশা করি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান এবং রাষ্ট্রপতি সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাবেক প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদকে বিশ্বাসঘাতক, রাষ্ট্রদ্রোহী ইত্যাদি যা-তা বলে গালি দিয়েছিলেন। তখনই বোঝা গিয়েছিলো যে হাসিনার তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি প্রীতির অকালমৃত্যু হয়েছে।

পরবর্তী পাঁচ বছর সে পদ্ধতির বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার আক্রোশ দিনে দিনে তীব্র হয়েছে। সংসদ বর্জন, ১৭৩ দিন ধরে হরতাল ইত্যাদি প্রতিবাদের কোন পন্থাই তিনি বাদ দেননি। লগি-লাঠি-বৈঠার আন্দোলনের কথা ভুলে গেছেন কেউ? খালেদা জিয়ার সরকার মেয়াদ শেষে ২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। সেদিনই বিকেলে শেখ হাসিনার ডাকে দেশের সকল অঞ্চল থেকে লগি-লাঠিধারী ভাড়াকরা গুণ্ডাদের শত শত বাসে করে রাজধানীতে আনা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রকাশ্য দিবালোকে তারা পুরানা পল্টনে জামায়াত সমর্থক দাবি করে কয়েকজন পথচারীকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মারে। পরবর্তী কয়েকদিনে রেললাইন উপড়ানো হয়েছে, সড়ক, সেতু ও বন্দর অবরোধ করে দেশের অর্থনীতিকে স্থবির করে

দেয়া হয়েছে, আরো অনেক লোককে সড়কে লাঠিপেটা করে হত্যা করা হয়েছে। এমনকি বঙ্গভবনের বিদ্যুৎ, গ্যাস ও টেলিফোন সংযোগ বন্ধ করে দিয়ে সপরিবারে রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজ উদ্দিন আহমেদকে অসহায় অবস্থায় গৃহবন্দী করে রাখা হয়।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে তখন কয়েকটি অশুভ নক্ষত্রের শ্মশান-নৃত্য চলছিলো। একখানি ইংরেজি ও একখানি বাংলা দৈনিক তাদের 'মাইনাস টু' ফর্মুলা বাস্তবায়নের আশায় ভারতের হাইকমিশনার বীনা সিক্রি ও মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টম্যাসের সঙ্গে হাত মেলায়। পেছন থেকে এ চক্রকে ইন্ধন দিচ্ছিলেন সেনাপ্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদ। সম্প্রতি জানা গেছে যে ফাঁকতালে নির্বাহী রাষ্ট্রপতি হবার শখ ছিলো তার। এ চক্রের চাপে রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভেঙে দিতে বাধ্য হন। দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয় এবং ওয়াশিংটন থেকে মার্কিন নাগরিক ফখরুদ্দীন আহমেদকে এনে 'অন্তর্বর্তী' সরকারের 'প্রধান উপদেষ্টা' করা হয়। ২০০৭ সালের ১৫ এপ্রিল বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের কাছে শেখ হাসিনার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তিনি বরাবরই এ ষড়যন্ত্রের বলয়ে ছিলেন। সেদিন তিনি বলেছিলেন যে এই বর্ণচোরা সামরিক সরকার 'তারই আন্দোলনের ফসল'। শেখ হাসিনা আরো বলেছিলেন যে ক্ষমতা পেলে সে সরকারের সকল কাজকর্ম তিনি বৈধ করে দেবেন।

থলের বেড়াল এখন বেরিয়ে এসেছে

অশুভ নক্ষত্রদের অশুভ চক্রান্তে শেখ হাসিনা ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে 'জয়ী' হন এবং ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে সরকার গঠন করেন। তখন থেকেই শুরু হয় গণতন্ত্র হত্যা করে পেছনের দরোজা দিয়ে বাকশালকে ফিরিয়ে আনার তৎপরতা। খুবই বিতর্কিত একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির তদোধিক বিতর্কিত রায়ের একাংশের দোহাই দিয়ে বিরোধী দল বিবর্জিত সংসদে সংবিধান নিয়ে আরো একবার পুতুল খেলা চলে। তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি নিষিদ্ধ করা হয় পঞ্চদশ সংশোধনীতে। বিরোধী দলগুলো তখন থেকেই প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলন এক পর্যায়ে এতোই বেগবান হয় যে শেখ হাসিনার সরকারের পতন আসন্ন মনে হচ্ছিলো। একদিকে বিদেশীদের চাপ, অন্যদিকে নিজ দলের ভেতরের আওয়ামী চরদের ছলনায় খালেদা জিয়া আন্দোলনে ঢিলে দিয়েছিলেন। আমার প্রায়ই জানতে ইচ্ছে করে এই জিরিয়ে জিরিয়ে আন্দোলন করা সম্বন্ধে এখন তিনি কি ভাবেন।

গদি দখলের পরে পরেই অর্ধশিক্ষিত (কথাবার্তায় তাই মনে হয়) আইন প্রতিমন্ত্রী কামরুল ইসলামের অধীনে কমিটি করে শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি থেকে হত্যা পর্যন্ত বিভিন্ন অভিযোগে সোয়া সাত

হাজার মামলা তুলে নেওয়া হয়েছিলো। এখন আবার পাইকারী হারে (পদ্মা সেতু দুর্নীতিতে বিশ্বব্যাংক দ্বারা অভিযুক্তরাসহ) মন্ত্রীদের সরকারের তাবেদার দুর্নীতি দমন কমিশন ধুয়ে মুছে তুলসীপাতা করে দিয়েছে। অন্যদিকে খালেদা জিয়াসহ বিরোধী দলের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে সাজানো অভিযোগের মামলাগুলোতে তাদের দোষী সাব্যস্ত করার জন্যে সরকার ব্যস্ত হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। এবং সে উদ্দেশ্যে সংবিধান নিয়ে আরেক দফা পুতুল খেলা চলছে।

দ্রুত এই ষোড়শ সংশোধনীটি পাস করার একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বিচারপতিরা যেন তাদের দোষী সাব্যস্ত করে রায় দেন। ওদিকে আবার বিরোধীদের বিরুদ্ধে 'এবডো' (নির্বাচিত পদের জন্যে অযোগ্যতা অধ্যাদেশ) প্রয়োগ সংক্রান্ত কানাঘুষাও শোনা যাচ্ছে। থলের বেড়াল এখন পুরোপুরি বেরিয়ে এসেছে। মনে হচ্ছে ডেমোক্লিসের খাঁড়ার ভয়ে বিচারকরা সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী বিএনপির শীর্ষ নেতাদের দোষী সাব্যস্ত করবেন। তারপর এবডো ব্যবহার করে তাদের নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষণা করা হবে এবং সরকারের নতজানু নির্বাচন কমিশন তাদের প্রার্থী হতে দেবে না। এমতাবস্থায় বিএনপির 'দুই নৌকার' নেতারা তো লাফ দিয়ে শেখ হাসিনার কাতারে আশ্রয় নেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছেন।

খালেদা জিয়া এখন কি করবেন?

কি করবে বিএনপি এবং অন্যান্য বিরোধী দল? আন্দোলন করবেন তারা? হরতাল-আন্দোলন নিষিদ্ধ করার কথা যে শেখ হাসিনা ভাবতে শুরু করেছেন সংসদে তার উক্তি থেকেই সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। সে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার কোন চেষ্টার বিরুদ্ধে সরকার তো প্রস্তুত হয়েই আছে। পৌনে ছয় বছরে পুলিশ বাহিনীর কলেবর আড়াই-তিনগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এবং এটা কোন গোপন কথা নয় যে নবনিযুক্ত এবং পদোন্নতিপ্রাপ্তরা সকলেই আওয়ামী লীগের ক্যাডারের লোক। পরিস্থিতি দাঁড়াচ্ছে এ রকমঃ আরো একবার গণতন্ত্রকে হত্যা করে বাকশাল চালু হবে এবং শেখ হাসিনা হবেন আজীবন রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রী। বিরোধীদলীয় নেতাদের অধিকাংশকে জেলে পুরে রাখা হবে, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেয়া হবে না তাদের। বিশ্বাসঘাতকরা আওয়ামী শিবিরে গিয়ে আবারো দুর্নীতি করার সুযোগ পাবেন। নেতৃত্ব-বিহীন দেশের মানুষকে আন্দোলন করতে দেয়া হবে না। চিৎকার করে তারা যেন প্রতিবাদও করতে না পারে সেজন্যে তো সম্প্রচার আইনই করা হচ্ছে। নির্বাচনী বিজয়ের এই সুনিশ্চিত টেকনিকটা শেখ হাসিনা পেটেন্ট করে বাজারে ছাড়তে পারেন।

(লন্ডন, ১৬.০৯.১৪)

বিবেক দংশনে আত্মাহুতি এবং বিবেককে কোরবানী

মালালা বলেছে, ওরা আমার মাথায় একটা গুলি ছুঁড়েছে, সারা দুনিয়া সে গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছে। সত্যি তাই। ১৭ বছরের স্কুল ছাত্রীকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেয়া নিয়ে নিশ্চয়ই নোবেল কমিটিও চিন্তা-ভাবনা করেছে কিন্তু শেষ অবধি পুরস্কার দেয়াটাই তারা ভালো বিবেচনা করেছে। সারা বিশ্বের প্রতিক্রিয়া থেকেও মনে হচ্ছে তাদের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিলো।

সোয়াতের মেয়ে মালালা ইউসুফজাই। পাকিস্তানের এই উপত্যকায় তালেবানদের প্রভাব বেশি। তারা মেয়েদের স্কুলে যাওয়া ও লেখাপড়া শেখার ঘোরতর বিরোধী। কিন্তু মালালা পড়াশুনা করবেই, স্কুলে যাবেই। অন্য মেয়েদেরও সে স্কুলে যেতে উৎসাহ দিচ্ছিলো। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাস থামিয়ে তালেবানরা তাকে গুলি করে দুবছর আগে। তাকে শাস্তি দিয়ে তালেবানরা সকল মেয়েকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলো। বৃটেন মালালার চিকিৎসার সুব্যবস্থা করে দেয়। সুস্থ হয়ে মালালা নিজে পড়াশুনা করছে আর সুযোগ পেলেই মেয়েদের শিক্ষা দানের গুরুত্বের কথা বলছে। গত বছর জাতিসংঘে তার ভাষণে বিশ্বব্যাপী সাড়া জেগেছিলো। নাইজেরিয়ায় বোকো হারামরা দুশো স্কুলের ছাত্রীকে ছিনতাই করে নিয়ে যায় গত এপ্রিল মাসে। তারাও তালেবানদের মতো নারী শিক্ষার ঘোরতর বিরোধী। মালালা ছুটে নাইজেরিয়ায়ও গিয়েছিলো মেয়েদের এবং তাদের বাবা-মাদের ভরসা ও উৎসাহ দিতে, তারা যেন ভয় পেয়ে লেখাপড়া ছেড়ে না দেয়। মালালা ইউসুফজাইকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দান গোটা বিশ্বের জাগ্রত বিবেকের প্রতীক।

মালালার গুণগ্রাহীদের এখনো কিছু শঙ্কা আছে। গোটা দুনিয়ার মানুষ তাকে দেখতে, তার কথা শুনতে চাইবে। তার লেখাপড়ায় মনোযোগ তাতে ভিন্নমুখী হবে নাতো? আরো কেউ কেউ এখানে-ওখানে সমালোচনা করছেন। সেটাও স্বাভাবিক। ঈর্ষাপরায়ণতা বলে একটা কথা সকল ভাষাতেই আছে। আমার বিবেচনায় নোবেল কমিটির নির্বাচনগুলো সব সময়ই মোটামুটি সঠিক হয়। তারা চোখ-কান খোলা রাখে, কার কি প্রকৃত কিংবা ভুয়া অর্জন খোঁজখবর নেয়, চেষ্টা-তদ্বিরে বিভ্রান্ত হয় না। তারা বাংলাদেশের ড. ইউনূসকে শান্তি পুরস্কার দিয়েছে। ইউনূস গ্রামীণ নারীর দারিদ্র্য অপনোদন ও তাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ

ব্যাংক স্থাপন করেছিলেন। ধীরে ধীরে বিশ্বের আরো বহু দেশ তার সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করছে। মালালাও শান্তি পুরস্কার পেয়েছে নারীর শিক্ষা প্রসার করে তাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দৃষ্টান্ত সৃষ্টির কারণে।

মালালার সঙ্গে এ পুরস্কার ভাগাভাগি করে পেয়েছেন ভারতের কৈলাশ সত্যার্থী। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত কৈলাশ সত্যার্থী বহু বছর যাবৎ ভারতের শিশু কৃতদাস প্রথা দূর করার লক্ষ্যে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। এবং মনে রাখতে হবে যে ভারতে কয়েক কোটি শিশু ক্রীতদাস ও মেয়াদী শ্রমিক আছে। সত্তরের দশকে আমি এ ক্ষেত্রের অন্য এক কর্মী সুব্রাহ্মনিয়াম সোয়ামীর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম বিবিসির জন্যে। সঠিক কতো কোটি তিনি বলেছিলেন এখন আর মনে করতে পারছি না। তবে সত্যার্থীর পুরস্কারপ্রাপ্তি সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই কিছু লোকের চোখ টাটাবে, কিছু লোক খামোখা ঈর্ষাতুর হবে। আসলে কিছু লোক স্বভাবতই বিবেকের দরোজায় কুলুপ এঁটে রাখে।

এই বিবেকের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিলাম কিছুদিন থেকে। বৃটেনের ব্রেন্ডা লেইল্যান্ড ধনী মহিলা ছিলেন। বয়স ৬৩ হয়েছিলো। সন্তানরা বড়ো হয়ে অন্যত্র সরে গেছে। এ দেশে সেটাই নিয়ম। ছেলে মেয়ে স্কুল শেষ করে মা-বাবার বাড়ি ছেড়ে যায়। কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যায়। কেউ চাকরি নেয়। ব্রেন্ডা বিধবা কি তালাকী জানতে পারিনি। ইংল্যান্ডের লেস্টারশায়ারে ছবির মতো সুন্দর গ্রাম বার্টন ওভারিতে নিজ বাড়িতে একাই থাকতেন। প্রতিদিন হাঁটতে যেতেন। বাকি সময়টা কম্পিউটার আর ইন্টারনেট নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। সেটাই তার কাল হলো। কিছুকাল ধরে প্রায়ই টুইটারে যাকে সম্ভব নানা বাণী পাঠাতেন।

নিরুদ্দেশ ম্যাডেলিন আর ব্রেন্ডার আত্মাহুতি

সম্প্রতি ম্যাকান পরিবারের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য পাঠিয়ে ব্রেন্ডা বলতে গেলে লোকের কান ঝালাপালা করে ফেলেছিলেন। এখানে এসে ম্যাকান পরিবার সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। স্বামী জেরি সুদক্ষ শৈল্য চিকিৎসক, আর স্ত্রী কেট ম্যাকান পারিবারিক চিকিৎসক। দুটো ফুটফুটে মেয়ে– তিন বছরের ম্যাডেলিন বড়ো, ছোটটার তখন বয়স ছিলো প্রায় দুবছর। ২০০৭ সালে তারা সপরিবারে ছুটিতে গিয়েছিলো পর্তুগালে। সমুদ্রের ধারে সুন্দর একটা হলিডে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিলো। এক রাতে ম্যাকান দম্পতি পাশেই এক রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়েছিলো অন্য ফ্ল্যাটের বন্ধুদের সঙ্গে। কেট দুই মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে গিয়েছিলো। মাঝে দু-একবার এসে দেখেও গিয়েছিলো। ফিরে এসে তারা দেখে বড়ো মেয়ে ম্যাডেলিন বিছানায় কিংবা কোথাও নেই।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ডাকা হয়। তারা সে বাড়িতে এবং আশপাশে তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালিয়েও তিন বছরের ম্যাডেলিনকে খুঁজে পায়নি। তদন্ত ক্রমেই

প্রসারিত হতে থাকে। কাছাকাছি কোথাও মাটিতে সামান্য ব্যতিক্রম দেখলে খুঁড়েও দেখা হয়েছে। কেউ একজন খবর দিয়েছিলো যে সে রাতে সে একটা লোককে দেখেছে ছোট্ট একটা শিশুকে কোলে করে সমুদ্রের দিকে যেতে। তদন্ত করে তাতেও আর কোন হদিস পাওয়া যায়নি। বছর দুই পরে পর্তুগীজ পুলিশ নথিপত্র বন্ধ করে তদন্ত গুটিয়ে ফেলে। কিন্তু ম্যাকান দম্পতি হাল ছেড়ে দিতে রাজি নয়। তারা ব্রিটিশ এবং ইউরোপীয় মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার চালায়, ম্যাডেলিনকে তাদের খুঁজে পেতেই হবে। তাদের এবং জনমতের চাপে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড তদন্তের ভার নেয়। পর্তুগীজ পুলিশের সহায়তায় তারাও কয়েকদিন ধরে তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালায়। কাছাকাছি কয়েকটা নরোম মাটির জায়গা খুঁড়েও দেখে তারা। কিন্তু ম্যাডেলিন ম্যাকান আজো নিরুদ্দেশই রয়ে গেল।

পর্তুগীজ পুলিশের যে স্থানীয় অফিসার ম্যাডেলিনের নিখোঁজ হওয়ার তদন্ত করছিলেন চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তিনি একখানি বই লেখেন। সে বইতে তিনি এ সন্দেহ প্রকাশ করেন যে ম্যাডেলিনের বাবা-মা হয়তো দৈবাৎ মেয়েকে মেরে ফেলেছিলেন এবং লাশ গুম করেছিলেন। ইতোমধ্যে বৃটেনে বারবার ম্যাকান দম্পতির টেলিভিশনের পর্দায় উপস্থিতিতে হয়তো কারো কারো বিরক্তি সৃষ্টি হয়েছিলো, কেননা কিছুকাল থেকে কিছু লোক টুইটার ইত্যাদিতে দম্পতি সম্বন্ধে নানান রকম অপ্রীতিকর ভাষায় মন্তব্য ও গালাগাল করে যাচ্ছিলো। তাদের তৎপরতা মিডিয়ারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মিডিয়ার কোন কোন অংশ তাদের 'ট্রোল' (দানব) বলে বর্ণনা করতে শুরু করে।

টুইটারে কয়েকদিন ধরে ম্যাকান দম্পতি সম্বন্ধে তার কটু মন্তব্যের পরে এদেশের জনপ্রিয় স্কাই টেলিভিশন নিউজের সংবাদদাতা মার্টিন ব্রান্ট অক্টোবরের গোড়ায় একদিন ব্রেন্ডা লেইল্যান্ডকে ধরে ফেলেন তার বাড়ির দরোজায়। মার্টিন ব্রান্ট জানতে চান ব্রেন্ডা কেন এমন করে ম্যাকানদের পেছনে লেগেছেন। ব্রেন্ডা জেদ ধরেন যে তিনি ঠিক কাজই করছেন। তিনি আরো বলেন যে দেখা পেলে ম্যাকানদের জিজ্ঞেস করার মতো অনেক প্রশ্ন তার আছে। ব্রেন্ডা বলেন যে তিনি অন্যায় কিংবা বেআইনী কিছু করেননি। স্কাই টেলিভিশন এ বিষয়ে একটা অনুষ্ঠান প্রচার করে। গত ৪ অক্টোবর শনিবার বাড়ির কাছের অভিজাত হোটেল মেরিয়টের এক কামরায় ব্রেন্ডার মৃতদেহ পাওয়া যায়। তদন্তের পর পুলিশ বলেছে তারা এ সম্বন্ধে আর কাউকে সন্দেহ করছে না। পুলিশী ভাষায় তার অর্থ হচ্ছে যে ব্রেন্ডা লেইল্যান্ড আত্মহত্যা করেছেন। পুলিশ আরো বলেছে ব্রেন্ডাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার কিংবা তার বিরুদ্ধে মামলা করার কোন পরিকল্পনা তাদের ছিলো না।

অ্যালিস গ্রসের হৃদয়বিদারক কাহিনী

আরেকটি আত্মহত্যার ঘটনা প্রকাশ পায় ৪ অক্টোবর শনিবারেই। তারপর থেকে এ ঘটনাটিও মিডিয়ায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। আগস্ট মাসের শেষে অ্যালিস গ্রস নামে পশ্চিম লন্ডনের ১৪ বছরের এক কিশোরী প্রতিদিনকার মতো তার বাড়ি থেকে হাঁটতে বেরিয়েছিলো, কিন্ত সে আর বাড়ি ফিরে আসেনি। পুলিশ গোড়ায় এটাকে নিরুদ্দেশের ঘটনা বলেই ধরে নিয়েছিলো। এ বয়সের ছেলেমেয়ের মাথা কিছু গরোম থাকে। মতানৈক্য কিংবা বাবা-মার শাসনে চটে গিয়ে বন্ধুদের বাড়িতে ওঠে। মাথা ঠাণ্ডা হলে আবার বাড়ি ফিরে আসে। তখন পুলিশের সন্দেহ আরো গভীর হয়। তারা অ্যালিসের বাড়ির এবং তার সচরাচর হাঁটার পথের ধারেকাছে তল্লাশি শুরু করে। তল্লাশির এলাকা ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হয়। অ্যালিস পুরনো কালেরপরিবহনের এক খালের পাশ দিয়ে অনেকটা পথ হাঁটতো। সে খালেও তল্লাশি চালায় পুলিশ। এক পর্যায়ে এ দেশের ছয়টি পুলিশ বাহিনী এই তল্লাশিতে যোগ দেয়।

ইতোমধ্যে অ্যালিস যে পথ দিয়ে হাঁটছিলো সে পথের সিসিটিভি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা শুরু করে পুলিশ। দেখা গেল যে উক্ত খালের ওপরের সেতু পেরিয়ে অ্যালিস হেঁটে যাচ্ছে। তার কয়েক মিনিট পরেই সে সেতুর ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে একটা লোক। পুলিশ তাকে পূর্ব ইউরোপের ল্যাটভিয়া থেকে আগত বিল্ডিং শ্রমিক আর্নিস জালকাল্‌ন্স বলে সনাক্ত করে। এদেশে বিগত কয়েক বছর ধরে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর কয়েক লাখ লোক মূলত শ্রমিকের কাজ করতে আসে। সে দেশগুলোতে মাইনে-মজুরি খুব কম। তাছাড়া ব্রিটিশরা অনেক কাজ করতে চায় না। এদেশের খামার মালিক, বিল্ডিং কম্পানি প্রমুখরা সস্তায় মওসুমী কাজে পূর্ব ইউরোপীয় শ্রমিক নিয়োগ করেন। কিছুদিন কিছু অর্থ জমিয়ে লোকগুলো আবার দেশে ফিরে যায়। কিছু দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝতে পারবেন। যে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার মাঝে মাঝে আমাকে সাহায্য করেন তার দেশ পোল্যান্ডে। যে মহিলা আমাদের বাড়ি পরিষ্কার আর জামাকাপড় ইস্ত্রি করেন তার বাড়ি রুমানিয়ায়। আর আমাদের বাগানের মালী হাঙ্গেরীর লোক।

আর্নিস জালকাল্‌ন্স সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে গিয়ে পুলিশ বের করে ল্যাটভিয়ায় নিজের স্ত্রীকে হত্যার দায়ে সে সাত বছর জেল খেটেছে; ২০০৯ সালে পশ্চিম লন্ডনেই ১৪ বছরের এক মেয়েকে সে যৌন নির্যাতন করে। তখন থেকে নিরুদ্দেশ আর্নিসের জন্যে নিবিড় তল্লাশি শুরু করে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড। তাদের কয়েকজন অফিসার সে খোঁজে ল্যাটভিয়া পর্যন্ত গিয়েছিলো। ল্যাটভিয়ার পুলিশের সহায়তায় তল্লাশি চালিয়েও তার কোন হদিস পাওয়া গেল না। লোকটা যেন হাওয়া হয়ে গেল। কিন্তু পুলিশ খোঁজ ছাড়েনি। এদিকে অবিরাম তল্লাশিতে পাঁচ সপ্তাহ পরে অ্যালিসের মৃতদেহ পাওয়া গেল যে খালের ধারে সে হাঁটতে

যেতো তারই তলায়। স্বল্প পানির নিচে কবর খুঁড়ে বস্তাভর্তি লাশটি পুঁতে দিয়ে তার ওপর কাঠ-পাথর ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিলো। সেজন্যেই প্রথমবারের তদন্তে পুলিশ লাশের সন্ধান পায়নি। তার কয়েকদিন পরেই ৪ অক্টোবর পুলিশ কাছাকাছি একটা পার্কে গাছ থেকে ঝুলানো একটা গলিত লাশ আবিষ্কার করে। পুলিশের ফোরেনসিক তদন্তে সেটা আর্নিস জালকাল্‌ন্সের বলে শনাক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রেও পুলিশ বলেছে তারা অন্য কাউকে সন্দেহ করছে না, অর্থাৎ আর্নিস আত্মহত্যা করেছিলো।

বিবেকের কাছ থেকে ছুটি নিচ্ছে ওরা

দুই-দুটো আত্মহত্যা। কিন্তু কোন কি প্রয়াজন ছিলো? আর্নিস ধুরন্ধর লোক এবং ইইউতে ইউরোপীয় নাগরিকদের চলাচল খুবই শিথিল বলা চলে। সে অবশ্যই জানতো বৃটেনে এখন আর প্রাণদণ্ড দেয়া হয় না। সে নিশ্চয়ই জানতো ব্রিটিশ পুলিশ সহজে হাল ছেড়ে দেয় না। বিশেষ করে খুনের ব্যাপারে। উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহার করে আজকাল তারা ৩০-৪০ বছরের পুরনো খুনিকেও পাকড়াও করছে। অন্তত কিছুকাল পালিয়ে থাকার চেষ্টা করতে পারতো সে। সেটা না করে যেখানে সে অ্যালিসকে পুঁতে দিয়েছিলো তারই কাছাকাছি এক গাছে গলায় ফাঁস দিয়ে সে আত্মহত্যা করেছে।

আর ব্রেন্ডা লেইল্যান্ড। তার বিরুদ্ধে পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। তার সম্বন্ধে তদন্ত করার কোন পরিকল্পনাও ছিলো না তাদের। তবু কেন সে আত্মহত্যা করতে গেল? নিশ্চয়ই স্কাই টেলিভিশনের প্রতিনিধির জিজ্ঞাসাবাদের পরে তার বিবেকের উদ্রেক হয়েছিলো। সে বুঝতে পেরেছিলো ম্যাকান পরিবারকে গালাগাল করে, তাদের সম্বন্ধে কুৎসা রটনা করে সে ভালো করেনি। হয়তো আর্নিস জালকালন্সও বিবেকের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলো। হয়তো অবশেষে তার পাষণ্ড মনেও বিবেক জাগ্রত হয়েছিলো।

বাংলাদেশে কুৎসা রটনা অনেকটা রাজনীতিকদের পদোন্নতির পথের সোপানে পরিণত হয়েছে। সরকারে পদোন্নতি আর দলে প্রভাব বৃদ্ধির আশায় নেতা-মন্ত্রীরা অনর্গল এর-তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে চলেছেন। সম্মানী ব্যক্তির সুনামকে সামান্য রাজনৈতিক সুবিধা লাভের লোভে হরহামেশা ধূলিলুণ্ঠিত করার চেষ্টা করছেন মন্ত্রীরাও। বিবেক বলে কোন বস্তু কি তাদের মধ্যে নেই? সে বিবেক কি এতোই মৃত যে সে আর কোনদিন জেগে উঠবে না? কুৎসা বা গিবৎ মহান আল্লাহ্‌তা'য়ালারও বিরক্তি উৎপাদন করে বলে ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি। এহরাম বেঁধে হজ করে এলেই কি তাদের সব পাপ মাফ হয়ে গেল? তারা আবার ধোয়া তুলসীপাতা হয়ে গেলেন?

বিবেকের কাছ থেকে ছুটি

দুর্নীতি অবশ্যই আল্লাহ্‌র আইনে অপরাধ। মানুষের আইনেও দুর্নীতি আর দুষ্কৃতিকে অপরাধ করা হয়েছে। কিন্তু একজন থার্ড ক্লাস উকিল আর কুখ্যাত রাজনীতিকের অধীনে কমিটি করে সোয়া সাত হাজার মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে এ তালিকায় কয়েকজন শীর্ষ রাজনীতিকের বিরুদ্ধে গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ ছিলো, ছিলো কয়েকটি খুনের মামলায় অভিযুক্ত দাগী ব্যক্তিরাও। বিগত ছয় বছরে বহু দুর্নীতির কথা মানুষ শুনেছে এবং জানে। বিশ্ব ব্যাংক, মার্কিন আর ক্যানাডীয় সরকার সবাই মিলে পদ্মা সেতুর ব্যাপারে দুর্নীতির প্রমাণ পেয়েছিলো, কিন্তু বাংলাদেশে সেসব অভিযোগের ফাইল এখন মুছে ফেলা হয়েছে। লোকে বলে রাজনীতিকদের হুকুমে এবং তাদের প্রশ্রয়ে কয়েক হাজার মানুষ গুম ও খুন হয়েছে, সরকারের মন্ত্রীদের নির্দেশে ক্রস-ফায়ার বন্দুকযুদ্ধ আর ডাকাত বধের অজুহাতে বহু রাজনৈতিক বিরোধীকে হত্যা করা হয়েছে।

এবারে আর থার্ড ক্লাস উকিলের অধীনে কমিটি করে নয়, এবারে ফার্স্ট ক্লাস সরকারি আজ্ঞাবহদের নিয়ে গঠিত কমিশন দুদককে দিয়ে মন্ত্রী-নেতাদের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ স্খলন করা হচ্ছে – যেমন করে ঘসেমেজে ঘরের মেজের রক্তের দাগ মুছে ফেলা হয়। সারা জীবন শুনে এসেছি 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে'। কিন্তু প্রায়ই ভাবি সে বাতাস কেন এতো ধীরে বহে, ধর্মে কি করে এতো কিছু সয়? এদিকে ওপর-ওয়ালাদের কলকাঠি নাড়ানোয় রাজনৈতিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাচ্ছে আর অভিযোগ গঠন করছে দুদক। ভবিষ্যৎ নির্বাচনে এসব নেতা যাতে অংশ নিতে না পারেন এবং বিনা বাধায় দখলী স্বত্বে গদি আঁকড়ে থাকা সরকার লোক-দেখানো নির্বাচনে জয়ী হয়ে 'বৈধতা' লাভ করতে পারে সেজন্যেই এতোসব আয়োজন। আর হ্যাঁ, দুদকেরও কিছু কাজ দেখাতে হবে তো দেশের মানুষকে?

এদিকে দেশের অবস্থা কি ভাবছেন কেউ? নবজাতক শিশু বেচাকেনা হচ্ছে, প্রেমে বিফল হয়ে ছেলেরা মেয়ের মাকে খুন করছে, মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি না হওয়ায় হবু বর ঘরে আগুন লাগিয়ে মা আর দুই মেয়েকে পুড়িয়ে মেরেছে, শিক্ষক কচি শিশুকে ধর্ষণ করছে, এসব অমানুষিক খবর পড়তে পড়তে গায়ে ঘৃণা ধরে যাচ্ছে। নেতা-নেত্রীরা বিবেক-বঞ্চিত। শত অপরাধ করেও তারা পার পেয়ে যাচ্ছেন। লাখ লাখ টাকার গোরু জবাই করে তারা যেন বিবেককেই কোরবানী দিচ্ছেন। তাদের দেখাদেখি তরুণ সমাজও বিবেকের কাছ থেকে ছুটি নিয়েছে। এই ভাগ্যাহত দেশটার কাছ থেকে আর কি আশা করবো?

(লন্ডন, ১৪.১০.১৪)

পিয়াস করিম ও লতিফ সিদ্দিকী–
আওয়ামী বিচারের মাপকাঠি

বেশ কিছুকাল থেকে ভাবছি 'মান' ও 'সম্মান' – এই দুটো শব্দ বাংলা অভিধান থেকে মুছে ফেলা হয়েছে কিনা। তবে কিছুদিন ধরে পত্রিকার পৃষ্ঠায় পড়ছি প্রধানমন্ত্রীর অবমাননা কিংবা মানহানির অভিযোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে এর-তার বিরুদ্ধে আদালতে পাইকারি হারে মামলা হচ্ছে। অর্থাৎ শব্দদুটোকে এখনো ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়নি। কেউ কেউ ভাবছে সম্মানিত ব্যক্তি এখনো কিছু অবশিষ্ট আছেন, অন্তত থাকা উচিত।

ছোটবেলায় বাড়িতে গুরুজনরা এবং স্কুলে শিক্ষকরা এই সম্মান দেয়া-নেওয়ার ব্যাপারটা জোর দিয়ে শেখাতেন। তাদের শিক্ষার আসল বক্তব্যটা ছিলো 'যিনি জ্ঞানে কিংবা অভিজ্ঞতায় বড়ো তাকে সম্মান দিতে শেখো। তাহলে একদিন তুমিও সম্মান পাবার উপযোগী হবে।' স্কুলের নিচু ক্লাসে একটি ছেলে এক গুণীজন সম্বন্ধে 'সে' এবং 'বলেছে' ইত্যাদি ভাষায় রচনা লিখেছিলো। মাস্টার মশাই ওকে গোটা ক্লাসের সামনে দাঁড় করিয়ে বলেছিলেন, 'কার সম্বন্ধে লিখেছিস তুই? সে লোকটা তোর বাড়ির চাকর নাকি?' বাড়ির কাজের লোকেদেরও যারা বয়সে বড়ো ছিলো তাদেরও আপনি করে বলতে শেখাতেন আমার বাবা-মা।

দেশের বিদগ্ধ কারো কারো সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা হয়। তার থেকে যতোটুকু বুঝতে পারছি বাংলাদেশে এখন প্রকৃত পুঁথিগত কিংবা নৈতিক শিক্ষা দেয়া হয় না। সন্তানদের ওপর পিতা মাতার নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি হারিয়ে গেছে বলা চলে। সন্তানরা জানে কষ্ট করে লেখাপড়া শিক্ষার প্রয়োজন নেই; আওয়ামী লীগের ক্যাডারভুক্ত হলেই টাকাপয়সা ও প্রভাবের অভাব থাকবে না, আর টাকা দিলেই রাজনীতিকদের মালিকানাধীন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুটো-একটা সার্টিফিকেট সহজেই ক্রয় করা যাবে। বাবা-মাও বুঝে গেছেন সন্তান যখন ক্যাডারভুক্ত হয়ে গুণ্ডা-গার্দি করবে তখন তাদের আদপ-কায়দা শেখানোর চেষ্টা অরণ্যেরোদন হবে।

আমাদের দিনে আরেকটা রোল-মডেল ছিলো। সমাজের যারা মাথা ছিলেন আর যারা রাজনীতি করতেন নম্রতা, বিনয় এবং সম্ভ্রম প্রায় সময়ই তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যেতো। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, খাজা নাজিমুদ্দিন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ জাতীয় নেতাদের কাছে থেকে জানার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। সাধারণ মানুষও দেখা করতে এলে তারা সৌজন্যের সঙ্গে তাদের সঙ্গে কথা বলতেন। ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত উর্দু পড়েছি। নেতাদের আচরণ থেকে 'বড়োঁ কা দেমাগ ভি বড়া হোতা হ্যায়' প্রবাদটার সার্থকতা নেতাদের মধ্যে দেখে খুশি হয়েছি। আরো একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি। তারা সকলেই অত্যন্ত বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন – আধুনিক কালে যাকে বলা হয় ক্যারিশমা।

আর এখন কি দেখছি? রাজনৈতিক নেতা এবং মন্ত্রী যারা হচ্ছেন মুখে কিংবা আচরণে এতোটুকু ভদ্রতা কিংবা সৌজন্য নেই তাদের মধ্যে। বর্ণাঢ্যতা কিংবা ক্যারিশমার তো প্রশ্নই ওঠে না। শিক্ষা কিংবা অভিজ্ঞতার যোগ্যতা তাদের নেই।পদোন্নতি কিংবা আধিপত্যের আশায় কটু-কাটব্য আর খিস্তি-খেউড়ের প্রতিযোগিতা পড়ে যায় তাদের মধ্যে– যেন জন্মের সময় মা তাদের মুখে মধুর পরিবর্তে দিয়েছিলেন ধুতুরার বিষ। দিনরাত টেলিভিশনে এবং সভাসমিতিতে এসব গালিগালাজ শুনছে ছেলেমেয়েরা। বাবা মার শিক্ষার বিরুদ্ধে একটা স্বাভাবিক প্রতিরোধ তাদের মনে গড়ে ওঠে।

জাতীয় লজ্জা ও অপমান

আশা করি বুঝতে পারছেন অধ্যাপক ড. পিয়াস করিমের কথা মনে করেই কিছু কথার অবতারণা করেছি। এই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের সঙ্গে আমার কখনো পরিচয় হয়নি। কিন্তু মিডিয়া থেকে তার অনেক মন্তব্য ও অভিমত জানতে পেরেছি এবং জেনে উপকৃত হয়েছি। বাংলাদেশের বর্তমান সরকার এবং তাদের পরগাছারা এই জ্ঞানী-গুণী ও সম্মানিত শিক্ষাবিদকে নিয়ে যা করেছে তার জন্যে গোটা জাতি লজ্জিত ও অপমানিত বোধ করছে। একই সঙ্গে বিশ্ববাসীকে আমরা জাতীয় বৈশিষ্টের যে পরিচয় দিয়েছি সেটা মোটেই গৌরব করার মতো নয়।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার আমাদের জাতীয় গরিমার অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত। ৬২ বছর আগে মাতৃভাষা সংস্কৃতি ও গণতন্ত্র প্রীতির তাড়নায় আমরা ভাষা আন্দোলন করেছিলাম। অন্তত চারজন ছাত্র সে বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে আত্মদান করেছিলেন। তাদের স্মৃতিকে এবং নিজেদের আত্মগরিমাকে অমর করে রাখার লক্ষ্যে আমরা শহীদ মিনার গড়েছিলাম। তখন থেকে কোন জাতীয় সংগ্রামকে সমুন্নত করার অথবা কোন বিদেহী জাতীয় বীরকে শ্রদ্ধা নিবেদনের

লক্ষ্যে জাতি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমবেত হতে চায়। অধ্যাপক ড. পিয়াস করিমের মরদেহ সকলের শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে শহীদ মিনারে স্থাপন করার প্রস্তাবও উঠেছিলো সে কারণে।

মনে হচ্ছে শ্রদ্ধা গৌরব আর গরিমার ভাষা যারা বোঝে না শহীদ মিনারকে তারা ছিনতাই করে নিয়েছে। দেশে যারা এখন ক্ষমতার আসন জুড়ে বসে আছে ইংরেজি অভিধানে তাদের বলতে হবে 'স্কোয়াটার'– জবর দখলকারী। ভোট দিয়ে দেশের মানুষ তাদের ক্ষমতার আসনে বসায়নি, গুণ্ডা-গার্দির জোরে তারা গদি দখল করেছে, আর দিনরানি দেশে ও বিদেশে গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে গলা ফাটাচ্ছে। অবৈধ ক্ষমতা পোক্ত করার আশায় তারা একে একে দেশের সকল অনুশাসন ও প্রতিষ্ঠানকে দখল করে নিচ্ছে ও ধ্বংস করছে।

শহীদ মিনারকেও তারা এখন ছিনতাই করে নিয়েছে মনে হয়। অথচ বর্তমান শাসক দলের বিশেষ কোন দাবি কিংবা অধিকার নেই ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনারের ওপর। এসব খবর আমি নিজে ছেপেছি পত্রিকার পাতায়: অমর একুশে তারিখে আইন ভঙ্গ করে আত্মাহুতি দানের ঘোরতর বিরোধিতা করেছিলো আওয়ামী লীগ। তখন বলাবলি হচ্ছিলো যে পাকিস্তান সরকার শিগগিরই পূর্ব পাকিস্তান আইন সভার নির্বাচন দিতে যাচ্ছে এবং আওয়ামী লীগ নিশ্চিত ছিলো যে তারাই জয়ী হবে এবং গদি পাবে। সরকার ও পুলিশের সঙ্গে বিবাদ করে তারা নির্বাচনের সম্ভাবনা ভণ্ডুল করে দিতে চায়নি। একুশে ফেব্রুয়ারিতে কোন কারাগারের জানালা থেকে কোন চিরকুট বর্ষিত হয়নি। আসলে আওয়ামী লীগ কোন আদর্শের দল নয়, তারা গদির দল। একাত্তরেও তারা স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়নি, মুক্তিযুদ্ধের সময় বিদেশে পালিয়ে গিয়ে তারা গা বাঁচিয়েছে, কিন্তু এ দেশটাকে তারা এখন পৈতৃক সম্পত্তি বলে দাবি করে।

পিতার পরিচয়ে সন্তানের বিচার হতে পারে না

ড. পিয়াস করিমের বিরুদ্ধে তাদের আক্রোশের আসল কারণ কারো বুঝতে বাকি নেই। বিশেষজ্ঞের চোখ দিয়ে তিনি সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ করতেন টেলিভিশনের টক-শোতে। তাতে সরকারের অসত্য কথাবার্তা আর দুর্নীতি ও হত্যাকাণ্ডের মুখোশ ফাঁস হয়ে যাচ্ছিলো। অর্থাৎ তারা আর 'বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাতে' পারছিলো না। পিয়াস করিম এখন গত হয়েছেন। তার কণ্ঠে এখন আর প্রতিবাদ নিঃসৃত হবার ভয় নেই। এ সুযোগে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা তার এবং তার পিতার চরিত্র হনন করে গায়ের ঝাল মেটাচ্ছেন। এবং তারা ভ্রান্ত আশা করছেন এভাবে দেশের মানুষের মনে পিয়াস করিমের অতীতের বিশ্লেষণ ও মন্তব্যগুলোর যে স্মৃতি গেড়ে আছে সে স্মৃতিও তারা মুছে ফেলতে পারবেন।

আওয়ামীলীগ ওয়ালাদের বক্তব্য

পিয়াস করিমের বাবা একাত্তরে পাকিস্তানীদের গঠিত শান্তি কমিটির স্থানীয় পর্যায়ের নেতা ছিলেন। সে অভিযোগ সত্যি হলেও প্রশ্ন ওঠে, ব্যক্তির পরিচয় কি বাপের পরিচয় দিয়ে হয়? গুজরাতের গ্রামীণ রেল স্টেশনের চা ভেন্ডারের পুত্র নরেন্দ্র মোদিকে আজ আর চা-ওয়ালা বলে অবজ্ঞা দেখানোর হিম্মৎ আওয়ামী লীগ নেতাদের হবে? আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা নিজেদের রবীন্দ্রনাথের আদর্শের ধারক ও বাহক বলে দাবি করতে চান। রবীন্দ্রনাথও কি তার 'ফুল বলে' গানটিতে লিখে যাননি, 'জন্ম নিয়েছি ধূলিতে, দয়া করে দাও ভুলিতে, দাও ভুলিতে'?

তাহলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে (যে শহীদ মিনার কারো বাপের সম্পত্তি নয়) পিয়াস করিমের শবদেহ জনসাধারণের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণ রাখার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের ক্রুসেড ঘোষণা কেন? এবং মনে রাখতে হবে অতীতেও মৃতদের স্মৃতিকে বহুবার অপমানিত করেছে আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন, শেখ মুজিবুর রহমান সমমর্যাদার আওয়ামী লীগ নেতা, তাজউদ্দীন আহমেদের এবং শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের মন্ত্রী এবং একজন সাবেক রাষ্ট্রপতি খোন্দকার মুশতাক আহমেদের জন্যে বাংলাদেশের রাজধানীতে জানাজার নামাজ আদায় করতে দেয়নি আওয়ামী লীগ। একবারও কি তাদের মনে হয়েছে, যে ব্যক্তি জীবিত কিংবা মৃত অন্যদের শ্রদ্ধা দেখাতে জানে না শ্রদ্ধা পাবার যোগ্যতা তার নেই?

গত কালের হিরো আজকের ভিলেন

একাত্তরে অধ্যাপক পিয়াস করিম ও তার পিতার ভূমিকার সঠিক বৃত্তান্ত দিয়েছেন সরকারের আইনমন্ত্রী (এবং মুজিব হত্যা মামলার প্রধান সরকারি কৌসুলী) আনিসুল হক। তিনি বলেছেন, পিয়াস করিমের পিতাও আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন। একাত্তরে পিয়াস করিম মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করছিলেন বলে পাকিস্তানীরা তাকে গ্রেফতার করে। তারপর তার মুক্তিপণ হিসেবে তার পিতাকে শান্তি কমিটিতে যোগ দিতে বাধ্য করে। এই সত্যটি প্রকাশের কারণে শেখ হাসিনার সরকারের মূল্যবান আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের বিরুদ্ধে আওয়ামী ওয়ালারা যে তাণ্ডব শুরু করেছে (অবশ্যই সরকারের সায় নিয়ে) তাকে রীতিমতো কুৎসিত ও অশ্লীল না বলে উপায় নেই।

আমি যতোদূর জানি আনিসুল হকের বংশগত আনুগত্য আওয়ামী লীগের প্রতি। আজ তিনি রাজাকার হয়ে গেলেন! এবং এখনো কেউ ভুলে যায়নি যে মাত্র কিছুদিন আগেই মুক্তিযুদ্ধের উপপ্রধান সেনাপতি এবং শেখ হাসিনার সর্বশেষ বৈধ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনামন্ত্রী এয়ার মার্শাল এ করিম

খোন্দকারের বিরুদ্ধেও অনুরূপ কুৎসিত আন্দোলন হয়েছে, তাকেও রাজাকার বলে অপবাদ দেয়া হয়েছে। কি অপরাধ ছিলো এয়ার মার্শাল করিম খোন্দকারের? তিনি তার স্মৃতি কথায় লিখেছিলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেননি।

একই কথা শেখ মুজিবুর রহমানের অতি ঘনিষ্ঠ সহকর্মী এবং বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদসহ (তার কন্যা শারমিন আহমদের রচনা অনুযায়ী) আরো অনেকে বলে গেছেন, এমনকি আমি নিজেও বহুবার প্রমাণ ইত্যাদিসহ লিখেছি। তাহলে কি একথা না বলে উপায় আছে যে আওয়ামী লীগ মোটেও আদর্শভিত্তিক দল নয়, এ দলের ভিত্তি সম্পূর্ণ মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং দলটি টিকে আছে শুধুমাত্র গদির লোভে এবং গদির কল্যাণে?

লতিফ সিদ্দিকী ভাগ্যবান

এর বিপরীতে এখন তুলনা করা যাক হাসিনার সরকারের সদ্য অব্যাহতিপ্রাপ্ত মন্ত্রী আব্দুল লতিফ সিদ্দিকীর প্রসঙ্গকে। এই মন্ত্রী সম্বন্ধে বহু অভিযোগ প্রকাশ্যেই আলোচিত হয়েছে। মন্ত্রীপদে আসীন থাকাকালীন বহু দুর্নীতি ও অনিয়মিত কাজ তিনি করেছেন। কিন্তু সেসব কারণে তার চাকরি যায়নি, এমনকি নতজানু দুদকও কোন তদন্ত করেনি তার বিরুদ্ধে। এমনকি নিউইয়র্ক সফরে প্রধানমন্ত্রীর প্রিয়ভাজন ১৮৫ জন সফরসঙ্গীরও অন্যতম ছিলেন আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী। কিন্তু তিনি এবং আরো বেশি করে সরকার এখন বিপদে পড়েছেন এই সফরের কারণে। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীদের এক ঘরোয়া বৈঠকে লতিফ সিদ্দিকী ইসলামের মহানবী (দ), ইসলামের পাঁচ খুঁটির অন্যতম হজ্ব এবং তাবলীগ সম্বন্ধে বহু অবমাননাকর কটুক্তি করেছেন।

লতিফ সিদ্দিকীর এসব কদর্য উক্তি বাংলাদেশে তো বটেই বিশ্বব্যাপী ঈমানদার মুসলমানের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে। কিন্তু কোন প্রতিবাদ হয়েছে কি আওয়ামী লীগ থেকে? কোন মিছিল হয়েছে প্রতিবাদে? কেউ তার কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে? যেমন এখন প্রতিবাদ হচ্ছে আনিসুল হকের বিরুদ্ধে? এমনকি লতিফ সিদ্দিকীকে মন্ত্রীপদ, আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা কমিটির সদস্যপদ এবং এ দলের সদস্যপদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে? সরকার কোন গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেছে, দেশে ফিরিয়ে আনার কোন চেষ্টা হয়েছে লতিফ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে? মহানবী (দ) ও ইসলামের অপমান এবং বিশ্ব মুসলিমের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা দূষণীয় নয়, কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে আওয়ামী লীগ নেতাদের সমালোচনা এবং স্বাধীনতা ঘোষণার মিথ্যা দাবি অস্বীকার করা চরম অপরাধ!

অব্যাহতির আসল কারণ

অনেক ধানাই-পানাই ও কালক্ষেপণ করে অবশেষে আব্দুল লতিফ সিদ্দিকীকে মন্ত্রীসভা থেকে 'অব্যাহতি' দেয়া হয়েছে। অথচ সংবিধান অনুযায়ী কোন ব্যক্তি মন্ত্রীপদে বহাল থাকেন 'প্রধানমন্ত্রীর সন্তুষ্টি'অনুযায়ী, তার মন্ত্রী থাকা না থাকার সিদ্ধান্ত নেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তে তিনি লতিফ সিদ্দিকীকে বরখাস্ত করতে পারতেন। রাষ্ট্রপতির স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্যে অপেক্ষা প্রকৃত কারণ ছিলো না। তাছাড়া বর্তমানে যেসব ওঁছা ও কদর্য ব্যক্তিত্বের অধিকারীরা মন্ত্রীপদ 'অলংকৃত' করছেন তাদের দায়দায়িত্ব নিতে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদের রুচিতে কুলাবে কিনা আমার সন্দেহ আছে।

তবে লতিফ সিদ্দিকীকে এখন 'অব্যাহতি' দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেটা মহানবীর (দঃ) অবমাননা, হজ্ব সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য কিংবা তাবলীগের বিরোধীতা করার জন্যে নয় – ভিন্ন কারণে এই 'অব্যাহতি' বলে অনেকেই সন্দেহ করছেন। জ্যাকসন হাইটসের সে বৈঠকে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পুত্র জয় সম্বন্ধে 'তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য' করে কিছু কথা বলেছেন। তার থেকেই আমরা জানতে পারি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য প্রযুক্তি উপদেষ্টা হিসেবে জয়কে মাইনে দেয়া হয় বিদেশী মুদ্রায়, যেটা মুদ্রা পাচারের সামিল। তাছাড়া তাকে যে পরিমাণ মাইনে দেয়া হয় সে অর্থে সর্বাধিক যোগ্যতা সম্পন্ন দশজন প্রযুক্তিবিদ নিয়োগ করা সম্ভব। আব্দুল লতিফ সিদ্দিকীর বর্ণিত অর্থের পরিমাণ সঠিক হলে বলতেই হবে যে সে মাইনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পারিশ্রমিকের চাইতে অনেক বেশি এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের বেতনের কাছাকাছি। সাধারণ লোকের ধারণা এই বেফাঁস ও বিব্রতকর তথ্যগুলো ফাঁস করে দেবার কারণেই এই মন্ত্রীকে 'অব্যাহতি' দেয়া হয়েছে।

আওয়ামী ওয়ালাদের ধৃষ্টতা বেড়েই চলেছে। তারা এখন 'ফতোয়া' দিতে শুরু করেছে। সম্মানিত কলামিস্ট ফরহাদ মজহার, ইংরেজি দৈনিক নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীর, দৈনিক মানব জমিন সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, কলামিস্ট ও বিশ্লেষক মাহফুজ উল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশ্লেষক অধ্যাপক আসিফ নজরুল ও আইনজীবী তুহিন মালিকসহ নয়জনকে (অর্থাৎ বাংলাদেশে যারাই সত্য কথা বলবেন তাদের সবাইকে) শহীদ মিনারে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে। যেন শহীদ মিনার কারো পৈতৃক সম্পত্তি। বাইরে নোটিশ টাঙিয়ে দিলেই হলো "ব্যক্তিগত সম্পত্তি, প্রবেশ নিষেধ"।

(লন্ডন, ২১.১০.১৪)

শেখ হাসিনার জাদুর কাঠি আর প্রতারিত বাংলাদেশ

দু'হাজার নয় সালের কথা সকলের মনে আছে কি? যাদের মনে নেই তারা হাত তুলুন। তখনকার যে ব্যাপারটা আমার সবচাইতে বেশি করে মনে পড়ে সেটা হচ্ছে প্রশাসনে, বিশেষ করে সচিবালয়ে নৈরাজ্য। ইংরেজিতে এরা যাকে বলে 'চীনামাটির তৈজসের দোকানে মত্তহস্তীর তাণ্ডব'।

প্রশাসনের প্রায় সাতশো শীর্ষ কর্মকর্তাকে ওএসডি করে একপাশে গুদামজাত করে রাখা হলো। তাদের স্থলে আওয়ামী লীগের প্রতি অনুগত অপেক্ষাকৃত অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের ডবল প্রমোশন দিয়ে সেসব শূন্যপদে নিয়োগ করা হয়েছে। তখন খবর পাওয়া গিয়েছিলো যে শেখ হাসিনার ভোটব্যাংক সংখ্যালঘু কর্মকর্তাদের সর্বোচ্চ পদে স্থাপন করার লক্ষ্যে কাউকে কাউকে ট্রিপল প্রমোশনও দেয়া হয়েছিলো। সে সময় একাধিক কলামে আমি বলেছিলাম ওএসডি করে সরিয়ে দেয়া কর্মকর্তাদের অনেকেই বিভিন্ন স্তরে ২০ কিংবা ২৫ বছর কাজ করে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

রাষ্ট্রের কর্মকর্তা হিসেবে তাদের অর্জিত এসব অভিজ্ঞতা রাষ্ট্রের সম্পদ– যেমন করে কলকারখানাগুলোকে সম্পদ বিবেচনা করা হয়। সেসব অভিজ্ঞতা তারা অর্জন করেছিলেন রাষ্ট্রের ব্যয়ে এবং রাষ্ট্রের আয়োজনে। আর যে কারণে পাবলিক সার্ভিস কমিশন সর্বাধিক যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের নির্বাচন করে এবং বিশেষিত প্রশিক্ষণ দিয়ে চাকরির উঁচু ক্যাডারগুলোতে নিয়োগ দিতে চায়। সেসব সম্পদ অপচয় হতে দিয়ে অপক্ষোকৃত অনভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের সেসব পদে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা তাদের থাকার কথা নয়। থাকলে আগেই তারা পদোন্নতি পেতেন। অনেক পড়েছি, অনেক শুনেছি এবং নিজের চোখে দেখেছি কম যোগ্যতার কাউকে অধিকতর যোগ্য ব্যক্তির মাথার ওপরে বসিয়ে দেয়া হলে অথবা নিজের যোগ্যতার সীমার উর্ধ্বে কোন পদে নিয়োগ দেয়া হলে তাদের মাথা মোটা হয়ে যায়, ভুলভ্রান্তি তারা অনেক বেশি করে। অবশ্যি দু'একটি ক্ষেত্রে যে এর ব্যতিক্রম হয় না তা নয়।

দুহাজার নয় সালে যে সরকার গদি পেয়েছিলো তাদের ক্ষমতা প্রাপ্তির রহস্য এখন আমরা জানি। দুটি বিদেশী শক্তি দেশজ কয়েকজন মীরজাফরকে নিয়ে

ষড়যন্ত্র করে একটা সাজানো মাস্টারপ্ল্যানের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে গদি দিয়েছিলো। দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক রায়ে ক্ষমতা পাওয়া অসম্ভব জেনে তারা অসাধু উপায়ে গদি চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে তখন থেকেই আটঘাট বেঁধে প্রস্তুতি শুরু করে। সিভিল সার্ভিসের দলীয়করণ সমাধা করে তারা রাষ্ট্রের অন্যান্য শাখা-প্রশাখা ও শেকড়ের দিকে নজর দেয়। সংবিধানের বিবরণ অনুযায়ী পুলিশ দেশে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা, হত্যা, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি প্রতিহত করা, কোথাও তেমন ঘটনা ঘটলে দুষ্কৃতকারীকে ধরে তার উপযুক্ত শাস্তি বিধান ইত্যাদি কর্তব্য পালনের দায়িত্বপ্রাপ্ত। কিন্তু তাদের দৈনন্দিন কর্তব্য পরিচালনার দায়িত্ব যেহেতু প্রতিষ্ঠিত সরকারের ওপর ন্যস্ত সেহেতু পুলিশের কোন কোন অংশ মনে করতে পারে যে তাদের প্রকৃত প্রভু গণভবনের ভাড়াটেরা।

সরকারি চাকরির চার্টার ও দুরভিসন্ধি

রাষ্ট্রের ক্ষমতা যাদের হাতে তারা বর্তমানে এসব ভুল ধারণার পুরোপুরি সুযোগ নিচ্ছেন। আইন-শৃঙ্খলা বলে দেশে কিছু অবশিষ্ট নেই, কারণ পুলিশকে তারা পুরোপুরি নিজেদের গদি রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন। দেশের মানুষের ওপর ভরসা নেই বলে তারা সর্বক্ষণ নিজেদের দুর্গকে শক্তিশালী করার চিন্তায় ব্যস্ত। বারেবারে তারা হাজার হাজার নতুন লোক নিয়োগ করে পুলিশ বাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি করে চলেছেন। এসব নিয়োগের বেলায় তারা নিজেদের দলের কর্মী ও ক্যাডারগুলোকেই বেছে নিয়েছেন। এমনকি বিভিন্ন সংবাদে দেখেছি যে ডিজিএফআই এবং এনএসআই নামক দুটো সামরিক গোয়েন্দা সংস্থাতেও ছাত্রলীগ-যুবলীগের বহু ক্যাডারকে উচ্চপদে স্থাপন করা হয়েছে। প্রায় ছয় বছর ধরে শাসকদলের প্রতি ষোলোআনা অনুগত কর্মীদের পদোন্নতি দিয়ে দিয়ে সর্বোচ্চ পদগুলোতে উন্নীত করা হয়েছে। বছর দুই আগে প্রাপ্ত কিছু পরিসংখ্যানে দেখেছিলাম যে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৪২টিতেই জেলা প্রশাসক ডেপুটি কমিশনাররা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, সহকারী সচিব, উপসচিব প্রভৃতি নির্বাহী কর্মকর্তা এবং পুলিশের ওসি থেকে সুপারিটেনডেন্ট পর্যন্ত কর্মকর্তাদেরও অধিকাংশ সেসব পরিসংখ্যানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক বলে দেখেছি।

প্রশাসনিক ও পুলিশ কর্মকর্তাদের অন্যায়-অবিচারের প্রতিবিধানের দায়িত্ব সংবিধান দিয়েছে বিচার বিভাগকে। কিন্তু প্রায় ছয় বছর আগে গদি পেয়েই বর্তমান ক্ষমতাসীনরা দলীয় লোকদের দিয়ে বিচার বিভাগে নিজেদের দলের একক গরিষ্ঠতা সৃষ্টি করেছে। ইতোপূর্বেই দেখা গেছে সরকারের ইচ্ছা পূরণ

বিচার বিভাগের প্রধান কর্তব্যে পরিণত হয়েছে। ভবিষ্যতেও যাতে বিচারকরা বিদ্রোহ করে সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন রায় দিতে না পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়েছে সম্প্রতি। বিচারকদের চাকরিতে বহাল রাখা না রাখার অধিকার দেয়া হয়েছে বর্তমানের অনির্বাচিত ও অবৈধ সংসদকে। বিচারকরা এমন অর্বাচিন নন যে সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রায় দিয়ে তারা নিজেদের চাকরি বিপন্ন করবেন। অর্থাৎ ন্যায়বিচার এবং অন্যায়ের প্রতিকার পাবার সব পথই এখন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। শুধুই কি তাই? দেশের ও বিদেশের জনমতের সামনে সরকারের কোন অন্যায় অবিচারের কথা প্রকাশ পাবার পথও রুদ্ধ করা হয়েছে মিডিয়ার স্বাধীনতার ওপর বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করে। অবস্থাটা যেন এ রকম: বাড়ির দরোজা-জানালা বন্ধ করে পরিবারের সদস্যদের হাতপা বেঁধে তাদের ওপর নির্যাতন করা হচ্ছে, গলা টিপে ধরে তাদের কাঁদবার কিংবা প্রতিবাদ করার অধিকারও রহিত করা হয়েছে।

আনুগত্য রাষ্ট্রের প্রতি, দলের প্রতি নয়

সচিবালয়ে হোক আর জেলা-উপজেলাতেই হোক যারা প্রশাসনের কাজে নিয়োজিত আছেন, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার পরিবর্তে যারা বিরোধী দলকে ঠ্যাঙাতে ব্যস্ত আছেন, আর ন্যায়বিচারের পরিবর্তে যারা সরকারের ইচ্ছা পূরণ করছেন রাষ্ট্রীয় উচ্চপদের পটভূমিটাই তারা ভুলে যাচ্ছেন। সিভিল সার্ভিসের সনদ সব দেশেই আছে। হিটলার-মুসোলিনীর মতো জঘন্য ও নিকৃষ্ট প্রশাসন ছাড়া সকল দেশেই ধরে নেওয়া হয় যে কোন বিশেষ দল ও সরকার নয়, বরং আমলাদের দায়িত্ব রাষ্ট্রের প্রতি। এবং তাদের চূড়ান্ত জবাবদিহিতাও রাষ্ট্রের প্রতি, কোন ক্ষণস্থায়ী সরকারের প্রতি নয়। সে জন্যেই আমলাদের চাকরির নিরাপত্তা দিয়ে তাদের নিরপেক্ষ থাকার অনুপ্রেরণা দানের লক্ষ্যে সিভিল সার্ভিসে চাকরির একটা চার্টার কিংবা সনদ সকল দেশেই থাকে।

ন্যায়নীতি অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করে কোন দলীয় সরকারের বিরক্তি উৎপাদন করলেও তাদের বরখাস্ত করা অথবা অন্য কোন শাস্তি থেকে সংরক্ষণ দেয়াই এই চার্টারের উদ্দেশ্য। তেমনি পরবর্তী কোন দলীয় সরকার যদি মনে করে যে আমলারা পূর্ববর্তী সরকারের প্রতি আনুকূল্যের কারণে তাদের প্রতি অবাধ্যতা দেখাচ্ছেন তাহলেও তারা সিভিল সার্ভিস চার্টারের সংরক্ষণ পেতে পারেন। তেমনি আমলাদেরও সর্বক্ষণ মনে রাখতে হবে তাদের চাকরি, বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি দিচ্ছে রাষ্ট্র, জনসাধারণের প্রদত্ত রাজস্ব থেকে। সুতরাং তারা যদি নিরপেক্ষতা ভুলে গিয়ে কোন দলীয় সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখান তাহলে সেটাও হবে চার্টারের অবমাননা। একই সঙ্গে নিজেদের বিবেকের এবং স্রষ্টার কাছেও তারা দায়ী হবেন।

সিভিল সার্ভিসের চার্টার বর্তমান সরকার সংশোধন করতে চায়, কিন্তু মিডিয়ার খবরে দেখা যাচ্ছে যে তার আগে তারা দলীয় এবং দলের প্রতি অনুগত আরো এক ঝাঁক কর্মচারী-কর্মকর্তার নিয়োগ, পদোন্নতি ইত্যাদি দিতে চায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে প্রশাসনের ষোলোআনা এবং নিশ্ছিদ্র দলীয়করণের সিদ্ধান্ত সরকার নিয়ে ফেলেছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের ব্যয়ে তারা গোটা দেশটাকে দলীয় ক্যাডারে পরিণত করতে চায়। গদি চিরস্থায়ী করার জন্যে সরকার কেমন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে এ হচ্ছে তার প্রমাণ। কিন্তু একটা ব্যাপার তারা ভুলে যাচ্ছে। দলীয় সরকারের আজ্ঞাবহ হতে গিয়ে আমলারাও প্রতারিত হচ্ছেন। বর্তমান সরকার ইচ্ছা ও সুবিধা অনুযায়ী সংবিধান পরিবর্তন করছে, সিভিল সার্ভিসের চার্টার ও নিয়মাবলী সংশাধন করছে। তারা ভুলে যাচ্ছে যে পরবর্তী কোন সরকারও তাদের সৃষ্ট নজির অনুসরণ করে এখনকার সংবিধান এবং এই সরকারের তৈরি সিভিল সার্ভিস চার্টার বদলে দিতে পারবে। তেমন অবস্থায় ডবল-ট্রিপল প্রমোশন পাওয়া আমলারা হয়তো পথে বসবেন।

সরকার বাস্তব-বিমুখ, আত্মপ্রতারক

দূরদৃষ্টির অপবাদ এই সরকারকে কেউ কখনো দেয়নি। কিন্তু মনে হচ্ছে যে তারা এখন বাস্তব-বিমুখ হয়ে পড়েছে, আত্মপ্রতারণায় ভুগছে। প্রধানমন্ত্রীর উক্তিগুলো বিবেচনা করলেই সেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন 'খালেদা জিয়ার পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে গেছে।' কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখছি? খালেদার জনসভায় জনসমাগম ক্রমেই বেড়ে চলেছে। নীলফামারীর সভায় এমন বিশাল সমাগম হবে বলে কি প্রধানমন্ত্রীও কল্পনা করতে পারতেন আগে? সরকারের মন্ত্রীরা, আওয়ামী লীগের নেতারা সকাল-সন্ধ্যা বিএনপির মৃত্যু-ঘোষণা প্রচার করে চলেছেন। সত্যি বটে যে বিএনপির ভেতরে কিছু কাঠামোগত সমস্যা আছে। মিডিয়ার খবর থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সমস্যা আরো সঙ্কটাপন্ন। এমন দিন কমই যায় যেদিন আওয়ামী লীগ ও শাখা-প্রশাখাগুলোর গৃহযুদ্ধে কিছু লোকের মৃত্যু ও আহত হবার খবর পত্রিকার পাতায় দেখা যায় না। সরকার পক্ষের লোকেরা যতো প্রতিবাদই করুক, যতোই তারা গায়ের জোরে বিদ্রূপ করুক, খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা হ্রাস পাবার পরিবর্তে বেড়েই চলেছে।

পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে আরো একটা সত্য বেরিয়ে আসবে। সরকার এবং শাসক দল ও গোষ্ঠী যাদেরই সমালোচনা করছে তাদের জনপ্রিয়তা ততোই বেড়ে যাচ্ছে। অধ্যাপক ড. পিয়াস করিমকে নিয়ে ইতরামীর কথা ভুলে গেছেন কেউ? শহীদ মিনারকে বাপের সম্পত্তি দাবি করে পিয়াস করিমের লাশ ভক্ত ও

অনুসারীদের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে শহীদ মিনারে রাখতে দেয়নি ওরা। কিন্তু মানুষের উদ্বেলিত শোক ও শ্রদ্ধা নিবেদনের দৃশ্য কি মন্ত্রীদের এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের চোখে পড়েনি? দেশের মানুষ শাসক গোষ্ঠীর ক্ষুদ্রতায় ছি-ছি করেছে। জানতে পেরেছি আওয়ামী লীগের এবং সেকুলারিজমের বহু সমর্থকও মৃতদের নিয়ে রাজনীতি করার, তাদের স্মৃতিকে অশ্রদ্ধা দেখানোর এই প্রবণতায় খুবই ব্যথিত হয়েছেন।

এর আরেকটা জ্বলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত দেখা গেছে গোলাম আজমের বেলায়। তার জানাজার নামাজ পরিচালনার বেলায় সরকার ভেটো প্রয়োগ করেছে, আওয়ামী লীগ নেতাদের এবং মন্ত্রীদেরও কেউ কেউ দাবি করেছেন গোলাম আজমকে যেন বাংলাদেশের মাটিতে কবর দিতে দেয়া না হয়। কি আবদার এদের! যেন বাংলাদেশের মাটিকেও তারা পৈতৃক সম্পত্তি মনে করেন। এসব ক্ষুদ্র-প্রাণতার কি জবাব বাংলাদেশের মানুষ দিয়েছে সেটা লক্ষ্য করার দূরদৃষ্টি কি এদের আছে? গোলাম আজমের জানাজায় শরিক হবার জন্যে দেশের দূর দূরান্ত থেকে দলে দলে মানুষ ঢাকায় এসেছে। বায়তুল মোকাররমে স্মরণ কালের বৃহত্তম সমাবেশ হয়েছে এ জানাজায়। দেশের আরো বহু স্থানে, ইউরোপ-আমেরিকা আর অস্ট্রেলিয়ার বহু শহর-নগরেও হয়েছে গায়েবানা জানাজা। বহু স্থানে মানুষ দীর্ঘ সারি দিয়ে শোকগ্রন্থে স্বাক্ষর করেছে। দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ এখন একটা নীরব বিপ্লব শুরু করেছে। শেখ হাসিনা এবং তার মন্ত্রীরা যা বলবেন তার বিরুদ্ধে যাবার সিদ্ধান্ত মানুষ নিয়ে ফেলেছে।

এরা হারুনর রশিদ নন

ভবিষ্যতে যখন নির্বাচন হবে তখন শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের বিরোধীতা করার জন্যেও মানুষ খালেদা জিয়া ও বিএনপিকে ভোট দেবে। সরকারও সেটা জানে এবং জানে বলেই বিএনপি নেতাদের ভবিষ্যৎ নির্বাচন থেকে বঞ্চিত রাখার কোন চেষ্টারই তারা ত্রুটি রাখছে না। খালেদা জিয়াসহ বিএনপির পাঁচ শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে ১৭২টি ভুয়া মামলা সে চেষ্টারই অংশমাত্র। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ পাগল নয় যে এসব ভুয়া অভিযোগ তারা বিশ্বাস করবে। শীর্ষ নেতারা বাংলামোটরে গিয়ে গাড়িতে আগুন লাগাচ্ছেন, এয়ারপোর্ট রোডে গাড়ি ভাঙচুর করছেন কিংবা সচিবালয়ে পটকা ছুঁড়ছেন– এমন কথা বদ্ধ পাগলেও বিশ্বাস করবে না। তাছাড়া বাংলাদেশের কিছু মানুষেরও মনে আছে শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলায় গিয়ে ষড়যন্ত্র করেছিলেন, পাকিস্তানীরা তাকে কয়েদ করেছিলো, নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষণা করেছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুজিবকে নিয়েই ১৯৭০ সালে জেনারেল ইয়াহিয়া খান নির্বাচন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

যে কোন মনঃস্তত্ত্ববিদ আপনাকে বলে দেবে মিথ্যা বলতে বলতে মিথ্যাবাদী এতোই অভ্যস্ত হয়ে যায় যে নিজেকেও সে মিথ্যা বলতে শুরু করে; অন্যকে প্রতারণা করার এক পর্যায়ে প্রতারক নিজেকেও প্রতারণা করতে শুরু করে। বর্তমান সরকারেরও হয়েছে সে দশা। তারা মনে করে তাদের প্রধানমন্ত্রী একজন পরী– তিনি দেশে-বিদেশে উড়ে গিয়ে জাদুর কাঠি ছুঁইয়ে দিয়ে আসবেন আর সেসব দেশই বাংলাদেশের প্রেমে আবিষ্ট হয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রী যে দেশে যাচ্ছেন, যে নেতার সঙ্গে কথা বলছেন কিংবা ফটোসেশন করছেন, সকলেই তাকে পরামর্শ দিচ্ছেন দ্রুত 'সংলাপের মাধ্যমে সকলের গ্রহণযোগ্য' নির্বাচন দিতে। কিন্তু দেশে ফিরে প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন সকলেই তার ৫ জানুয়ারির নির্বাচনী রঙ্গ-তামাশাকে মেনে নিয়েছে, উপভোগ করেছে।

সরকার বলছে এদেশ-সেদেশ এবং বহু দেশ বাংলাদেশকে অর্থ সাহায্য করবে, বাংলাদেশে বিনিয়োগ করবে এবং লাখে লাখে বাংলাদেশী শ্রমিক নিয়োগ করবে বলে 'আভাস পাওয়া গেছে'। কিন্তু আভাসে মানুষের পেট ভরে না। বেকার শ্রমিক আর আশ্বাস পায় না। দেশে রেমিটেন্স আসে না। এ সরকার খলিফা হারুনর রশিদের সে কাহিনীর কথা আমাকে মনে করিয়ে দেয়। এক রাতে খলিফা তার অমাত্যকে নিয়ে ছদ্মবেশে বাগদাদ নগরীর প্রকৃত অবস্থা দেখতে বেরিয়েছিলেন। এক জায়গায় দেখেন এক মা হাঁড়িতে পাথর সিদ্ধ করছেন আর ক্ষুধার্ত সন্তানদের বলছেন যে শিগগিরই রান্না হয়ে গেলে তারা পেট ভরে খেতে পারবে। শিশুরা কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়বে বলে আশা করছিলেন সে মা। খলিফা ও অমাত্য গিয়ে দ্রুত কিছু খাবার নিয়ে এলেন, পেটপুরে খেয়েছিলো পরিবারটি। হায়! আজকের বাংলাদেশ রূপকথার দেশ নয়, আর শেখ হাসিনাও হারুনর রশিদ নন।

(লন্ডন, ২৮.১০.১৪)

বর্তমান বাস্তবতার আলোকে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান

এ বছরের পয়লা নবেম্বর তারিখটা বাংলাদেশের মানুষ বহুকাল ভুলতে পারবে না। মাঝ সকালে হঠাৎ করে গোটা দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল এক সঙ্গে। আলো ঝলোমলো বিপনী কেন্দ্রগুলোতে নেমে এলো অন্ধকার। হাসপাতালে প্রাণ বাঁচানো যন্ত্রপাতির জন্যেও নেই বিজলি। কলকারখানা ঘরবাড়ি অফিস আদালতের কাজ বন্ধ। এমনকি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন এবং প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ও ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। আলোর অভাবে শিশুরা লেখাপড়া করতে পারছে না। ফ্যান, এসি, টিভি, টেলিফোন সবই অচল। বহুতল ভবনের লিফট চলছে না। এসব ভবনের চৌদ্দ, পনেরো কিংবা ১৬ তলায় যাদের বাস তাদের অবস্থা কল্পনা করতেও আতঙ্ক হয়। বিদ্যুৎ নেই রাতেও। মহাকাশ পরিক্রমারত কৃত্রিম উপগ্রহগুলো থেকে বাংলাদেশকে নিশ্চয়ই বিশাল এক অন্ধকারপুরী মনে হয়েছে। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় ছেয়ে গিয়েছিলো বাংলাদেশ।

সর্বত্র একই কথা শোনা গেছে। ভারতের নিজের বিদ্যুৎ সঙ্কট দেখা দিয়েছিলো। তারা বাংলাদেশের গ্রিডে বিদ্যুৎ পাঠানো বন্ধ করে দেয়। তিক্ত বিদ্রূপের সুরে অনেকে আমাকে বলেছেন, ভারতের বিদ্যুৎ ভারত নিজের চাহিদা আগে মেটাবে, বাংলাদেশকে বিক্রি করবে তার পরে, কার কি বলবার আছে তাতে? যুক্তি সঠিক। আপত্তি করার কিছু নেই তাতে। আরেকজন বলেন, সব ডিম এক ঝুড়িতে রাখলে যা হয় এখানেও তাই হয়েছে। তারা তো আর শেখ হাসিনার সরকার নয় যে নিজে না খেয়ে সব কিছু প্রতিবেশী দেশকে দিয়ে দেবে! বাংলাদেশের কাছে যে বিদ্যুৎ ভারত বিক্রি করছে তার মধ্যে নিশ্চয়ই অভিন্ন নদীতে বাঁধ তৈরি করে উৎপাদিত বিদ্যুৎ আছে, আছে ত্রিপুরা রাজ্যে উৎপন্ন বিদ্যুৎও। আপনাদের মনে থাকার কথা ত্রিপুরায় বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্যে অতিকায় যন্ত্রপাতি নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে। সেজন্যে ১৩৪ চাকার ভারী ট্রেলার নিয়ে যেতে মধুমতি নদীতে এবং এক ডজন খালে বাঁধ

দিয়ে স্রোত বন্ধ করে দেয়া হয়েছিলো। বাংলাদেশের পরিবেশের তাতে অবর্ণনীয় ক্ষতি হয়েছে। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান প্রায় দুবছর ধরে জেল খাটছেন, বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলী তো গুম হয়ে গেলেন।

কিন্তু ভারতের দেখাদেখিও তো বাংলাদেশ সরকার বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করে নিজেদের দেশের চাহিদা মেটাতে পারতো। ছয় বছর কি সেজন্যে যথেষ্ট সময় ছিলো না? তার বদলে তারা কুইক রেন্টালের নামে আত্মীয়স্বজন এবং দলের নেতাদের ২০,০০০ কোটি টাকা রাতারাতি পকেটস্থ করতে দিয়েছে। 'বাঙালি জাতীয়তার' নামে যদি তারা ভারতীয় ধনপতিদের বিত্ত-সম্পদ বাড়িয়ে দিতে চায় তাহলে আরো বহু গলাধাক্কা এবং হেনস্থা সইতে হবে বাংলাদেশের মানুষকে। 'এক মাঘে শীত যায় না', একবার যেখানে দিবারাত্রি বিদ্যুৎ-বিহীন থাকতে হয়েছে দেশের মানুষকে, সেখানে বিদ্যুৎ বন্ধের ঘটনা আরো বহুবার ঘটবে, কেন না ভারতীয়রাই বলছে তাদের বিদ্যুৎ সঙ্কট ক্রমেই বেশি তীব্র হয়ে উঠছে।

পরনির্ভরশীলতার কারণে আরো অনেক দুঃখ আছে বাংলাদেশের কপালে। অবস্থা যেন ধনকুবেরের হাতে ভিখিরির দুটো পয়সা তুলে দেয়া। অনেক বেশি ধনী দেশ ভারত। কিন্তু তাকে দাক্ষিণ্য দেখাচ্ছে ফতুর দেশ বাংলাদেশ। বিনা মাশুলে আমরা আমাদের নদীপথ এবং নদী ও সমুদ্রবন্দর ভারতকে অবাধে ব্যবহার করতে দিচ্ছি। তা না হলে নাকি বাংলাদেশের মানুষ অসভ্য হয়ে যাবে। শুধু বহির্বাণিজ্য নয়, উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যের জন্যেও তারা এখন চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের অধিকার দাবি করছে। আমাদের রেলপথ এবং সড়কগুলো ভারত অবাধে ব্যবহার করবে। আমাদের অবকাঠামোই যে শুধু তাতে নষ্ট হবে তা নয়, এইচআইভি, গনোরিয়া-সিফিলিস জাতীয় যৌন ব্যাধিগুলোরও ব্যাপক আমদানি হবে বাংলাদেশে – ইয়াবা ও ফেনসিডিলের মতো। ওদিকে ভারতের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক ঘাটতিতেও নতুন নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হচ্ছে।

অতিকায় দেশ ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর এসব সমস্যা দিব্যচোখে দেখতে পেয়েছিলেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। তিনি বুঝেছিলেন প্রতিবেশী ক্ষুদ্র দেশগুলোর কাছে ভারত নিত্যনতুন দাবি জানাবে। দিতে অস্বীকার করার সাহস ক্ষুদ্র দেশগুলোর হবে না। বিশেষ করে বর্তমান বাংলাদেশের মতো যখন ক্ষুদ্র কোন দেশের শাসকরা দিল্লির অধিপতিদের করুণার ওপর নির্ভর করে গদিতে টিকে থাকতে চাইবে। জিয়াউর রহমান সার্ক (দক্ষিণ আঞ্চলিক সহযোগিতা সমিতি) সংস্থাটি গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এর অন্তর্নিহিত লক্ষ্যটি ছিলো ছোট বড়ো সব দেশই সমান অধিকারের ভিত্তিতে

পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে; কোন দেশ অন্যের কাছে অন্যায় সুবিধা চাইতে পারবে না; এক দেশ যতোটুকু চাইবে তাকে দিতেও হবে ততোটুকু। দিল্লিতে যারা তখন ক্ষমতায় ছিলেন তাদের উদ্দেশ্য সাধু ছিলো না। তারা জিয়াউর রহমানের আদর্শে শরিক হতে রাজি ছিলেন না। সার্ককে পাশ কাটিয়ে যাবার এবং উপেক্ষা করার পথই তারা বেছে নিয়েছিলেন। বর্তমানে ভারতের দিক থেকে সার্ক-প্রীতি আসছে এ কারণে যে বাংলাদেশকে তারা পুরোপুরি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। সমান সমান অধিকার দাবি করে দিল্লির জন্যে অসুবিধা সৃষ্টি আর এই ক্ষুদ্রতর প্রতিবেশীটির জন্যে সম্ভব নয়।

জিয়াউর রহমান বুঝে গিয়েছিলেন বড়ো দেশের ছোট প্রতিবেশীর বেঁচে থাকার চাবিকাঠিই হচ্ছে দুই সম্পত্তির মাঝখানের বেড়া মজবুত করা এবং একই সঙ্গে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হবার সকল চেষ্টা শুরু করা। বড়ো প্রতিবেশীর কাছে তেল-নুনটা ধার করতে যাবেন, একদিন দেখবেন প্রতিবেশী আপনার বসত-ভিটেটাও দখল করে নিতে চাইছে – রবীন্দ্রনাথের দুই বিঘা জমির মতো। বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রচার করে জিয়া দুই সম্পত্তির মধ্যেকার বেড়াটাই মজবুত করতে চেয়েছিলেন। আর স্বাবলম্বী হবার ধ্যান-ধারণার কথা ক্ষমতা প্রাপ্তির গোড়াতেই খুলে বলেছিলেন আমাকে।

অগতির গতি নেতা

জিয়াউর রহমান সকল বিচারেই 'অগতির গতি' গোছের নেতা ছিলেন। একাত্তরের মার্চ মাসে দেশ টগবগ করে ফুঁসছে। জয়দেবপুরে, চট্টগ্রাম বন্দরে বাংলাদেশী সেনাসদস্য আর সাধারণ মানুষের সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু আন্দোলনের নেতা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্নে বিভোর। পাকিস্তানীরা পূর্ব পাকিস্তানে সমরশক্তি বৃদ্ধির জন্যে সময় নিচ্ছিলো। আমার বড়ো ভাই পাকিস্তান বিমান বাহিনীর রেডার বিশেষজ্ঞ এবং শেখ মুজিবুর রহমানের কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের বন্ধু গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ বি এম মাহবুবুর রহমান করাচি থেকে লোক পাঠিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। মুজিব সেটা গায়ে না মেখে বলেছিলেন, 'মাহবুব আমাকে ভালোবাসে, ওকে বলে দিও অনর্থক চিন্তা না করতে'। সে হুঁশিয়ারির কথা জানাজানি হয়ে যাবার পর আমার ভাইকে ৬৬দিন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নির্যাতন করা হয়েছিলো।

পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এলে তাকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করা হবে– জেনারেল ইয়াহিয়া খানের এ আশ্বাসে বিশ্বাস করে শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেলেন। এদিকে ৯৩ হাজার পাকিস্তানী সৈন্য

'হটহেডদের মাথা ঠাণ্ডা করার জন্যে' পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। তখন আর পিছু হটার সময় ছিলো না। মেজর জিয়াউর রহমান এগিয়ে এসে আন্দোলনের হাল ধরলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করলেন। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগে মুজিবের ডান হাত এবং ভারতে নির্বাসিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, মুক্তিযুদ্ধের উপপ্রধান সেনাপতি এয়ার মার্শাল এ কে খোন্দকার, মুজিবের সেনাপ্রধান জেনারেল সফিউল্লাহসহ অনেক দায়িত্বশীল ব্যক্তি জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার কথা বলে গেছেন।

পঁচাত্তর সালে কয়েকজন বিদ্রোহী সেনাকর্মকর্তা 'আজীবন রাষ্ট্রপতি' শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে। তারা আওয়ামী লীগ নেতা হিসেবে মুজিবের সমসাময়িক এবং তার সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী খোন্দকার মুশতাক আহমেদকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিতে চাপ দেয়। তিনি মুজিব সরকারের আটজন মন্ত্রীকে নিয়ে একটি আওয়ামী লীগ দলীয় সরকার গঠন করেন। কিন্তু ভারত সে সরকারের ওপর ভরসা করতে পারেনি। ভারতপন্থী বলে বিদিত জেনারেল খালেদ মোশাররফ একটি রক্তক্ষরা অভ্যুত্থান ঘটান। খালেদ মোশাররফ সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী করেন। সেনাবাহিনীর কয়েকজন অফিসার এবং গরিষ্ঠসংখ্যক সাধারণ সৈনিক খালেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে-বাইরে প্রচুর প্রাণহানি হয়েছিলো। অবশেষে ভারতে পালিয়ে যাবার সময় খালেদ মোশাররফ সাধারণ সৈনিকদের হাতে ধরা পড়েন এবং গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। সাধারণ সৈনিকরা ফটক ভেঙে জিয়াকে মুক্ত করেন এবং সেনা সদর দফতরে নিয়ে যান। কাণ্ডারীবিহীন রাষ্ট্রের হাল শক্ত হাতে না ধরে জিয়ার গত্যন্তর ছিলো না, বাংলাদেশকে তিনি মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন।

সাক্ষাৎকার নয়, আলোচনা

তিন মাস পরে, ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তার সেনানিবাসের অফিসে জেনারেল জিয়ার সাক্ষাৎকার নিতে যাই। তিনি নিজে এগিয়ে এসে আমাকে অভ্যর্থনা করেন। আমার হাত থেকে টেপরেকর্ডার, মাইক্রোফোন, ক্যামেরা ইত্যাদি নিয়ে তিনি তার পিএস কর্নেল অলির হাতে দিলেন। বললেন, ওলি, এগুলো প্রাণ দিয়ে রক্ষা করো; রাইফেল যেমন তোমার-আমার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ এগুলো মি. রহমানের জন্যে সমানই গুরুত্বপূর্ণ। আমাকে তার খাস দফতরে নিয়ে যেতে যেতে তিনি বললেন, সাক্ষাৎকার নয়, আমি আপনার সঙ্গে দেশের জটিল সমস্যাগুলো এবং আমার চিন্তা-ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

প্রায় দুঘণ্টা ধরে অনেক কথাই তিনি আমাকে বলেছিলেন। চুয়াত্তরের মন্বন্তরের স্মৃতি তার মনে তখনো তাজা। খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির সকল চেষ্টা অবিলম্বে শুরু করতে হবে এবং সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা। সেনাবাহিনীর নিজের কিছু সমস্যা আছে (তিনি রক্ষীবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ, এ বাহিনীকে জাতীয় সেনাবাহিনীর চাইতে অনেক বেশি পক্ষপাতিত্ব দেখানোর ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন), তাছাড়া বাইরের কিছু লোক উস্‌কানি দিয়ে সেসব সমস্যা বাড়িয়ে তুলেছে। জিয়া বলেন, সেনাবাহিনীতে চেইন-অব-কমান্ড ফিরিয়ে আনা তার প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে। তিনি বলেন, এর পরের সমস্যা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার এবং পরবর্তী কিছু ঘটনার কারণে (তিনি ৯৩ হাজার পাকিস্তানী সেনাকে মুক্তিদান অথচ কিছু বাংলাদেশীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ বাসনার প্রতি ইঙ্গিত করছিলেন) সমাজে ও জাতিতে বিরাজমান উত্তেজনা। তিনি বলেন, 'এই লোকগুলো তো এ দেশেরই লোক। এদের নিয়ে আমি কি করবো? আর কোন দেশ কি তাদের নেবে? নেবে না। তাহলে আমি কি করবো এদের নিয়ে? এদের কি আমি বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিয়ে আসবো?' জেনারেল জিয়াউর রহমান বলেন, এই লোকগুলোকে জাতীয় জীবনে সম্পৃক্ত করা না হলে তারা পিঠে ছুরি মারবে। পিঠ বাঁচানোর চিন্তায় যদি আমি সব সময় ব্যস্ত থাকি তাহলে দেশের কাজ করার সময় পাবো কখন?

জিয়ার কথা জিয়ার কাজ

জিয়া বলেন দেশ ছোট, সম্পদ কম, কিন্তু জনসংখ্যা খুব বেশি। বেকার, বিশেষ করে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা খুব বেশি। সঠিকভাবে কাজে লাগানো গেলে এরা বিরাট সম্পদ হতে পারতো। কিন্তু বেকার থাকলে এরা সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করবে। তিনি বলেন, এদের উৎপাদনশীল কাজে কিভাবে ব্যস্ত রাখা যায় আমি সিরিয়াসলি সে চিন্তা করছি। একটা সম্ভাবনা হচ্ছে এদের নিয়ে সমবায় পদ্ধতিতে শ্রমশিল্প গড়ে তোলা। তাতে এক সঙ্গে দুই রকমের ফল পাওয়া যাবে। জিয়া বলেন, প্রতিবেশী দেশ অভিন্ন নদীতে বাঁধ তৈরি করছে, তাতে প্রয়োজনের সময় আমরা নদীর পানি পাচ্ছি না। আমাদের কৃষি তাতে ব্যাহত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। নদী আর খালগুলোর সংস্কার করে এবং পানি ধরে রাখার জন্যে বড়ো বড়ো জলাশয় তৈরির কথা আমি ভাবছি।

জিয়া বলেন, বাংলাদেশের মানুষ একরোখা। তাদের গণতন্ত্র না দিলে চলবে না। আর সংবাদপত্রকেও স্বাধীনতা দিতে হবে। শিগগিরই আমি পত্রপত্রিকার ওপর থেকে সকল বিধিনিষেধ তুলে নেবার পরিকল্পনা করেছি। আর বাকশালীরা তো সকল রাজনৈতিক দল বেআইনী করে দিয়েছে। সেসব দলকে আবার চালু

করে কিভাবে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা যায় সে সম্বন্ধে কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকসহ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছি।

লন্ডনে ফিরে এসে পরবর্তী কিছুকাল আমি জেনারেল জিয়াউর রহমানের কাজ ও কথাগুলোর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছি। তার কথা ও কাজের মিল কতোখানি সেটাই আমার দেখবার বিষয় ছিলো। দেখেছি আমাকে তিনি যা-যা বলেছিলেন তার সঙ্গে তার কথা ও কাজগুলো হুবহু মিলে যাচ্ছে। তিনি সংবাদপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে দিলেন। এবং আওয়ামী লীগসহ সকল দলকে আবার বৈধ ঘোষণা করলেন, নতুন রাজনৈতিক দল গঠনও বৈধ হলো। নিজেও তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি গঠন করেছিলেন। বিশেষ করে শিক্ষিত বেকারদেরসহ জাতীয় জীবনের সকল স্তরের নরনারীকে নিয়ে তিনি খাল খনন ও নদী সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। নিজেও তিনি মাটি কেটেছেন বিভিন্ন স্থানে। প্রায় একই সময়ে তিনি দেশের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে তার ঐতিহাসিক ১৯ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ১৯ দফায় এবং বিএনপির কর্মসূচির মধ্যে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি ও শ্রমশিল্পের উন্নয়নের কথা তিনি জোর দিয়ে বলেছেন।

নতুন প্রজন্মের চরম অধঃপতন

সমবায় পদ্ধতির উন্নয়ন রাষ্ট্রের সম্পদের সুষম বন্টনের প্রকৃষ্ট উপায় বলে জিয়াউর রহমান বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশে যা ঘটেছে এবং ঘটছে সেটা জিয়ার স্বপ্নের বাংলাদেশের পুরোপুরি বিপরীত। পাকিস্তানী আমলে বলা হতো দেশের সম্পদের গরিষ্ঠ অংশের মালিক ২২টি পরিবার। বর্তমান বাংলাদেশে সে সংখ্যা সম্ভবত ২২০০ হবে। দেশের মোট সম্পদের ৯৫ শতাংশ ইতোমধ্যেই এদের হাতে চলে গেছে। অবশিষ্ট মানুষ কোনমতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জীবনের গাড়ি ঠেলছে। বর্তমান অবস্থা চলতে থাকলে এরা আরো শোষিত হবে, চাকর-বাকর শ্রেণীতে চলে যাবে তারা। দেশ এবং জাতির কথা নতুন প্রজন্ম এখন আর ভাবছে না। উৎপাদনশীল কর্মের পরিবর্তে ভাড়াটে গুণ্ডামী, লুটপাট, ছিনতাই, ধর্ষণ, হত্যা এসবে লিপ্ত হচ্ছে আজকের নতুন প্রজন্ম।

ভারত যা চাইছে আগ বাড়িয়ে তার চাইতেও বেশি দিচ্ছে আজকের সরকার। এ ক্ষেত্রে দেয়াটাই সার হচ্ছে, বিনিময়ে আমরা কিছু পাচ্ছি না। এমনকি চুক্তিবদ্ধ অঙ্গীকারগুলোও পালন করছে না প্রতিবেশী দেশ। ১৯৭৪ সালে শেখ মুজিব ও ইন্দিরা গান্ধীর স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী স্থলসীমা স্বাভাবিকীকরণ আজো হয়নি। নানা অজুহাত দেখিয়ে এবং ধানাই পানাই করে ভারত বাংলাদেশের প্রাপ্য ভূখণ্ডগুলো হস্তান্তর করছে না। অভিন্ন নদীগুলোর

পানির ন্যায্য হিস্যা ভাঁটির দেশগুলোকে দেয়া আছে জাতিসংঘ সনদ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইনে। কিন্তু অন্তত ৩৫টি নদীতে বাঁধ বেঁধে ভারত ন্যায্য অধিকার থেকে বাংলাদেশকে বঞ্চিত করছে। তারপরেও বিনা তদন্ত, বিনা আপত্তিতে টিপাইমুখে বাঁধ তৈরির সুযোগ বাংলাদেশ সরকার ভারতকে দিয়ে দিয়েছে। তিস্তা নদীর পানি বণ্টন সম্বন্ধে চুক্তি করবে বলে কয়েক বছর ধরে বলে আসছে ভারত। এখানেও স্থলসীমা চুক্তির মতো ধানাই পানাই করে কালক্ষেপণ করছে ভারত। ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়ার সঙ্গে ফারাক্কায় গঙ্গার পানি বণ্টন সম্বন্ধে চুক্তিতে সই করেছিলেন। সে চুক্তি অনুযায়ী পানি বাংলাদেশ কোন বছরই পায়নি। এখন আবার গঙ্গার উজানে আরো ১৬টি বাঁধ তৈরি করছে ভারত। তার পরে যে বাংলাদেশের ভাগ্যে আরো কম গঙ্গার পানি জুটবে শিশুতেও সেটা বোঝে।

ভাবছি শহীদ জিয়ার আদর্শ অনুসরণ করে চললে বাংলাদেশের পরিস্থিতি এমন হতে পারতো কিনা!

(লন্ডন, ০৪.১১.২০১৪)

থলির বিড়ালগুলো পাড়াময় লাফালাফি করছে

পুরাতন বস্তার মধ্যে ঠেঁসে ঠেঁসে ধান ভরানো দেখেছেন নিশ্চয়ই। বস্তা আর নিতে পারছে না। এখানে সেখানে সেলাই খুলে যাচ্ছে। ধান বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। এখানে সেলাই দিন, ওখানে আবার সেলাই খুলবে কিংবা ফাটল ধরবে। ঠিক যেন বর্তমান অবৈধ আওয়ামী লীগ সরকারের মতো। এদের অন্যায়ের বোঝা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এখন আর সামাল দেয়া যাচ্ছে না। নেতা-নেত্রীদের কথায় ও কাজে সব চিচিং ফাঁক হয়ে পড়ছে।

বিগত বৈধ নির্বাচনের কথা মনে আছে? সে নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ নেতারা, বিশেষ করে তাদের প্রগলভ নেত্রী শেখ হাসিনা মৌসুমী বর্ষার জলধারার মতো অকাতরে প্রতিশ্রুতি বর্ষণ করে যাচ্ছিলেন। তার দল নির্বাচিত হলে ১০ টাকা কেজি দরে চাল পাবে বাংলাদেশের মানুষ, নুন-তেল-মসলার দামও কমে যাবে, বিদ্যুতের লোডশেডিং হবে না, ধন-ধান্য-পুষ্পে ভরে যাবে বাংলাদেশ। অন্য প্রতিশ্রুতিগুলোও মনে আছে আপনাদের? ওই যে দুর্নীতির প্রসঙ্গ! প্রধানমন্ত্রী হলে শেখ হাসিনা মাঝে মাঝে সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীদের সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করবেন– যার থেকে দেশের মানুষ বুঝতে পারবে দেশে দুর্নীতি হচ্ছে কিনা।

তার পরে কি হলো? বিদেশী প্রভু এবং স্বদেশী মীর জাফররা মাস্টারপ্ল্যান করলো, শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হলেন। বেশি সময় নষ্ট না করেই তিনি ঘোষণা দিলেন সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীরা সম্পদের বিবরণ তৈরি করবেন। তবে সেটা সাধারণ্যে প্রকাশিত হবে না, প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা পড়বে। প্রধানমন্ত্রী সেসব বিবরণ নিয়ে কি করবেন তার কোন ব্যাখ্যা কখনোই দেয়া হয়নি। সেই কুমির যে শেয়ালের কাছে তার ছানাদের পুষতে দিয়েছিলো সে কাহিনী নিশ্চয়ই জানেন সকলে!

প্রথম কোপ পড়লো শেয়ারবাজারের ওপর। ৩৫ লাখ স্বল্পবিত্তের ছা-পোষা মানুষের যৎসামান্য বিনিয়োগ, তাদের সর্বস্ব লোপাট হয়ে গেল রাতারাতি। গোটা দেশের মানুষ জানলো মূলধন দিয়ে যারা আওয়ামী লীগের পেশীর রাজনীতি বাঁচিয়ে রেখেছিলো, শত শত বাস ভাড়া করে ভাড়াটে সমর্থকদের সভা-সমাবেশ আর লগি-লাঠি-বৈঠার হত্যালীলায় হাজির করেছিলো, তাদের

ঋণের প্রথম কিস্তি শোধ হয়ে গেল। বাংলাদেশের যে কোন গাঁয়ে-গঞ্জে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন। আওয়ামী লীগকে কে পুঁজি দিয়েছিলো, কার ঋণ শোধ হলো, সকলের নাম লোকের মুখে মুখে। কিন্তু আমরা যারা ভাগ পাইনি ও পেতে চাইনি মহাজনদের নামগুলো আমরা বলতে পারলাম না। মাতুব্বরের বাতকর্ম শুনলেও নাকি বলতে নিষেধ। চুপ করে থাকাই বিজ্ঞতা।

হাজার হাজার কোটি টাকার হরির লুট

বাংলাদেশের পরিবেশ ধ্বংস করে ১৩৪ চাকার ট্রাক গেল আগরতলায়, বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানার অসম্ভব ভারী যন্ত্রপাতি নিয়ে। আমাদের এক নদী আর ১২ খালে বাঁধ দিতে হলো সেজন্যে। ক্ষতি হলো কৃষকের আর পরিবেশের। তার বদলে ভারত নাকি ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে বিদ্যুৎ বিক্রি করবে। আর বাংলাদেশ কি করলো? নিজের বিদ্যুৎ কারখানা তৈরি না করে কুইক রেন্টালের নামে ২০ হাজার কোটি টাকার হরির লুট দিলো আওয়ামী লীগ নেতাদের পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের। গুপ্ত খবরের সন্ধান পেয়েছিলেন সাংবাদিক দম্পতি মেহেরুন রুনি ও সাগর। বিবরণ ছিলো তাদের কম্পিউটারে। গভীর রাতে নিজেদের শোবার ঘরে পাঁচ বছরের পুত্রের সামনে তাদের খুন করে সে কম্পিউটার চুরি হয়। সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই খুনিদের গ্রেফতারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আজো অবধি সে মামলা ঝুলছে তো ঝুলছেই। ঝুলবে না তো হবে কি? তখনই ব্যাপক জনশ্রুতি শোনা গিয়েছিলো যে খুনি দুজন ছিলো ২০ কোটি টাকার ভাগিদারদের আত্মীয় এবং তাদের অবিলম্বে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো।

তারপর থেকে সকলকে জানান দিয়ে ডেসটিনি, হলমার্ক ইত্যাদি নানান জমকালো নামে আরো ২০-২২ হাজার কোটি টাকা লোপাট হয়ে গেল, আরো নানা ভাবে পেছনের দরোজা দিয়ে কোন কোন ব্যাংকের বহু হাজার কোটি টাকা গিয়ে কারো কারো পকেটে ঢুকলো। শুনেছি পাঁচটি রাষ্ট্র-মালিকানাধীন ব্যাংক এখন বলতে গেলে ফতুর। এবং এ নাম- সে নামে দুর্নীতি বাংলাদেশের বিগত ছয় বছরের ইতিহাসের সঙ্গে সমার্থক হয়ে গেছে। বাংলাদেশে কাউকে বিদেশী মুদ্রায় মাসিক দুই কোটি টাকা মাইনে দেবার কথা আগে শুনেছেন কখনো? অনেকেই বলছেন, ঘনিষ্ঠ লোকেদের টাকার পাহাড় বানানোর সুযোগ দিয়ে এই সরকার একটা অলিগার্ক শ্রেণী গড়ে তুলছে সাত তাড়াতাড়ি। সরকার আশা করছে এরা অর্থ, অস্ত্র আর পেশীশক্তির জোগান দিয়ে এই সরকারকে চিরকাল গদিতে বহাল রাখবে। বস্তুত সরকারের কোন কোন মন্ত্রী তো প্রকাশ্যেই বলছেন শেখ হাসিনা চিরকাল প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। আর শেখ হাসিনার নিজের কথাবার্তায় মনে হয় তিনি অন্তত ২০৪১ সাল (অর্থাৎ আমাদের অনেকের প্রত্যাশিত আয়ুর পর) পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী থাকার পরিকল্পনা করে ফেলেছেন।

বিচার রাজনীতির হাতিয়ার, দুর্নীতি তার বাহন

একথা নিশ্চয়ই মানবেন যে আইনকে বিগত ছয় বছরে যেভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে পৃথিবীর আর কোন দেশে সে রকমটা হয় না। সরকার গঠন করেই তারা কমিটি করলো, সে কমিটি শেখ হাসিনা থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে সোয়া সাত লাখ মামলা তুলে নিলো। এর মধ্যে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মিগ ৩৯ জঙ্গি বিমান এবং অস্ত্রশস্ত্র বিহীন ঠুঁটো জগন্নাথ ফ্রিগেট ক্রয় ইত্যাদি ব্যাপারে পাঁচটি দুর্নীতির মামলা এবং অন্যদের বিরুদ্ধে কয়েকটি খুনের মামলাও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। পদ্মা সেতু প্রকল্পে দুর্নীতি নিয়ে অভিযোগ করেছে বিশ্বব্যাংক এবং নিশ্চয়ই বর্তমান বাংলাদেশের চাইতে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য তদন্তের পর কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের সরকার সংশ্লিষ্ট কোন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিছু আইনী ব্যবস্থা নিয়েছিলো। কিন্তু অন্যের বিবেচনায় যেটা দুর্নীতি বাংলাদেশের বর্তমান সরকার সেটা দুর্নীতি মনে করেনি। তাদের দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) তদন্ত তদন্ত খেলার পর একে-দুয়ে এবং তিনে-চারে সংশ্লিষ্টদের সকলকে নির্মল, নিষ্পাপ, ধোয়া তুলসী পাতা বলে ঘোষণা করেছে। গুজব রটেছে সরকার দলীয় দুর্নীতিবাজরা এখন চেষ্টা-তদ্বির করে কিংবা ঘুষ দিয়ে দুদককে দিয়ে নিজেদের সম্বন্ধে তদন্ত করাচ্ছেন, কেন না পাপ-দুর্নীতি ঝেড়ে ফেলার অপূর্ব আধার এখন দুদক, যেমন করে গঙ্গা সাগরে স্নান করে হিন্দুরা পাপের বোঝা থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়।

এতোদিন ধারণা ছিলো যে নিজেদের লোকেরা দুষ্কৃত কিছু করে ফেলেছে, তবু স্নেহশীল সরকার তাদের শাস্তি দিতে চায়নি, রাজনৈতিক সুবিধার কথা বিবেচনা করে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তাদের কৃত অপকর্মগুলো সহ্য করে গেছে। কিন্তু এখন প্রমাণ হচ্ছে ব্যাখ্যাটা অতো সহজ নয়। আসলে তারা নীতি-নৈতিকতা এবং আইন-কানুনই বদলে ফেলছে সুপরিকল্পিতভাবে। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত সরকারের অন্যতম শক্ত খুঁটি। বহু মন্ত্রী এলেন আর গেলেন, কোন কোন মন্ত্রী রাজাকারের অপবাদও মাথায় নিয়েছেন। কিন্তু মুহিত সাহেব হাজারো বাজে, বেফাঁস ও বেপরোয়া কথা বলেও পার পেয়ে যাচ্ছেন। সেই মুহিত সাহেবই এখন বলে ফেলেছেন আসল কথাটাঃ ঘুষ-দুর্নীতি আর অবৈধ নয়। অতএব যে যা পারো লুটেপুটে নাও।

স্বজনপ্রীতি গুরুতর দুর্নীতি

স্বজনপ্রীতি আর আত্মীয় তোষণ আমাদের দেশেও অন্যায় ও অপরাধ বলে বিবেচিত হতো কিন্তু ছয় বছর আগে পর্যন্ত। ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হলো। প্রথম চোটেই সোয়া সাতশো সর্বোচ্চ স্তরের সরকারি কর্মকর্তা ওএসডি হয়ে গেলেন। কেন? সরকারের নিজের কিছু

লোক, ছাত্রলীগ, যুবলীগের সাবেক নেতা এবং সরকারের ভোট ব্যাংকের কিছু লোককে উঁচু পদগুলোতে বসাতে হবে। কেন? এই সরকারকে চিরস্থায়ী করতে এসব শক্তিধর পদে এমন লোক দরকার যাদের আনুগত্য থাকবে রাষ্ট্রের প্রতি নয়, আওয়ামী লীগের প্রতি। জ্যেষ্ঠতা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতায় এসব কর্মকর্তার অধিকাংশ এতো উচ্চপদে উঠতে পারতেন না। তাতে কি এসে যায়? ডবল কিংবা ট্রিপল প্রমোশান দিয়ে দাও! বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা সংখ্যায় জনসংখ্যার বড়জোর আট-নয় শতাংশ হবে। কিন্তু দেখতে দেখতে সচিবালয়ের উচ্চ পদগুলো, বিভাগীয় কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, পুলিশের ডিআইজি, এসপি, ডিএসপি ও ওসিদের অর্ধেকেরও বেশি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক। তেমনি আধা-সরকারি সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ইত্যাদির সর্বোচ্চ ব্যক্তিরাও আর ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী নন। জেলায়, হাইকোর্টে, সুপ্রিম কোর্টে রাতারাতি আওয়ামী লীগ সমর্থিত আইনজীবীরা গরিষ্ঠসংখ্যক বিচারকের আসনে বসে গেছেন। দেশজোড়া শোনা যেতে লাগলো সাধারণ মানুষ সুবিচার পাচ্ছে না, তাদের অধিকার রক্ষিত হচ্ছে না, অত্যাচার-নিপীড়ন হচ্ছে তাদের ওপর।

এই সরকারের আমলে পুলিশ প্রভৃতি তথাকথিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষী বাহিনীগুলোর আকার বিগত ছয় বছরে তিন থেকে চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে সরকারের কোন সমস্যা হয়নি, জ্যেষ্ঠতা ডিঙোনোর প্রশ্নও ওঠেনি। এখন শোনা যাচ্ছে পুলিশের শীর্ষ স্তরে সচিব পদমর্যাদার ৬০-৭০ জন কর্মকর্তা স্থাপন করা হবে। এরা কারা হবেন বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। সরকারের খেয়াল-খুশি ও পছন্দের লোকেদের অভিপ্সিত পদে স্থাপন করা হয়েছে। তবে জানাজানি হয়ে যেতেও বেশি দেরি হয়নি যে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হয় ছাত্রলীগ-যুবলীগের সাবেক নেতা কিংবা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক। মৃদু প্রতিবাদ উঠেছে, কিন্তু মিনমিনে প্রতিবাদ দূরের কথা দেয়ালে মাথা কুটলেও এ সরকারের পরিকল্পনার নড়চড় হয় না। দেশের প্রতিরক্ষার চোখ-কান হলো এনএসআই ও ডিজিএফআই নামের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। বিভিন্ন দফায় খবর রটেছে যে ছাত্রলীগ-যুবলীগের বহু নেতাকে এ দুটি সংস্থার উচ্চপদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এক দফায় ৩২ জন ছাত্রলীগ নেতার এনএসআইতে নিযুক্তির খবর শুনেছিলাম।

সুপরিকল্পিত ও প্রতিষ্ঠিত নীতি

এখন দেখা যাচ্ছে এটাও সাময়িক কিংবা অস্থায়ী কোন ব্যাপার নয়। প্রাচীন মিসরীয় ফেরাউনদের মতো মমি তৈরি করে হলেও নিজেদের ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার মতলবে এই দলীয় নিয়োগগুলোও দেয়া হচ্ছে সুপরিকল্পিতভাবে। এবং এ সরকার যতোদিন ক্ষমতায় থাকবে ততোদিন এ রীতিটাই চলতে থাকবে।

সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অ-আওয়ামী লীগ ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষার চেষ্টা করে এখন আর লাভ নেই। সরকারি চাকরির উঁচুপদ তারা পাবে না, জান কোরবানী দিয়ে তাদের বিদেশে কোথাও শ্রমিক-মজুরের কাজ খুঁজতে হবে, অথবা দেশে থেকেই চুরি-ডাকাতির পথ ধরতে হবে। বিশ্বাস হচ্ছে না আপনার? প্রধানমন্ত্রীর পরম শক্তিধর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম ১২ নবেম্বর বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে ছাত্রলীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় কি বলেছেন আবারো পড়ে দেখুন।

দেশের সর্বোচ্চ ক্যাডারের কর্মকর্তা নির্বাচনের দায়িত্ব পাবলিক সার্ভিস কমিশনের। প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা দিয়ে পাস করতে হয়। তারপর সশরীরে তাদের বিশেষ নির্বাচনী বোর্ডের সামনে হাজির হতে হয়। নির্বাচকরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রার্থীর জ্ঞান-বুদ্ধি, আচার-আচরণ, উপস্থিত বুদ্ধি ইত্যাদি যাচাই করে দেখেন। এ পর্বটাকে বলা হয় 'ভাইবা'। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অবশ্যই জানা আছে সর্বোচ্চ পদের চাকরি পেতে হলে এই ভাইবা পর্বটাই বেশি কঠিন। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম টিএসসিতে তার বক্তৃতায় ছাত্রলীগের সদস্যদের বলেছেন, "তোমাদের লিখিত পরীক্ষায় ভালো করতে হবে। তার পরে আমরা দেখবো।" অর্থাৎ প্রয়োজন হলে নকল করে কিংবা প্রশ্নপত্র ক্রয় করে হলেও তোমরা ভালো ভাবে পাস করো, তার পরে ভাইবার ব্যাপারটা আমরা দেখবো। এ উক্তিতে এটা পরিষ্কার করেই বলা হলো যে দুর্নীতিপূর্ণ পন্থায় হলেও উঁচু পদের সরকারি চাকরিগুলো ছাত্রলীগের সদস্যরাই পাবে।

এইচ টি ইমাম বেকায়দায় পড়েছেন। কথায় বলে 'চুরি বিদ্যা মহাবিদ্যা যদি না পড়ো ধরা'। সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের দুর্ভাগ্য। রেলমন্ত্রী থাকাকালীন ঘুষের ৭০ লাখ টাকার ব্যাপারে তিনি ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং মি. ইমামকে পরামর্শ দেবার যোগ্যতা তার হয়েছে। সুরঞ্জিত তাকে বলেছেন সতর্ক হয়ে কথা বলতে। এইচ টি ইমাম এখন জালে আটকানো বাইন মাছের মতো আঁকা-বাঁকা কসরৎ করছেন। বলছেন তার বক্তব্য কর্তিত আকারে ছাপা হয়েছে। কিন্তু কর্তিত মানে এই নয় যে সেটা অসত্য। আরেকটি বাংলা প্রবাদবাক্য হচ্ছে 'হাঁড়ির ভাত একটা টিপলেই বোঝা যায়'। তাছাড়া বক্তৃতার আরেকটি স্থানে মি. ইমাম স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকেই জড়িয়ে ফেলেছেন। তিনি বলেছেন,"নেত্রী কাউকে চাকরি দেবার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করেন: 'প্রার্থী ছাত্রলীগ করেছে কিনা, কি ছিলো, কোন পর্যায়ে ছিলো।' টিএসসিতে এইচ টি ইমাম এ ধারণাই দেবার চেষ্টা করেছেন যে তিনি তার নেত্রীর ইচ্ছারই প্রতিফলন করছেন।

প্রধানমন্ত্রী এবার কি করবেন?

আওয়ামী লীগের নেতা-মন্ত্রীদের মান-ইজ্জত খুবই ঠুনকো। কথায় কথায় তাদের মানহানি হয়। আকাশচুম্বী শত শত কোটি টাকার মানহানির মামলা

ঠোকেন তারা। এককালে জানতাম মানহানির মামলা করতে হলে দাবির টাকার একটা অংশ বাদীর আদালতে জমা দিতে হয়। এসব মামলায় সেসব রীতি-নীতি মেনে চলা হচ্ছে কিনা কে জানে? প্রধানমন্ত্রী যদি মি. ইমামের বক্তৃতায় উদ্ধৃত কথাগুলো বলে না থাকেন তাহলে অবশ্যই মি. ইমামের বক্তৃতায় দেশে-বিদেশে প্রধানমন্ত্রীর মানহানি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এ যাবৎ বলেননি, কাউকে চাকরি দেবার আগে তিনি মি. ইমামকে এ ধরনের প্রশ্ন করেছেন কিনা। সেটা যদি তিনি না করে থাকেন তাহলে প্রধানমন্ত্রীর অবশ্য কর্তব্য হবে অবিলম্বে এইচ টি ইমামকে বরখাস্ত করা এবং তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দাবি করে মানহানির মামলা করা।

শুধু অর্থমন্ত্রী মুহিত এবং প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচ টি ইমামই নন, আরো কয়েকজন বর্তমান ও প্রাক্তনমন্ত্রী শাসক আওয়ামী লীগ দলের কোপে পড়েছেন। মন্ত্রী আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী নিউইয়র্কে আল্লাহ-রাসূল ও ইসলাম সম্বন্ধে অবমাননাকর উক্তি করে মুসলিম বিশ্বকে ক্ষুব্ধ করেছেন; প্রধানমন্ত্রীর পুত্রের অস্বাভাবিক পারিশ্রমিকের অঙ্ক প্রকাশ করে হয়তো প্রধানমন্ত্রীরও রোষানলে পড়েছেন। কিন্তু তাকে বরখাস্ত করার ব্যাপারে সরকারের গড়িমসি আমরা দেখেছি। সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে তো সর্বশেষ বৈধ সরকারের আবার চাকরি দেয়া হয়েছিলো রাতের আঁধারে। মুক্তিযুদ্ধের উপ-প্রধান সেনাপতি এবং সেক্টর কমান্ডার ফোরামের চেয়ারম্যান এয়ার মার্শাল (অব) এ কে খন্দকার আগেই মন্ত্রীসভা থেকে বাদ পড়েছিলেন। কিন্তু অনেক অন্যায় গালাগাল করা হয়েছে তাকে। আইনমন্ত্রী আনিসুল হককে মাত্র সেদিন আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা প্রকাশ্যে রাজাকার বলে গালি দিয়েছে। আরো অনেকের কদর্য উক্তি ও কাণ্ডকারখানার ফিরিস্তি দিয়ে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না।

কি প্রমাণ হয় এসব থেকে? প্রমাণ কি হয় না যে সরকারের ভেতরেও আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছু অবশিষ্ট নেই? মন্ত্রীরা কি এতোই শক্তিশালী হয়ে গেছেন যে প্রধানমন্ত্রীকেও আর তারা তোয়াক্কা করেন না? সাধারণ মানুষ এসব কাণ্ডকারখানা থেকে এ ধারণাই পাচ্ছে যে ভেতরে ভেতরে দুর্নীতি করার অবাধ লাইসেন্স মন্ত্রীদের আগেই দেয়া হয়েছিলো এবং হিটলারের নাৎসিদের মতো শুধু দলীয় লোকেদেরই চাকরি দেয়াও সরকারেরই নীতি – এখন মন্ত্রীদের বেসামাল কথাবার্তায় থলের বিড়ালগুলো একে একে বেরিয়ে পড়ছে এবং পাড়াময় ছোটাছুটি করছে।

(লন্ডন, ১৮.১১.১৪)

শহীদ জিয়ার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়া বর্তমানে জরুরি প্রয়োজন

জেনারেল জিয়াউর রহমান তখন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে (সেদিন তিনি সাক্ষাৎকারের পরিবর্তে বলেছিলেন যে আমার সঙ্গে তাঁর অনেক কথা আছে) তাঁকে আমার একজন সৈনিক বলেই মনে হয়েছিল, তাঁর ভাগ্যহত দেশটার জন্যে অনেক কিছু করার তাগিদ বোধ করছিলেন তিনি। প্রথম সমস্যাটার কথা তিনি বললেন তাঁর প্রিয় সেনাবাহিনী সম্বন্ধে। তিনি সংক্ষেপে জবাব দিলেন, সেনাবাহিনীর নিজের কোন সমস্যা নেই, তবে বাইরের কিছু লোক সমস্যা সৃষ্টির চেষ্টা করছে।

সমস্যা যে তত সহজ ছিলনা সেটা আমি ভালো করেই জানতাম। স্বাধীনতার সময় থেকেই মূলত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত জাতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে রক্ষী বাহিনীর বিরোধ ছিল। জাতীয় বাহিনীকে বঞ্চিত রেখে রক্ষী বাহিনীকে আদরের দুলালের মতো তোষণ করা হচ্ছিলো। জাতীয় বাহিনীর সৈনিকরা যখন রাবারের স্যাণ্ডেল পায়ে কুচকাওয়াজ করছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর অনুরূপ ইউনিফর্ম পরিহিত রক্ষী বাহিনী নতুন ভারতীয় জিপে সর্বক্ষণ ঘুরে বেড়াতো। দু'বাহিনীর মধ্যে রেষারেষি তখন লক্ষ্য না করে উপায় ছিল না।

এর ওপর ভারত আওয়ামী লীগের কয়েকজন তরুণ নেতাকে ভারতীয় সামরিক একাডেমিতে প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল। দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে তাঁরা সাত তাড়াতাড়ি ঢাকা ফিরে আসেন। মুজিব বাহিনী নামে পরিচিত এই ব্যক্তিরা রক্ষী বাহিনীকে দিক-নির্দেশনা দিতেন। প্রধানমন্ত্রীর অফিসে পালাক্রমে তাঁদের কারো না কারো উপস্থিতি থেকে আমার ধারণা হয়েছিল যে তাঁরা শেখ মুজিবের ওপরও নজর রাখছিলেন।

মার্ক টালি প্রমুখ বিবিসির ডাকসাঁইটে সংবাদদাতারা তখন প্রায়ই নতুন স্বাধীন বাংলাদেশে যেতেন। তাঁরা খবরগুলো প্রচার করতেন এবং 'খবরের

পেছনের খবরগুলো' সম্পাদকীয় বৈঠকে আমাদের শোনাতেন। আমি নিজেও প্রায়ই বাংলাদেশে গেছি তখন। মুজিব মুক্তিযোদ্ধা সৈনিক ও অফিসারদের ডবল প্রমোশন দিয়েছিলেন। পাকিস্তান থেকে ছাড়া পেয়ে বাঙালি অফিসাররা দেশে ফিরে এসে দেখেন তাঁদের জুনিয়ারদের কেউ কেউ এখন তাঁদের সিনিয়র হয়ে গেছেন। অর্থাৎ সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ টানাপড়েনে আরো একটা মাত্রা যুক্ত হলো।

শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যায় কয়েকজন সেনা অফিসারের বিদ্রোহের পরিণতি হলেও তার পেছনে জাতির সমর্থন না হলেও গৌণ সায় ছিল। অশাসন-কুশাসন, রক্ষী বাহিনীর গুপ্ত হত্যা, সর্বময় দুর্নীতি, অর্থনীতির চরম বিপর্যয়, চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষে ৭০ হাজার প্রাণহানি, বিশেষ ক্ষমতা আইনে হাজার হাজার মানুষ গ্রেফতার ইত্যাদি কারণে জাতীয় জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। এবং মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জাতীয় জীবনের প্রতিভূ, তারা বিশেষ কোন মার্শাল রেস বা বিশেষ কোন শ্রেণী থেকে আসেনি। শেখ মুজিবের জন্যে কেউ অশ্রু বর্ষণ করেনি বলে অভিযোগ শেখ হাসিনাও করেছেন।

টানাপড়েনের বৈদেশিক মাত্রা

মুজিব হত্যার পর থেকে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর টানাপড়েনে একটা বৈদেশিক মাত্রাও যুক্ত হয়। খোন্দকার মুশতাক আহমাদ জাতীয়তাবাদী ছিলেন-যদিও তাঁর মন্ত্রিসভায় মুজিব সরকারের আটজন মন্ত্রী অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। একাত্তরে আলোচনার মাধ্যমে পাকিস্তানের সঙ্গে মীমাংসার প্রস্তাব দিয়ে তিনি দিল্লির বিরাগভাজন হয়েছিলেন, সেজন্যে ভারত ও মস্কোর চাপে তাজউদ্দিন আহমদ তাঁকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মুশতাক রাষ্ট্রপতি হবার প্রথম দিন থেকেই সাউথ ব্লক (ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) তাঁর অপসারণ কামনা করতে থাকে। ৩ নবেম্বর (১৯৭৫) জেনারেল খালেদ মোশাররফ যখন অভ্যুত্থান করে খোন্দকার মুশতাককে অপসারণ এবং জেনারেল জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী করেন। দিল্লিতে তখন আনন্দোৎসব শুরু হয়েছিল, সাউথ ব্লকে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়েছিল।

কিন্তু সাধারণ সিপাহিরা তাদের নামে অফিসারদের অভ্যুত্থানপ্রীতি সমর্থন করেনি। কর্নেল তাহের ও অন্য জাসদ নেতাদের প্রভাবে তারা ৩ নবেম্বরের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। আমার বড়ভাই প্রয়াত এয়ার কমান্ডার এ বি এম মাহবুবুর রহমান ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমাকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে একজন অফিসারের শূন্য বাড়িতে নিয়ে যান। সে বাড়িতে দেয়ালে অন্তত হাজার খানেক বুলেটের গর্ত আমি দেখেছি। খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, ভারতে পালিয়ে যাবার সময় তিনি সিপাহিদের হাতে ধরা পড়েন এবং সিপাহিরা তাঁকে হত্যা করেন।

সাধারণ সিপাহিরা ৭ নবেম্বর গৃহবন্দী দশা থেকে জেনারেল জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করে কাঁধে চড়িয়ে সেনা সদর দফতরে নিয়ে যায় এবং সেনাপ্রধানের পদে অধিষ্ঠিত করে। কিন্তু সেদিনের একটা প্রবণতায় জিয়া উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। সিপাহিরা দল বেঁধে ক্যান্টনমেন্টে সমাজতন্ত্রী প্রচারপত্র বিলি করছিল, 'সিপাই সিপাই ভাই ভাই, অফিসারের কল্লা চাই' ইত্যাদি বলে স্লোগান দিচ্ছিল। তারা গণচীনের তৎকালীন স্বেচ্ছাসেবী গণবাহিনীর অনুকরণে বাংলাদেশে চেন-অব-কমান্ড-বিহীন একটা অনিয়মিত সেনাবাহিনী দাবি করছিল। এটাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন কর্নেল তাহের।

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল জিয়াউর রহমানের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের নির্ধারিত দিন সকালে আমি বিমানে রাজশাহী থেকে এসে তেজগাঁও বিমান বন্দরে নামি। পরিচিত এক ব্যক্তি বললেন, বিএমএল-এর ইন্টারভিউ নিতে এসেছেন শুনেছি, কিন্তু ইন্টারভিউ তো আজ হবে না। তিনি আরো বললেন, আগের দিন পতেঙ্গা ক্যান্টনমেন্টে এক সিপাহি জনৈক মেজর সাহেবকে স্যালুট করতে অস্বীকার করলে মেজর তার আঙ্গুলে গুলি করেন। সেখানে উত্তেজনা চলছে এবং সে উত্তেজনা সামলাতে জিয়া কিছুক্ষণ পরেই চাটগাঁ যাচ্ছেন। ভদ্রলোক অতিরিক্ত কিছু তথ্যও দিলেন আমাকে। এ রকম অবস্থা দেশের সর্বত্রই চলছে এবং পরিস্থিতি শান্ত করতে জিয়া এ ক্যান্টনমেন্ট থেকে সে ক্যান্টনমেন্ট ছোটাছুটি করছেন, ঘুঁটি চালাচালির মতো করে নন-কমিশন্ড অফিসারদের বদলি করছেন। শেরাটন হোটেলে পৌঁছার অল্পক্ষণের মধ্যেই বিএমএল এর পিএসএ কর্নেল অলি আহমেদ টেলিফোন করলেন। বললেন, আমার সঙ্গে নাকি জেনারেলের অনেক কথা আছে, আজ তাঁর হাতে সময় কম, আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্টটা একদিন পিছিয়ে দিলে কি আমি কিছু মনে করবো?

পরের দিনের সাক্ষাতে জেনারেল জিয়া অনেক কথা বলেছিলেন আমাকে। আমার টেপ রেকর্ডার আর ক্যামেরা তিনি নিজের হাতে কর্নেল অলির হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আমার ধারণা হয়েছিল যে আমার সঙ্গে কথা বলে নিজের এবং দেশের সমস্যাগুলো তিনি গুছিয়ে চিন্তা করার চেষ্টা করছিলেন। আমাকে তিনি বলেছিলেন যে সেনাবাহিনীতে চেন অব কমান্ড ফিরিয়ে আনা তাঁর প্রথম প্রায়োরিটি। সমস্যাগুলো তখন এবং পরে আমি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। যতই ভেবেছি সমস্যাগুলো ততই দুরূহ মনে হয়েছে। তাঁর মর্মান্তিক হত্যার পরে রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমানের মূল্যায়ন করতে গিয়ে মার্ক টালি বলেছিলেন, জিয়া তাঁর সেনাবাহিনীকে মনে -প্রাণে ভালোবাসতেন, আর হয়তো সেজন্যেই তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

জিয়া যেভাবে সমস্যাগুলো শনাক্ত করেছেন

কুশলী সেনাপতি যেভাবে রণক্ষেত্র ও যুদ্ধ-পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেন জিয়াউর রহমান ঠিক সেভাবেই বাংলাদেশের সমস্যাবলী বিশ্লেষণ করছিলেন আমার কাছে। এর পরেও কয়েকবার তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, একাধিকবার তাঁর সাক্ষাৎকারও নিয়েছি। কিন্তু ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারির সেদিনের দীর্ঘ এবং একান্ত আলাপ জিয়াউর রহমানের মূল্যায়নের জন্যে আমার বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। তিনি বলছিলেন বাংলাদেশের মানুষ মনেপ্রাণে গণতন্ত্রকে ভালোবাসে, গণতন্ত্র তাদের রক্তে মিশে আছে। তার প্রমাণ বহুবার দিয়েছে। সুতরাং তাদের গণতন্ত্র দিতেই হবে। কিন্তু বাকশাল, মুজিব হত্যা, একাধিক সামরিক অভ্যুত্থান ইত্যাদির পর হঠাৎ করে অবাধ গণতন্ত্র দেওয়া নিরাপদ হবে না। নিরাপদে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার পন্থা নিয়ে তিনি শিগগিরই বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করবেন।

এটা হয়তো নতুন প্রজন্মের জানা নাও থাকতে পারে। শেখ মুজিব সরকারি মালিকানাধীন দৈনিক বাংলা, বাংলাদেশ টাইমস, দৈনিক ইত্তেফাক আর বাংলাদেশ অবজারভার, এই চারটি ছাড়া অন্য সকল দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কিছুদিনের ভেতরই জেনারেল জিয়া সকল পত্রপত্রিকার ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন, পত্রপত্রিকা প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বাকশাল চালুর সময় আওয়ামী লীগ সহ সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়। সকল রাজনৈতিক দলের ওপর নিষেধাজ্ঞাও প্রত্যাহার করেছিলেন জিয়া। তিনি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের পথ উন্মুক্ত করে দেন এবং নিজেও তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন করেন। গোড়া থেকেই তিনি কূটনৈতিক পন্থায় শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে দিল্লি থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। সেসব উদ্যোগ ব্যর্থ হলে তিনি আওয়ামী লীগের দু'জন শীর্ষ নেতা ড. কামাল হোসেন ও আব্দুর রাজ্জাককে দিল্লী পাঠিয়ে শেখ ভগিনীদ্বয়ের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ত্বরান্বিত করেন। তাঁরা অবশেষে রাষ্ট্রপতি জিয়ার হত্যার মাত্র ১৩ দিন আগে ১৯৮০ সালের ১৭ মে দেশে ফিরে আসেন।

জিয়াউর রহমান বলছিলেন, বাংলাদেশ ছোট দেশ কিন্তু জনসংখ্যা বিরাট। তার ওপর দেশটা যুদ্ধবিধ্বস্ত এবং প্রাকৃতিক সম্পদও খুবই সীমিত। মুক্তিযুদ্ধে জনসাধারণের প্রত্যাশা অনেক বেড়ে গেছে, বিদেশী রেডিও- টেলিভিশন তাদের প্রত্যাশা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। মানুষের প্রত্যাশা নিকট ভবিষ্যতে কিছু পরিমাণেও পূরণ করা না গেলে গণরোষ সামালের বাইরে চলে যেতে পারে। বিশেষ করে তিনি শিক্ষিত বেকারদের নিয়ে সমস্যার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, এদের গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করা না গেলে তারা দেশজোড়া

বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে। বিগত তিন বছরে ছাত্রলীগ, যুবলীগ ইত্যাদি সংস্থা যেভাবে হত্যা, ছিনতাই, সম্পত্তি গ্রাস, ভর্তি বাণিজ্য, টেন্ডার সন্ত্রাস ইত্যাদি চালাচ্ছে জেনারেল জিয়াউর রহমান খুব সম্ভবত এসব নৈরাজ্য দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছিলেন।

জিয়াউর রহমান তারপরে রাষ্ট্রপতি হন। তিনি যখন দেশজোড়া খাল খনন ও নদী সংস্কারের কাজ শুরু করেন তখন আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম যে 'শিক্ষিত বেকারদের গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করার' এই পন্থাটি গোড়াতেই তিনি বেছে নিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের এই কর্মসূচি দেশের শিক্ষিত ও পেশাজীবী মহলে তুমুল আলোড়ন তুলেছিল এবং বিশ্বব্যাপী তাতে দারুণ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। আর মাত্র একটা ব্যাপারেই সে রকম আন্তর্জাতিক উৎসাহ সৃষ্টি হয়, সেটা ড. মোহাম্মদ ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশে কখনো বন্যা, কখনো খরা-এই হচ্ছে প্রকৃতির তাণ্ডব। সাম্প্রতিক কালে ভারত নিদারুণ পানি আগ্রাসন শুরু করেছে এ দেশের বিরুদ্ধে।

আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করে তারা সেচের জন্যে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে বাঁধ তৈরি করে পানি আটকাচ্ছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের নদীগুলোর মধ্যে সংযোগ খাল তৈরি করে তারা মধ্য ভারতের ঊষর অঞ্চলে সেচের জন্যে সেসব নদীর পানি নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করেছে।

পানি আগ্রাসন ও জিয়ার খাল খনন-প্রকল্প

অভিন্ন ৫২ টি নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে ভারত ইতোমধ্যেই বাংলাদেশকে বঞ্চিত করছে। শেখ মুজিব ১৯৭৪ সালে 'পরীক্ষামূলক ভাবে' দু'সপ্তাহের জন্যে ফারাক্কা বাঁধ চালু করার সুযোগ ভারতকে দিয়েছিলেন। ভারত সেটাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালের ২৭ ডিসেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়ার সঙ্গে ফারাক্কায় গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি করেছিলেন। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী পানি এক বছরও বাংলাদেশ পায়নি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর 'নতজানু বন্ধুত্বের' সম্পর্ক। শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মানুষকে কল্পনার রসগোল্লা খাওয়াচ্ছিলেন এই বলে যে সেপ্টেম্বর মাসে (২০১১) ঢাকায় এসে মনমোহন সিং তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তিতে সই করবেন। মনমোহন এলেন এবং গেলেন, কিন্তু তিস্তার পানি নিয়ে চুক্তি হলো না।

ভারতীয়রা নিজেদের মধ্যে কূটনৈতিক মানাভিমানের খেলা খেললো, মাঝখান দিয়ে বঞ্চিত হলো বাংলাদেশ। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী নাকি শেখ হাসিনার 'জ্ঞানী দোস্ত'। হালে আবার মমতা বন্ধুত্বের জালে

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মণিকেও জড়িয়ে ফেলেছেন। কিন্তু তিনি বলছেন যে খরার মওসুমে তিস্তার পানি তিনি বাংলাদেশকে দেবেন না, দেবেন বর্ষাকালে, যখন বন্যা সামলাতে বাংলাদেশের মানুষের প্রাণান্ত হয়। বিশেষজ্ঞরা সবাই বলছেন ভারতের টিপাইমুখ বাঁধ বাংলাদেশের সর্বনাশ করবে, সুরমা কুশিয়ারা আর মেঘনা শুকিয়ে যাবে। কিন্তু শেখ হাসিনা আর দীপু মণি বলছেন ভারতীয়রা কথা দিয়েছে বাংলাদেশের ক্ষতি তারা করবে না।

বাংলাদেশের মানুষকে নতুন করে বেঁচে থাকার চিন্তা শুরু করতে হবে, শহীদ জিয়ার নদী সংস্কার, খাল খনন ও জলাধার নির্মাণের কর্মসূচিতে ফিরে যেতে হবে। দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রে জিয়া যদি নিহত না হতেন, তাঁর এই আন্তর্জাতিক ভাবে সমাদৃত কর্মসূচি যদি পরিত্যক্ত না হতো তাহলে বাংলাদেশের মানুষ খাবার পানি, সেচের পানি, মাছ, মাছ চাষের পানির ব্যাপারে মোটামুটি স্বনির্ভর হতে পারেতো। বর্তমানের সংকটপূর্ণ সময়ে বেঁচে থাকতে হলে আবারো তাদের জরুরি ভিত্তিতে সে কর্মসূচির কাজ শুরু করতে হবে।

বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের একটা কর্মসূচির কথা তিনি ভাবছেন-এ কথা জেনারেল জিয়াউর রহমান আলোচ্য বৈঠকেই আমাকে বলেছিলেন। পরবর্তী কালের উনিশ দফা কর্মসূচিতে সেটা বিকাশ লাভ করেছে। এ কর্মসূচিকে যথার্থই জাতীয় মুক্তির ম্যাগনাকার্টা বলা হয়েছে। ১২১৫ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের জমিদার ও জনপ্রতিনিধিরা এক অধিকারের সনদে রাজা জনের স্বাক্ষর আদায় করেছিলেন। ম্যাগনাকার্টা নামে বর্ণিত এ দলিল এখনো বৃটিশ গণতন্ত্রের রূপরেখা বলে স্বীকৃত। শহীদ জিয়ার প্রণীত ১৯ দফার প্রথমটিতেই "সর্বতোভাবে দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার" কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে খাদ্য আর পানীয়ের পরেই মানুষের প্রধান ভাবনা শেখ হাসিনার সরকারের ভারতের প্রতি অত্যধিক ঔদার্য থেকে দেশের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার পবিত্রতা রক্ষা করা।

উনিশ দফায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারকে রাষ্ট্রের মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশকে একটি স্বনির্ভর এবং সুশৃঙ্খল দেশ হিসেবে গড়ে তোলার ওপর। নারীর মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের একটা প্রধান লক্ষ্য ছিল। ভুলে গেলে চলবেনা যে প্রারম্ভিক ভাবে ১০ শতাংশ সরকারি চাকরি নারীদের জন্যে বরাদ্দ রাখার এবং বালিকাদের স্কুলে পাঠানোর বিনিময়ে বাবা-মাকে খাদ্য সাহায্য দেবার ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি জিয়াই প্রথম চালু করেন। জিয়ার ঘোষিত মূলনীতি থেকে আজকের বাংলাদেশ কতখানি সরে এসেছে তার প্রমাণ প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং।

বাংলাদেশে ফসল ভালো হয়েছে, সেজন্যে প্রধানমন্ত্রী কৃতজ্ঞতা জানান তাঁর 'মা-দুর্গাকে', আরো একটা 'রামকৃষ্ণ মিশন' স্থাপনের জন্যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় তোড়জোড় চলছে বলে শুনেছি। অন্যদিকে টুপি-দাড়িধারীদের ওপর নাকি রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দারা খবরদারী নজর রাখছে।

সার্ক গঠনের অনুপ্রেরণা

সমতার ভিত্তিতে সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করা রাষ্ট্রপতি জিয়ার উনিশ দফার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই নীতি অনুসারেই জিয়া দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সমিতি (সার্ক) গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত ভারতের পিছুটানের কারণে সার্ক পূর্ণতা পায়নি। ভারতের লক্ষ্য ছিল ক্ষুদ্রতর প্রতিবেশী দেশগুলোকে বিভক্ত ও দুর্বল রেখে তাদের ভারত-নির্ভর করে রাখা। স্বভাবতই রাষ্ট্রপতি জিয়ার সার্ক গঠনের উদ্যোগকে তারা সন্দেহের চোখে দেখেছে।

তার বিপরীতে বর্তমান সময়ে আমাদের বৈদেশিক সম্পর্কের শোচনীয় পরিস্থিতি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। ভারতের সঙ্গে 'নতজানু বন্ধুত্ব' স্থাপন করতে গিয়ে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের গুরুত্ব অবনতি করা হয়েছে। ভারতকে সন্তুষ্ট করার প্রয়োজনে আগ্রাসী ধর্মনিরপেক্ষতা অনুসরণ করা হচ্ছে। (যদিও ভারতের প্রধান বিরোধী দলই হচ্ছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় জনতা পার্টি, যে শিবসেনা গোষ্ঠী মহাত্মা গান্ধীর পরমত সহিষ্ণুতা সহ্য করতে না পেরে তাঁকে হত্যা করেছিল সে শিবসেনারা এখন বিজেপির অঙ্গদল), সংবিধান থেকে ইসলামকে বাদ দেওয়া হয়েছে, নানা অছিলায় ধর্ম-ভিত্তিক রাজনীতিকদের ধরে ধরে জেলে পোরা হচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের গুরুতর অবনতি হয়েছে। এই দেশগুলো এখন সাহায্য বাণিজ্য ও শ্রমিক নিয়োগের বেলায় ক্রমেই বাংলাদেশের প্রতি বেশি বৈষম্য দেখাচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বিগত হয়েছেন প্রায় ৩২ বছর আগে। যে বাংলাদেশের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন সে দেশটিকে আমরা বাস্তবায়িত করতে পারিনি। দেশকে আজ যে পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে তাতে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্তিত্বই বিপন্ন মনে হচ্ছে। সেটা যদি আমাদের কাম্য না হয় তাহলে শহীদ জিয়াউর রহমানের লক্ষ্য ও আদর্শের নতুন করে মূল্যায়ন করতে হবে আমাদের। জিয়ার প্রয়োজন আজ জরুরিভাবে অনুভূত হচ্ছে।

(লন্ডন, ১৬.০১.১২)

সিরাজুর রহমান : সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার রহমতপুর গ্রামে ১৯৩৪ সালে। শিক্ষা কলকাতার গর্ভনমেন্ট মডেল স্কুল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে দু'বছর নোয়াখালীর আমিশাপাড়া এম. ই স্কুল ও দত্তপাড়া রামরতন হাইস্কুল, কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশন, ঢাকা কলেজ ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।

সাংবাদিকতায় প্রবেশ দৈবাৎ। কলকাতায় ১৯৪৬-৪৭ সালের হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জের ধরে একমাত্র মুসলিম বাংলা *দৈনিক আজাদের* সম্পাদকীয় কর্মিরা ওয়াক আউট করে পত্রিকার প্রকাশ অসম্ভব করে তুললে সংবাদ অনুবাদের জন্যে বেকার হোস্টেল থেকে খায়রুল কবির ও সিরাজুদ্দিন হোসেন এবং মুকুলের মাহফিলের নিয়মিত লেখক স্কুলছাত্র সিরাজুর রহমানকে তলব করা হয়।

মুকুল ফৌজের পরিচালক এবং দৈনিক আজাদের (পরবর্তীতে কিছুকাল ইত্তেহাদের) বার্তা সম্পাদক মোহাম্মদ মোদাব্বের (বাগবান) ১৯৪৯ সালে ঢাকা থেকে অর্ধ- *সাপ্তাহিক পাকিস্তান* পত্রিকা প্রকাশ করেন। সিরাজুর রহমান এ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক হন। পরবর্তীকালে তিনি দৈনিক জিন্দেগী ও দৈনিক ইনসাফে কিছুকাল কাজ করেন এবং ১৯৫১ সালের শেষে মোহাম্মদ মোদাব্বের নতুন দৈনিক *মিল্লাতের* সম্পাদক নিযুক্ত হলে ওই পত্রিকার বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। গোড়া থেকেই এ পত্রিকা ভাষা আন্দোলন সম্বন্ধে সঠিক ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন করে। সে বছরের ২১ শে ফেব্রুয়ারী ও পরবর্তী ঘটনাবলীর সংবাদ ও সঠিক বিশ্লেষণ একমাত্র এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় বলে নতুন পত্রিকা মিল্লাত তখন ঢাকার সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ছিলো। সিরাজুর রহমান এ সময় সত্যেন মজুমদার সম্পাদিত কলকাতার বহুল আলোচিত বহুল প্রচারিত *সত্যযুগ* পত্রিকার পূর্ব পাকিস্তান সংবাদদাতাও ছিলেন।

সিরাজুর রহমান ১৯৫৩ সালের জানুয়ারীতে ঢাকায় বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসের সাব-এডিটর নিযুক্ত হন। পরবর্তী সাত বছরে এই তথ্য কেন্দ্রের ব্যাপক প্রসার হয় এবং তিনি প্রথমে সম্পাদক ও পরে প্রধান সম্পাদক পদে উন্নীত হন। ১৯৫১ সালের শেষে নিষিদ্ধ ঘোষিত *পাকিস্তান অবজার্ভার* পত্রিকার নিষেধাজ্ঞা হঠাৎ করে ১৯৫৪ সালের প্রথমার্ধে প্রত্যাহৃত হলে সিরাজুর রহমান কয়েক মাস খণ্ডকালীন বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। সে বছরের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি দৈনিক *ইত্তেফাক* পত্রিকায় খণ্ডকালীন সম্পাদকীয় লেখক নিযুক্ত হন এবং ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত যুগপৎ বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসেস এবং *দৈনিক ইত্তেফাকে* কর্মরত ছিলেন।

স্কুল জীবনে সিরাজুর রহমান কলকাতায় অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো থেকে প্রথমে শিশুদের এবং পরে স্কুল ছাত্রদের অনুষ্ঠানে অংগ্রহণ করতেন। দেশ বিভাগের পর ঢাকায় এসেও তিনি বিভিন্নভাবে তৎকালীন পাকিস্তান ব্রডকাস্টিং সার্ভিস ও পরে নতুন নামের রেডিয়ো পাকিস্তানের সঙ্গে জড়িত হন। সে সূত্র ধরেই ১৯৬০ সালের ১লা জানুয়ারী তিনি বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের (বিবিসি) পূর্ব পাকিস্তান অনুষ্ঠান বিভাগে যোগ দেন। সে অনুষ্ঠান প্রচারিত হতো প্রতি বুধবার ৩০ মিনিট এবং প্রতি সোমবার ১৫ মিনিট করে। পশ্চিমবঙ্গের শ্রোতাদের জন্যে অনুরূপ একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হতো। সিরাজুর রহমানের অক্লান্ত চেষ্টা পরিশ্রমে বিবিসি বাংলা বিভাগের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অব্যাহত থাকে। ১৯৯৪ সালের গোড়ায় তিনি যখন অবসর নেন তখন বিবিসি থেকে প্রতিদিন চার বার করে বাংলা অনুষ্ঠান প্রচারিত হতো।

উনিশশো ৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় এবং ১৯৮৮ সালে সামরিক স্বৈরতন্ত্রের আমলে বাংলাদেশের বিবিসি শোনা এবং বিবিসিকে খবর পাঠানোসহ সকল প্রকারে বিবিসির সঙ্গে সহযোগিতা আইনত : দণ্ডনীয় করা হয়। এই দুইবারই বিবিসি বাংলাদেশের খবর প্রচার বন্ধ করে দেওয়ার সম্ভাবনা বিচার করছিলো। সিরাজুর রহমানের চেষ্টায় বিবিসি তখনও বাংলাদেশের সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশন করতে সক্ষম হয়েছিলো। ১৯৭১ সালে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর অনুরোধে তিনি মুক্তিযুদ্ধের বিদেশী প্রচারণায় সমন্বয় করেন।

সে সময় বৃটিশ, পশ্চিম ইওরোপীয় এবং মার্কিন মিডিয়ায় তাঁর বহু সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে। বাঙলাদেশের ১৯৭৩ ও ১৯৯১ সালের নির্বাচনে এবং ১৯৯০ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে সামরিক শাসনের পতনের খবরাদি প্রচারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

বিবিসির জন্য সংবাদ ও অনুষ্ঠানের মাল-মশলা সংগ্রহের কাজে সিরাজুর রহমান বহু দেশ সফর করেছেন। বিশেষ করে বার্লিন দেওয়ালের পতন ও সোভিয়েত শাসনের ধসের পরে পূর্ব বার্লিন ও প্রাগ থেকে প্রচারিত তাঁর বিবরণগুলো শ্রোতাদের প্রচুর প্রশংসা পেয়েছিলো। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে ব্যাপক সফর ছাড়াও তিনি নেপাল, শ্রীলঙ্কা, বার্মা, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ওমান, আমীরাত, ইতালী, স্পেন, চেকোশ্লোভাকিয়া, বিভক্ত জার্মানীর দুই অংশে এবং পুনরেকত্রীকৃত জার্মানী, ফ্রান্স, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় সফর করছেন।

বিবিসি থেকে অবসর নেবার পরেও তিনি লণ্ডনেই বসবাস করছেন এবং ঢাকা, কলকাতা, লণ্ডন ও নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকা ও সামায়িকীতে নিয়মিত লিখছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাদি হচ্ছে (ঢাকা থেকে) *বাংলাদেশ স্বাধীনতার পনেরো বছর, প্রীতি নিন সকলে, লন্ডনের চিঠি;*

বাংলা নাট্যানুবাদ-*প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস, গ্রেট এক্সপেকটেশন্স, জেন এয়ার, আন্তন চেকভের নাটক;* (কলকাতা থেকে) *বিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত, সম্পাদক দায়ী নহেন; নাটক-একান্ত তোমারি* ও দুটি একাঙ্কিকা।

২০১৫ সনের ১ জুন, সোমবার লন্ডনের একটি হাসপাতালে ৮১ বছর বয়সে সাংবাদিকতার প্রবাদ পুরুষ সিরাজুর রহমান-এর দেহাবসান ঘটে।

লন্ডনে লাবণ্য : কুইন মেরীতে বাংলাদেশ সিরাজুর রহমান চিরদিনের

এক.

হিথরোর আনুষ্ঠানিকতার পুলসিরাত পেরিয়ে সন্ধ্যায় লন্ডনের মুখোমুখি হতেই আমাকে আপাদমস্তক জাপটে ধরে উত্তর মেরু ছুঁয়ে আসা ভয়াবহ শীত। ভেতরে ভেতরে আমি যখন বঙ্গোপসাগরের কুকড়ি-মুকড়ি দ্বীপের আকার নিচ্ছি, সেই সময় আমাকে হ্যারডসের দামি ওভারকোটের মতো একরাশ উষ্ণতার মধ্যে জড়িয়ে নিলেন প্রফেসর ড. কে এম এ মালিক। হৃদয়ের একূল-ওকূল ভেসে যাওয়া হাসি উপচে পড়ে তার চোখে- মুখে, 'আমরা তো ধরে নিয়েছিলাম, আপনাকে আসতেই দেবে না।' ড. মালিকের সঙ্গে যুক্তরাজ্য জাসাসের সভাপতি এমএ সালাম, সম্পাদক ইকবাল হোসেন, সাবেক সভাপতি এমাদুর রহমান, কাশেম আহমদ ও বেলাল হোসেন তুহিন। তারা আমার হাত ভরে দেন ফুলে। আর আমার বুক ভরে যায় স্বজনের সান্নিধ্যে। ড. মালিক যুক্তরাজ্যের কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর, War on Terror-এর খ্যাতিমান লেখক, সিরাজুর রহমান সিভিক রিসিপসন কমিটির আহ্বায়ক। বললেন, 'আমাদের কমিটির সবারই আসার কথা ছিল। আমিই বারণ করেছি। আগামীকাল ৮ অক্টোবর মিডিয়া মহলে কমিটি প্রস্তুতি সভা। সেখানেই সবার সঙ্গে দেখা হবে। ১৭ অক্টোবর নাগরিক সংবর্ধনা নিয়ে বহুদিন পর বাংলাদেশী কমিউনিটি যেন উৎসবের আনন্দে জেগে উঠেছে। দেশে বিরাজমান নানা গোলযোগের মধ্যেও যে শেষ পর্যন্ত আপনি আমাদের দাওয়াতে আসতে পেরেছেন, সে জন্য ভালো লাগছে। আশাকরি, সবার পরশে পবিত্র করা একটা জমকালো অনুষ্ঠান আমরা উপহার দিতে পারব। দেশে ফিরে গিয়ে বলতে পারবেন আমাদের জাতির এক শ্রেষ্ঠ সন্তানকে সুদূর লণ্ডনে আমরা যথাযথ সম্মান দিয়ে ঋণ স্বীকার করেছি।'

দুই.

সিরাজুর রহমান সত্যিকার অর্থেই 'এক জীবন এক ইতিহাস'। সাংবাদিকতার জীবন্ত কিংবদন্তি। আমাদের সংবাদপত্র শিল্পের স্থপতিদের অন্যতম শেষ পুরুষ। ভাষাসৈনিক, ভাষা আন্দোলনে অংশ নেয়ার জন্য যার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে তার নিজ পরিবারের। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যার রয়েছে অবিস্মরণীয় ভূমিকা। বিচারপতি আবু

সাঈদ চৌধুরীকে সামনে নিয়ে বাঙালিদের সংগঠিত করে লণ্ডনকে কেন্দ্র করে গোটা বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যিনি গড়ে তুলেছিলেন বিশাল ব্যাপক জনমত, ছয় ছয়টি দশকব্যাপী বিস্তৃত তার বর্ণাঢ্য সাংবাদিক জীবন। ৩৪ বছর যিনি কাটিয়েছেন বিবিসির বাংলা বিভাগ পরিচালনায়। জাতীয় রাজনীতির দুই মহান পুরুষ মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী এবং মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্বস্ত ও বিশেষ স্নেহের পাত্র। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এমএজি ওসমানী এবং স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের যিনি ঘনিষ্ঠজন। কণ্ঠ ও কলম দুই ক্ষেত্রেই যিনি তার পুরো জীবনকেই উৎসর্গ করেছেন মানবতার সেবায়- সেই সিরাজুর রহমানকে নাগরিক সংবর্ধনা দিচ্ছেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা।

এগিয়ে এসেছেন সর্বস্তরের সচেতন বাংলাভাষীরা। ড. কেএমএ মালিককে আহ্বায়ক করে এগিয়ে এসেছেন বিশিষ্ট সংবাদিক ঔপন্যাসিক সাঈদ চৌধুরী, প্রবীণ সাংবাদিক জগলুল হোসেন, সেন্টার ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ইউকের প্রধান মাহিদুর রহমান, মিডিয়াব্যক্তিত্ব শামসুল আলম লিটন, মানবাধিকার কর্মী মনোয়ার হোসেন বদরুদ্দোজা, বাংলাদেশ ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক প্রধান মিয়া মনিরুল আলম, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের সাবেক প্রধান কেএম আবু তাহের চৌধুরী, লণ্ডন মেইল সম্পাদক ড. এমএ আজিজ, মেজর (অব.) আবু বকর সিদ্দিক, এশিয়ান কাউন্সিল ফর হিউম্যান রাইটস সম্পাদক এমএ মালেক, ব্যারিস্টার নজরুল ইসলাম, পারভেজ এস কোরেশী, আবদুল কাদির জিলানী, শেখ আবদুর রউফ, মোজাম্মেল হোসেন, শাহ ইউসুফ, কায়েস আলী, ব্যারিস্টার ফিরোজ হাসান মাওলানা সৈয়দ নায়েম, অলি রহমান নয়ন, এমাদুর রহমান এমাদ, আশরাফ গাজী, কামাল উদ্দিন, মোহাম্মদ রিয়াজ, এমএ শহীদ, আখলাকুর রহমান, অলিউর হোসাইন, হাবিবুর রহমান বাবলুসহ অনেকেই।

বাংলাদেশের আকাশে যখন দুর্যোগের ঘনঘটা, রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব থাকবে কি থাকবে না- এই রকম ভয়ঙ্কর চক্রে যখন জাতিকে নিক্ষেপ করেছেন শাসকরা, যখন আমাদের রাজনীতির বিরাট অংশ খ্যাতি ও প্রতিপত্তির মোহে আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন আত্মা, যখন দেশের ওপর দিয়ে বিজাতীয় অপসংস্কৃতির অশুভ ঝড় বয়ে যাচ্ছে, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা যখন চূড়ান্তভাবে স্তম্ভিত করছে সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় ইতিহাসের মূল পাটাতনকে, সেই সময় লন্ডনে কিছু দেশপ্রেমিক মানুষ ঝলমল করে উঠেছেন কর্তব্যবোধে।

সত্যি দুর্ভাগ্যজনক, যারা মুক্তিযুদ্ধের ধারে-কাছে ছিলেন না, তারা আজ মুক্তিযোদ্ধার মুখোশ পরে ছিনতাই করছে জাতীয় অর্জন। ভুয়া ভাষাসৈনিকদের কেচ্ছা-কাহিনীতে কান ঝালাপালা। অথচ সিরাজুর রহমানকে কখনই তার প্রাপ্য মর্যাদাটা দেয়া হয় নি।

তিন.

সিরাজুর রহমানের জন্ম ১৯৩৪ সালে। নোয়াখালী, কলকাতা এবং ঢাকায় কেটেছে তার শিক্ষাজীবন। সাংবাদিকতায় প্রবেশ আকস্মিকভাবে। '৪৬-৪৭'- এর দাঙ্গার পর হিন্দু সাংবাদিকরা 'আজাদ' ত্যাগ করে গেলে বেকার হোস্টেল থেকে ডাক পড়ে তরুণ খায়রুল কবির, সিরাজউদ্দিন হোসেন ও সিরাজুর রহমানের। গুরু মোহাম্মদ মোদাব্বের। কলকাতা থেকে ঢাকায় এসে ১৯৪৯ সালে অর্ধ সাপ্তাহিক পাকিস্তানের বার্তা সম্পাদক হন। পরবর্তী সময়ে দৈনিক জিন্দেগী এবং দৈনিক ইনসাফেরও বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫১ সালে ইউসুফ আলী চৌধুরী মোহন মিয়া প্রকাশ করেন দৈনিক মিল্লাত। মোহাম্মদ মোদাব্বের সম্পাদক আর সিরাজুর রহমান বার্তা সম্পাদক। মহান ভাষা আন্দোলনে এ পত্রিকা পালন করে বস্তুনিষ্ঠ ভূমিকা। এ সময় তিনি কলকাতার সত্যযুগের ঢাকা প্রতিনিধিও ছিলেন। ১৮৫৩ সালে সাব-এডিটর হিসেবে যোগ দেন ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসে। ১৯৫৪ সালে অবজারভারের খণ্ডকালীন বার্তা সম্পাদকের ভারও বহন করেন। ইত্তেফাকেও সম্পাদকীয় লেখকের কাজ করেছেন বেশ ক'দিন। স্কুল জীবনে কলকাতার অল ইন্ডিয়া রেডিওতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশ নিতেন। ১৯৪৭-এর পর পাকিস্তান ব্রডকাস্টিং সার্ভিস ও পরে রেডিও পাকিস্তানের অনুষ্ঠান বিভাগে যোগ দেন। সেই সুবাদে ১৯৬০ সালে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশনের (বিসিসি) পূর্ব পাকিস্তান অনুষ্ঠান বিভাগে যোগ দেন। সে সময় বিবিসি সপ্তাহে মাত্র দুই দিন পনের মিনিট করে অনুষ্ঠান প্রচার করত। সিরাজুর রহমান-এর বিরামহীন প্রয়াস ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিবিসিতে নিয়ে আসেন ব্যাপক পরিবর্তন। ১৯৯৪ সালে তিনি যখন ৩৪ বছর পর অবসর নেন তখন বিবিসি দিনে চারবার করে বাংলা অনুষ্ঠান প্রচার করত।

ভাষা আন্দোলনে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আজও অগ্রন্থিত। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিবিসিকে বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ের কাছে পৌঁছে দেন। এরশাদবিরোধী আন্দোলনেও তার অবদান তাৎপর্যময়। বার্লিন দেয়ালের পতন এবং সোভিয়েত শাসন অবসান তিনি চাক্ষুস করেছেন এবং সফল প্রতিবেদক। ঘুরেছেন তামাম দুনিয়া, পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে আছে তার গুণগ্রাহী। যেমন– বাইরের পৃথিবীতে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার জন্য বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে সবচেয়ে মশহুর তিনি।

চার.

সিরাজুর রহমান যেমন বহু ইতিহাসের নির্মাতা, তেমনি নিজেও এক ইতিহাস। তারই উজ্জ্বল স্মারক তার নিজের লেখা বইগুলো। ঢাকা-কলকাতা লণ্ডন থেকে প্রকাশিত এ যাবৎ তার কুড়িটির মতো গ্রন্থের হদিস পেয়েছি আমরা। বাকিগুলো লাপাত্তা। তার বই : প্রীতি নিন সকলে, লণ্ডনের চিঠি, ইতিহাস কথা কয় ও নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ, ইরাকের বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধ, বাংলাদেশ : স্বাধীনতার পনের বছর;

অনুবাদ : টম সয়্যার, দ্যা স্কার্লেট লেটার, প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস, অন্তন চেখভের নাটক, গ্রেট এক্সপেকটেশনস, জেন আয়ান; সম্পাদক দায়ী নহেন, বিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত, ভালুক, দি ইম্পোর্টেন্স অব বিয়িং আর্নেস্ট এবং তার আত্মজীবনী এক জীবন এক ইতিহাস।

ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধে তার ভূমিকা, সাংবাদিকতায় তার অবদান যেমন অনুদঘাটিত রয়ে গেছে, তেমনই তার লেখক জীবনও রয়ে গেছে আচ্ছাদিত। দায়িত্বশীল সমালোচক ও মেধাবী গবেষকের অভাবে তার জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশটি আজও পড়ে আছে আমাদের চোখের বাইরে।

এ ক্ষেত্রে সিরাজুর রহমানের মার্জিত রুচিশীল ভদ্রলোকোচিত মানসিকতাও কিছুটা দায়ী। কোলাহলের পথ তার নয়। 'নিজেকে করিতে গৌরব দান' এর ইতর-মানসিকতা তার কখনোই ছিল না। ফলে হাটের হট্টগোলে যারা অন্যের পাথেয় কেড়ে খায়, তাদের সঙ্গে একই পঙ্‌ক্তিতে বসতে চিরকালই অনীহা তার। সে জন্যই নেপথ্যের নির্জনতা তাকে মহিমান্বিত করে। কিন্তু দেশপ্রেম ও দায়িত্বশীলতা তাকে বারবার করে রাখে কর্মব্যস্ত। এই কর্তব্যবোধ থেকেই উৎসারিত তার গ্রন্থের পৃথিবী।

উপন্যাসে আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'পদ্মা মেঘনা যমুনা' এবং সুনীল গঙ্গোপাধায়ের 'পূর্ব পশ্চিম' কিংবা প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁর আত্মজীবনী 'বাতায়ন'-এর যে অবস্থান ও মূল্য, আমি মনে করি সিরাজুর রহমানের 'এক জীবন এক ইতিহাস'কে সেই আলোতে দেখাটা জরুরি। কারণ, এ গ্রন্থ কেবল ব্যক্তি জীবনী নয়, এ হলো আমাদের সমাজ জীবনের মহামূল্যবান ইতিহাস। আমাদের সাংবাদিকতার জলজ্যান্ত দলিল। আমাদের নিজেদের দেখার ও চেনার আয়না। নির্মোহ, নৈর্ব্যক্তিক, সংযত তার বলার ভঙ্গিটি। গাফ্ফার চৌধুরীর মতো আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তিনি ইতিহাস লেখেন না। নির্মেদ এবং ঝরঝরে তার ভাষা। অথচ গভীর অভিনিবেশ পাতায় পাতায়। অতিকথন ও অতিরঞ্জন থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত।

তার বইগুলো এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ঢাকায় যেমন, লণ্ডনেও তেমন। এখন দরকার তার রচনাবলীর প্রকাশ।

পাঁচ.

১৭ অক্টোবর বিকেল ৬টায় ইস্ট লন্ডনের হোয়াইট চ্যাপেলে ইতিহাসখ্যাত কুইন মেরি বিশ্ববিদ্যালয় পিপলস প্রেস মিলনায়তনে যখন পৌঁছলাম, তখন কানায় কানায় ভরে গেছে অডিটেরিয়াম। আমার সঙ্গে ডাবলিন থেকে আসা আয়ারল্যান্ড মাইনরিটি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট বন্ধু শেখ মহিউদ্দিন আহম্মদ। করতালিতে মুখর হয়ে উঠল মিলনায়তন। আগেই স্ত্রী সফিয়া রহমানকে সঙ্গে নিয়ে এসে গেছেন 'সুস্থ সংবাদিকতার পথিকৃৎ' সিরাজুর রহমান, সবার সিরাজ ভাই। আমাদের স্বাগত জানালেন ড. মালিক ও সাঈদ চৌধুরীসহ অন্যরা। বিলেতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের

সব শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধিরা ছুটে এসেছেন সিরাজ ভাইকে শ্রদ্ধা জানাতে। শুভ্র কেশ চিরকালের শান্ত সিরাজ ভাই চুপচাপ বসে আছেন।

অনুষ্ঠান শুরু হলো সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার পর। বাইরে গা-হিম করা শীতে যখন লণ্ডন কাঁপছে, সেই সময় মিলনায়তন উপচে পড়ে প্রাণের কলরব। ড. মালিকের সভাপতিত্বে মঞ্চে আসন নিলাম আমরা। চমৎকার অত্যাধুনিক মিলনায়তনের কোনায় প্রাণের উত্তাপ। উপস্থাপনায় এলেন সদস্যসচিব সাঈদ চৌধুরী। মওলানা আবদুল মুকিতের কোরআন তেলাওয়াতের ভেতর দিয়ে শুরু হলো কর্মসূচি। সিরাজ ভাই, সফিয়া ভাবী এবং আমাকে ফুল দিয়ে বরণ করা হলো কর্মসূচি। এরই মধ্যে অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রকাশিত সুন্দর স্যুভেনীরটি দর্শকদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ, প্রসেফসর মনিরুজ্জামান মিঞা, সাদেক খান, শওকত আলম চৌধুরী, মহিদুর রহমান, মানসী বড়ুয়া, গোলাম কাদের, সাগর চৌধুরী, শামসুল আলম লিটন, মনোয়ার হোসেন বদরুদ্দোজা, মেজর (অব.) সৈয়দ আবু বকর সিদ্দিক এবং আমি সহ অনেকেই লিখেছেন তাতে।

প্রথমেই ড. মালিকের স্বাগত ভাষণ। এরপর সাঈদ চৌধুরী ও শামসুল আলম লিটন নির্মিত সিরাজ ভাইর সাক্ষাৎকার ভিত্তিক তথ্যবহুল একটি ডকুমেন্টারি ছবি প্রদর্শিত হলো। উপস্থাপক বললেন, এবার মানপত্র পাঠ। কিন্তু প্রথাগত কোনো মানপত্র নয়। কবি আবদুল হাই শিকদারের লেখা একটি কবিতার মধ্যেই প্রতিধ্বনিত হয়েছে আমাদের সব কথা। সেই কবিতাটিই আজ আমাদের মানপত্র, সেটাই সিরাজ ভাইকে উপহার দেব। তার আগে কবির স্বকণ্ঠে তা আমরা শুনব। আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, বক্তব্য পরে দেব। এখন শুধু 'সিরাজুর রহমান চিরদিনের' কবিতা আবৃত্তি শেষ করে যখন সেটি সিরাজ ভাইর হাতে তুলে দিচ্ছি– সে এক অনন্য মুহূর্ত। সব দর্শকশ্রোতা ওঠে দাঁড়িয়ে করতালিতে ফেটে পড়লেন।

শুরু হলো বক্তৃতার পর্ব। কথার মালায় সিরাজ ভাইকে অভিষিক্ত করার পালা। একে একে মঞ্চে উঠে এলেন টাওয়ার হ্যামলেটের লিডার (বর্তমান নির্বাচিত মেয়র) লুৎফর রহমান, বিবিসি বাংলা বিভাগের প্রধান সাবির মোস্তফা, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক শাসসুল আলম চৌধুরী, বাসসের সাবেক প্রধান গাজীউল হাসান খান, লণ্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সভাপতি বেলাল আহমদ, শিক্ষাবিদ কর্ণেল (অব.) আলী আহসান, কবি ফরিদ আহমেদ রেজা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ফরহাদ হোসেন, ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক প্রধান মিয়া মনিরুল আলম, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের সাবেক প্রধান আবু তাহের চৌধুরী, প্রবীণ কলামিস্ট জগলুল হোসেন, ব্রিটিশ বাংলাদেশের চেম্বার অব কমার্সের ডাইরেক্টর সাদ গাজী, ফেডারেশন অব ক্যাটারার্সের প্রেসিডেন্ট ইয়াউর খান, আইরিশ মাইনরিটি কাউন্সিলর প্রেসিডেন্ট শেখ মহিউদ্দিন আহমদ, শামসুল আলম লিটন, মেজর (অব.) আবুবকর সিদ্দিক, লন্ডন মেইলের সম্পাদক ড. এমএ আজিজ, ড. শামসুদ্দীন আহমদ, ব্যরিস্টার ফিরোজ হাসান, অধ্যাপক ফরিদ আহমদ, নাসির

হেলাল প্রমুখ। সবশেষে প্রধান অতিথির ভাষণ। আমার বক্তৃতার পর ভাষণ দিলেন সিরাজুর রহমান।

দীর্ঘ বক্তৃতা করার সময় ছিল না। শ্রোতাদের দাবি ছিল। কিন্তু উপায় ছিল না। সংক্ষেপে যতটুকু পেরেছি, বললাম, 'এই অনুষ্ঠানটি হচ্ছে বাঙালিদের করা আজকের শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান। যদিও সন্ধ্যা আসছে মন্দ মন্থরে, তবু আমরা যে পরাভব মানব না কোনদিন, তারই স্বাক্ষর আজকের অনুষ্ঠানটি। সিরাজ মানে প্রদীপ। সেই প্রদীপের শিখা চিরদিন আমাদের পথ দেখিয়ে গেছে, সামনের দিনগুলোতেও দেখাবে নিশ্চয়। আজকের অনুষ্ঠানটি গভিরভাবে দেখলে–স্বাধীনতার অনুষ্ঠান, মঙ্গলের যাত্রীদের অনুষ্ঠান। অসাধারণ এক জাতীয় কর্তব্য এখানে সম্পাদিত হলো। সিরাজ ভাইকে সম্মান দেখানোর অর্থ জাতীয় ইতিহাস এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সম্মান দেখানো।'

আবেগাপ্লুত সিরাজুর রহমান সংক্ষিপ্ত ভাষণে বললেন, 'আজ আপনারা আমাকে যে ভালোবাসা ও সম্মান দেখালেন, তার কোনো প্রতিদান দেয়ার সাধ্য আমার নেই। তবে আজীবন আমি সত্যের সঙ্গে, ন্যায়ের সঙ্গে থাকতে চেয়েছি। আমার সব সামর্থ্য দিয়ে চেষ্টা করছি সত্য ও ন্যায়কে তুলে ধরতে। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে আমৃত্যু আমি দেশের জন্য, মানুষের জন্য লিখে যেতে চাই।'

সিরাজ ভাইর বক্তৃতা শেষ হতে হতে রাত ৯টা। তার বক্তৃতার পর যেন শুরু হলো করতালির আতশবাজি। টানা ১০ মিনিট ধরে চলল বিরামহীন করতালি। সবাই ছুটে আসছেন মঞ্চের দিকে। বিজাতীয় বিভাষীয় লণ্ডনের কুইন মেরী ইউনিভার্সিটির পিপলস প্রেস মিলনায়তন ততক্ষণে পরিণত হয়েছে একখণ্ড বাংলাদেশে। হ্যান্ডশেক, কোলাকুলি ফ্লাশের ঝিলিক, সৌজন্য বিনিময় আর ভিড়ভাট্টা মিলে যেন ফুলে-ফেপে উঠেছে পদ্মা-মেঘনার কূল-উপকূল। প্রাণের আবেগ প্রাণের বাসনা রুধিয়া রাখিতে নারি।

ভিড়ের ভেতর থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন সদ্য লণ্ডন প্রবাসী সাংবাদিক সহযোদ্ধা সালেহ শিবলী আর বন্ধু মাহিদুর রহমান। নিয়ে চললেন গ্রাউন্ড ফ্লোরে। সেখানে লণ্ডনের বিখ্যাত রেস্টুরেন্ট 'বাবুর্চী'র বিরিয়ানি পরিবেশিত হচ্ছে সবার জন্য।

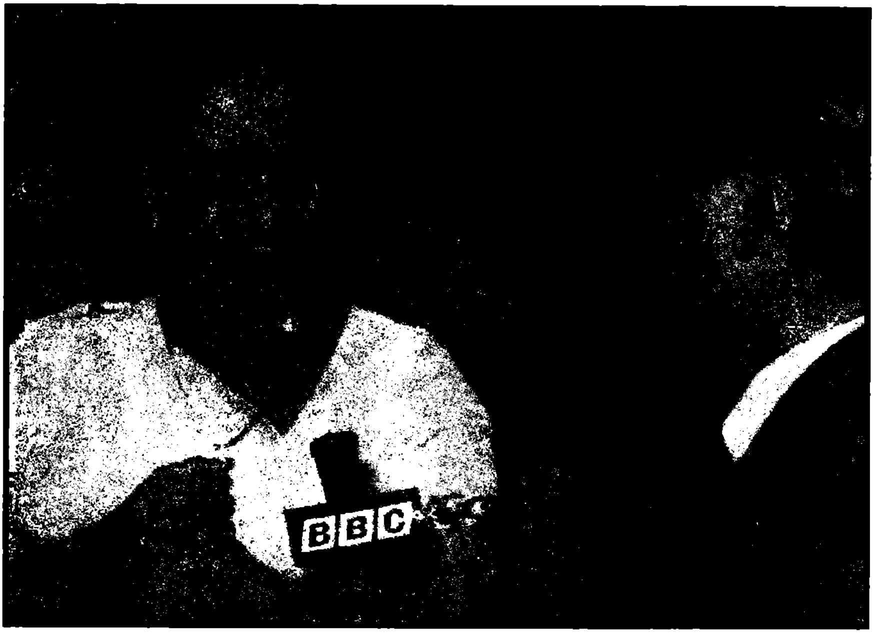

শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী সিরিমাভো বন্দর নায়েকের মুখোমুখি (১৯৬৪)

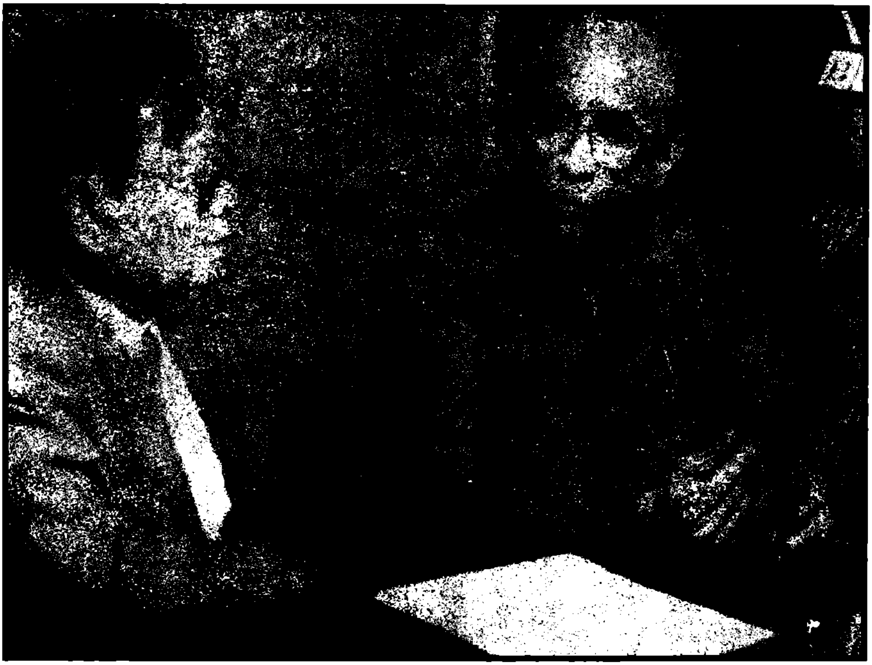

জ্যোতি বসুর সঙ্গে গ্রন্থকার সিরাজুর রহমান

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর একান্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ (১৯৬৯)

হাস্যজ্জ্বল পরিবেশে লন্ডনে শেখ মুজিবুর রহমান এর সঙ্গে গ্রন্থকার

লন্ডনের হিল্টন হোটেলে (১৯৯২) অবস্থানকালে গ্রন্থকারকে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন বেগম খালেদা জিয়া

আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে বিবিসির সাংবাদিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন সিরাজুর রহমান

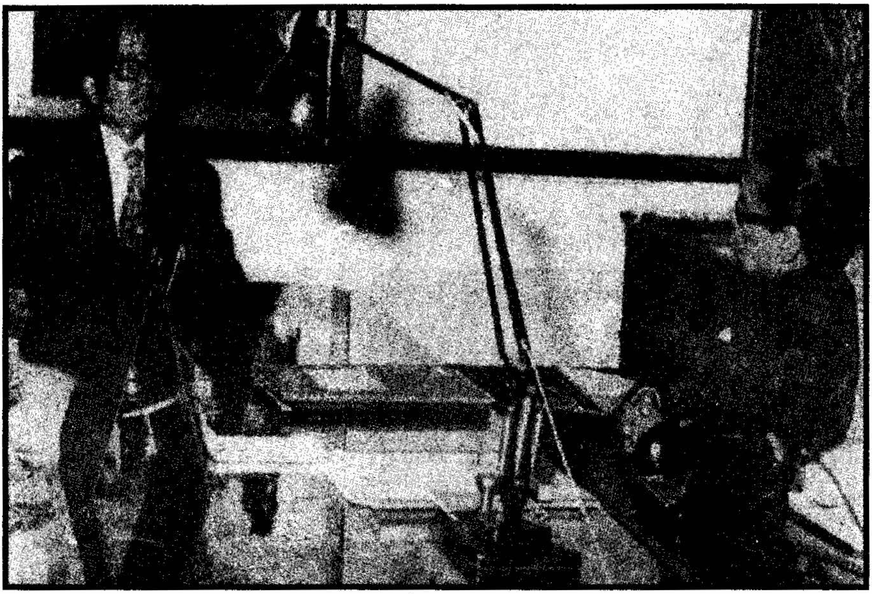

প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ (১৯৭২)

বিচারপতি আবদুস সাত্তার এর সঙ্গে (১৯৮২)

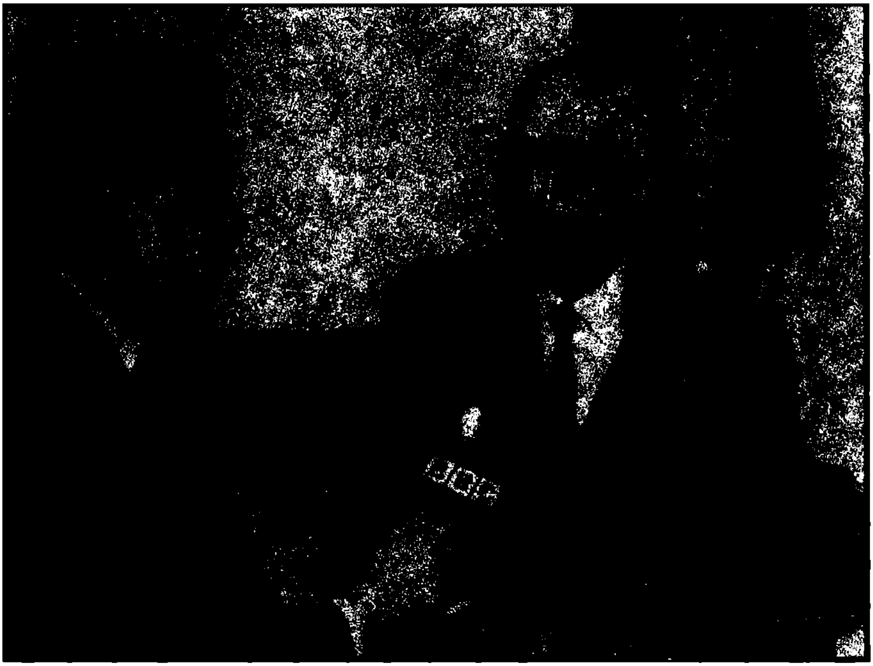

পাকিস্তান মুসলিম লীগ সভাপতি মিয়া মমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানার সাক্ষাৎকার গ্রহণ (১৯৬৯)

প্রেসিডেন্ট জেনারেল এরশাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ (১৯৮৩)

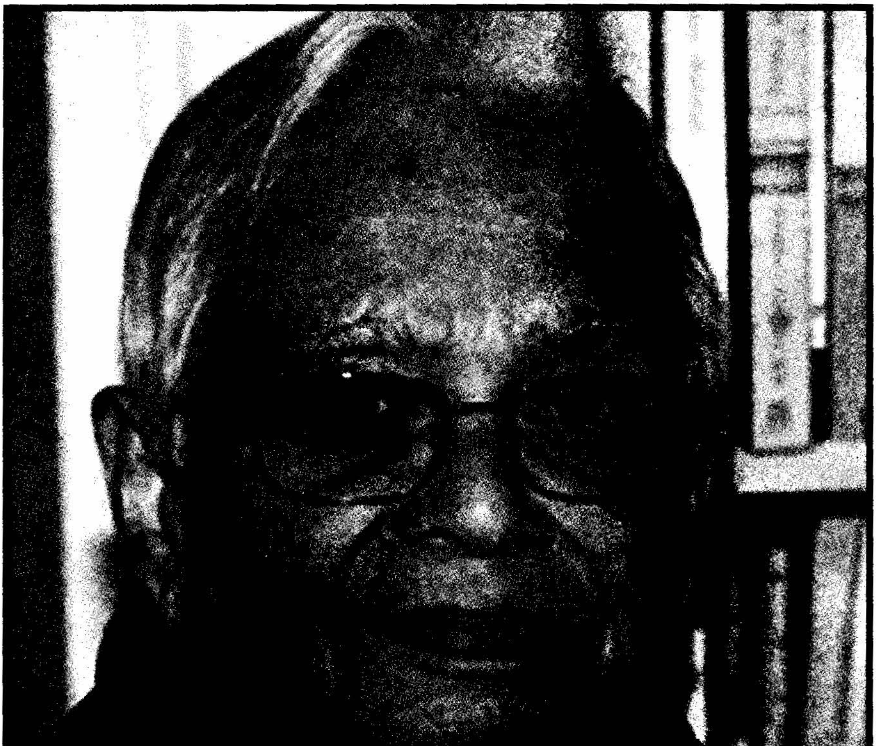

সিরাজুর রহমান

জন্ম ঃ ১৯৩৪ নোয়াখালী। মৃত্যু ঃ ১ জুন ২০১৫ লন্ডন।

সিরাজুর রহমান

জন্ম নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার রহমতপুর গ্রামে ১৯৩৪ সালে। স্কুল জীবন কলকাতায়। সাংবাদিকতার শুরু তখন থেকেই। পূর্ণ কালীন সাংবাদিকতা ১৯৫০ সালে ঢাকা থেকে। অর্ধ সাপ্তাহিক পাকিস্তান, দৈনিক জিন্দেগী, দৈনিক ইনসাফ, দৈনিক মিল্লাত, পাকিস্তান অবজারভার ও দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় সাংবাদিকতা। প্রধান সম্পাদক হিসাবে বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শুরু হয়।

বিবিসি বাংলা বিভাগে যোগদান
জানুয়ারী ১৯৬০, অবসর গ্রহণ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪। মুক্তিযুদ্ধে বিশ্ব মিডিয়া সংযোগের দায়িত্ব পালন করেছেন।

কলাম লেখক হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তা বিপুল। লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। স্ত্রী সোফিয়া রহমান অবসরপ্রাপ্ত হাইস্কুল শিক্ষক। পুত্র সাইফুর রহমানের মৃত্যু ২০১১ সালে, কন্যা নাজনীনের ২০02 সালে। চার মহাদেশে বহু দেশ সফর করেছেন।

গত ১ জুন ২০১৫ সোমবার লন্ডনে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

সিরাজুর রহমান চিরদিনের

আবদুল হাই শিকদার

পলাশী রুখতে পদ্মা কিনারে দেশমুক্তির যুদ্ধ,
জ্বালালো সিরাজ সিরাজের শিখা পবিত্র পরিশুদ্ধ।
দেশ থেকে দেশে ছড়ান আতর ক্লান্তিবিহীন কনভয়,
মাতৃভূমির গতরে জঠরে তার কথা অক্ষয়।

রহমান তিনি বহমান তিনি সৌরলোকের কেন্দ্র,
অভ্রংলিহ তিনিই তো একাকী, প্রীতি নিন মানবেন্দ্র।
অন্দরে তিনি অন্তরে তিনি, বাইরেও মহাকাশ-
তাকেই সালাম জানিয়ে পাঠায় জীবনের উচ্ছ্বাস।

টেমসের পাড়ে মেঘনার ঢেউ বেদনার স্বরবর্ণ,
তার আত্মার প্রতি কলরবে স্বদেশের ধূলি স্বর্ণ।
তিনি থাকলেই চির তারুণ্য, না থাকলে সব শূণ্য,
সর্বনাশের বিরুদ্ধে তিনি অবিনশ্বর পূণ্য।

ইতিহাস তার হাতে নির্মিত, তিনি নিজে ইতিহাস,
শ্যামল দেশের পরতে পরতে আছে তার আশ্বাস।
আনন্দে তিনি আনন্দধারা, বরাভয় সংকটে,
শুশ্রূষা হাতে ছুটে যান দুঃখে পাললিক সমতটে।
তাকে দেখলেই লাঞ্ছিত নদী সেও হয়ে ওঠে নাব্য,
আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তিনি আমাদের মহাকাব্য।

বয়স তো তাকে হারাতে পারে না, প্রতি ভোরে তিনি সূর্য,
গৌরব তিনি সৌরভ তিনি আপস না জানা তূর্য।
ব্যাকুল দু'হাতে অকল্যাণের আঁধার তাড়ান বার বার,
বাংলাভাষীর প্রতিটি হৃদয়ে আছে তার সংসার।

[সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কুইন মেরী ইউনিভার্সিটিতে পঠিত ১৭-১০-২০১০]